

'খাইবার ফ্যালকন'—এ লুণ্ঠনকারী সর্দার বাজপাখীকে ক্যারাভানের সংবাদ আনতে ছেড়ে দিচ্ছে।



"খাইবার ফ্যালকন" ছবিতে উপজাতীয়দের 'খাটাক্' নৃত্য। ছবিটি তোলা হয় রাওয়ালপিণ্ডির কাছে একটি 'লোকেশনে' ১৯৩০ সালে।



'লাহোর'-এর পথে ষ্টীয়ারিংএ শ্রীমতি সাধনা বসু—গাড়ীর সামনে মেকানিক্ ড্রাইভার বিষ্টু



লাহোর-এর ফিরোজপুর রোডস্থ বাংলোর সামনে—১৯৩১ সালের মার্চ মাসে।



অহীন্দ্র চৌধুরী 'বিদ্যুৎপর্ণা' নাটকে মোহন্ত রূপে



'ওমর খৈয়াম'এ সাকী [সাধনা বসু] ও প্রীতিকুমার মজুমদার [ওমর]

আমার জীবন

মধু বসু

বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯



মধু বসু---১৯৩৯ সাল ছবিটি তুলেছিল গীতা ঘোষ চৌরঙ্গী প্লেসের ফ্ল্যাটে

প্রথম প্রকাশ :
—বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীস্বপন কুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীপরাণ চন্দ্র রায়
সনেট্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৬



সাধনা বসু ঃ রাজ-নর্ত্তকী ছবিতে রাজনটী মধুছন্দা রূপে

আমার কথা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কোনো এক জায়গায় বলেছেন যে, সব ঘটনারই একটা ইতিবৃত্ত আছে। যেমন সন্ধ্যার সময় পল্লীরমণীরা তুলসীতলায় প্রদীপ দেয় কিন্তু তার আগে আছে দুপুরবেলায় তাদের সলতে পাকানোর ইতিহাস। তেমনি আমারও এই জীবনী লেখার একটা ইতিহাস আছে। হঠাৎ কেন এই জীবনী লেখার সখ হলো আমার? আমি তো সাহিত্যিক নই—লেখা আমার পেশা নয়, নেশাও নয়। আমার জীবনের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমি বহু সাহিত্যিক, কবি ও নাট্যকারের সংস্পর্শে এসেছি—তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কত আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু একদিনের জন্যেও সাহিত্যিক হবার বাসনা মনে জাগেনি।

কিন্তু হঠাৎ এই সাহিত্য-বাসরে নামবার কারণ কি? সেই সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কিছুকাল আগে আমার আবাল্য সুহৃদ শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন কথায় কথায় বললে: বর্তমানে তো তোমার হাতে কোনো ছবি নেই—একটা কাজ কর না কেন?

আমি বললাম: কি কাজ?

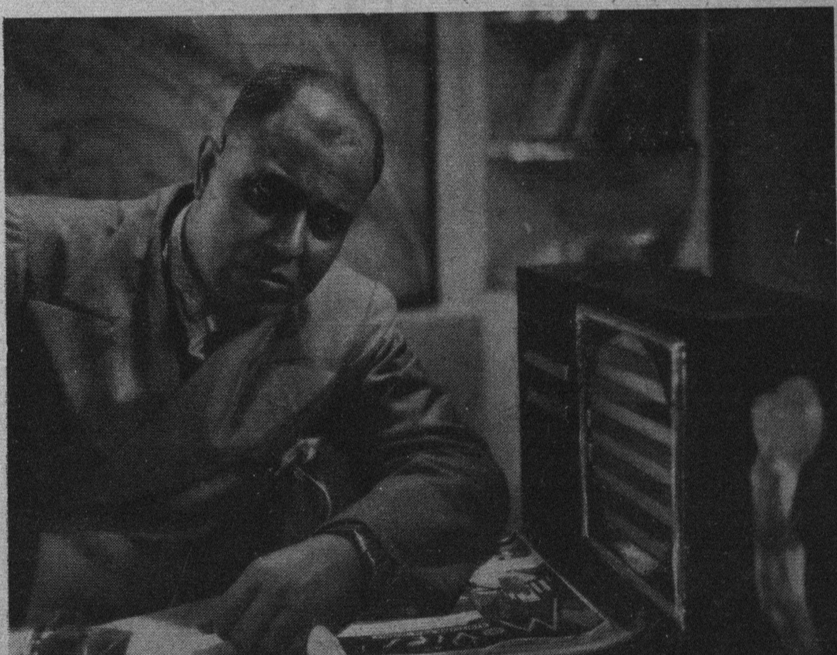
—নিজের জীবনী যাকে বলে Reminiscences লেখ না কেন? তোমার জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে যা খুব কম লোকের জীবনেই ঘটে—বাংলা তথা ভারতের মঞ্চ ও চিত্রজগত সম্বন্ধে একটা সুন্দর ইতিহাস পাওয়া যেতে পারে তোমার লেখার মধ্যে।

আমি সেদিন তার সামনে কথাটার খুব গুরুত্ব দিইনি—বরং হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু কথাটা একেবারে উড়িয়েও দিতে পারিনি—প্রায়ই মনের মধ্যে সৌম্যেনের কথাটা উঁকি ঝুঁকি মারতো।



'রাজনটী' নাটকের একটি দৃশ্যে মধু বসু (যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি) ও সাধনা বসু (রাজনটী মধুছন্দা)।



'অভিনয়' ছবিতে থিয়েটার ম্যানেজারের ভূমিকায় তুলসী লাহিড়ী

এই সুরু হলো 'আমার জীবন' লেখা।

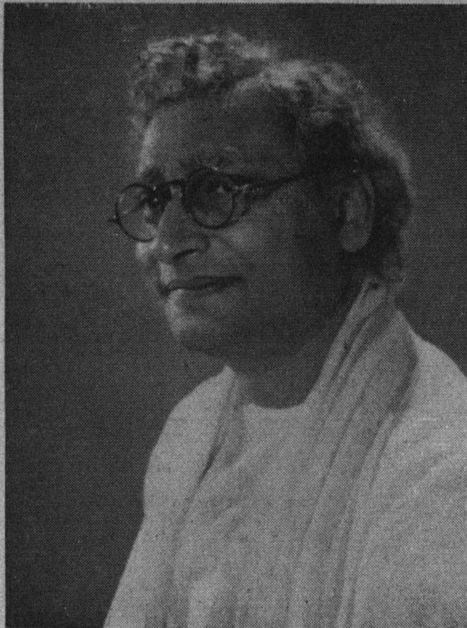
কিন্তু পরে দেখলাম মুখের কথায় অনেক ফাঁক থেকে যায়। যা লিখতে চাই তা মুখে বলতে গিয়ে অনেক ভুল করে ফেলি। শেষে ইংরেজি-বাংলার মিশ্রণে একটা রচনা নিজেই খাড়া করলাম। আর তার ওপর ভিত্তি করেই বঙ্কিম নিজের ভাষায় তা লিখে যেতে লাগল। এইভাবে বেশ কিছুদিন গেল এটা সম্পূর্ণ করতে।

লেখা শেষ হবার পর একদিন সৌম্যেনই আমায় নিয়ে গেল বিখ্যাত প্রকাশক এম. সি. সরকার এণ্ড সন্সের দোকানে। স্বত্বাধিকারী শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। ওখানে তখন আমার আর একজন বন্ধু বসেছিলেন —তিনি হচ্ছেন 'প্রবাসী' সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এবং সুধীর-বাবু দুজনেই খুব উৎসাহ প্রকাশ করলেন এই জীবনী প্রকাশ ব্যাপারে এবং এটি ধারাবাহিক ভাবে 'অমৃত' পত্রিকায় ছাপবার কথাও বললেন। তবে তিনি এই কথাটাও বললেন যে এই জীবনীটা যেন ছ' সাত মাসের মধ্যেই শেষ হয়। কারণ তা না হলে পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা।

আমি সেই ভাবেই অগ্রসর হচ্ছিলাম। ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সাল থেকে 'অমৃত'-এ প্রকাশিত হতে সুরু করল। অনেকেই লেখা পড়ার পর আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। এর মধ্যে আরও যাঁরা আমাকে উৎসাহ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কবি-দম্পতি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর একজন যিনি আমার লেখায় নানাভাবে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি হলেন বন্ধুবর 'অমৃত' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ একটি চিঠি পেলাম এমন একজন সাহিত্যিকের কাছ থেকে যাঁর সঙ্গে আগে আমার কোনও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তাঁর লেখা অবশ্যই পড়েছি কিন্তু চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় হয়নি। চিঠিখানির খানিকটা অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

"এবার অনেক বছর পরে আপনার জীবনীতে আটকে গিয়েছি। 'অমৃত' পত্রিকাটি এলেই আপনার রচনাটি পড়ে তবে অন্য কাজে হাত দিই। এত ভালো লাগছে পড়তে যে ভয় হয় শেষ পর্যন্ত ভালো লাগবে তো? আপনি যে-যুগের কথা লিখছেন সে-যুগ আমার কাছে খুব স্পষ্ট ছিল না। আপনার লেখার মাধ্যমে তা স্বচ্ছ হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে।



'অভিনয়ে' পীতাম্বর চৌধুরীর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী



'অভিনয়ে'র একটি দৃশ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্য (হীরক চৌধুরী) ও সাধনা বসু (মনীষা)

শুধু একটি অনুরোধ যে কোনও কারণে এটিকে আপনি সংক্ষিপ্ত করবার চেষ্টা করবেন না। আমরা আপনার জীবনের আপনার যুগের সমস্ত খুঁটিনাটি ঘটনা ও কাহিনী শুনতে উৎসুক। আপনার আনন্দ-বেদনা আপনার আবেগ-উদ্বেগ আমাদেরই আনন্দ-বেদনা, আবেগ-উদ্বেগ হয়ে উঠছে। আপনার অন্য সমস্ত পরিচয় বিচ্ছিন্ন করে আপনার এই রচনাটিকে সাহিত্য বিচারের মানদণ্ডে ওজন করেই এই প্রশস্তি-বাক্য লিখছি। একজন সামান্য পাঠক হিসাবে আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করছি। এর চেয়ে বড়ো গুণ লেখার আর কী হতে পারে আমার জানা নেই।"

কথাটা আমার খুব মনে লাগলো। ভেবে দেখলাম—সত্যিই তো—যদি ছ' সাত মাসের মধ্যে আমার আত্মকথা শেষ করতে হয়, তাহ'লে আমার ঘটনা-বহুল জীবনের অনেক বক্তব্য বাদ পড়ে যাবে। সুতরাং আমি তখন আরও বিস্তারিত ভাবে লিখে ছ' সাত মাসের পরিবর্তে বৎসরাধিককাল সময় নিয়ে এই আত্মকথা রচনা শেষ করলাম।

এই পত্রখানির লেখক হলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীবিমল মিত্র। তাঁর সঙ্গে এই সূত্রে আমার একটা গভীর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

পরে পাণ্ডুলিপিটি পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় বিমল আগাগোড়া পড়ে সংশোধন করে দিয়েছে। এর আগে অনেকটা অংশ সংশোধন ও পরিমার্জন করে দিয়েছিল আমার বিশেষ প্রীতিভাজন বন্ধু সাংবাদিক, সমালোচক ও চিত্র পরিচালক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়। এদের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

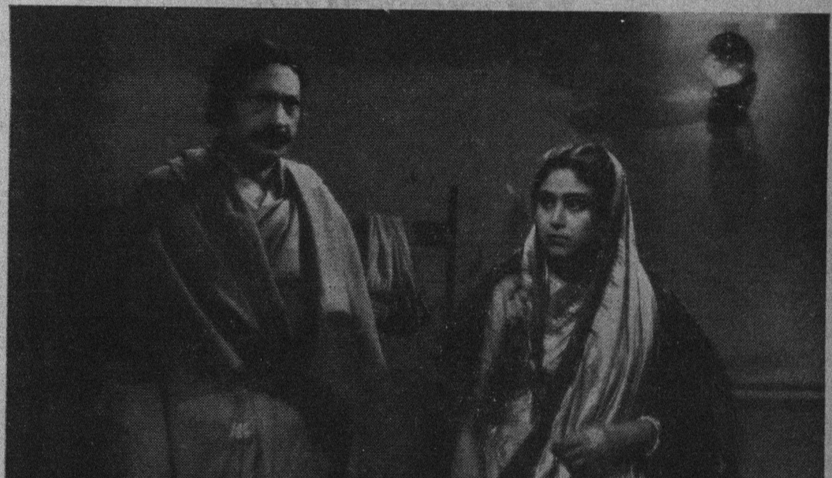
সর্বশেষে আমি আর একজনের নাম এই প্রসঙ্গে সানন্দ চিত্তে স্মরণ করতে চাই। তিনি হলেন 'বাক-সাহিত্য'র কর্ণধার শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই পুস্তক প্রকাশে শচীনবাবুর পরিশ্রম ও আন্তরিকতা বিশেষ ভাবে আমাকে মুগ্ধ করেছে।

ইতি—

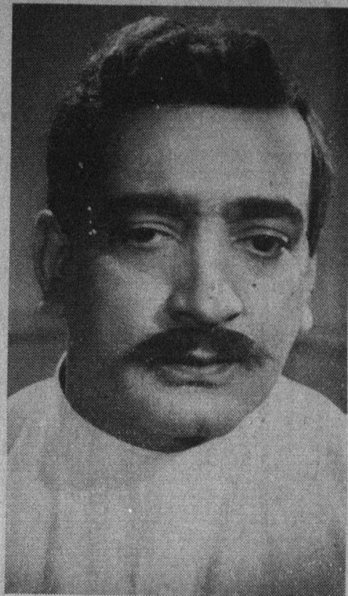




'মাইকেল মধুসূদন' চিত্রের নাম ভূমিকায় উৎপল দত্ত সর্বপ্রথম চিত্রাবতরণ করেন।



'মাইকেল মধুসূদন' চিত্রের একটি দৃশ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী (রাজনারায়ণ দত্ত) ও মলিনা (জাহ্নবী দেবী)



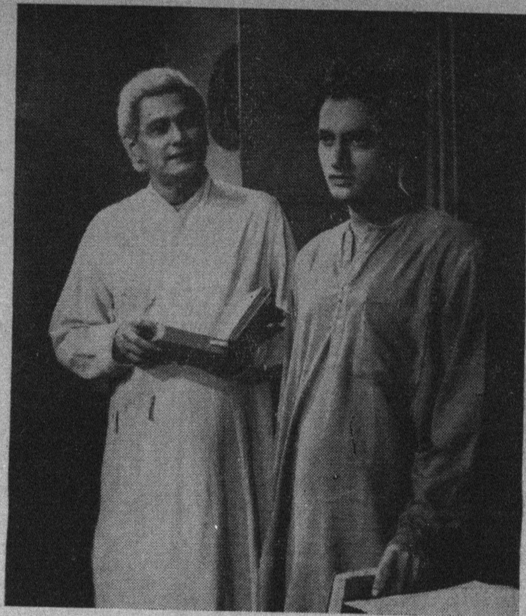
মহাকবি গিরিশচন্দ্রে' নাম ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল



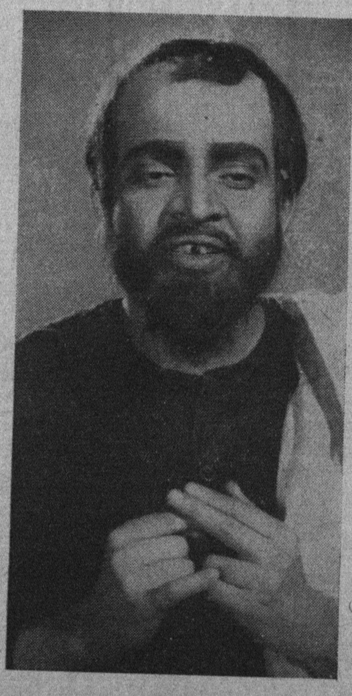
মহাকবি গিরিশচন্দ্রে'র একটি দৃশ্যে অসিতবরণ (অমৃতলাল) এবং পাহাড়ী সান্যাল (গিরিশচন্দ্র)

মার উদ্দেশ্যে

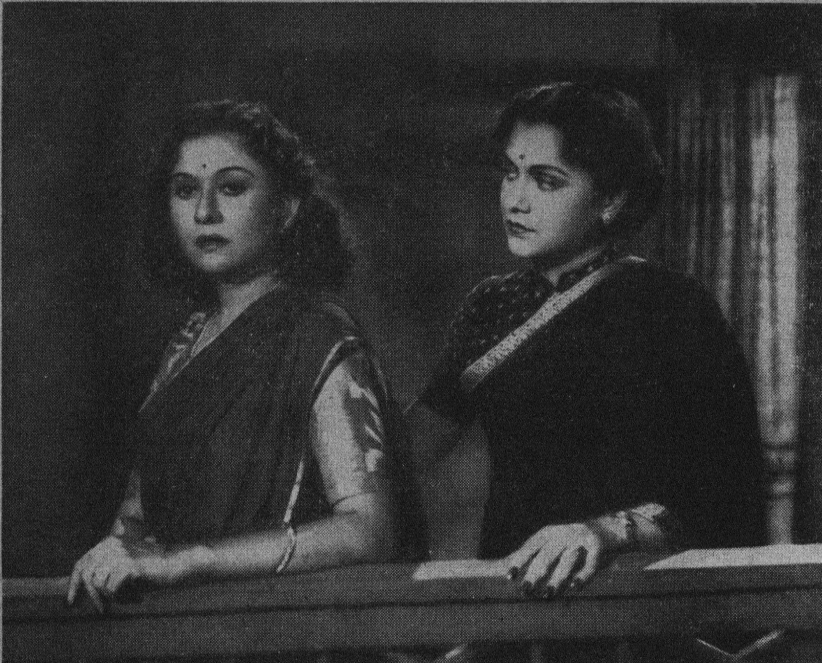
—মধু



'শেষের কবিতা'র একটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস (অবনীশ) ও
সমর রায় (শোভনলাল)



'মহাকবি গিরিশচন্দ্রে' ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভূমিকায় [illegible]



'শেষের কবিতা'র একটি দৃশ্যে সাধনা বসু (কেটি) ও বনানী চৌধুরী (সিসি)



'শেষের কবিতা'র একটি দৃশ্যে নির্মল কুমার (অমিত) ও দীপ্তি রায় (লাবণ্য)



মা



'অভিনয়ে'র একটি দৃশ্যে প্রতিমা মুখোপাধ্যায় (রাজকুমারী রত্না)
ও ধীরাজ ভট্টাচার্য (হীরক চৌধুরী)



"রূপ কথা" নাটকের একটি দৃশ্যে সাধনা বসু (রাজকন্যা) ও অহীন্দ্র চৌধুরী ([illegible])



"কুমকুম্" ছবিতে নাম ভূমিকায় সাধনা বসু



"কুম্‌কুম্-এর একটি দৃশ্যে ভুজঙ্গ রায় (সূর্যশঙ্কর) ও রবি রায় (জগদীশ প্রসাদ)

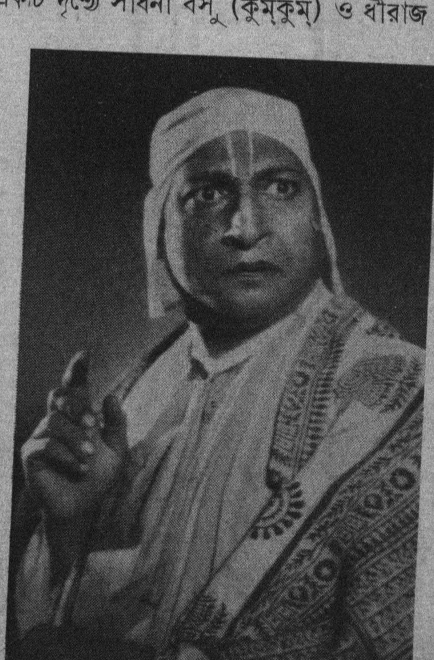
আমার জীবনের শেষ পরিচ্ছেদে এসে কেন যে এই জীবন কাহিনী লিখতে বসলাম তার একটা পূর্বভাষণ প্রয়োজন। কিন্তু লিখতে গিয়ে ভাবছি আমার জীবন তো শুধু আমার একলার জীবনই নয়, আমার জীবনের সঙ্গে যে আরো অসংখ্য মানুষের জীবন জড়িয়ে আছে, তাদের সকলের কথা কি আমি অকপটে আর অসঙ্কোচে বলতে পারবো? সে অধিকার কি আমার আছে? যদি অপকট সত্য কথা বলতে গিয়ে কাউকে আমি অজ্ঞাতে আঘাত দিয়ে ফেলি? যদি আমার লেখা পড়ে কেউ ক্ষুণ্ণ হয়?

যখন আত্মকথা লিখতে সুরু করি তখন মনে মনে এই সিদ্ধান্তই করেছিলাম যে সহজ ও নির্ভয়েই করবো। জীবনে যা ঘটেছে বা ঘটছে তা যতই অপ্রীতিকর হোক, তা চিরদিনের মত আড়ালে রাখবো না, অর্থাৎ কোনও মিথ্যে ভাণের প্রশ্রয় দেব না। কোনও উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্য অথবা সত্যকে অবগুণ্ঠিত করবো না। কিন্তু আমার কথা যতই এগোতে লাগলো, দেখলাম যে, যে-সিদ্ধান্ত নিয়ে লিখতে বসে-ছিলাম তার থেকে সরে যাচ্ছি, যাদের সঙ্গে আমার খুব গভীর হৃদ্যতা ছিল তাদের সম্বন্ধে লিখতে বসে দেখলাম যে বহু ঘটনা সত্য হলেও নির্ভয়ে প্রকাশ করা অসম্ভব। যেখানে আমার নিজের দোষ-ত্রুটির প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে আমি নির্মম এবং নির্ভীক হয়েছি, কিন্তু অন্যের ব্যাপারে কি ততখানি নির্মম হওয়া সম্ভব? একদিন যাদের সঙ্গে খুবই হৃদ্যতা ছিল, সমস্ত সত্য প্রকাশ করে দিয়ে তাদের মনে কি আঘাত দেওয়া উচিত?

যাহোক, যাঁদের সঙ্গে আমি আবাল্য পরিচিত, যাঁদের সঙ্গে আমি জীবনের যাত্রা সুরু করেছিলাম, তাঁদের অনেকেই আজ বিগত, আবার অনেকে এখনও আমাকে সঙ্গ দিয়ে চলেছেন। জানি আমার এই সত্য-ভাষণে সকলকে সুখী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই সে চেষ্টা আমি করবোও না। শুধু এই সূত্রে একজনকে স্মরণ করেই এই দুরূহ কাজে অবতীর্ণ হয়েছি। তিনি আমার মা। এই গ্রন্থের সুরুতেই তাই মা'কেই আমি একান্ত ভাবে স্মরণ করছি। আমি বিশ্বাস করি তিনি যেখানেই থাকুন, আমার এই প্রচেষ্টাকে তিনি নিশ্চয়ই অদৃশ্যলোক থেকে আশীর্বাদ করবেন। তিনি বার বার বলতেন 'মধু, ভগবানে বিশ্বাস রেখো, সুখে-দুঃখে তিনিই তোমাকে



কুম্‌কুম্‌-এর একটি দৃশ্যে সাধনা বসু (কুম্‌কুম্‌) ও ধীরাজ ভট্টাচার্য (চন্দন)



অহীন্দ্র চৌধুরী ঃ 'রাজনর্তকী' ছবিতে প্রভুপাদ কালীশ্বর গোস্বামী রূপে

রক্ষা করবেন।' তখন অবশ্য মায়ের কথায় আমি কর্ণপাত করিনি। ভাবতাম আমিই সব, আমিই কর্তা আর আমিই কারক। কিন্তু সংসারে অনেক দিন বেঁচে থেকে এইটুকুই সার বুঝেছি যে, অত বড় সত্য কথাও বুঝি আর দুটি নেই। আমার জীবনে সাফল্য এসেছে, সার্থকতা এসেছে, অর্থ ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য সব কিছুই এসেছে। যতটুকু চেয়েছি তার চেয়ে বেশিই পেয়েছি। কিন্তু তখনও বুঝিনি যে সাফল্যেরও একটা শেষ আছে আর সার্থকতারও একটা সীমা আছে। অনেক পাওয়ার আনন্দে অনেক হারানোর যন্ত্রণার কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। জানতে পারিনি যে জীবনে সুখ যেমন সত্য, দুঃখও তেমনি। ফুল যতখানি সত্য, কাঁটাও ঠিক ততখানিই। সেদিন মায়ের কথায় অবিশ্বাস করে জীবনের একটা দিকেই শুধু নজর রেখেছিলাম, অন্য দিকটা অগ্রাহ্য করে গিয়েছি।

কিন্তু যখন একটার পর একটা আঘাত আসতে লাগলো, ধীরে ধীরে সমস্ত আস্থার মূল শিথিল হতে সুরু করলো, তখনই আবার মায়ের সেই পুরোন কথা স্মরণে এলো—মধু, ভগবানে বিশ্বাস রেখো, সুখে দুঃখে ভগবানই তোমাকে রক্ষা করবেন।

মার কাছে শুনেছি, আমার যখন জন্ম হয় আমার দাদামশাই রমেশচন্দ্র দত্ত তখন লক্ষ্মৌয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর সভাপতিত্ব করে এসে কিছুদিন আমাদের ধর্মতলার বাড়ীতে আছেন। উত্তর প্রদেশ থেকে সদ্য ফিরেছেন বলে তিনি আমার নাম রাখলেন 'অযোধ্যা—অবশ্য সে নাম শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি। মধু নামটি যে কেন হলো তারও একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। শুনেছি, আমি যখন কয়েক মাসের শিশু, তখন আমাকে একদিন মধু খাওয়াতে গিয়ে আমার গলায় মধু আটকে যায়—আমার তখন প্রায় দম বন্ধ হবার অবস্থা। মা ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার এল এবং তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। এই সময় আমাদের এক চাকর ছিল—নাম পাহাড় (পরে প্রায় "পুরাতন ভৃত্যের" পর্যায়ে পড়েছিল), সে আমার নাম দিল মধু। এর পর বাড়ীতে সকলেই আমাকে মধু বলে ডাকতে শুরু করে এবং সেই নামটাই বহাল থেকে গেল।

আমার দাদা (অশোক) আমার নাম রাখলেন সুকুমার। আমার স্কুল ও কলেজে এই নামই চালু ছিল। তারপর যখন বিলেতে গেলাম, তখন আমার 'পাসপোর্টে'ও সুকুমার নাম ছিলো। কিন্তু যখন জার্মানীতে ছিলাম, তখন এমন নামবিভ্রাট হলো এই সুকুমার আর মধু নিয়ে যে, দেশে ফিরে এসে আমি সুকুমার নামটি বাতিল করে

দিলাম। আজকের দিনে কয়েকজন স্কুলের বা কলেজের বন্ধু ছাড়া সুকুমার বলে কেউ আমাকে জানে না। এই প্রসঙ্গে ছোটবেলার একটি ঘটনা মনে পড়ল।

যখন আমি রাঁচী জেলা স্কুলে পড়ি, তখন বয়স কতই বা হবে—নয় কিংবা দশ। আমাদের স্কুলে একটি লোক এলো—সে ছুঁচ দিয়ে গায়ের চামড়ায় নানারকম নক্সা বা নাম খোদাই করত কাল কালি দিয়ে—যাকে ইংরাজিতে Tattoo বলে। অনেক ছেলে তাদের হাতে নামের প্রথম অক্ষর লেখাল, আমিও হাতে বড় করে 'S' লেখালাম। অনেক বছর বাদে আমার বিয়ে হবার পর আমার হাতে 'S' লেখা দেখে বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলত: তোদের প্রেমই হলো আসল প্রেম—সাধনার নামটা পর্যন্ত হাতে লিখিয়েছিস! কিন্তু তাদের যখন আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতাম তখন কেউ আমার কথা বিশ্বাস করত আবার কেউ বা করতো না। তবে বেশীর ভাগই মনে করত, আমি একটা গল্প বানিয়ে বলছি। তারা ত বরাবর আমাকে মধু বলেই জানে, আমি আবার সুকুমার কবে ছিলাম!

আমার জন্ম বিংশ শতকের প্রথম ভাগে—১৯০০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় ৬৩নং ধর্মতলা স্ট্রীটে। সেই পুরানো বাড়ী ভেঙ্গে অবশ্য এখন নতুন বাড়ী হয়েছে। আমি বাবা-মার নবম সন্তান। আমার আগে তিন ভাই এবং পাঁচ বোন। আমি সর্বকনিষ্ঠ, দাদারা সবাই গত হয়েছেন, দিদিরা এখনও বেঁচে আছেন।

আমার মা কমলাদেবী ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যা। আর আমার বাবা ছিলেন প্রমথনাথ বসু। ভারত সরকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূতত্ত্ববিদ হিসেবে তাঁর যশ ছিল সুবিস্তৃত। অনেকের ধারণা, আমরা নাকি ব্রাহ্ম, অর্থাৎ বাবা-মা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এটা একটা মস্ত ভুল ধারণা—সুতরাং এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে বাবা বিলেতে থাকতেই ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হলেন এবং একেবারে চাকুরি নিয়েই দেশে ফিরলেন। কলকাতায় ইংরাজী শিক্ষিত প্রগতিশীল সমাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল, কিন্তু তাঁর গ্রাম গৈপুর (গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা) ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকের কাছে তখনও সমুদ্রযাত্রা ছিল প্রায় ধর্মত্যাগের সমান। ঐ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু পণ্ডিতসমাজ বাবার উচ্চ সরকারী পদপ্রাপ্তিতে গৌরবান্বিত বোধ করলেও তাঁরা বিধান দিলেন যে বাবাকে তাঁরা সমাজে নিতে রাজি আছেন, যদি তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন। কিন্তু বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সমুদ্রযাত্রা করে তিনি আদৌ অন্যায় করেননি। কাজেই তিনি

প্রায়শ্চিত্ত করতে সম্মত হলেন না, সুতরাং নিজের গ্রামে অপাংক্তেয় হয়েই রইলেন। এ অবস্থায় সে সময় তাঁর পক্ষে ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়াটা মোটেই অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ বাবা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর কাছে শুনেছি যে, তিনি যখন গ্রামে এসেছিলেন তখন বাবা তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। এমন কি বাবা যখন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়তেন, তখনও কেশবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে গিয়ে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। বাবা বলতেন যে কেশবচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা সম্মোহিনী শক্তি ছিল যে, তাঁর বক্তৃতা শুনলে মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না।

কেশবচন্দ্রের মতবাদকে শ্রদ্ধা করলেও তিনি নিজের আজন্ম সংস্কার ও মতবাদ কোন কারণেই বিসর্জন দেন নি। তিনি মনে-প্রাণে হিন্দু ছিলেন, হিন্দু সমাজের বহু অন্যায় ও কুসংস্কারে তাঁর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হলেও তিনি কোনদিনই হিন্দুধর্ম বা সমাজ ত্যাগ করার কথা চিন্তা করেন নি।

তিনি যে কত উদারপন্থী তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিবাহেব সময়ের ঘটনা লক্ষ্য করলে। এই সম্বন্ধে আমার বাবার জীবনীকার শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ইংরাজীতে যা লিখেছেন, তার কিছু অংশ এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি :

"কমলা ও প্রমথনাথের বিবাহ হয় শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ২০নং বিডন স্ট্রীটের বাড়ীতে, ১৮৮২ সালের ২৪-এ জুলাই তারিখে। সকলেই ভেবেছিলেন যে, এই বিবাহ ১৮৭২ সালের তিন-আইন (সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট) অনুসারেই হবে। কিন্তু এই আইন অনুসারে যাঁরা বিয়ে করতেন, তাঁদের ঘোষণা করতে হতো যে তাঁরা কোন প্রচলিত ধর্মমতে যথা—হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান অথবা অন্য কোন ধর্মে বিশ্বাসী নন। প্রমথনাথ এই ধরণের ঘোষণা করতে অস্বীকৃত হন, কাজেই বিবাহ পুরোপুরি হিন্দুমতেই হয় এবং তাঁর বংশের কুল-পুরোহিত বিবাহকার্য সম্পন্ন করেন।

রমেশচন্দ্র প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন এবং সেই সূত্রে তৎকালীন বহু সাহিত্যিক বন্ধু এই বিবাহ উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। তৎকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যমণি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন, এবং উদীয়মান কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স একুশ—তাঁর "সন্ধ্যা সঙ্গীত" সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। যখন রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন, তখন দেখলেন গৃহকর্তা রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে মাল্যভূষিত করতে উদ্যত। রবীন্দ্রনাথকে দেখেই বঙ্কিমচন্দ্র সেই মালা রমেশচন্দ্রের হাত থেকে নিয়ে তাঁর গলায় পরিয়ে

দিয়ে বললেন—"রমেশ, তুমি 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' পড়েছ ?" রমেশচন্দ্র 'না' বলতে তিনি বলেছিলেন, 'পড়ে দেখো' এই বলেই তিনি "সন্ধ্যা-সঙ্গীত"-এর মূল বক্তব্যটি বর্ণনা করে শুনিয়েছিলেন। এই ঘটনা নবীন কবির মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলো।"

সুরুতেই বলে রাখা ভালো যে আমাদের পরিবার ছিলো যথেষ্ট প্রগতিশীল—অর্থাৎ কলকাতা শহরের আধুনিক সমাজের যাঁরা স্রষ্টা, আমাদের পরিবার ছিলো তাঁদের অন্যতম। এ সম্বন্ধে আমার বড়দি শ্রীমতী সুষমা সেন আমার বাবার জীবনীতে লিখেছেন—"আমাদের ধর্মতলার বাড়ীটি ছিলো সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল স্বরূপ। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ ও হৃদ্যতা ছিলো—যেমন সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁদের জোড়াসাঁকোর পরিবারের সমস্ত ছেলে-মেয়েরা, কেশবচন্দ্র সেনের পরিবার (যাঁরা থাকতেন 'লিলি কটেজে'), ডবলিউ সি বনার্জি, মনোমোহন ঘোষ, বি এল গুপ্ত, জি কে গোখলে, ডঃ জে সি বসু, আর এন রায়, কে জি গুপ্ত, এ এম বসু, ডি এল রায়, মার্গারেট নোবল্ (ভগিনী নিবেদিতা) প্রভৃতি। ভারতীয় সমাজের এই সব শ্রেষ্ঠ নর-নারীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসার দুর্লভ সুযোগ আমাদের হয়েছিল।"

আমার দাদামশাই ছিলেন ভগিনী নিবেদিতার ধর্মপিতা, সেজন্য ভগিনী নিবেদিতা প্রায়ই আমাদের কলকাতা ও দার্জিলিং-এর বাড়ীতে আসতেন। আরো আসতেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে তাঁর বড় ছেলে করুণা সেন। তাঁর সঙ্গে আসত তাঁর দুই ছেলে সুনন্দ (ক্যাবলা) ও কুনাল। সন্ধ্যের সময় আমাদের বাড়ীতে গান বাজনার আসর বসত। শুনেছি, করুণাবাবু গান-বাজনা খুব ভালবাসতেন। ক্যাবলাদা ও কুনালদা আমার দাদাদের খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেনের বড় মেয়ে সুনীতিদেবী মার সহপাঠিনী ছিলেন। এই কারণে তাঁর ছোট বোনেরা সবাই আমার মাকে তাঁদের বড়দিদির মতই দেখতেন। এই সম্বন্ধে মা নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 'আপার সার্কুলার রোডে একটি অনাথ আশ্রম ছিলো (যেটি এখন 'লিলি-কটেজ')। সেখানে মিস পিগট নামে একজন মিশনারী মহিলা ও তাঁহার অন্যান্য ইংরাজ শিক্ষয়িত্রীরা উপরে থাকিতেন। নীচের তলায় অনাথ বালিকারা থাকিত। বিলাত হইতে তখন যাঁহারা ফিরিয়া আসিতেন, তাঁহাদের স্ত্রী ও ছোট ছেলেমেয়েদের থাকিবার নিমিত্ত মিস পিগট ফ্যামিলি

কোয়ার্টার্স' খুলিয়াছিলেন। মা, আমি এবং আমার তিন বোন, বিমলা, অমলা ও সরলা সেই ফ্যামিলি কোয়ার্টারে থাকিতাম। মা ওখানে থাকিয়া মিশনারী মেমদের কাছে ইংরাজি ও সেলাই ইত্যাদি শিখিতে আরম্ভ করিলেন। মিসেস বি, এল, গুপ্ত ও তাঁর লটি নামে এক কন্যা ও সতীশ নামে এক পুত্র আর একটি ফ্যামিলি কোয়ার্টারে থাকিতেন। সেই সময় সুনীতিদেবী ও তাঁহার এক ভগিনী আমাদের ওখানে পড়িতে আসিতেন। তখন তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। ওঁরা তখন কলুটোলায় থাকিতেন। এগারটার সময় আচার্য কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাদের স্কুলে রাখিয়া যাইতেন এবং বিকেল চারটের সময় লইতে আসিতেন। আমরা সারাদিন এক শিক্ষকের কাছে পড়িতাম। অল্পদিনের মধ্যেই কুচবিহার মহারাজের সহিত সুনীতির বিবাহের প্রস্তাব আসিল। বিবাহের সব জোগাড় হইলে তাঁহারা কুচবিহারে চলিয়া গেলেন। মিস্ পিগটের স্কুলে অবস্থিতিকালে বাবা বিডন স্ট্রীটে জমি কিনিয়া নূতন বাড়ী তৈয়ার করিলেন। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে আমরা স্কুল হইতে নূতন বাড়ীতে আসিলাম।"

সুনীতি দেবী মাকে নিজের বোনের মত দেখতেন বলে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত (রাঁচিতে ১৯৩২ সনের শেষের দিকে ইনি দেহত্যাগ করেন) মা'র সঙ্গে সেই সম্বন্ধই বজায় রেখেছিলেন।

আমাদের ধর্মতলার বাড়ীতে আর একজন দেশবরেণ্য ব্যক্তির দু-তিনবার শুভাগমন ঘটেছিল; তিনি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। মার এক খুড়তুতো ভাই, আমাদের অনিলমামা সংসার ত্যাগ করে স্বামীজির ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরই সঙ্গে তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন এবং ব্রহ্মসঙ্গীতও গেয়েছিলেন। মা ও দিদিদের কাছে শুনেছি যে, স্বামীজি এমন ভাবে বিভোর হয়ে গাইতেন যে, সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতেন। আমার মাও বেশ ভাল গাইতে পারতেন। অনেক সময় মা, করুণা-বাবু, সত্যভূষণ গুপ্ত মশাই এবং দিদিরাও ব্রহ্মসঙ্গীতে যোগ দিতেন। আগেই বলেছি, আমাদের ধর্মতলার বাড়ীটা ছিল এক কথায় সংস্কৃতির কেন্দ্র—গান-বাজনার আসরে কোনদিন রবীন্দ্রনাথ,- কোন দিন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও অংশগ্রহণ করতেন। যখন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আসতেন, তখন তিনি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন।

অবশ্য কলকাতার আধুনিক সমাজের যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরাই যে কেবল এবাড়ীতে আসতেন, তা নয়। আমার পিসিমারা, আমার কাকা কাকিমারা, মার পিসিমা, পিসতুতো ভাইয়েরা, জাঠতুতো ভাইয়েরা যখনই আমাদের বাড়ীতে আসতেন,

তখনই তাঁরা সমানভাবে আদর এবং অভ্যর্থনা পেতেন। দিদিদের কাছে শুনেছি, প্রায় প্রতি রাত্রে আট দশ জন অতিথি আমাদের এখানে খেয়ে যেতেন। তাঁদের মধ্যে নামী-অনামী অনেকেই থাকতেন। তা ছাড়া বড়দিনের সময়ে আমাদের যে সব আত্মীয় বিদেশে থাকতেন তাঁরা সবাই আমাদের এখানে এসেই উঠতেন; তখন আমাদের ন'জন ভাই বোনকে নিয়ে বাড়ীতে হতো অন্তত তিরিশ জন লোক। সে এক হৈ হৈ ব্যাপার। অথচ এমন সুষ্ঠুভাবে মা সমস্ত ব্যবস্থা করতেন যে, কারও কোনও অসুবিধা হতো না। মনেই হতো না যে, বাড়িতে এতগুলো লোক। আগেই বলেছি, সন্ধ্যের সময় আমাদের দোতলার হলঘরে প্রায়ই বিরাট আসর বসত—হাসি, ঠাট্টা, আবৃত্তি ও গানবাজনার ভেতর দিয়ে সময় যে কি ভাবে কেটে যেতো কেউ বুঝতেই পারত না। বাবা অবশ্য বেশীর ভাগ সময় পড়াশুনা নিয়েই থাকতেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি এসব আসরে এসে যোগ দিতেন, বিশেষ করে যেদিন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আসতেন; কারণ তাঁর গান বাবার খুব প্রিয় ছিল।

আমার বাবার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। শুধু ভূতত্ত্ববিদ হিসাবেই বাবা প্রখ্যাত নন, চিন্তাশীল লেখক, বিশেষ করে ভারতের হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক লেখক হিসেবে তাঁর অবদান বড়ো সামান্য নয়। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে আছে: (1) A History of Hindu Civilisation during British rule; (2) Epochs of Civilisation; (3) The root-cause of the great war; (4) Illusious of New India; (5) Give the people back their own; (6) Survival of Hindu Civilisation; (7) National Education and modern progress; (8) Some present day Superstitions; (9) Swaraj-Cultural and political.—বলা বাহুল্য, সবগুলিই ইংরাজীতে রচিত। এ ছাড়া তাঁর মধ্যে ছিল স্বদেশপ্রীতির গভীরতা, স্বজাতিপ্রেম, আর ন্যায়নিষ্ঠা। জাতির ও আপন সম্মান রক্ষার্থে তিনি বিদেশী শাসকের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান এবং তাঁর নিম্নপদস্থ ব্যক্তির অধীনে চাকরি করতে অস্বীকৃত হন। হেনরী হল্যাণ্ড গভর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ব বিভাগে পরে নিযুক্ত হয়েও তাঁর উপরে প্রমোশন পাওয়াতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। হল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু সরকারের অবিচার তিনি সইতে পারেননি। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি যখন সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৯ বছর। পদত্যাগ করায় তিনি পুরো পেনসন পেলেন না, পেলেন তখনকার পুরো

বেতনের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু তিনি ছিলেন উদ্যোগী পুরুষসিংহ—নিজের কর্মশক্তিতে অগাধ বিশ্বাস ছিলো তাঁর। তখন তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ লোরেটো কনভেণ্টে, কেউ বা কলেজে পড়াশুনা করছে এবং কোনও মেয়েরই বিয়ে হয়নি। তা ছাড়া তাঁর ভাইদের ও বোনদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যয়ও তাঁকে বহন করতে হতো। তবু তিনি বিচলিত হলেন না। এ হল আদর্শের সংঘাত। মহান আদর্শকে বজায় রাখতে তিনি কখনও কারও কাছে মাথা নত করেন নি—এক্ষেত্রেও তাই হলো। এবং বাবাকে এবিষয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন মা। বাবা সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করেছেন শুনে ময়ুরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও বাবাকে আমন্ত্রণ করেন তাঁর রাজ্যে খনিজ-সম্পদের সন্ধান করতে। ১৯০৩-৪ খ্রীস্টাব্দে বাবা গুরুমহিষাণী লৌহ আকরের সন্ধান পান। এই সন্ধানের ফলেই পরে "টাটা আয়রণ ও স্টীল ওয়ার্কসের" জন্ম হয়। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পরে বলব। কারণ এই গুরুমহিষাণী লৌহ আকরের আবিষ্কার নিয়ে "টাটা" কোম্পানীকে জড়িয়ে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাবা জাগতিক সম্মান ও অর্থপ্রাপ্তি থেকে মানসিক শান্তিকেই বেশী প্রাধান্য দিতেন।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে আমার বড়দির (সুষমার) সঙ্গে কেমব্রীজের বিখ্যাত ছাত্র প্রশান্তকুমার সেনের বিবাহ হয়। তিনি তখন সদ্য বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে ফিরেছেন। তাঁর পিতা প্রসন্নকুমার সেন আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রিয় সহযোগী-প্রচারকরূপে বাংলাদেশে সে সময় অতি সজ্জন জ্ঞানে সমাদৃত হয়েছিলেন। প্রসন্নকুমার বিলাতেও কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সচিব ছিলেন। প্রশান্তকুমারও পিতার ভগবত-ভক্তি পেয়েছিলেন।

বড়দির বিবাহের মাসখানেক পরে আমার দাদা (অশোক) সরকারী বৃত্তি নিয়ে খনিজবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলেতে যান। বাবা তখন 'টাটা' কোম্পানীর সঙ্গে ময়ুরভঞ্জ মহারাজার হয়ে গুরুমহিষাণী লৌহ-সম্পদের বিষয় আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। সেই কারণে কলকাতার বাইরে তাঁকে থাকতে হতো। মেজদা (অলোক) সেজদা (অমর), আমার চার বোন ও আমাকে নিয়ে মা ধর্মতলার বাড়ী ছেড়ে ১৯০৪ সালের শেষ দিকে দার্জিলিং চলে যান। সেখানে 'রুবী হল' (Ruby Hall) বলে একটি বাড়ী ভাড়া করেন। 'রুবী-হলের' কিছু কিছু স্মৃতি আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তখন শীতকাল, দার্জিলিংয়ে প্রচুর বরফ পড়েছে। সেই তুষারপাতের

মধ্যে আমরা বরফের মানুষ তৈরী করতাম ও বরফের বল করে খেলতাম। আমার চার বোন, সেজদা ও আমি 'মিস টোয়েন্টিম্যানস্ স্কুলে' ভর্তি হলাম। মিস টোয়েন্টিম্যান নামে এক বৃদ্ধা মহিলা এই স্কুলটি স্থাপন করেন। শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই মেম-সাহেব। এইখানেই আমার প্রথম হাতেখড়ি। স্কুলটা শুধু মেয়েদের জন্য, তবে অনেক ছোট ছোট ছেলেও সেখানে পড়ত। অবশ্য বেশীর ভাগই ইংরাজের ছেলে মেয়েরা। দেশী লোকের মধ্যে আমরা ক'জন ভাইবোন এবং আরও দু-তিনজন মেয়ে পড়ত।

এই স্কুলের একটি ঘটনা আমার এখনও মনে আছে। ছোটবেলা থেকেই আমি বেশ একটু ডান-পিটে গোছের ছিলাম—কারণে অকারণে ছেলেদের সঙ্গে মারামারি লেগেই থাকত। একদিন একটি ছেলের সঙ্গে কি নিয়ে বচসা হলো, অমনি আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করলাম বক্সিং-এ। বক্সিং মানে তখন বুঝতাম শুধু ঘুষোঘুষি। দুটি দল হলো। এক দল ওকে উৎসাহ দিচ্ছে, আর একদল আমাকে। আমার দিদিরা অবশ্য আমার দলে। তারা আমাকে খুব উৎসাহ দিচ্ছে—শুনতে পাচ্ছি তারা বলছে, 'go on Modhu—go on Modhu'। শেষে আমার একটি ঘুষি খেয়ে ছেলেটির নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। এই রক্ত দেখে এতক্ষণ যারা আমাকে উৎসাহ দিচ্ছিল, তারা যে নিমেষের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। এদিকে এই ব্যাপার দেখে শিক্ষয়িত্রীরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল মিস্ টোয়েন্টিম্যানের কাছে। তিনি আমাকে রাগের চোটে বেত্রাঘাত শুরু করে দিলেন। কিন্তু বেচারী বুড়ির হাতে আর কতই বা জোর—আমি কিছু অনুভবই করলাম না। তারপর দিদিদের কাছে শুনেছিলাম যে, আমাকে বেত মারার ফলে উত্তেজনায় ও রাগে তিনি নাকি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

১৯০৫ সালের শেষের দিকে আমার মেজদা (অলোক) রুবি-হল থেকেই বিলাত চলে গেলেন উচ্চ-বৈজ্ঞানিক পড়াশোনার জন্য—অবশ্য সরকারী বৃত্তি নিয়ে। তারপর আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। আমার দাদামশাই পূজার সময় কলকাতায় এলেন এবং আমাদের সকলকে বরোদায় নিয়ে গেলেন—তিনি তখন বরোদা স্টেটের দেওয়ান। সেজদাকে মা কলকাতায় রেখে গেলেন আমার বড়দির কাছে, যাতে বাংলা স্কুলে ভর্তি হয়ে বাংলা শিখতে পারে।

বাবা তখন পাতিয়ালা, রাজ-পিপ্লাই এবং অন্যান্য ষ্টেটে খনিজ পদার্থের সন্ধান

করে বেড়াচ্ছেন। বরোদায় আমরা প্রায় ছয় মাস ছিলাম। আমি ছোটবেলা থেকেই ভালমন্দ খেতে ভালবাসতাম; আর লোভে পড়ে এক একদিন এমন খেতাম যে পরদিন অসুস্থ হয়ে পড়তাম। তাই দাদামশায়ের বাড়ীতে কোন টি-পার্টি বা খাওয়া-দাওয়া হলেই, পাহাড় এবং বিশেষ করে আমার সেজদি, আমার ওপরে কড়া নজর রাখত। প্রত্যেক রবিবারে দাদামশাইয়ের ওখানে টি-পার্টি হতো, টেনিস্ খেলা হতো।

একদিনের ঘটনা মনে আছে। অনেকে টেনিস খেলতে এসেছেন—খাবার ঘরে বিরাট টেবিল ছিলো—সেই টেবিলে নানা রকম খাবার সাজানো আছে। চোখের সামনে এত খাবার—জিভের জল আট্‌কে রাখা দুষ্কর। কিন্তু আমার ওপর কড়া পাহারা। চাকরদের সব হুকুম দেওয়া হয়েছে, যাতে আমি খাবার-ঘরে না ঢুকতে পাই। পাহাড়ের চোখও রয়েছে আমার ওপর। বেশ মনে আছে, আমি শেষে নিরুপায় হয়ে গাড়ি-বারান্দার সিঁড়িতে বসে কাঁদতে শুরু করে দিলাম। আমার খেলার সাথীরা কত ডাকল ব্যাডমিণ্টন খেলার জন্য—কিন্তু আমি জিদ ধরে বসলাম যে, আমাকে খাবার ঘরে যেতে না দিলে আমি কিছুতেই উঠব না—সিঁড়িতে বসে থাকব আর কাঁদব এবং তাই রইলাম। দাদামশাই সে সময় কি কাজে ভেতরে যাচ্ছিলেন—আমাকে এই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাঁদছিস্ কেন রে?' তাতে আমি বলেছিলাম, 'আমায় ওরা কিছুতেই খাবার ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না।' তিনি তখনই একজন চাকরকে ডেকে আমায় খাবার ঘরে নিয়ে যেতে বললেন, এবং তাকে আরও বলে দিলেন যে, আমি যা কিছু খেতে চাই এবং যত খেতে চাই, খেতে দিতে, আমাকে যেন কেউ বাধা না দেয়। অতবড় টেবিলে রয়েছে নানান রকমের খাবার—মিষ্টি, নোন্‌তা, কেক্, পেষ্ট্রি, আইস্‌ক্রিম আরও কত কি। আমি একা একা মনের আনন্দে গোগ্রাসে খেলাম। খেলাম ত আকণ্ঠ মনের আনন্দে, কিন্তু তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া শুরু হলো পরদিন সকালে। মা, সেজদি, পাহাড় সকলেই আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলে, কখন আমি খেলাম? খাবার টেবিলের চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, 'বড়-সাহেবের হুকুম', সে কি করবে? দাদামশাই তাতে হেসে বলেছিলেন, 'যাক, বেচারির খাবার সাধ ত' মিটেছে।'

ছোট বয়েস থেকেই আমি জিদ্দি ছেলে। জিদের দ্বারা চালিত হয়ে আমি জীবনে অনেক কিছুই করেছি—তাতে কখনো জিতেছি, আবার কখনো ঠকেছি। কিন্তু এই জিদ কখনো ছাড়িনি। ছোট বেলায় এই জিদের আর একটি ঘটনা বলি।

সেটাও বরোদাতে ঘটেছিল। দাদামশাইর ওখানে হাস্নু মিঞা বলে এক চাপরাসী ছিল। যদিও আমার খেলার সাথীরা বিকেলবেলায় আসত এবং তাদের সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলতাম, কিন্তু সমস্ত দিন হাস্নু মিঞাই ছিল আমার খেলার সাথী। ঘুড়ি ওড়ানো, মার্বেল খেলা, ব্যাটবল খেলা সবই হাস্নু মিঞার সঙ্গে। তাকে ছাড়া আমার একদণ্ড চলত না। যখন বরোদা থেকে চলে আসার কথা হল, তখন আমি ঝোঁক ধরে বসলাম হাস্নু মিঞাকেও কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে—সে কলকাতায় না গেলে আমি এখান থেকে যাচ্ছি না। মা আর দিদিরা কত বোঝালেন, 'এটা কি করে সম্ভব? সে দাদামশাইর চাপরাসী, সে কলকাতায় যাবে কি করে? কলকাতায় এ রকম অনেক হাস্নু মিঞা পাওয়া যাবে।' পাহাড় আমাকে ধমকালো পর্যন্ত—আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা—হাস্নু মিঞাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। শেষ পর্যন্ত আমার জিদই বজায় থাকল। দাদামশাই বললেন, 'যাক্ বাপু যাক্, মধু যখন ঝোঁক ধরেছে তখন ও ছেলেমানুষের মনে দুঃখ দিয়ে কি হবে?' সুতরাং হাস্নু মিঞাও আমাদের সঙ্গে কলকাতায় এলো। হাস্নু মিঞার বরাত ভাল, তার কলকাতা দেখা হয়ে গেল।

কলকাতায় এসে আমরা উঠলাম আমার মামার বাড়ীতে ৯।১ হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে (যেটা এখন এনফোর্সমেণ্ট অফিস্)। দাদামশাই অবশ্য সে বাড়ীটা কিনেছিলেন। কলকাতায় নতুন সঙ্গী সাথী পেয়ে হাস্নু মিঞাকে ভুলেই গেলাম। সে কিছুদিন পরে বরোদায় ফিরে গেল। কিছুদিন মামার বাড়ীতে থাকবার পর আমরা ধর্মতলায় আর একটি বাড়ীতে গেলাম এবং সেখান থেকে মটস্ লেন-এ উঠে গেলাম। মটস্ লেনের বাড়ীটা খুব বড় ছিল। মনে আছে নীচে ছিল এক মস্ত বড় ঘর সেটা বোধহয় বসবার ঘরই। বাবা তখন কাজের জন্য বেশীর ভাগ সময় কলকাতার বাইরে থাকতেন। আমাদের সঙ্গে আমার সেজকাকা (তাঁকে আমরা সুরেনকাকা বলে ডাকতাম) থাকতেন। এই মটস্ লেনের একটি ঘটনা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। একদিন আমাদের নীচেকার বসবার ঘরে দেখলাম অনেক রকম জিনিস এসেছে—কাপড়-চোপড় থেকে শুরু করে খেলনা পর্যন্ত। ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কি! যা হোক, আমি ওর মধ্যে থেকে বেছে একটা ছোট ক্রিকেট ব্যাট ও বল নিয়ে বাইরে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলতে আরম্ভ করলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম পাহাড় বড় বড় চোখ করে—সে চোখ দেখলে সত্যিই আমার ভয় হত—আমার দিকে এগিয়ে আসছে। একটু পরে ব্যাট-বল সমেত আমাকে ধরে মার কাছে নিয়ে গেল। মা তখন আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে, কলকাতায় শিগ্গীর

একটি বড় প্রদর্শনী হবে এবং নিচেকার ঘরের জিনিসগুলো সেই জন্যই এসেছে, আমি আমি যেন না জিজ্ঞেস করে কোন জিনিসে হাত না দি।

এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে পরে আমি দিদিদের কাছে যা শুনেছি তার একটু বিবরণ দিচ্ছি :—মা তখন কলকাতায় একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেন এবং তার যুগ্ম সম্পাদিকা হন মা ও শ্রীমতী সরলা রায় (মিসেস পি. কে. রায়)। এই মহিলা সমিতির অর্থসাহায্যের জন্য এক বিরাট প্রদর্শনী হয়েছিল 'পোড়াবাজারে' (অর্থাৎ এখন যেখানে ক্যালকাটা ক্লাব সেখানে)। ঠিক হয়েছিল, এই প্রদর্শনীতে মেয়েদের দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' অভিনয় হবে। 'মায়ার খেলা' গুরুদেব শ্রীমতী সরলা রায়কেই উৎসর্গ করেছিলেন। পোড়া-বাজারের প্রদর্শনী মাঠে একটি স্টেজ তৈরি করা হয়েছিল—'মায়ার খেলা'র রিহার্সাল সেইখানেই হতো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী শ্রীমতী অমলা দাশ গান শেখাতেন। ওঁর গান আমি কখনও শুনিনি, তবে রেকর্ড শুনেছি। গুরুদেব নিজে প্রায়ই আসতেন এবং গানের সুরগুলো ঠিক হয়েছে কিনা—রিহার্সাল ঠিকমত এগুচ্ছে কিনা—তার তত্ত্বাবধান করতেন। আমার সেজদি (প্রতিমা) 'প্রমদার' ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সেজদির গানের গলা ছিল চমৎকার। বড় হয়ে ওঁর গান অনেকবার শুনেছি এবং খুবই ভাল লাগত। শুনেছি 'মায়ার খেলা' অভিনয় দেখে গুরুদেব নাকি বলেছিলেন, 'প্রমদা'র ভূমিকাটা যেন ওর জন্যই তৈরী। আমার মেজদি (সুরমা) এবং দেশবন্ধু পরিবারের অন্যান্য মেয়েরা এবং তৎকালীন কলকাতার অভিজাত সমাজের অনেকেই বিভিন্ন ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেছিলেন।

১৯০৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে আমরা আবার দার্জিলিং গেলাম। বাবাও কিছুদিন কাজ থেকে অবসর নিয়ে আমাদের সঙ্গে গেলেন। দার্জিলিংয়ে আমার মেজ মেশোর একটি বাড়ী ছিলো, 'রথীমে'। আমরা সেইখানেই গিয়ে উঠলাম। আমি এবং ন'দি (পূর্ণিমা) ও ছোড়দি (উমা) কুইনস্‌হিল (Queen's Hill) স্কুলে ভর্তি হলাম। সেটাও ইংরাজী স্কুল। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাংলা শিক্ষা বিশেষ কিছুই হয়নি। মাকে একা সংসারের সবদিক সাম্‌লাতে হতো। এতগুলো ছেলেমেয়ের কার কখন কি দরকার—সব দিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তারই মধ্যে সময় পেলেই তিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন। পূজার সময় দার্জিলিংয়ে প্রতিদিনই হয় পিক্‌নিক নয় টি-পার্টি লেগেই থাকত। এই সব জায়গায় ভাল মন্দ জিনিস দেখে আমি আর লোভ সামলাতে পারতাম না—

গোগ্রাসে খেতাম—তারপর অসুখে পড়ে দিদিদের ও পাহাড়ের কাছে বকুনি খেতাম।

এই সময়ে আমার মেজদির বিয়ে হয়ে গেল ব্যারিস্টার রজতনাথ রায়ের সঙ্গে। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালী অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল মিস্টার আর. এন. রে-র (যার নামে এখন রে স্ট্রীট) একমাত্র পুত্র। তিনি যেমন সুপুরুষ ছিলেন, স্বভাব-চরিত্রও ছিল তাঁর তেমনি সুন্দর। এই সময়েই আমার সেজদিরও বিয়ে স্থির হয়ে গেল ব্যারিস্টার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের (বি. এল. মিত্রের) সঙ্গে। অসাধারণ অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং আপ্রাণ চেষ্টার ফলে তিনি বহু উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ও "স্যার" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।

এর কিছুদিন আগে বাবা রাঁচীতে একুশ বিঘে জমি কিনেছিলেন মনের মতন একটি বাড়ী ও বাগান করবার আশায়। জমি কেনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাড়ী করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বাবার প্রথম রাঁচী-দর্শন একটা রীতিমত স্মরণীয় ব্যাপার। তাঁর কাছ থেকে এই সম্বন্ধে যা শুনেছি তাই লিখ্‌ছি। বাবা প্রথম রাঁচী চলেছেন—সঙ্গে আছেন আমার মেজমেশো শ্রীবলিনারায়ণ বরা। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। পুরুলিয়া থেকে রাঁচী "মিটার গেজ" রেলপথ তখন সবে তৈরী হচ্ছে। সুতরাং পুরুলিয়া থেকে ৭২ মাইল পথ "পুশ্‌পুশ্‌"-এ করে চলেছেন তাঁরা। "পুশ্‌পুশ্‌" হলো দু' চাকার একটা মস্তবড় গাড়ী—ভেতরে দুজন মানুষ লম্বা হয়ে শুতে পারে; তার ছাদের ওপর মাল রাখবার জায়গা। দুজন কুলি সামনে থেকে টানে এবং দু' তিনজন কুলি পেছন থেকে ঠেলে। রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম, মাঝে মাঝে গভীর জঙ্গল। এই রকম একটি জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ বাঘের ডাক শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে "পুশ্‌পুশ্‌"-এর কুলিরা গাড়ী ফেলে উধাও। বাবা ও মেজমেশো দুজনেই অবশ্য তাঁদের কর্মজীবনে অনেক গভীর জঙ্গলে ঘুরেছেন এবং বাঘের ডাকও শুনেছেন; সুতরাং তাঁরা অতটা ভয় পাননি। তাছাড়া সঙ্গে তাঁদের বন্দুকও ছিলো; তাঁরা বন্দুক ঠিক করে বসে রইলেন। তারপর বাঘের ডাক থেমে গেলো এবং কিছুক্ষণ হাঁকডাক করার পর কুলিদেরও দর্শন পাওয়া গেল। এই ভাবে তাঁরা রাঁচী পৌঁছোলেন।

বাবার জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরা সম্বন্ধে মা তাঁর আত্মজীবনীতে যা লিখেছেন, তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম :—

"...তখন আমার সন্তান অশোক তিন মাসের মাত্র...কখনও কখনও আমাদের গভর্নমেণ্ট রিজার্ভ ফরেস্ট-এর মধ্য দিয়া যাইতে হইত...রাত্রে তাঁবুর মধ্যে শুইয়া

প্রায়ই বাঘের ডাক শুনিতাম। কখনও নিজের প্রাণের ভয় হইত না, কেবল ভয় হইত পাছে তাঁবুর পর্দার ভিতরে ঢুকিয়া বাঘ খোকাকে লইয়া যায় এবং সেইজন্যই তাহাকে নিজের বুকের কাছে লইয়া শুইতাম। আমাদের চাকর-বাকরেরা অন্য ছোট তাঁবুতে শুইত। গাছের তলায় আমাদের দু'জনের (আমার এবং আমার স্বামীর) ঘোড়া বাঁধা থাকিত। একদিন সকালে সহিস আসিয়া আমাদের বলিল, রাত্রে এক বাঘ আসিয়া আমাদের একটি ঘোড়া মারিয়া ফেলিয়াছে।"

মার আত্মজীবনীতে এইরকম বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা আছে।

রাঁচীতে বাবা যেখানে জমি কিনেছিলেন, সেখানে কোন লোকালয় ছিল না বললেই চলে। একুশ বিঘা জমির মধ্যে প্রায় অর্ধেকটা ছিল ফলের বাগান ও ধানের জমি। বাবা সব সময় বলতেন যে রাঁচী একদিন একটা বিরাট শহরে পরিণত হবে এবং স্বাস্থ্যকর স্থান বলে প্রসিদ্ধিলাভ করবে। তাঁর সেদিনের সেই ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি সফলতা লাভ করেছে, তা আজ আর নতুন করে বলতে হবে না।

মেজদির বিয়ের পরে মা আমার তিন বোনকে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে বাঁকুড়া যাবেন বলে স্থির করলেন। এখানে দাদামশাইয়ের একখানি বাড়ী ছিল। আমাদের রাঁচীর বাড়ীটি তখনও সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি বলেই মায়ের এই বাঁকুড়া যাওয়া।

এদিকে বাবাও স্থির করলেন, আমাকে আর সেজদাকে বোলপুর "ব্রহ্মচর্য বালক বিদ্যালয়ে" (বর্তমানে শান্তিনিকেতন) ভর্তি করে দিয়ে আসবেন। কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেজদা, তাঁর বয়স তখন প্রায় বারো, খুব খুশী মনেই যাবার তোড়জোড় করতে লাগল—কিন্তু গোল বাধল আমাকে নিয়ে। আমাদের চাকর পাহাড়ের কথা এর আগে অনেকবার বলেছি—বলতে গেলে সেই বেশীরভাগ আমার দেখাশুনা করত। শান্তিনিকেতনে যাবার কথা শুনে আমি ঝোঁক ধরে বসলাম যে, পাহাড়কেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। বাবা আমার এ জিদ পছন্দ করলেন না। মা কিন্তু নেহাৎ অনন্যোপায় হয়েই পাহাড়কে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। বোধহয় আমি ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বলে আমার ওপর মার একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি অনেক বিষয়ে আমাকে প্রশ্রয় দিতেন এবং অনেক অন্যায় আবদার সহ্য করতেন।

যা হোক, সেজদা, আমি ও পাহাড় বাবার সঙ্গে বোলপুরের জন্য রওয়ানা হলাম। আর মা আমার বোনেদের নিয়ে বাঁকুড়া চলে গেলেন।

বোলপুর স্টেশনে আমরা যখন পৌছলাম, তখন বিকেল হয়ে এসেছে। স্টেশন থেকে আশ্রমের দূরত্ব প্রায় মাইল তিনেক হবে। গরুর গাড়ী ছাড়া তখন ওখানে

আর কোন যানবাহন ছিল না। গ্রামের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। এখানকার লোকজন, বাড়ী-ঘর, রাস্তাঘাট, সবই আমার কাছে নতুন। অবাক বিস্ময়ে চারদিক দেখতে দেখতে আমরা যখন শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌছলুম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। শান্তিনিকেতনে পৌছে গুরুদেবের কাছে বাবা আমাদের নিয়ে গেলেন—তিনি তখন দোতলার ঘরে বসে লেখাপড়া করছিলেন। বাবা যেতেই গুরুদেব তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। আমরাও প্রণাম করে দাঁড়ালাম। একথা-সেকথার পর বাবা আমার সঙ্গে পাহাড়কে রাখার কথা বলায় গুরুদেব বললেন: "চাকর সঙ্গে রাখার ত কোন নিয়ম নেই এখানে। সবকিছু কাজ ছেলেদের নিজের হাতেই করতে হয়। এর কাজ যদি চাকরে করে দেয় তাহলে অন্য ছেলেরা কিছু মনে করতে পারে।" বাবা বললেন: "ও যখন জিদ ধরেছে তখন কয়েকটা দিন পাহাড় থাক—নইলে ত ওকে এখানে রাখাই যাবে না। কয়েকদিন পরে আপনিই ঠিক হয়ে যাবে, তখন ওকে সরিয়ে নিয়ে গেলেই হবে।" রবীন্দ্রনাথ বাবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হলেন। আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত করে বাবা পরদিন চলে গেলেন।

তখনকার শান্তিনিকেতন বলতে বোঝায়: একদিকে আমের বাগান—অন্য দিকে শালের বন, তার মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে ছিল লম্বা বারো-চোদ্দটা চালাঘর, সবই খড়ের ছাউনি। তারই মধ্যে কয়েকখানা কোঠাঘরও ছিলো; সেখানে শিক্ষকরা থাকতেন সপরিবারে। একটা মাঝারী চালাঘরে আমরা থাকতাম কয়েকজন—সেইখানেই একটা তক্তপোষে আমার সিট হয়েছিল। সেখানে যারা ছিল, তারা সবাই অল্পবয়স্ক। সেজদার সিট হলো অন্য ঘরে। আমাদের ঘরে তত্ত্বাবধায়করূপে একজন শিক্ষকও থাকতেন।

ছোটবেলা থেকেই পালঙ্কে নরম বিছানায় শোওয়া অভ্যাস। আর এ রকম পরিবেশেও কখনও শুইনি—লম্বা করিডরের মতন ঘর—জানালার ফাঁক দিয়ে শীতের কন্‌কনে হাওয়া ঢুকছে—শক্ত তক্তপোশ, সুতরাং প্রথমদিন খুবই অসুবিধা বোধ করেছিলাম। কিন্তু সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর শোওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম। অঘোরে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমায় ঠেলছে আর বলছে, "ওঠ, ওঠ, মাঠে যাবার ঘণ্টা পড়ে গেছে।" প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে উঠে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এত রাত্রে মাঠে কেন? ছেলেটি জবাব দিল, রাত কোথায়! ওই তো ফরসা হয়ে এসেছে। এই সময়েই তো মাঠে যেতে হয়—এখানে তো পায়খানা নেই।—এতক্ষণে বুঝলাম মাঠে যাবার অর্থ। ছোট বেলা থেকেই

বাথরুমে যাওয়া অভ্যাস ; মাঠে যেতে হবে শুনে আমার চক্ষুস্থির। কিন্তু নিরুপায় ; অগত্যা অন্য ছেলেদের সঙ্গে আমাকে মাঠেই যেতে হলো।

এরপর ফ্রি-হ্যাণ্ড ব্যায়াম সেরে নিয়ে স্নান করতে গেলাম। স্নানের বেলাতেও সে আর এক সমস্যা—ছোটরা সব ইঁদারার কাছে বসবে আর বড়রা ইঁদারা থেকে টিনের ক্যানেস্তারা করে জল তুলে তাদের মাথায় ঢেলে দেবে। একসঙ্গে এতগুলো অনিয়ম দেখে পাহাড় আর থাকতে পারল না—সে শিক্ষক মহাশয়ের কাছে প্রতিবাদ করতে গেল। কিন্তু শিক্ষক মশাই বললেন: "এটাই নিয়ম—সব ছেলেরা যখন করছে, তখন ওই বা না পারবে কেন?" একটি বড় ছেলে তখন জোর করে আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে মাথায় জল ঢেলে দিল। শীতে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে চোখে জল এসে যাবার যোগাড়। পাহাড় ত গজ্-গজ্ করতে লাগল। কিন্তু তার গজ-গজানিতে কোনই কাজ হলো না।

তারপর আর এক বিপদ। এই ৭।৮ বছর বয়স পর্যন্ত ধুতি কখনও পরিনি, বরাবরই হাফ প্যাণ্ট পরতে অভ্যস্ত। আমরা পাশ্চাত্য রীতিতে মানুষ হয়েছি। মেমসাহেবের স্কুলে পড়ার জন্য বাংলা ভাষাও বিশেষ কিছু শিখিনি। আমাদের শান্তিনিকেতনে দেবার কারণই হচ্ছে এই যে, আমরা বাঙালীর ছেলে—বাঙালী আদব-কায়দা জানি না—শেষে কি একটা ফিরিঙ্গী হয়ে উঠব? শান্তিনিকেতনে থেকে অন্তত আমরা নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে পারব। যা হোক, মা আমার কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে কয়েকখানি ধুতিও দিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেরা আমায় ধুতি পরা শেখাল। তখন শীতকাল বলে সার্ট পরতাম। গরম-কালে একেবারে খালি গা—খালি পা তো বটেই। আশ্রমের মধ্যে জুতো পরার নিয়ম ছিল না। প্রথম দু-চারদিন খুবই কষ্ট হয়েছিলো ; খালি পায়ে বেড়ানো কোন কালে অভ্যাস নেই। আশ্রমের কাঁকর বিছানো রাস্তা—তার ওপর মাঝে মাঝে কাঁটা-ঝোপ। খালি পায়ে অনভ্যাসের দরুণ পা কেটে রক্ত বেরুত—লুকিয়ে লুকিয়ে আমবাগানে গিয়ে কাঁদতাম। কিন্তু অভ্যাসে মানুষের কি না হয়! কিছুদিনের মধ্যে সবই অভ্যাস হয়ে গেল—এমন কি বিছানা করা, কাপড় কাচা প্রভৃতি নিজেই করতে লাগলাম।

স্নানের পর জলখাবার। জলখাবার বলতে ছিল ছোলা ভিজে নুন কিংবা গুড় দিয়ে ; কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন বোঁদে আর এক গ্লাস দুধ। তারপর নিজের আসনখানি নিয়ে গাছতলায় বসে উপাসনা। উপাসনা কি করে করতে হয় জানি না—সেজদা বললো,—"চোখ বুজে চুপচাপ বসে থেকে ভগবানের নাম করবি।"

উপাসনার পরে ঘণ্টা পড়ত। আমরা উঠে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতাম। তারপর গুরুদেব এসে দাঁড়াতেন, তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করতেন আমরা সেইগুলি পুনরাবৃত্তি করতাম। তিনি কি বলতেন এখন আর তা আমার মনে নেই, শুধু মনে আছে একটি লাইন:

'ওঁ, পিতা নোঽসি—পিতা নোঽবধি।' আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বলে যেতাম।

ক্লাস বসত গাছের নীচে। গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপর আমরা বসতাম। গাছের গুঁড়িতে ব্ল্যাকবোর্ডটি টাঙান থাকত। চেয়ার বেঞ্চির কোন বালাই ছিল না। বোধহয় মাটির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটা গভীরতর করবার জন্যই এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন গুরুদেব। ঘণ্টা দুয়েক ক্লাস হবার পর ছুটি, তারপর খাওয়া। খাওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিরামিষ। খাওয়ার পর সামান্য বিশ্রাম—তারপর আবার ক্লাস বসত সেই উন্মুক্ত উদার প্রকৃতির ছায়াঘন তরুতলে, অপরাহ্নে ক্লাসের পর জলখাবার। তারপর খেলাধুলো, সন্ধ্যার সময় আর পড়ার ক্লাস নয়। গান, বাজনা, অভিনয় এবং গল্প হতো।

তখন 'শারদোৎসব'-এর রিহার্সাল চলছে—আমার গানের গলা বেশ ভালই ছিল, সেই জন্য আমার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল—গুরুদেব ছিলেন সন্ন্যাসীর ভূমিকায়। 'শারদোৎসব' সবটাই গানে। পুজার আগে অভিনয় হবে। অনেক-গুলি গান সুতরাং এখন থেকেই রিহার্সাল হতো। দিনদা (স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এসরাজ নিয়ে বসতেন—এবং আর একজন শিক্ষক হারমোনিয়ম নিয়ে বসতেন। গুরুদেব যখন থাকতেন, তিনিই গান শেখাতেন—তা না হলে দিনদাই শেখাতেন।

গরমের ছুটিতে আমি আর সেজদা রাঁচী গেলাম। মা অবশ্য বাঁকুড়ায় মাস তিনেক কাটাবার পরেই আমার বোনেদের নিয়ে রাঁচী চলে গিয়েছিলেন। তখন সবেমাত্র পুরুলিয়া থেকে রাঁচী যাবার মিটার গেজ রেল চালু হয়েছে। আমাদের বাড়ী তখনও সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি বলে মা প্রথমে গিয়ে উঠেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যে বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন, সেই বাড়ীতে। তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁর কন্যা ইন্দিরা দেবী (আমরা তাঁকে 'বিবি' মাসী বলতাম) ও তাঁর এক নাতি সুবীর। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ওখানে দিন পনেরো থাকবার পরেই মা আমাদের অর্ধসমাপ্ত নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ করেন। এখানে ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে আমার সেজদির সঙ্গে ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবাহ সম্পন্ন হয়। শুনেছি: তাঁর বিয়েতে বিবিমাসী গান করেছিলেন এবং এমন একটি সুন্দর কবিতা লিখে-ছিলেন, যেটি সেজদি আজও সযত্নে রেখে দিয়েছেন।

বংশীয় মহিলারা অবগুণ্ঠন খুলে সকলের কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে দিয়ে চলেছে—বহু লোক সেটা অবাক হয়ে চেয়ে দেখত।

মনে আছে একদিন স্কুলে কয়েকজন ছেলে আমায় জিজ্ঞাসা করলে: "হ্যাঁরে, তোরা কি খ্রীস্টান?" তাতে আমি বলেছিলাম: "খ্রীস্টান হতে যাব কেন?" তাদের মধ্যে দু-একজন সবজান্তা ধরনের ছেলেও ছিল, তারা বলে উঠল: "নারে না, ওরা ব্রাহ্ম।" অর্থটা কি, আমি ঠিক বুঝলাম না। বাড়ীতে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করতে মা বললেন: "আমরা খ্রীস্টানও নই, ব্রাহ্মও নই। আমরা হিন্দু, তবে আমরা গির্জাতেও যাই, ব্রাহ্ম-মন্দিরেও যাই, আবার হিন্দুর মন্দিরেও যাই। সব ধর্মই যে সমান; কোন ধর্ম কারু থেকে ছোট নয়।"

পরের দিন আমি স্কুলে গিয়ে জোর গলায় ছেলেদের বললাম, "মা বলেছেন যে আমরা হিন্দু, তবে আমরা সব ধর্মই বিশ্বাস করি।" এই কথার পর ছেলেরা সব চুপ করে গেল।

স্কুলে যাবার জন্যে আমার একটি ছোট ঘোড়া ছিল—এমনিতে সে ছিল খুবই ঠাণ্ডা, কিন্তু মাঝে মাঝে বিগড়ে যেত—বিশেষ করে যখন মাদলের আওয়াজ পেত। মাদলের আওয়াজ পেলেই ঘোড়াটা ক্ষেপে যেত আর তীরের মত ছুটতে শুরু করত। আমি তখন নিরুপায় হয়ে লাগাম ছেড়ে ওর গলাটাকে জাপটে ধরে পড়ে থাকতাম। কিন্তু অভ্যেসমত ও ঠিকই আমাদের বাড়ীর গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যেত। মা মাঝে মাঝে ওপর থেকে এ দৃশ্য দেখে বাবাকে বলতেন ঘোড়াটাকে বদলাতে, কিন্তু বাবা তাতে বলতেন: এমনিভাবে ও ঘোড়ায় চড়া শিখে নেবে এবং তখন ঠিক সামলে নেবে। বাস্তবিক তাই-ই হ'ল এবং ঘোড়াটাও ক্রমশ মাদলের আওয়াজে অভ্যস্ত হয়ে গেল। যদিও বা কোনদিন জোরে ছোটার চেষ্টা করত, আমি সামলে নিতাম। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে আমার অনেক কাজে লেগেছিল, বিশেষ করে যখন শ্রীহিমাংশু রায়ের কাছে সহকারী প্রোডাকশন ম্যানেজার রূপে কাজ করি 'লাইট অব এশিয়া' ছবিতে। জয়পুরে স্যুটিং-এর সময় বিরাট বিরাট ক্রাউড সিনগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে হতো আমাকে, টুটু ঘোষকে ও প্রফুল্ল রায়কে ঘোড়ায় চড়ে: এ ঘোড়াগুলো ছিল জয়পুরের মহারাজার নিজস্ব অশ্বশালা থেকে নেওয়া। ভাল রকম ঘোড়ায় চড়া জানা না থাকলে এ সব ঘোড়াকে আয়ত্তে রাখা মুশকিল। অনেকে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি, শেষে আমরা তিনজনই একাজ করতাম।

এই সময় আমার দাদা বিলেত থেকে ফিরে এলেন ভূতত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করে।

আমি জ্ঞান হবার পর এই প্রথম দাদাকে দেখলাম। তিনি যখন বিলেতে গিয়েছিলেন তখনকার কথা আমার কিছুই মনে নেই—আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মিষ্টি স্বভাব। আমার মনে আছে আমাকে ডেকে বললেন: ভাল করে পড়াশুনা করছ ত। পরে বিলেত যাবে, ওখান থেকে একটা মানুষের মত মানুষ হয়ে আসবে। বাবার সঙ্গে সরকারের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদে দাদা যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকারী চাকরি নিলেন না। ত্রিপুরা রাজ-সরকার তখন তাঁদের খনিজ পদার্থ আবিষ্কারের জন্য একজন ভাল ভূতত্ত্ববিদ খুঁজছিলেন—দাদার নাম শুনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। দাদা সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

এর কিছুদিন পর আমার মেজদাও বিলেত থেকে ফিরে এলেন "মেটালার্জিস্ট" হয়ে। তিনিও কোন এক স্টেটে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন।

পূজোর সময় রাঁচী একেবারে সরগরম হয়ে থাকত। আমার বোনেরা, জামাই বাবুরা ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা সবাই আমাদের ওখানে আসতেন। যদিও বাড়ীটা আমাদের বেশ বড় কিন্তু সেখানেও সেই সময় "তিল ধারণের স্থান" থাকত না। তখনকার দিনের নামকরা অনেকেই প্রায় রাঁচীতে যেতেন। এখানে ওখানে 'টি-পার্টি' হতো—এখনকার মত তখন অবশ্য 'ককটেল পার্টির' হিড়িক ছিল না। চা খাবার পর আরম্ভ হতো গান-বাজনা।

মা নিজে অনেকগুলি ছোট ছোট নাটক লিখেছিলেন—যেমন ধ্রুব, প্রহ্লাদ ইত্যাদি, সেই সব নাটকই আমরা সব ভাইবোনেরা এবং পারিবারিক বন্ধুদের ছেলেমেয়েরা মিলে অভিনয় করতাম। এক এক সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকও অভিনীত হতো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচীতেই থাকতেন মোরাবাদী হিলে বাড়ী ক'রে। প্রায় প্রতি রবিবার সকালে তিনি আমাদের বাড়ীতে আসতেন 'রিক্সা' ক'রে। আমাদের গেটে ঢুকেই তিনি রিক্সার ঘণ্টাটি বাজাতেন, ঠুং ঠুং আওয়াজ শুনলেই বুঝতে পারতুম যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এসেছেন। তিনি এসে আমাদের নানারকম গল্প বলতেন, গান শেখাতেন। তাঁর আর একটি অভ্যাস ছিল, সেটা হলো ছবি আঁকা। আমাদের কাউকে একবার সামনে পেলে হয়, জোর করে বসিয়ে স্কেচ করতেন। এই ছবি আঁকার ভয়ে শেষে আমরা তাঁকে দেখলেই লুকিয়ে পড়তাম। কাউকে সামনে না পেলে হয়ত বাগানের মালীকে কিংবা বাড়ীর চাকরবাকর যাকেই সামনে পেতেন তাকেই ধরে নিয়ে বসিয়ে

ছবি আঁকতে শুরু ক'রে দিতেন। তাঁর ছবি আঁকা থেকে আমরা রেহাই পেতে চাইলেও, তিনি যখন গান শেখাতেন—বিশেষ করে যখন গল্প বলতেন তখন আমরা তাঁর কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকতুম—এত ভাল লাগত তাঁর সান্নিধ্য।

বাবাকে সকলেই শ্রদ্ধা করতেন—তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং মিষ্ট ব্যবহার-সকলকেই মুগ্ধ করত। সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতেন পি, এন, বোস—'দি গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান অফ রাঁচী।'

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে জামশেদপুরে টাটা কোম্পানীর বিরাট লৌহ কারখানার জন্য খনিজ লৌহ যেখান থেকে আসে, সেই গুরুমহিষাণীর আবিষ্কারক হচ্ছেন আমার বাবা। একটা গুজবও প্রচলিত আছে যে, এই আবিষ্কারের জন্যে তিনি নাকি একটা মোটা টাকা পেয়েছিলেন। এমন কি অনেকের মনে এ ধারণাও আছে যে, আমরা এখনও পর্যন্ত নাকি টাটা কোম্পানীর কাছ থেকে বেশ মোটা রকমের একটা মাসোহারা পেয়ে থাকি। এই ধারণাটা অবশ্য সাধারণ লোকের মনে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। আজ যে কোম্পানী কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে, লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করছে, সেই বিরাট মহীরুহের বীজটিকে যিনি বপন করেছিলেন, তাঁর প্রতি কোম্পানীর একটা কর্তব্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আসল কথাটি হচ্ছে এই।

আমি আগেই বলেছি যে, ১৯০৩-৪ সালে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের গুরুমহিষাণীতে লৌহ-আকর আবিষ্কার করেছিলেন বাবা। এই সময় বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জামসেদজী নাসেরওয়ানজী টাটা বিরাটভাবে বিলাতী আদর্শে একটা লৌহ কারখানা স্থাপন করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ পরিকল্পনায় তাঁকে উপদেশ ও পরামর্শ দিচ্ছিলেন সি, পি, পেরীন ও সি, এম, ওয়েল্ড। এঁরা মধ্যপ্রদেশের ঢুল্লি ও রাজহারায় প্রচুর লৌহ আকরের সন্ধান পেলেন। কিন্তু এই স্থান দুটি বহু পূর্বে ১৮৮৭ সালে বাবা আবিষ্কার ক'রে জিওলজিক্যাল সার্ভের রেকর্ডে প্রকাশ করে রেখেছিলেন। (Vide Records of the Geological Survey, Vol. XX, Pt. 1.) বর্তমানের ভিলাই লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় এই রাজহারা ও ঢুল্লি থেকেই আকরিক লৌহ চালান আসে।

যখন জামসেদজী টাটা জানতে পারলেন যে বাবা এই জায়গা দুটিতে লৌহ-আকরের আবিষ্কারক, তখন তিনি বাবাকে চিঠি লিখে এই স্থানে লৌহ কারখানা স্থাপন করার ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। তার উত্তরে বাবা জামসেদজী টাটাকে ২০।২।১৯০৪ তারিখের চিঠিতে জানালেন যে ময়ূরভঞ্জ স্টেটের গুরুমহিষাণীতে

প্রচুর লৌহ আকরের সমাবেশ রয়েছে। ঢুলি ও রাজহারা থেকে গুরুমহিষাণীতে কাজ করার সুবিধা এই জন্যে বেশী যে, বাংলাদেশের কয়লাখনিগুলি এর খুব নিকটেই। এই চিঠি পাবার পর শ্রীটাটা খুবই আকৃষ্ট হলেন এই প্রস্তাবে এবং বাবার সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেওয়ের পক্ষে বাবা এবং শ্রীটাটার পক্ষে শ্রীদোরাবজী টাটা, সি, পি, পেরীন, সি, এম, ওয়েল্ড ও মিঃ শাক-লাতওয়ালা আলোচনা চালান, কিন্তু কোন রকম বন্দোবস্ত পাকাপাকি হবার আগেই শ্রীজামসেদজী টাটা মারা যান ১৯০৪ সালে। এর পর তাঁর ছেলেরা বাবার সঙ্গে আলোচনা চালান। মহারাজ রামচন্দ্র ভঞ্জদেও বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি টাটা কোম্পানীর কাছ থেকে যে রয়ালটি পাবেন তার থেকে বাবাকে কিছু অংশ দেবেন। মহারাজের প্রতিশ্রুতির কথাটা একটা লেখাপড়া করে রাখার জন্যে বাবার বহু আইনজ্ঞ বন্ধু ও হিতৈষীরা অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বাবা বললেন: মহারাজা যখন বলেছেন তখন তাঁর কথায় অবিশ্বাস করব কি করে? লেখাপড়ার কোন দরকার নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মহারাজা এক শিকার দুর্ঘটনায় মারা যান। পরে মহারাজার উত্তরাধিকারীরা এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। বাবা যাতে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্যে তাঁর দু'একজন আইনজ্ঞ আত্মীয় ও বন্ধু বাবাকে এই সম্পর্কে আদালতে একটা এফিডেভিট ক'রে রাখবার পরামর্শ দেন। কিন্তু বাবা কোর্টে যেতে বরাবরই গররাজী, তাই তিনি তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি।

ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ে গেল। এর অনেকদিন পরে ১৯০৭ সালে টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী এক প্রস্পেক্টাস বের করেন। মজার কথা এই যে, তার কোনখানেই বাবার নামের উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। তার ওপর তার ভিতরে বহু ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল। যে গুরুমহিষাণী লৌহসম্পদের ফলে টাটা কোম্পানী আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রতিষ্ঠান, সেই লৌহসম্পদের আসল আবিষ্কারকের নাম না থাকায় বাবা অতিশয় ক্ষুব্ধ হন এবং স্বর্গত জে, এন, টাটার সেক্রেটারী মিঃ বি, জে, পাদশাকে প্রস্পেক্টাসের ভুলগুলি সংশোধন করে একটি চিঠি লেখেন।

সেই চিঠির সব শেষে তিনি লেখেন: I hope in justice to me and in the interest of truth you will be so good as to revise your prospectus in the light of these facts.

এ চিঠির উত্তরে মিঃ পাদশা ১৯০৭ সালের ৩রা জুলাই যে চিঠি লেখেন

সেটাকে ব্যবসায়িক কূটনীতির চূড়ান্ত নিদর্শন বলা যেতে পারে। মিঃ পাদশা লিখলেন :

"In a commercial document one is not always able to reserve place for giving due credit to everyone but it is perfectly fair that the document should not be so worded as to imply that credit elsewhere than where it is due."

এর পরেও আমার সেজমেসো (ক্ষীরোদ বিহারী দত্ত) বাবাকে অনেক করে বললেন : একটা কিছু করা দরকার। একটা এফিডেভিট করে ঘরে চুপ করে বসে থাক—বাকী সব কাজ আমরা করে দেব—তোমার একটি পয়সাও খরচ হবে না। তোমার ন্যায্য প্রাপ্য এভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।

বাবার সেই এক কথা—কোর্টে তিনি কখনও যাবেন না। ব্যাস্, বাবার নাম ও অর্থ দুইই চাপা পড়ে গেল কূটনৈতিক চালের ধাক্কায়।

কিন্তু সত্য একদিন না একদিন সাধারণ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েই। দীর্ঘদিন পরে টাটা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কীনানকে ১৯৩১ সালের ২৯-এ আগস্ট তারিখের এক চিঠিতে মার্কিন লৌহ-বিশেষজ্ঞ মিঃ সি, পি, পেরীন জানান—

"আপনি হয়ত জানেন না যে, ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতত্ত্ববিদ ছিলেন মিঃ পি, এন, বোস। গুরুমহিষাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনিই আমাদের প্রথম মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং পৃথিবীর সেই প্রান্তে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই আমি যাই। তাঁর আবিষ্কারের জন্যই আজ ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের লৌহ-আকরের এই বিরাট প্রতিষ্ঠান। এই ঘটনাগুলি না ঘটলে আজকের এই বিরাট টাটা প্রতিষ্ঠানের জন্ম হতো কিনা সন্দেহ।"

এর পরেও বাবার অবদানের কথা টাটা কোম্পানী স্বীকার করে নি। বাবার মৃত্যুর তিন বছর পরে যখন জামসেদপুরে তাঁর এক মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয় তখন উদ্বোধনের সময় টাটা কোম্পানীর পক্ষ থেকে বাবার আবিষ্কারের কথা স্বীকার করা হয়। এই স্বীকৃতির বেশী আর কিছু পাওয়া যায় নি টাটা কোম্পানীর কাছ থেকে।

বাবাকে আমরা প্রায়ই বলতে শুনেছি যে জীবনে দুটি জিনিসকে তিনি সসম্মানে এড়িয়ে চলেন—একটি হলো আদালত আর একটি হলো ডাক্তার। যিনি একবার আদালতে দাঁড়ালেই একটা বিরাট টাকার অধিকারী হতে পারতেন, তিনি তা

হাসিমুখে নিজের আদর্শের জন্য ছেড়ে দিলেন। মার কাছে আমরা শুনেছি যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তিনি কোনদিন কোন আদালতে যাননি এবং কোন ডাক্তারও দেখাননি। এতখানি মনের জোর আজকের দিনে যে-কোন মানুষের কল্পনার বাইরে। বাবার এই নির্ভীক মনের পরিচয় তাঁর জীবনে আমরা বহুবারই পেয়েছি। আমি এখানে একটি ঘটনার কথা শুধু বলব।

১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়ে বাবা বিলাত যাত্রা করেন। এই বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি সারা ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি বিলাত যাত্রার পাথেয় হিসাবে ১০০ পাউণ্ডের (আনুমানিক ১৫০০ টাকা) এবং প্রতি বছর ১০০ পাউণ্ড হিসাবে ৫ বছর এই বৃত্তি পান। ১৮৭৮ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু জানবার আশায় রয়েল কলেজ অফ সায়েন্সে প্রবেশ করেন। ১৮৭৯ সালে তাঁর গিলক্রাইস্ট বৃত্তির মেয়াদ শেষ হয়।

তখন নিজের খরচ চালাবার জন্য বহু ভারতীয় ছাত্রদের, বিশেষ করে সিভিল সর্ভিস পরীক্ষার্থীদের গৃহশিক্ষকতা করেন। এই সময় বিলাতে রবীন্দ্রনাথ আসেন তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। ওখানকার একটি স্কুলে রবীন্দ্রনাথ পড়াশুনা করতেন, বাবাই তাঁকে ইংরাজী পড়িয়েছেন কিছুদিন এবং এই গৃহশিক্ষকতা ছাড়াও বহু পত্র-পত্রিকাতে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একটি প্রবন্ধ ছিল ইন্দো-এরিয়ান সভ্যতা সম্বন্ধে। এই রচনার জন্য তিনি ইতালী সরকারের কাছ থেকে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

এই সময়ে বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি বিশেষ বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে বাবা ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দাদাভাই নৌরজী, ডব্লিউ, সি, বনার্জি, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠান ভারতীয়দের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন করেন—ফলে এর সভ্যরা তাঁদের এই স্বদেশপ্রীতির জন্য বিদেশীদের বিরাগভাজন হন। কিন্তু প্রমথনাথের নির্ভীকতা, সৎসাহস এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে তদানীন্তন ভারতের সেক্রেটারী অব স্টেটস্ পরম প্রীত হন এবং তাঁকে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার একটি উচ্চপদে নিযুক্ত করে ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়।

বাল্যাবস্থায় আমাদের একটি ভাল অভ্যাস ছিল। এ অভ্যাসটি মা'ই শিখিয়েছিলেন। প্রতি রাত্রে শয্যাগ্রহণের আগে আমরা ঈশ্বরের প্রার্থনা করতাম। সে অভ্যাস আজও ছাড়তে পারিনি। মার প্রভাব আমার জীবনে সব থেকে বেশী করে পড়েছিল। যতরকম আদর আবদার তা সে ন্যায্যই হোক আর অন্যায্যই হোক—মার কাছে করতাম। মা সেগুলো কখনও স্নেহে, কখনও শাসনে, এমন সুন্দরভাবে মানিয়ে নিতেন যে এখন ভাবলে অবাক লাগে। অনেকের কাছেই শোনা যেত যেন মার কাছে আমার আদরটা ছিল একটু বেশী রকম। দিদিরা বলত মা আমাকেই বেশী ভালবাসতেন। আমারও মনে হয় দিদিদের কথাই সত্যি।

মার মনটি ছিল অদ্ভুত রকমের সরল—অসম্ভব ছিল তাঁর আত্মমর্যাদাজ্ঞান। একটা বুদ্ধির দীপ্তি তাঁকে সব সময় সকলের থেকে পৃথক করে রাখত। ভগবানের ওপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। লেখাপড়ার দিকে ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। তখনকার দিনে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া জানা ক'জনই বা ছিলেন! আমার দাদামশাই রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন যেমন পণ্ডিত ব্যক্তি, বাবাও ছিলেন তেমনি বিদ্বান, সুতরাং লেখাপড়াজানা এবং সাহিত্যানুরাগী হওয়া তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ছোটবেলায় মনে আছে, মা দাদামশায়ের "মহারাষ্ট্র-জীবন প্রভাত", "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা," "মাধবীকঙ্কণ" "মহাভারত" ও "রামায়ণ" (ইংরেজীতে) এবং অনেক ইংরাজী কবিতা পড়ে পড়ে শোনাতেন।

বাঙলার নারী-জাগরণের আন্দোলনে তাঁর দান বড কম নয়। রাঁচীতে তিনি প্রথমে একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেন, তা থেকে অনেক গরীব মেয়ে ও বিধবাকে অর্থসাহায্য করা হতো। তাঁরই চেষ্টায় রাঁচীতে প্রথম মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়—"ছোটনাগপুর বালিকা বিদ্যালয়"। এর গৃহ নির্মাণকল্পে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চাঁদা আদায় করেন।

নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর এই বিরাট আগ্রহের কথা মনে রেখেই আমার ছোটকাকা অমিয়নাথ বসু ১৯৩২ সালে কলকাতায় মার নামে "কমলা গার্লস্ স্কুল" বালিকা-বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। ছোটকাকা—আমরা তাঁকে অমিয়কাকা বলেই ডাকতাম—মাত্র ৩০০০ টাকা সম্বল করে দক্ষিণ কলিকাতার লেক রোডে এই স্কুলটির পত্তন করেন। এই স্কুলের প্রথম সভাপতি হন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ১৯৩৪ সালে সেজদি (লেডী প্রতিমা মিত্র) এই প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী হন; কিন্তু ১৯৩৭ সালে স্যার বি, এল, মিত্র ভারত সরকারের আইনসচিব নিযুক্ত হওয়াতে

সেজদিকে সভানেত্রীর পদে ইস্তফা দিয়ে দিল্লী যেতে হয়। এই সময় থেকে, অর্থাৎ ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত, দীর্ঘ বার বৎসর মাননীয় বিচারপতি পরলোকগত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতি থেকে স্কুলটির অনেক উন্নতিসাধন করেন। এর পরে ১৯৫০ সাল থেকে সেজদি আবার কমলা গার্লস স্কুলের সভানেত্রী হন। সেজদির অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে কমলা গার্ল্স স্কুলের নিজস্ব নূতন বাড়ী হয়, এবং আজ কমলা গার্ল্স স্কুল, কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন বলে সর্বজনস্বীকৃত।

রাঁচীর নূতন বাড়ীতে দিনগুলি বেশ নিরুদ্বিগ্ন শান্তির ভিতর দিয়ে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু একদিন আমাদের সেই সুখের সংসারে দুঃখের ছায়াপাত ঘটল। ১৯০৯ সালের শেষের দিকে একদিন খবর এল বরোদায় আমার দাদামশাই রমেশচন্দ্র দত্ত দেহত্যাগ করেছেন। মা ছিলেন দাদামশাইয়ের বড়ো মেয়ে এবং সবচেয়ে আদরের। এই আকস্মিক আঘাতে মা একেবারে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। জীবনে এই তাঁর প্রথম শোক এবং এটা খুব বেশী করেই তাঁর বুকে বাজল। কিন্তু সময়ে সবই সয়ে যায়; মাও আস্তে আস্তে তাঁর শোকাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠলেন। আবার তিনি তাঁর পুরোনো কাজকর্মে ফিরে গেলেন—সেই মেয়েদের স্কুল, মহিলা সমিতি ইত্যাদি।

আমাদের বাড়ীর ভিতর বিরাট কম্পাউণ্ড ছিল। সেইখানে আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে ফুটবল এবং হকি খেলতাম। বন্ধু বলতে স্কুলের সহপাঠীরা ও কোল, ভীল, সাঁওতাল ছেলেরা। মাঝে মাঝে আমরা ম্যাচও খেলতাম। আমি ছিলাম দলের অধিনায়ক এবং আমার দলে থাকত বেশীর ভাগই কোল, ভীল, সাঁওতাল ছেলেরা। তারা হকি খেলায় বেশ পারদর্শী ছিল। কিন্তু তখন অত 'হকি ষ্টিক' তারা পাবে কোথায়? পেয়ারা গাছের ডাল ভেঙ্গে তাই দিয়ে বেশ সুন্দর 'হকি ষ্টিক' তৈরী করে তারা খেলত। আমার দলের ছেলেদের দেখে আমার সেজ ভগ্নিপতি ব্রজেন্দ্র-দা (স্যর বি, এল, মিত্র) ঠাট্টা ক'রে বলতেন: মধু ও তার কোল রেজিমেণ্ট। এই কোল-ভীল-সাঁওতাল ছেলেদের ওপর আমি একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতাম। শান্তিনিকেতন থেকেই এই আকর্ষণটি গড়ে উঠেছিল এবং আজও পর্যন্ত এটা থেকেই গেছে।

এলো ১৯১২ সাল।

সেজদা হাজারীবাগ কলেজে ভর্তি হয়েছে। রাঁচীর বাড়ীতে রয়েছি বাবা, মা, আমি ও আমার দুই দিদি—ন'দি ও ছোড়দি।

হঠাৎ একদিন খবর এলো বড়দা খুব অসুস্থ—ত্রিপুরা থেকেই অসুস্থ অবস্থায় কলকাতা চলে এসে আমার মামার ওখানে হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে উঠেছে। খবর পেয়েই মা সঙ্গে সঙ্গে দিদিদের নিয়ে চলে গেলেন কলকাতায়।

তার কয়েকদিন পর বাবার নামে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। টেলিগ্রামের বিষয় আমি কিছুই জানতে পারলাম না, শুধু বুঝতে পারলাম যে বাবাও সেই দিনই কলকাতা রওয়ানা হচ্ছেন। যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন: বাড়ীতে ঠিকভাবে থাকতে।

তিনচারদিন পরে বাবা ফিরে এলেন। আমি স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি বাবা বাইরের বাঁধানো চাতালটাতে চুপ করে বসে আছেন। আমি বাড়ীতে আসতেই পাহাড় কাঁদতে কাঁদতে এসে আমাকে বলল: দাদা আর নেই।

আমি যদিও এই ট্র্যাজেডীর গভীরতাটুকু সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারলাম না—তবু পাহাড়ের কান্না ও বাবার গম্ভীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনটা যেন উদাস হয়ে গিয়েছিল। আমি চুপ করে পাহাড়ের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি নির্বিকারভাবে তাঁর সেই প্রিয় ইজি চেয়ারটিতে বসে গড়গড়া টেনে যাচ্ছেন।

কিন্তু এই শোকাবহ ঘটনার পরেও বাবাকে দেখতাম, সেই একই রকমভাবে তিনি দৈনন্দিন কর্মগুলি করে চলেছেন। যেন এতবড়ো দুঃখ তাঁকে অণুমাত্রও স্পর্শ করেনি।

আজ বুঝতে পারি যে, জাগতিক বস্তুর ওপর আকর্ষণটা বাবার বরাবরই কম ছিল। টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ প্রভৃতির দিকে তাঁর কোন মোহ ছিল না—নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেই তিনি অপরিসীম আনন্দ পেতেন। মিথ্যে মায়ার বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে নিজের মানসিক স্থৈর্যকে নষ্ট করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। নিজের মনকে তিনি এমনভাবে তৈরী করেছিলেন, যা পার্থিব সুখশান্তির অনেক উর্ধ্বে। সেইজন্য বহু লোকে তাঁকে বৈজ্ঞানিক প্রমথনাথ না বলে বলত ঋষি প্রমথনাথ।

কয়েকদিন পরে সাহস করে বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: মা কেমন আছেন? কবে আসবেন? বাবা বেশ সহজভাবেই বললেন: মনে হয় এখন খানিকটা সামলে উঠেছেন। তবে তোমার মামা অজয় লিখেছে এই সময় একটা চেঞ্জে গেলে শরীর ও মন দুইই ভাল হবে। আমিও লিখে দিয়েছি দার্জিলিংএ

যাবার ব্যবস্থা করতে—তোমারও ত গ্রীষ্মের ছুটি হচ্ছে, তুমিও চলে যাও তোমার মার সঙ্গে দার্জিলিং-এ।

একদিন আমরা সকলে দার্জিলিং চলে এলাম। এখানে স্থান পরিবর্তনে এবং নূতন আবহাওয়ায় এসে মা ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। কথায় বলে, 'Time is the best healer'—সত্যিই তাই। সময়ে এই শোকেরও তীব্রতা কমে গেল। কিছুদিন দার্জিলিং-এ থাকার পর আমরা আবার রাঁচীতে ফিরে এলাম।

এই সময়ে আমার মেজদা অলোকনাথ টাটা কোম্পানীতে 'মেটালার্জিস্ট'-এর চাকরী পেলেন। এরই কিছুদিন পরে ১৯১৪ সালে টাটারই একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী অমূল্যচন্দ্র বসুর সঙ্গে ন'দির (পূর্ণিমা) বিবাহ হয়ে গেল রাঁচীতে। আমি তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি। বাবা নিজেই আমাকে পড়াতে শুরু করলেন। অবশ্য আগেও বরাবর ছুটির দিনে বাবা আমার পড়াশুনার তদারক করতেন। ছাত্র হিসাবে আমি ভালই ছিলাম বিশেষ করে ইংরাজী, অঙ্ক, ভূগোল ও ইতিহাসে। সংস্কৃত ও বাংলাতেই দুর্বল ছিলাম। সংস্কৃত পড়াবার জন্য উনি স্কুলের পণ্ডিতমশাইকে নিযুক্ত করলেন এবং বাংলা ও ইংরাজী নিজেই পড়াতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আমি যেন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালভাবে পাস করতে পারি। কিন্তু আমি তখন স্কুল টিমের ক্যাপ্টেন—ফুটবল এবং ক্রিকেটের। আমার টীম এখানে ওখানে খেলতে যাবে, আর আমি খেলাধূলো ছেড়ে বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকব? অগত্যা আমাকে নানা অজুহাত দেখিয়ে বাবার কাছ থেকে ছুটি নিতে হতো। কারণ আমি জানতাম যে, বাবা ফুটবল দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আর ফুটবল খেলতে যাচ্ছি বললে কিছুতেই যেতে দেবেন না। কখনও বলতাম রামগড়ে যাচ্ছি পিক্‌-নিক্‌ করতে, কখনও বলতাম বন্ধুর দিদির বিয়েতে যাচ্ছি। বাবা যে বুঝতে পারতেন না তা নয়, কিন্তু মুখে কিছু বলতেন না। রাঁচি জেলাস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তখন মিঃ অরগীল। এই খেলাধুলোর জন্য তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর কাছে ছিল আমার সাত খুন মাপ। অরগীলকে দেখেই আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে, "Englishmen have a natural weakness for sportsmen." কথাটা সত্যি।

ফুটবল খেলার নেশা তখন আমার এমন ছিল যে সাইকেল করে রাঁচী থেকে হাজারিবাগে (প্রায় ৭০ মাইল) খেলতে যেতাম। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি—তিনটে খেলাতেই সমস্ত বছর মেতে থাকতাম বলে বাবার আশা সফল করতে পারি নি।

অর্থাৎ যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম তখন ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করলাম এই পর্যন্ত, তার বেশী কিছু হয়নি। রাঁচীতে আমার এক বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ আইকতের দাদা সৌরেন্দ্রনাথ আইকত তখন কলকাতায় মেট্রোপলিটন কলেজে পড়ত। ভাল স্পোর্টসম্যান হিসেবে কলকাতায় তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। রাঁচীতে এলে সে প্রায়ই আমাকে মেট্রোপলিটনের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ এস, রায় ভাল স্পোর্টসম্যানদের কি রকম উৎসাহ দেন, সেই কথা বেশী করে শোনাত। তার কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি ঠিক করেছিলাম যে ম্যাট্রিক পাস করার পর আমিও মেট্রোপলিটন কলেজেই পড়ব। বাবাকে সে কথা বলায় বাবা তাতে রাজী হন নি। বাবা বুঝতে পেরে-ছিলেন যে কলকাতায় গেলে শুধু খেলাধুলাই হবে, পড়াশোনা কিছুই হবে না। তাতে গোল্লায় যাবার পথটা আমার প্রশস্ত হবে। তাই যখন ম্যাট্রিক পাস করলাম তখন বাঁকুড়ায় ওয়েস্লিয়ান কলেজে তিনি আমায় ভর্তি করে দিলেন।

বাঁকুড়া কলেজে ঢুকে খেলাধুলা, গানবাজনা বেশ পুরোমাত্রাতেই চলতে লাগল। এই সময় নতুন খেলা শিখলাম—তাস এবং পাশা। আর এই তাস পাশাতেই বেশীর ভাগ সময় কাটত। প্রায় প্রত্যেক দিনই আমার ঘরে হয় তাস না হয় পাশার আড্ডা বসত। এবং যথারীতি চেঁচামেচি হ'ত।

এদিকে হস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্পুনারের ঘর থেকে আমার ঘরটি স্পষ্ট দেখা যেত। সেজন্য আমরা একজন ছেলেকে আমার ঘরের সামনে বসিয়ে রাখতাম। বেশী রাত্রি পর্যন্ত আমাদের এই চেঁচামেচি শুনে মাঝে মাঝে মিঃ স্পুনার তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরের দিকে এলেই ছেলেটি আমাদের সবাইকে সাবধান করে দিত এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘর একেবারে সাফ। আমি একটা বই খুলে অত্যন্ত ভাল ছেলের মত পড়তে শুরু করে দিতাম। মিঃ স্পুনার যখন এসে জিজ্ঞাসা করতেন: এখানে এত গোলমাল হচ্ছিল কিসের? এই দেখলাম অনেক ছেলে মিলে হট্টগোল করছ—সব গেল কোথায়?

আমি নির্বিকারভাবে বলতাম: আমার এখানে কোন গোলমাল হয়নি স্যার, আপনি ভুল শুনেছেন।

মিঃ স্পুনার রাগতভাবে বলতেন: আমি যে নিজের চোখে দেখলাম কয়েকজন ছেলেকে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। আমি আগের মতই নির্বিকারভাবে বলতাম: ছেলেদের আপনি ঠিকই দেখেছিলেন তবে তারা এসেছিল আমার কাছে ইংরাজী পড়া জেনে নিতে, গোলমাল ত' কেউ করেনি।

—মিথ্যে কথা! আচ্ছা, যেদিন সবাইকে হাতেনাতে ধরব সেদিন টের পাবে, বলে তিনি চলে যেতেন।

কিন্তু তাস বা পাশা খেলা বন্ধ হলো না—আমার ঘরে বেশ সমানভাবেই চলতে লাগল। মিঃ স্পুনার বহু চেষ্টা করেও আমাদের হাতে-নাতে ধরতে পারলেন না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল রেভাঃ ব্রাউনকে একদিন রিপোর্ট করে দিলেন।

আমি আগেই বলেছি যে ইংরাজদের বরাবরই একটা দুর্বলতা আছে স্পোর্টস-ম্যানদের ওপর। প্রিন্সিপ্যাল ব্রাউন খেলাধুলোর জন্যে আমায় খুব ভালবাসতেন। তিনি আমাকে আরও ভালবাসতেন এই কারণে যে আমি খুব ভাল গান গাইতে পারতাম। বিশেষ করে খ্রীস্ট সঙ্গীত (Hymn)। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে তাঁর কোয়ার্টারে ডেকে পাঠাতেন গান গাইবার জন্য।

মিঃ স্পুনার রেভাঃ ব্রাউনের কাছে বেশ ভাল করেই লাগিয়েছিলেন আমার ঘরে হৈ-হল্লার কথা। রেভাঃ ব্রাউন একদিন আমায় ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: মিঃ স্পুনারের কাছে শুনলাম যে তোমার ঘরে প্রায়ই রাত্রে চেঁচামেচি হট্টগোল হয়। একি সত্যি?

মিঃ স্পুনার যখন আমাদের হাতে-নাতে ধরতে পারেন নি, তখন প্রথমটা ভাবলাম এ অভিযোগটাকে বেমালুম অস্বীকার করে যাই। কিন্তু রেভাঃ ব্রাউনের সৌম্য শান্ত মুখ দেখে মিথ্যা কথা বলতে মন চাইল না, আমি মুখ নীচু করে বললাম: হ্যাঁ স্যার, আপনি যা শুনেছেন সব সত্যি।

রেভাঃ ব্রাউন প্রশ্ন করলেন: তোমার ঘরে কে কে যায়? আমি চুপ করে রইলাম—তিনি বুঝতে পারলেন যে আমি কোন ছেলের নাম বলতে রাজী নই।

রেভাঃ ব্রাউন বললেন: যদিও আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে তোমাকে শাস্তি দেওয়া উচিত, তবুও আমি তোমাকে শেষবারের মত একটা সুযোগ দিচ্ছি। যদি আবার এই ধরণের ঘটনার কথা আমি শুনি তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে আর তোমার বাবার কাছেও আমায় চিঠি লিখে সব জানাতে হবে।

আমি মুখ নীচু করে বললাম: আর এরকম হবে না স্যার।

এরপর আমি যতদিন হস্টেলে ছিলাম—এ প্রতিশ্রুতি আমি পালন করেছিলাম।

রেভাঃ ব্রাউনকে কথা ত দিলাম কিন্তু তাস এবং পাশার নেশা এমনভাবে

আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল যে কয়েকদিন খেলতে না পেয়ে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠলাম।

কিন্তু হস্টেলে তো আর খেলা যাবে না, তাই একটা জায়গার খোঁজ করতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে কলেজের কাছেই একটি ছোট বাড়ী পাওয়া গেল। আমরা ৮।১০ জন মিলে ঠিক করলাম যে হস্টেল ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে থাকব। এতে থাকারও সুবিধে হবে আর খেলাধুলা বা আড্ডা দেওয়ার কোন রকম বাধা থাকবে না।

রেভাঃ ব্রাউনকে এসে বললাম একথা। তিনি শুনে বললেন: তোমরা যদি মনে কর যে এতে তোমাদের বেশী সুবিধে হবে তাহলে তোমরা স্বচ্ছন্দে ওখানে গিয়ে থাকতে পার।

আমাদের আনন্দ আর তখন দেখে কে? এরপর আমরা নতুন বাড়ীতে উঠে গেলাম।

বাবাকে লিখলাম হস্টেলের খাওয়া-দাওয়া মোটেই ভাল নয় তাই আমরা কয়েকজন মিলে একটা আলাদা বাড়ী নিয়েছি। নিজেদের পছন্দমত খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছি। আমরা ওখান থেকে অনেক ভাল আছি এখানে।

আমি জানতাম যে খাওয়ার বিষয় বললে বাবা কখনও আপত্তি করবেন না। আর সত্যিকথা বলতে কি, আমাদের দলের মধ্যে দুজন ছেলে ছিল যারা বাজার করা থেকে আরম্ভ করে ঠাকুর-চাকরের তদারক করা পর্যন্ত এমন সুষ্ঠুভাবে করতে লাগল যে হস্টেলের থেকে খাওয়া-দাওয়া অনেক ভাল হলো এবং খরচও কম হলো।

একদিন ক্লাস হচ্ছে, এমন সময় প্রিন্সিপাল রেভারেণ্ড ব্রাউন ক্লাসে ঢুকে বললেন: এখানে মধু বোস বলে কেউ আছে? আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম: আমারই নাম মধু বোস স্যার।

তিনি বললেন: তোমার নাম তো সুকুমার বোস। অবশ্য তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল কুকুমার—যেভাবে তুমি হস্টেলে মিঃ স্পুনারকে জ্বালাতন করেছিলে।

আমি সলজ্জ হাসি হেসে বললাম: মধু হচ্ছে আমার বাড়ীর ডাক নাম স্যার।

—ও—। তোমার নামে একটা চিঠি আছে। যে চাকর চিঠিটা এনেছে সে বললে তোমার আত্মীয় মিঃ কে. বি. ডাট লিখেছেন—এই নাও। চাকর দাঁড়িয়ে আছে অফিস রুমে—তুমি যাও তার সঙ্গে দেখা করে চিঠির জবাব দিয়ে দাও। ...আর হ্যাঁ, মধু নামটা উচ্চারণ করা সহজ, আমিও আজ থেকে তোমাকে মধুই বলব। বলে হাসতে লাগলেন।

আমি চিঠিটা নিয়ে খুলে পড়তেই দেখি সেজমেসো অর্থাৎ মিঃ কে. বি. দত্ত এসেছেন বাঁকুড়ায় একটা কেসের ব্যাপারে। আমাকে তিনি সন্ধ্যার সময় দেখা করতে বলেছেন। অফিসে গিয়ে দেখি বামাচরণ (সেজমেসোর পুরোনো চাকর) দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই বললে: সাহেব এসেছেন একটা কেস করতে, আজ সন্ধ্যের সময় ডাকবাংলোতে যেতে বলেছেন। আমি বলে দিলাম: তাঁকে বোলো যে আমি সন্ধ্যের সময় নিশ্চয় যাব।

আজকের দিনে খুব কম লোকই জানেন যে, এই ক্ষীরোদবিহারী দত্ত, বার-অ্যাট-ল তখনকার ব্রিটিশ রাজত্বের সময় অবিভক্ত বাঙলাদেশে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধকে উদ্বুদ্ধ করতে কতখানি সাহায্য করেছিলেন। বিলেতে তিনি লর্ড সিন্‌হা, স্যার বি. সি. মিত্র ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর মত আইনবিশারদদের সমসাময়িক ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি প্রথম প্র্যাকটিস্ শুরু করেন মেদিনীপুর জেলা আদালতে এবং অল্পদিনের মধ্যেই বিরাট পসার জমিয়ে ফেলেন। তিনি মেদিনীপুর বোমা মামলা ও তৎসংশ্লিষ্ট মামলাগুলির জন্য বহুদিন নিজের প্র্যাক্‌টিস বন্ধ করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের বিপ্লবীদের হয়ে মামলা চালিয়ে ছিলেন। সে সময় তাঁর বিপক্ষে সরকারের তরফে ছিলেন যতসব বাঘা-বাঘা আইনবিশারদ---যেমন এস. পি. সিন্‌হা (পরে লর্ড সিন্‌হা) মিঃ নর্টন, গার্থ, কেনরিক, ডান্ প্রভৃতি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের নবজাগরণকে গলা টিপে মারবার জন্য যে অত্যাচার শুরু করেছিল, তার বিপক্ষে যেসব বাঙালীর ছেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল তাদের সাহায্য করবার জন্য তিনি বহু ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। ডিফেন্স কাউন্সিল হিসেবে নিজে তো এক পয়সাও ফি নেন নি, তার ওপর যে সব গরীব ছেলে মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল, তাদের পরিবারদের যথাসাধ্য সাহায্যও করেছিলেন।

তিনি যখন প্রমাণ করলেন যে, মেদিনীপুর বোমা মামলাটি ওখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ অফিসারদের মধ্যে এক ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়—মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করে সবটাই বানানো ব্যাপার এবং শুধু তাই নয়, যখন তিনি আসামী-দের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করলেন, তখন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি তো তাঁকে মাথায় করে নাচতে শুরু করে দিল এবং ক্ষীরোদবিহারী দত্তকে আইন-জগতে বাঙলার মুকুটহীন সম্রাট আখ্যায় ভূষিত করল। অর্ধশতাব্দী আগে শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এরকম অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করার

কথা কল্পনাই করা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কে. বি. দত্তের অবদান এবং তাঁর দেশপ্রেমিকতার কথা ভোলবার নয়।

কলেজের ছুটির পর সন্ধ্যের সময় গেলাম ডাকবাংলোয় সেজ মেসোর সঙ্গে দেখা করতে। তখন শীতকাল, আমি তো গিয়েছি শুধু একটা সার্ট গায়ে দিয়ে, পরনে ধুতি আর পায়ে একটা স্যাণ্ডেল। গায়ে কোনরকম গরম জামা না দেখে তিনি বকে উঠলেন: এই শীতের সময় গরম জামা গায়ে দিসনি কেন? ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে!

আমি বললাম: আমার শীত তেমন লাগে না—রাঁচীর শীতেই গায়ে গরম জামা দিতাম না।

তিনি বললেন: না না, ওসব আদিখ্যেতা ভাল নয়—শীতের দিনে সন্ধ্যের সময় অন্তত: একটা গরম কোট পরিস।

আমি বললাম: ধুতির সঙ্গে কোট পরতে আমার ভাল লাগে না।

তিনি বললেন: তাহলে একটা শাল ব্যবহার করিস, নইলে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করলে কে দেখবে?

এই রাঁচীর শীত প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেক বছর পরে—বোধ হয় ১৯৪৪ সালে—একবার রাঁচী গিয়েছিলাম সাঁওতাল নাচের ছবি তোলার জন্য। তখন আমি আই-এফ-আই (ইনফরমেশন ফিল্মস্ অফ ইণ্ডিয়া)-এর হয়ে 'ড্যান্সেস অফ ইণ্ডিয়া' তুলছি। মনে আছে সন্ধ্যের সময় শুধু গরম স্যুটই নয়, বিলেতের ভারী ওভারকোট চাপিয়েও শীত করত—আশ্চর্য, অভ্যাস কি না করে!

বাঁকুড়ায় সেজ মেসো ২।৩ দিন ছিলেন—আমি রোজই যেতাম সেখানে। তার পর তিনি যেদিন চলে গেলেন—সেদিনও যাবার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন: শরীরটার যত্ন করিস রে—এটাই হল আসল। ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লাগাস নি।

বাঁকুড়ায় থাকতেই আমি সৌরেন্দ্র আইকতকে লিখেছিলাম যে, ফার্স্ট ইয়ার যা হলো, তা হলো,—সেকেণ্ড ইয়ারে উঠে আমি কলকাতায় মেট্রোপলিটানে চলে যাব। এখানে খেলাধুলার তেমন আদর নেই—যদিও আমি ফুটবল হকি এবং ক্রিকেট—সব বিভাগেরই ক্যাপ্টেন। কিন্তু খেলব কার সঙ্গে? কাছাকাছি পুরুলিয়া এবং আদ্রা ছিল। সেখানে খেলতে যেতাম—মাঝে মাঝে তারাও আসত। কিন্তু এতে ঠিক মন ভরত না।

সৌরেন্দ্র আমাকে লিখল: প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে আমি তোমার বিষয়ে কথা বলেছি। তিনি রাজী হয়েছেন এবং তোমাকে তিনি চান।

বাঁকুড়ায় ফার্স্ট ইয়ারে পরীক্ষা দেবার পর বাবাকে লিখলাম যে, এখানে সায়েন্স পড়ার ভাল বন্দোবস্ত নেই—ভাল ল্যাবরেটরী নেই—সেজন্যে এখানে আই-এস-সি পড়ার আমার ইচ্ছে নেই। আমি কলকাতায় মেট্রোপলিটান কলেজে পড়ার বন্দোবস্ত করেছি।

বাবা বুঝলেন যে এটা একটা অজুহাত মাত্র—আসলে আমার কলকাতায় যাবার ইচ্ছে। আর এটাও বুঝলেন যে, একবার যখন জিদ ধরেছি তখন আমি যাবই। এক্ষেত্রে আর আপত্তি করা বৃথা ভেবে, অনিচ্ছার সঙ্গে মত দিলেন।

আমি মেট্রোপলিটানে সেকেণ্ড ইয়ারে ভর্তি হলাম।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে মেট্রোপলিটান অর্থাৎ (বর্তমান বিদ্যাসাগর) হস্টেলে গিয়ে উঠলাম। বলা বাহুল্য, কলেজের ক্রিকেট ও ফুটবল টীমে আমার স্থান হয়ে গেল। তখন মেট্রোপলিটান ফুটবল টীমে অনেক নামকরা খেলোয়াড় ছিল, যেমন গোষ্ঠ পাল, নগেন কালি, রাজেন সেন (১৯১১ সালের মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়ী টিমের সভ্য) প্রভৃতি। রাজেন সেন ছিলেন আমাদের ফুটবল টীমের ক্যাপ্টেন।

ফুটবল মরশুমে প্রায়ই কলেজ কামাই হতো তবে 'প্রক্সি'র বন্দোবস্ত করা ছিল, যাতে কলেজের খাতায় হাজিরাটা ঠিক থাকে। তবে একটা ক্লাস কখনও কামাই করতাম না, সেটা হলো শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর ক্লাস। তিনি ছিলেন আমাদের ইংরাজীর অধ্যাপক।

খেলাধুলার জগতে সেই সময় এমন একটা আবহাওয়া ছিল যে, প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর মদ্যপান করত। এটা যেন একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমাদের দেশে বরাবরই ফুটবল খেলা হয় বর্ষাকালে। কোনদিন খেলার পর বা বৃষ্টিতে ভিজে শরীর একটু ম্যাজ-ম্যাজ করলে সবাই বলত: দুই-এক পেগ টেনে নাও—সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিই, এ অবস্থায় একটু খেলে শরীরের অবসাদ কেটে গিয়ে বেশ চাঙ্গা মনে হতো। এইভাবে একটু একটু করে মদ্যপান করতে করতে এটা একেবারে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় ফুটবল মরশুম শেষ হলে আমরা খেলতে যেতাম বাইরে—মুর্শিদাবাদ, তাজহাট, ঢাকা, কুচবিহার প্রভৃতি জায়গায়। একবার কুচবিহারে খেলতে গেছি। কুচবিহার টিমে বেশীর ভাগই মোহনবাগানের ভূতপূর্ব খেলোয়াড়েরা ছিল, যেমন শিবদাস ভাদুড়ী, বিজয় ভাদুড়ী, স্বকুল, কানু, অভিলাষ প্রভৃতি। আমরা

সব একসঙ্গে চলেছি এক কামরায় নরক গুলজার করে। কামরার মধ্যেই সুরার স্রোত বয়ে যাচ্ছে—তখন আমার বয়স কতই বা—আঠার বছর হবে। এইসব নামকরা স্পোর্টসম্যানের এই দৃষ্টান্ত চোখের সামনে দেখে আমার তরুণ মনে তখন এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ভাল স্পোর্টস্‌ম্যান হতে গেলে এই রকম না করলে চলে না। এইটাই রীতি বা ফ্যাশান। তার ওপর কুচবিহার মহারাজার অতিথি হয়েছিলাম আমরা—সেখানে তো খাদ্য ও পানীয়ের ছড়াছড়ি। সুতরাং আমিও এর প্রভাব থেকে বাদ পড়লাম না। এইভাবেই আমার ড্রিঙ্কের হাতেখড়ি হয়।

সন্ধ্যার পর মদ্যপান করলেও যাঁরা তখন ফুটবল খেলতেন, তাঁরা খেলার সময়ে যে একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, আজকের দিনে তা একান্তই দুর্লভ। মনে হয়, এই কারণেই সে-যুগে ফুটবল খেলার যে উচ্চমান এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে যে স্পোর্টসম্যান-স্পিরিট দেখা যেত, বর্তমানে তা হারিয়ে গেছে। সুকুল, নগেন কালি, রাজেন সেন, শিবদাস, বিজয়দাস, অভিলাষ, কানু রায়, গোষ্ঠ পাল প্রভৃতির মতো খেলোয়াড় আজ দুর্লভ।

এর কিছুদিন পরে হস্টেল থেকে একটা মেসে এসে উঠলাম। কারণ, হস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখলেন যে, আমাদের ছোট্ট দলটির অত্যাচারে হস্টেলের বাকি সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তিনি কাছাকাছি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে কলেজের একটা মেস্‌-এ আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। বললেন: যা কিছু করতে হয়, তোমরা ওই বাড়ীতে কর—হস্টেলের বাকী ছেলেগুলোর মাথা খেয়ো না।

ভালই হোল আমাদের। মনের আনন্দে গানবাজনা, খেলাধূলা চলতে লাগল। আমার ঘরে থাকত নগেন কালি। যতদিন আমি কলেজে পড়েছি, বরাবরই আমি ও নগেন একঘরে বাস করে এসেছি। তখনকার দিনে ফুটবলে নগেন কালি খুব একজন নামকরা গোলকীপার—আমাদের কলেজের টিমে খেলত এবং মোহনবাগানেও খেলত। তার সম্বন্ধে একটা মজার গল্প মনে পড়ে গেল।

নগেন কালি তখন ঢাকা উয়াড়ীর হয়ে খেলে। ঢাকা উয়াড়ী খেলতে এসেছে কলকাতায় আই-এফ-এ শীল্ডে। প্রথম রাউণ্ডে খেলা পড়েছে কাস্টমসের সঙ্গে। উয়াড়ীর টিম তখন বেশ শক্তিশালী। প্রথম দিন ড্র গেছে ০—০ গোলে। দ্বিতীয় দিনও কাস্টমস কিছুতেই গোল করতে পারছে না—এদিকে কাস্টমসের নাম-করা সেন্টার ফরোয়ার্ড গ্যালব্রেথ খালি সুযোগ খুঁজছে কি করে গোল করা যায়।

একবার নগেন বল ধরেছে কর্ণার কিক্ থেকে—এমন সময় গ্যালব্রেথ এমন ভীষণভাবে চার্জ করল যে, নগেন একেবারে ধরাশায়ী! গ্যালব্রেথ সেই ফাঁকে বলটি গোলে ঠেলে দেয়।

রেফারী বাঁশী বাজালেন 'গোল' বলে। এদিকে নগেন আর ওঠে না। দেখা গেল, নগেনের 'কলার-বোন' ভেঙ্গে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। মেডিক্যাল কলেজে সে রয়ে গেল কিছুদিন।

কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পর নগেন একটু সুস্থ হতেই কাউকে কিছু না বলে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে স্রেফ একেবারে ঢাকার টিকিট কিনে ট্রেনে চেপে বসল। এদিকে হাসপাতালে একটি রোগী এসে নগেন যে-বেডে ছিল সেই বেডেই ভর্তি হল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, রোগীটি এসেই সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। বিকালবেলায় সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টার নগেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে, ঐ বেডে যে-রোগীটি ছিল সে মারা গেছে। সে তখনই অফিসে গিয়ে কাল বর্ডার দিয়ে খবরের কাগজে ছেপে দেয়—প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় নগেন কালির মৃত্যু-সংবাদ।

নগেন যখন বাড়ী গিয়ে পেঁছায়, তখন শোনে যে, তার মৃত্যুসংবাদে বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। এদিকে নগেনকে সশরীরে উপস্থিত দেখে বাড়ীর সবাই তাকে প্রথমটা ভূত মনে করে আঁতকে ওঠেন। শেষে অবশ্য তার কথায় সকলে আশ্বস্ত হন এবং দু'একদিনের মধ্যেই খবরের কাগজের ভুল সংবাদটিও সংশোধিত হয়।

প্রতিদিন খেলার পর আমার ঘরেই আড্ডা বসত। চপ, কাটলেট এবং তরল পদার্থটি প্রচুর পরিমাণে চলতে লাগল। শিশিরকুমারের ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ী আমাদের আড্ডায় প্রায়ই আসত—এবং খাদ্য ও পানীয়তে অংশ গ্রহণ করত। একদিন তাকে এক পাত্র পানীয় এগিয়ে দিতে সে বলল: না ভাই, আজ ইনষ্টিটিউটে রিহার্সাল আছে, তোর মনে নেই? দাদা যদি মুখে গন্ধ পায় তাহলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বললাম: আরে দূর, গন্ধ পাবে কেন? একটু মশলা খেয়ে নে—আর কেউ ধরতে পারবে না।

বিশ্বনাথের ইচ্ছে ছিল পুরোপুরি—আমার একথায় আর আপত্তি করল না। আমরা দুজনেই বেশ একটু চাঙ্গা হয়ে রিহার্সালে গেলাম। যেতে বোধহয় মিনিট দশেক দেরী হয়েছিল। তার জন্যে প্রথম চোটেই বকুনি খেতে হলো শিশিরবাবুর

কাছে। তারপর আমাদের চাল-চলন দেখে তাঁর হয়ত কিছু সন্দেহ হয়েছিল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন: সুকুমার, এদিকে এসো তো—। একেবারে কাছে যেতে ভয় হচ্ছিল—একটু দূরেই গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন: দূরে কেন—কাছে এস।

কাছে যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন আমার অবস্থাটা। ধমক দিয়ে বললেন: এই বয়েস থেকেই শুরু করেছ? আর বিশেও ছিল বুঝি তোমাদের সঙ্গে? বিশ্বনাথের মুখ তখন সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বিশ্বনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শিশিরবাবু রাগতভাবে বললেন: ফের যদি তোমরা ড্রিঙ্ক করে রিহার্সালে আসবে তাহলে আর তোমাদের অভিনয়ে নেওয়া হবে না। আজ তোমরা যেতে পার—রিহার্সালের দরকার নেই।

মাথা নীচু করে আমি আর বিশু চলে এলাম। আসতে আসতে বিশু বললে: তোকে এত করে বললাম যে রিহার্সালের আগে খেয়ে কাজ নেই—দাদা বড় রাগ করেন। তোরা শুনলি না—জোর করে আমায় খাওয়ালি— ফলে এই বকুনিটা খেতে হলো। চল—এখন তোদের ওখানেই যাই—বাড়ী পরে যাব।

পুজোর সময় রাঁচী গেলাম। ১৯১৮ সাল। সেবার বিহারে ইনফ্লুয়েঞ্জার মড়ক লাগল চতুর্দিকে। আমি এবং স্কুলের পুরোনো বন্ধুরা ও পাড়ার ছেলেরা মিলে একটা দল করেছিলাম। অসুখে লোকেদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম, যাদের ডাক্তারের ফি দেবার ক্ষমতা ছিল না, তাদের জন্যে চাঁদা তুলে ডাক্তার আনতাম এবং কেউ মারা গেলে তাকে শ্মশানে নিয়ে যেতাম। আমরা সবাই এ রোগের প্রতিষেধক নিয়েছিলাম। শুধু বাবা ছাড়া। তিনি বরাবরই বলতেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আমি চলি— আমার কোন অসুখ করবে না। সেই তিনজন ডাক্তারের পরামর্শ হলো নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করা, ব্যায়াম করা এবং নির্মল বায়ু সেবন করা। সত্যি, এই তিনটি নিয়ম তিনি আজীবন মেনে চলতেন বলে আমরা কখনও তাঁকে অসুস্থ হতে দেখিনি।

ইনফ্লুয়েঞ্জার মড়ক সত্ত্বেও পূজার সময় হৈ-চৈ লেগেই ছিল। ইউনিয়ন ক্লাবে থিয়েটার (তাতে আমিও একটা বিশেষ ভূমিকায় নেমেছিলাম), দুর্গামেলায় যাত্রা ইত্যাদি পূর্ণোদ্যমে চলেছিল।

এমন সময় হঠাৎ খবর এলো যে আমার মেজদা (অলোকনাথ) সাকৃচীতে ইন-ফ্লুয়েঞ্জাতেই আমাদের সকলের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। এই খবরটা এত

আকস্মিক যে, বাবা ও মা দুজনেই সাংঘাতিক আঘাত পেলেন। এর এক বছর আগে আমার মেজ ভগ্নিপতি রজতনাথ রায়ও ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন। শোকের পর শোক—১৯১২ সালে দাদা, ১৯১৭ সালে রজতবাবু, আর এখন মেজদার মৃত্যুতে মা খুবই কাতর হয়ে পড়লেন।

আমাকে মেজদা খুব ভালবাসতেন। আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন প্রায়ই ছুটিতে মেজদার কাছে সাক্‌চীতে (এখন জামসেদপুর) যেতাম। মেজদার স্বভাব ছিল ঠিক বাবার মত। সাধারণ ভাবে থাকা এবং উচ্চচিন্তা করা—যাকে বলে Plain living and high thinking. কোন ক্লাবে যাওয়া বা কোন সভা-সমিতিতে গিয়ে হৈ-হল্লা করা মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর অফিস ছিল তখন কালীমাটিতে (এখন টাটানগর)। অফিস যেতেন, তাও পায়ে হেঁটে—সাক্‌চী থেকে কালীমাটির দূরত্ব হল দুই মাইলের বেশী। অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যের সময় তাঁর কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে বসে দাবা খেলতেন—অন্য কোন আমোদ-প্রমোদে একেবারেই যোগ দিতেন না। এমন কোন কোন দিন গেছে যেদিন হয়ত কোন বন্ধুই এসে পৌছুলেন না, তখন আমার সঙ্গেই বসে যেতেন দাবার ছক নিয়ে। আমার বয়স তখন তের কি চৌদ্দ। সেই বয়েসে আমিও দাবা খেলায় বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

মেজদার স্বভাব ছিল শিশুর মত সরল। আমাকে মেজদা চিরকালই সেই 'ছোট্ট মধুটা' বলে মনে করতেন। মনে আছে একবার পূজোর সময় মেজদা ও বৌদি রাঁচীর বাড়ীতে এসেছেন—তখন আমি বাঁকুড়া কলেজে পড়ি—আমিও পূজার সময় রাঁচীতে এসেছি। বোধহয় একদিন আমাকে সিগারেট খেতে কোথাও দেখেছেন, তাতে বৌদিকে বলেছিলেন: জান. মধুকে দেখলাম বেশ সিগারেট টানছে। বৌদি কলকাতার মানুষ, অনেক কিছু দেখেছেন। তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন: তাতে আর কি হয়েছে ? ও এখনও সেই "ছোট্ট মধুটা" আছে নাকি ? সে এখন কলেজে পড়ছে, শুধু সিগারেটের ওপর দিয়েই যদি যায় তবু তো ভাল। মেজদা কখনও সিগারেট খান নি—তাই আমাকে সিগারেট খেতে দেখে তিনি মনের মধ্যে আঘাত পেয়েছিলেন। এর আরও একটা কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি আমায় সত্যিই খুব ভালবাসতেন এবং আমার ওপর তাঁর একটা উঁচু ধারণা ছিল। তিনি সাক্‌চীতে তাঁর বন্ধুদের সামনে প্রায়ই বলতেন: তোমরা দেখো, ও একদিন মানুষের মত মানুষ হবে।

মেজদার বিয়ে হয়েছিল সেকালের বিখ্যাত ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের কন্যা শান্তির সঙ্গে। মেজদার মৃত্যুর পর মেজবৌদি তাঁর এক বছরের শিশুপুত্রকে (খোকন, ভাল নাম আশীষ) নিয়ে রাঁচির বাড়ীতে এসে উঠলেন।

এদিকে আমার পূজোর ছুটি ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু মাকে ঐ অবস্থায় ফেলে আসতেও মন চাইছে না। এরই মধ্যে দুই পুত্রকে হারিয়েছেন—সেজদাও তখন বিলেতে আছে দন্তচিকিৎসক হবার জন্য। সুতরাং ছেলে বলতে তখন আমিই একমাত্র। মা যেন আমাকে আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরলেন। কলেজ খুলতে আর দুদিন বাকী! বাবা বললেন: জানি, তোমার মাকে এই অবস্থায় ফেলে যেতে তোমার মন চাইছে না; কিন্তু কলেজ কামাই করাও উচিত নয়, সামনের বছরের গোড়ায় আই-এস-সি পরীক্ষা। সুতরাং এখন কলকাতায় ফিরে যাওয়াই তোমার উচিত। বিদায়ের দিন মা আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন আর বার বার একই কথা বলতে লাগলেন: শরীরের যত্ন করিস বাবা।

কলকাতায় ফিরে এলাম। তখন ক্রিকেট সিজন্। আমি কলেজের টিমের হয়ে খেলছি এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়েও খেলছিলাম। ক্রিকেট জগতে স্পোর্টিং ইউনিয়নের তখন খুব নাম-ডাক—অনেক ভাল ভাল খেলোয়াড় এই দলে ছিলেন—এর সেক্রেটারী ছিলেন শ্রী ডি. এন. সেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তখন কুচবিহার-মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের নিজের একটি ক্রিকেট টিম ছিল। জিতেন্দ্রনারায়ণ নিজেও খুব ভাল ক্রিকেট খেলতেন। এমন কি তাঁর অন্য দুই ভাইও (হীতেন্দ্রনারায়ণ ও ভিক্টরনারায়ণও) ভাল ক্রিকেট খেলতেন। আমরা সেই দিনটির জন্য উৎসুক হয়ে থাকতাম যেদিন উডল্যাণ্ডস-এ মহারাজার প্রাসাদে ক্রিকেট খেলা হবে। কেননা খাওয়া-দাওয়ার এলাহি বন্দোবস্ত। মনে আছে লাঞ্চের পর যদি খেলতে হতো, বিশেষ করে যদি ফিল্ডিং করতে হতো তবেই প্রাণান্ত।

ক্রিকেট খেলা ও হৈ-চৈ-এর মধ্যে দিয়ে দিন কেটে যেতে লাগল। তারপর কোন রকম করে আই-এস-সি পাস করলাম দ্বিতীয় বিভাগে। দ্বিতীয় বিভাগ হওয়ায় বাবা মর্মাহত হলেন। বললেন: মেট্রোপলিটন কলেজে পড়ে আর কাজ নেই—পড়াশোনা যা হচ্ছে তা তো বুঝতেই পারছি। খালি খেলা আর খেলা। তার চেয়ে সেণ্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হও। ওখানে ভাল ভাল প্রফেসর আছে—ভাল ল্যাবরেটরী আছে—পড়াশোনাও ভাল হবে। আমি আবার আপত্তি তুললাম, বললাম: কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল তো কিছুতেই আমাকে ছাড়বেন না—যাব কি করে? তাঁকে যে আমি কথা দিয়েছি, বি-এস-সি এখানেই পড়ব। বাবা দেখলেন যে, ছেলে নাছোড়বান্দা! কি আর করেন। তিনি হাল ছেড়ে দিলেন।

থার্ড ইয়ারটা বেশীর ভাগ 'প্রকসির' ওপর দিয়েই কেটে গেল। ভাল খেলোয়াড় বলে ফোর্থ ইয়ারে প্রমোশন পেয়ে গেলাম। খেলা ধূলাটা পুরোমাত্রাতেই চলছিল। কলেজ টীমে তো খেলছিই—তাছাড়া এরিয়াঙ্গে ফুটবল খেলি এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে খেলি ক্রিকেট।

তখন আমাদের ফিজিকস্-এর প্রফেসর ছিলেন ডঃ বি. সি. ঘোষ। তিনি আমাদের মেসের পাশেই থাকতেন। ছাত্রদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, বিশেষ করে আমাকে তিনি এবং তাঁর ইংরেজ স্ত্রী, দুজনেই খুব ভালবাসতেন। খেলার জন্য বেশীর ভাগ দিনই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে পারতাম না। কিন্তু তিনি আমাকে অবসর সময়ে ল্যাবরেটরীতে নিয়ে গিয়ে বিশেষ যত্ন করে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতেন।

ফোর্থ ইয়ারে উঠে আমরা কয়েকজন আমহার্স্ট স্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া নিলাম। সবাই আমরা একটি পরিবারের মতই থাকতাম। কলকাতায় থেকে শহরের আবহাওয়া এবং প্রভাব একদিকে যেমন আমার অনিষ্ট করেছিল, অপর দিকে তেমনি এই তিন বছরে আমার জীবনের আর একটি দিকও উদ্ঘাটিত হয়েছিল। আগেই বলেছি যে ছেলেবেলায় কি আরামেই না মানুষ হয়েছিলাম—বিশেষ করে যখন রাঁচীর স্কুলে পড়ি। কিন্তু সেখান থেকে যখন কলকাতার মেসে এসে উঠলাম তখন শুরু হল আমার এক নূতন পরীক্ষা।

ছারপোকা ভরা তক্তপোশে শোওয়া, চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জলে সকলের সঙ্গে স্নান করা, নিজে কাপড় কাচা, বিছানা করা, এমন কি আমহার্স্ট স্ট্রীট মেসে পালা করে বাজার করা—এই সব অভ্যাস আমাকে মানুষ হতে, পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে সম্মুখীন হতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

মনে আছে, ১৯১৯ সালে কলকাতায় বসন্ত যখন মহামারী রূপে দেখা দিল, তখন আমাদের মেসেও ৩।৪ জনের হলো। ঠাকুর-চাকর সবাই পালাল। তখন আমরা নিজেরাই বাজার করা থেকে রান্না করা পর্যন্ত, সবই করতাম। নিজেদের বিপদের কথা একবারও মনে আসেনি। ভগবানের দয়ায় আমার আর নগেন কালির কিছু হয়নি। এক কবিরাজ থাকতেন আমাদের মেসের কাছে। তিনিই সব দেখাশোনা করতেন। তিনি বলেছিলেন পাঁচন খেতে। হয়ত কবিরাজ মশায়ের পাঁচন খেয়েই আমাদের কিছু হয়নি।

তাই বলছিলাম, কলকাতায় এসে আমার যেমন ক্ষতি হয়েছিল তেমনি আবার লাভও হয়েছিল। মানুষের দুঃখ-কষ্টে ভাগ নেওয়া, সঙ্গী সাথীদের বিপদে বুক

পেতে দাঁড়ানো—এ সবই হোল মেসে সকলের সঙ্গে থাকার ফল। বাবা বোধহয় সেইজন্যেই আমার হস্টেল বা মেসে থাকাটা অনুমোদন করতেন। নইলে কলকাতায় আমার অনেক বড়লোক আত্মীয় ছিলেন সে সময়। আমি ইচ্ছে করলেই হয়ত পরম আদরে সেখানে থাকতে পারতুম। কিন্তু বাবা বলতেন যে আমার ছেলে মানুষ হোক গরীবি চালে—সাধারণের সঙ্গে থেকে, তাহলেই সে মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে শিখবে।

এই ভাবেই আমার কলেজ জীবন শেষ হলো।

এই সময় আমার ছোড়দি (উমার) বিয়ে হয়ে গেল জ্ঞানাঙ্কুর দে'র সঙ্গে। জ্ঞানাঙ্কুর মাত্র বছর খানেক আগে বিলেত থেকে ফিরেছে আই-সি-এস হয়ে, সে তখন কাঁথিতে এস-ডি-ও।

কলকাতায় তিন বছর থাকার ফলে আমি বেশ খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলাম, অর্থাৎ আগে যেরকম ধরাবাঁধা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে মানুষ হয়েছিলাম স্কুলজীবনে, কলকাতায় কলেজ-জীবনে সেসব নিয়মকানুন ও সংযমের বাঁধ কোথায় ভেসে তলিয়ে গিয়েছিল। ফলে শরীরটা একদম ভেঙ্গে পড়ল।

সেই সময় সেজদি দার্জিলিং যাচ্ছিল কিছুদিনের জন্য বেড়াতে। আমার শরীরের অবস্থা দেখে সেজদি বলল: তোর শরীরটা যে একেবারে ভেঙে পড়েছে রে—চল, আমার সঙ্গে কিছুদিন দার্জিলিং ঘুরে আসবি। তোর একটা চেঞ্জ দরকার।

সত্যিই আমার একটা 'চেঞ্জ' দরকার ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে সেজদির সঙ্গী হয়ে গেলাম।

সেজদির দুই ছেলে শঙ্কর ও চানু (ভাস্কর) এবং মেয়ে সীতাও আমাদের সঙ্গে গেল। ওরা তখন সকলেই ছেলেমানুষ।

আমরা গিয়ে উঠলাম প্রতিভা-লজে। সে-বাড়ীতে আরও দুটি পরিবার ছিলেন—এক জাস্টিস এস. সি. মল্লিক ও মিসেস্ মল্লিক এবং অপর পরিবারটি হলেন আমার ছোট মেসো মিঃ জে. এন. গুপ্ত ও ছোট মাসীমা। ছোট মাসীমা সরলা দেবী হলেন রমেশচন্দ্র দত্তের চতুর্থ কন্যা। সকলেই পরিচিত এবং আপনা-আপনির মধ্যে, সুতরাং খুব মনের আনন্দে দিন কাটতে লাগল। ছোট মেসো বেজায় আমুদে লোক, সুতরাং সব সময় তিনি আসর জমিয়ে রাখতেন।

এখানে ফাঁকা হাওয়ায় বেড়ানো, ঘোড়ায় চড়া এবং একটা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকার ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্যের উন্নতি বেশ বুঝতে পারলাম।

একদিন জাস্টিস মল্লিক, ছোট মেসো ও আমি 'ঘুমে' গেছি বেড়াতে। 'ঘুমে'র খুব কাছেই টাইগার হিল। ছোট মেসো বললেন : জাস্টিস মল্লিক, চলুন আজ রাত্রে টাইগার হিলের ডাক-বাংলোয় থাকি—কাল সকালে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় ও মাউন্ট এভারেষ্টের চূড়ো দেখা যাবে।

জাস্টিস মল্লিক বললেন : তা কি করে হয়? বাড়ীতে তো বলে আসিনি। আর আমরা এসেছিও তো অপ্রস্তুত অবস্থায়।

ছোট মেসো বললেন : আরে বাড়ীতে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করছি। মধু চলে যাক বাড়ীতে—সে খবর দিয়েও আসবে আর সঙ্গে করে কিছু বিছানা ও রাগ্ নিয়ে আসবে।

আমারও 'টাইগার হিল' থেকে সূর্যোদয় দেখার ইচ্ছে হচ্ছিল—আমি ছোট মেসোকে সমর্থন করে বললাম : আমি এখুনি যাচ্ছি—গিয়ে মাসীমা আর মিসেস মল্লিককে বুঝিয়ে বলে আসছি—আর আসবার সময় বিছানা-পত্তর নিয়ে আসব। বলে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলাম প্রতিভা-লজে। আমি এসে খবর দিতে মাসীমা এবং মিসেস মল্লিক দুজনেই গজ্‌গজ্ করতে লাগলেন। আমি কিছু বিছানা ও 'রাগ্' নিয়ে চলে এলাম—টাইগার হিলের ডাক-বাংলোয়। সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ আগে ডাক-বাংলোর লোকেরা আমাদের জাগিয়ে দিয়ে গেলো। আমরা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম সেই পরম বাঞ্ছিত মুহূর্তটির জন্যে। আমাদের বরাত গুণে সেদিন আবহাওয়াটা ভাল ছিল। ধীরে ধীরে সূর্য উঠল—সে যে কি দৃশ্য তা জীবনে ভুলবার নয়। ওখান থেকে দূরে তুষারধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গগুলির ওপরে সূর্যের সোনালী কিরণ পড়ায় মনে হচ্ছে যেন বিধাতা অকৃপণ হস্তে আকাশ থেকে গলিত সোনা বৃষ্টি করছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার বহু চিত্র আমি দেখেছি বহু শিল্পীর তুলির মাধ্যমে, কিন্তু চোখের সামনে অনন্ত ঐশ্বর্যশালী হিমালয়ের যে ধ্যানগম্ভীর মূর্তি দেখলাম তা অবিস্মরণীয়। এতক্ষণে বুঝলাম যে কেন পৃথিবীর দূর দূরান্তর থেকে লোক ছুটে আসে এই সূর্যোদয় দেখবার জন্যে।

সূর্যোদয় ও মাউন্ট এভারেস্ট দেখা শেষ করে আমরা বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। আসবার সময় জাস্টিস মল্লিক বললেন : 'সান রাইজ' দেখা তো হলো, মাউন্ট এভারেস্টও দেখা হল—আর তা দেখে আমাদের মনও খুব খুশী, কিন্তু এইবার 'হোম ডিপার্টমেণ্ট'কে খুশী করতে পারবেন কি?

ছোট মেসো বললেন : এতবড় একটা জিনিস দেখা তো হল—আবার কবে সময় সুযোগ হবে তার ঠিক নেই। 'হোম ডিপার্টমেণ্ট' যে 'চার্জ সীট' দেবে

সেটা নির্বিবাদে মেনে নিয়ে 'Silence is golden' পন্থা অনুসরণ করুন—দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

হলোও ঠিক তাই। তাঁরা বাড়ী ঢুকতেই ওপর থেকে মাসীমা এবং নীচে থেকে মিসেস মল্লিকের সুউচ্চ কণ্ঠস্বর বেশ ভালোই শোনা যেতে লাগল কিছুক্ষণ ধরে। মেসোর মত জাস্টিস মল্লিকও সম্পূর্ণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে রইলেন।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল আনন্দ-কলরবের মধ্যে দিয়ে।

ওখানে আমি নিয়মিত ঘোড়ায় চড়তাম। এই ঘোড়ায় চড়া উপলক্ষ্যে একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল, যা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে রইল।

একদিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে—রাস্তাঘাট বেশ ভিজে। পাহাড়ী ঝর্ণার জল উপ্‌চে উঠে রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আমি ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে জলাপাহাড়ের কাছে একটা ঝর্ণার ধারে পৌঁছুতেই দেখি, একজন তরুণী সেখানে একলা অশ্বপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটি যতবার ঘোড়াটিকে নিয়ে জলটা পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, ততবারই ঘোড়াটা জলের ধার পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে সামনের পা দুটো তুলে।

মেয়েটিকে এর আগেও দার্জিলিং-এ দেখেছি ঘোড়ায় চড়তে। অবশ্য সে সময় এর ছোট ভাই সঙ্গে থাকত। আজই তাকে প্রথম একলা দেখলুম। তাকে এই রকম বিপন্ন অবস্থায় দেখে তার দিকে আমি এগিয়ে গেলাম, যদি তার কোন সাহায্যে লাগি এই মনে করে।

আমি তরুণীটিকে অভিবাদন করে বললাম, ঘোড়াটা জল পেরোতে চাইছে না কেন, এর নিশ্চয় একটা সঙ্গত কারণ আছে। আপনি একবার নামুন তো ঘোড়া থেকে, দেখি ব্যাপারটা কি! আমার ঘোড়ার লাগামটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়েই আমি তার ঘোড়াটার পিঠে উঠে পড়লুম; এরপর তার পেটে পা দিয়ে মৃদু আঘাত করতেই ঘোড়াটা সুড়ুৎ করে জলটা লাফিয়ে পেরিয়ে গেল। এই দেখে মেয়েটি তো অবাক! বললে—আশ্চর্য তো, আপনি চাপতে বেশ পেরিয়ে গেল, আর আমাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে কেন?

আমি বললুম, খুবই স্বাভাবিক। আপনি তো side-saddle-এ (অর্থাৎ মেয়েরা দুটি পা একদিকে রেখে যে-ভাবে চড়ে সেইভাবে) চড়েন, ঘোড়াটি হয়ত side-saddle-এ অভ্যস্ত নয়। আপনি নিশ্চয়ই এই ঘোড়াটায় আজ নতুন চড়ছেন।

তরুণীটি বললেন: আপনি ঠিক ধরেছেন—এ ঘোড়াটায় আমি আজই প্রথম চড়ছি। আপনি না এলে আমি হয়ত আরও খানিকটা চেষ্টা করতুম, ঘোড়াটা

ক্ষেপে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়ত আমাকে ফেলেই দিত। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

—না না, এতে ধন্যবাদ দেবার কি আছে? বলে আমি সেদিনের মতো বিদায় নিলাম।

এর পরে তরুণীটির সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হতে লাগল। দু'জনে একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াই, হেঁটেও বেড়াই, রেস্তোরাঁয় যাই। আলাপ ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। তরুণীটি খুব ভালো বেহালা বাজাতো। প্রায়ই তাদের বাড়ীতে গিয়ে তার বেহালা বাজানো শুনতাম, এবং সে শুনতো আমার গান। দু'জনে দু'জনের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতাম।

এই প্রথম বসন্তের ছোঁয়াচ লাগল আমার জীবনে, একটা অননুভূত আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেতে লাগল আমার শরীরে। ওখানকার সমাজে আমাদের দুজনকে ঘিরে অল্প অল্প কানাঘুসাও শুরু হয়ে গেল।

এদিকে কলকাতায় ফেরার দিন এগিয়ে এল। সেখানে ফিরে গিয়ে দুজনের মধ্যে কতটা মেলামেশা সম্ভব হবে, সেই ভাবনায় আমি যখন মশগুল, ঠিক সেই সময় একদিন তরুণীটি বলল—মা একবার তোমায় দেখা করতে বলেছে। শুনেই কেমন হকচকিয়ে গেলাম; বুঝলাম তিনি কি বলবেন। তবু কম্পিতবক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হল! তিনি স্থির গলায় ধীরে ধীরে যা বললেন, তা হচ্ছে এই: আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বেশ ভালোরকম জানাশোনা আছে বলেই বলছি, তোমার ভবিষ্যৎ তো এখনও অনিশ্চিত, সবে কলেজ ছেড়েছ। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার মতো অবস্থা না হলে তোমার খুব হিসেব করে সমঝেই চলা উচিত, তাই নয় কি? তুমি বড়ো হয়েছ, তোমাকে বুদ্ধিমান বলেই জানি। আশা করি, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

না, আমি তাঁকে ভুল বুঝিনি। আমাকে আমার সম্বন্ধে সচেতন করে তিনি ভালোই করেছেন। সত্যিই তো, আর একজনের দায়িত্ব নেব, এমন ক্ষমতা তখন আমার কোথায়? কাজেই বিদ্রোহী মনকে বশে আনতেই হল; মনে আছে সেদিন চোখের জলে জীবনের প্রথম বসন্তকে অকস্মাৎ আমি সেই শেষ অভিবাদন জানিয়েছিলাম।

কলকাতায় ফিরে এসে উঠলাম হ্যারিসন রোডের (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) এক মেসে। ভাল একটা কাজের জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলাম। একে বলি, তাকে বলি, সকলেই বলে দেখি চেষ্টা করে। ছোটমেসো (জে. এন. গুপ্ত) তখন

বর্ধমান বিভাগের কমিশনার। ছোটমাসীমা ও ছোটমেসোর চুঁচুড়ার বাড়িতে একদিন গেলাম, বললাম ছোটমেসোকে একটা কাজের জন্যে। তাঁর তখন প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি। বহু ছেলের চাকরী করে দিয়েছেন। কাউকে রেলওয়েতে এ, টি, এস, কাউকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে, আবার কাউকে কোন বিলাতী সওদাগরী অফিসে। তাঁকে বলায় তিনি বললেন চেষ্টা করে দেখবেন।

এদিকে কলকাতায় মেসের খাবার আমার ঠিক সহ্য হচ্ছিল না—শরীরে আবার ভাঙ্গন ধরল। টাকা-পয়সার টানাটানি দেখা দিল। মাকে টাকার বিষয় লিখতে মা একবার কিছু টাকা পাঠালেন। তাতে মেসের খরচ চালিয়ে ব্যক্তিগত খরচ চালান সম্ভব হলো না। ক্রমশঃ শরীর আবার ভেঙ্গে পড়তে লাগল। মার পক্ষে নিয়মিত বেশী টাকা পাঠানো সম্ভবও ছিল না—বাবার পেনসনের টাকা থেকে রাঁচীর অতবড় সংসার চালিয়ে উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছুই থাকত না।

চুঁচুড়ায় আমি প্রায়ই যেতাম—ছোটমেসো আমার শরীরের অবস্থা দেখে একদিন বললেন: যতদিন না কোন কাজকর্মের ব্যবস্থা হয়, ততদিন কলকাতায় মিছিমিছি থেকে কি হবে—তার চেয়ে তুই এইখানেই থাক—আমি চেষ্টা করে দেখি কতদূর কি করতে পারি।

বাধ্য হয়ে কলকাতায় মেসের বাস তুলে দিয়ে চুঁচুড়াতেই চলে এলাম।

মেসোমশাইয়ের চরিত্রের মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যা খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁর মতো আমুদে, পরিহাসপ্রিয় এবং দিলখোলা লোক আমি খুব কম দেখেছি। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকতেন—হৈ-চৈ হাসি-ঠাট্টা ছাড়া থাকতে পারতেন না। এতবড় সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও সকলের সঙ্গে এমন প্রাণ খুলে মিশতে পারতেন, যা এখন ভাবলে অবাক লাগে। ভাল-মন্দ খাওয়ার দিকে তাঁর একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল; কিন্তু তিনি নিজে খাওয়ার থেকে লোকজনদের খাওয়াতেই ভালবাসতেন খুব বেশী। সুতরাং তাঁর বাড়ীতে যতদিন ছিলাম, খুব আনন্দেই ছিলাম।

কিছুদিন কেটে যাবার পরে একদিন ছোটমেসো বললেন: তোর একটা চাকরির জন্যে অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু…

একটু থেমে আবার বললেন: সব জায়গাতেই এক কথা—তারা বিলেতফেরত ছেলে চায়। আমি অনেক ছেলেকে জানি, যারা রেলওয়ে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বা বিলাতী সওদাগরী অফিসে ঢুকেছে, এদের অনেকের থেকে তুই বিদ্যা বা বুদ্ধিতে কিছুমাত্র কম নোস। কিন্তু এই বিলেতফেরত হওয়াটাই মনে হচ্ছে তাদের

কাজ পাবার একটা বড়ো তক্‌মা। যাই হোক, এন. সি. সরকার এণ্ড সন্স নামে যে বিরাট কোলিয়ারীর ফার্ম আছে, সেখানে তোর একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওখানে ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠিপত্র লেখালেখির কাজ করতে হবে। এর জন্য এখন তারা কিছু হাতখরচ বাবদ দেবে।

আমি দেখলাম চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে তো ভাল, হাত-খরচার টাকাটা তো অন্ততঃ পাওয়া যাবে—সুতরাং রাজী হয়ে গেলাম।

যোগদান করলাম এন. সি. সরকার এণ্ড সন্সে। তাদের অফিস ছিল সোয়ালো লেনে—আমি চুঁচুড়া থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করতাম।

মেসোমশায়ের বাড়ী ছিল চুঁচুড়ায় ঠিক গঙ্গার ধারে। তাই সময় বাঁচাবার জন্যে ট্রেনে করে কলকাতায় না এসে ওখান থেকে নৌকা করে গঙ্গা পেরিয়ে নৈহাটি থেকে ট্রেনে করে শিয়ালদহ দিয়ে কলকাতায় আসতাম। ঐ সময় আমার সঙ্গে আলাপ হয় বর্তমান মঞ্চ ও চিত্র-জগতের স্বনামধন্য শিশির মল্লিকের সঙ্গে। শিশিরের বাবা জাস্টিস এস. সি. মল্লিক ছিলেন তখন চুঁচুড়ার সেসন জজ। শিশির তখন থেকেই কি একটা ব্যবসায় নেমেছিল। সেই থেকে প্রায় চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব আমাদের এখনও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে।

ওতে আমাতে প্রায়ই একসঙ্গে কলকাতা আসতাম। অবশ্য ফিরতাম আলাদা আলাদা ভাবে। একদিন বর্ষাকালে সন্ধ্যার কিছু আগে বাড়ী ফিরছি। নৈহাটি থেকে যখন নৌকায় উঠি তখনই আকাশে মেঘ করেছিল, মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলাম: কোন ভয় নেই তো রে বাবা? একগাল হেসে মাঝি আশ্বাস দিল: না বাবু, ভয় কিসের! এ-মেঘে ডরালে কি চলে বাবু?

চেনা মাঝি—রোজই এর নৌকাতে যাওয়া-আসা করি। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে নৌকায় উঠলাম। মেঘ ক্রমশ কালো হয়ে আসতে লাগল। অল্প অল্প ঝড়ের দোলায় নৌকা বেশ দুলতে লাগল। নৌকা তখন প্রায় গঙ্গার মাঝামাঝি। ক্রমে ঝড়ের বেগ বাড়তে লাগল। আমি প্রাণপণে নৌকোটাকে চেপে ধরে বসে আছি। মাঝি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে যতটা সম্ভব ঢেউ বাঁচিয়ে নৌকা বেয়ে চলেছে। এইভাবে প্রায় বাড়ীর ঘাটের কাছে এসে পড়েছি—আর হাত ২৫।৩০ গেলেই পৌঁছে যাব, এমন সময় একটা প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় নৌকোটাকে দিল উল্টে। নিমেষের মধ্যে আমি জলে ছিট্‌কে পড়লাম। আমার অবস্থা একেবারে কাহিল তখন। মোটে সাঁতার জানি না। অসহায় অবস্থায় জলে পড়ে প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছি আর জল

খাচ্ছি। কয়েকটি মুহূর্ত—তারপর আর কিছু মনে নেই। পৃথিবীর সব আলো আমার চোখের সামনে থেকে যেন নিভে গেল। বড় অন্ধকার—অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলেছি—কোথায়, কে জানে ?

যখন জ্ঞান হোল দেখি—আমি মেসোমশায়ের বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে। মাথার কাছে মেসোমশায় ও মাসিমা উদ্বিগ্নভাবে বসে আছেন। আর সে মাঝিটা বারান্দার এক কোণে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে। পরে শুনলাম যে সেই মাঝিটাই আমাকে বাঁচিয়ে বাড়ী এনে পেঁছে দিয়েছে।

আমাকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে, মেসোমশাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি মাঝিটাকে ভাল বখশিস দিয়ে কাছে গিয়ে বললেন : দেখ বড়মিঞা, এই বাবুর নাম মধু, ফের যদি এই বাবু তোর নৌকায় ওঠে বলবি : শুধু আপনি হলে হবে না হুজুর, তোমাদের মধুসূদন দ্যাবতাকেও সঙ্গে করে আনো।

এর আগেও যখন কলেজে পড়ি, তখন একবার মানকড়ে গেছি ফুটবল খেলতে বাঁকুড়া কলেজ টীমের হয়ে। সেখানেও পুকুরে স্নান করতে গিয়ে একবার ডুবে গিয়েছিলাম। এই দ্বিতীয় বার জলে ডোবার পর থেকে জলে আমার বড় ভয়—জলাতঙ্ক বলতে পারা যায়। এরপর বহুবার কাশী বা কাশ্মীরে নৌকা-বিহারের কথা উঠলে আমি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছি।

এদিকে এন, সি, সরকার এণ্ড সন্সের অফিসে কর্তাদের নিজেদের মধ্যে বেশ গোলমাল শুরু হয়ে গেল। সেই সময় আমার ক্ষিতীশকাকা (বাবার খুড়তুতো ভাই) আমায় একদিন বললেন : আমি একটা কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করেছি—তুই তো কিছুদিন কোলিয়ারীর মালিকদের হয়ে কাজ করলি ; চিঠিপত্র লেখা এবং অন্যান্য কাজ তো মোটামুটি শিখে নিয়েছিস। এবার আমার কোম্পানীতে চলে আয়। আর পয়সা-কড়ি ওখানে যা পাচ্ছিস তার থেকে কিছু বেশীই ব্যবস্থা করে দেব।

আমি দেখলাম প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আমি রাজী হয়ে ক্ষিতীশকাকার কোম্পানী কে. সি. বাসু এণ্ড কোং-তে চলে এলাম। ঐ সময় আমাদের সঙ্গে যোগ দিল আমার পিসতুতো ভাই প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র বা নোড়াদা।

তখন আমি থাকি উষাদির বাড়ী ৩নং চৌরঙ্গী রোডে। উষাদি হলো আমার সেজমেসো ক্ষীরোদবিহারী দত্তের বড় মেয়ে। উষাদির স্বামী শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (জে. সি. মুখোপাধ্যায়) তখন কলিকাতা করপোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান। পরে তিনি হন এর চীফ একজিকিউটিভ অফিসার। আমার নিজের

ভগ্নিপতি না হলেও জে. সি. (লোকে তাঁকে এই বলেই ডাকত, আমি অবশ্য বলতাম জ্যোতিষ-দা) নিজের ভগ্নিপতির থেকে কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনি আমাকে বড়দাদার মতই স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন আমার সত্যিকারের শুভাকাঙ্খী ও বন্ধু। তাঁর শ্বশুর কে. বি. দত্তর মত এই মহৎ গুণটি তাঁরও ছিল যে, বহু সম্মান ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও তিনি সকল লোকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কখনও বৈষম্যমূলক আচরণ করেননি। কতখানি উদারহৃদয় হলে যে মানুষ এই বিশেষ গুণটির অধিকারী হয়, তা ধারণা করা কঠিন। একজন বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করতে এঁরা শ্বশুর জামাই দুজনেই বহু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। বর্তমানের বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি এই জে. সি. মুখার্জির নাতি, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অধীপের ছেলে।

যখন আমি চৌরঙ্গী রোডে উষাদির বাড়ীতে থাকি, তখন ম্যাডান কোম্পানীর কলকাতায় ৭।৮টা সিনেমা হাউস—শুধু কলকাতায় কেন সারা ভারতবর্ষেই এবং ভারতবর্ষের বাইরেও (যথা কলম্বো, রেঙ্গুন, ইত্যাদি) প্রধান প্রধান শহরে তাঁদের একশো'র ওপর সিনেমা হাউস ছিল। তার ওপর কলকাতায় তাঁদের নিজস্ব স্টুডিওতে ছবি তোলা হতো। ম্যাডান কোম্পানীই সারা ভারতবর্ষে চিত্রশিল্পের প্রচার ও প্রসারের অন্যতম পথিকৃত। চার দিকে এঁদের তখন খুব নাম-ডাক। এই ম্যাডান কোম্পানীর কর্তা জে. এফ. ম্যাডান (জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডান) এবং তাঁর ছেলেদের সঙ্গে জ্যোতিষদা'র খুব হৃদ্যতা ছিল। প্রায়ই দেখতাম জে. এফ. ম্যাডানের ছেলেরা—বিশেষ করে বার্জোর ম্যাডান এবং জাহাঙ্গীর ম্যাডান—তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে উষাদি ও জ্যোতিষদার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এই বন্ধুত্বের ফলে জ্যোতিষদাকে—শুধু জ্যোতিষদাকে বলব কেন, তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকেই আর টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে হতো না। সেই সুযোগে আমারও আর কোন ছবি দেখাই বাদ যেত না। প্রায়ই রাত্রের শো-তে জ্যোতিষদা ও আমি কোন-না-কোন সিনেমায় যেতাম। উষাদি অবশ্য বেশী সিনেমা-ভক্ত ছিল না। ডিনারের পর পড়তে ভালবাসত—অনেক সময় সিনেমা থেকে ফিরে এসে দেখতাম বই কিংবা ম্যাগাজিন হাতে উষাদি সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছে—এদিকে বাতি জ্বলছে।

একদিন সন্ধ্যার দিকে আমি, জ্যোতিষদা ও উষাদি বসে আছি ড্রইং-রুমে—এমন সময় জাহাঙ্গীর ম্যাডান ও তাঁর স্ত্রী এলেন। জাহাঙ্গীরজী বরাবরই জে. জে নামে

পরিচিত। জ্যোতিষদা আমার সঙ্গে জে. জে-র আলাপ করিয়ে দিলেন। ঠাট্টা করে বললেন : অভিনয়ে এর খুব শখ—কলেজ ফাংসনে অনেক অভিনয় করেছে। তা ছাড়া ও হলো শিশির ভাদুড়ীর ছাত্র। দাও না তোমার ফিল্মে মধুকে একটা চান্স। জে. সি-র কথা বলার ধরনে মৃদু হেসে জে, জে বললেন—তাই নাকি! তা বেশ তো—ইয়ং ম্যান, করবে নাকি ফিল্মে অভিনয়?

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে আমি তো রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়লাম। তখন ছায়াচিত্রে এডি পে'লো, এলমো দি মাইটি প্রভৃতির ছবি দেখে আমার জীবনের স্বপ্নই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওইরকম একবার নায়ক সেজে লোকজনদের তাক লাগিয়ে দিই। হাজার বিপদকে একা অগ্রাহ্য করে নায়িকাকে যখন উদ্ধার করে নিয়ে আসব তখন দুনিয়া-সুদ্ধ লোক অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে আমার দিকে। মিঃ ম্যাডানের এই কথায় আমার হাতে যেন স্বর্গ এসে গেল। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল!

আমি জ্যোতিষদার দিকে একবার তাকিয়ে সলজ্জভাবে উত্তর দিলাম : ভাল 'রোল' পেলে ফিল্মে নামতে আপত্তি কি থাকতে পারে?

জাহাঙ্গীরজী বললেন : ভালো কথা। আমি আমার পরের বই-এর নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে একটি উপযুক্ত ছেলে খুঁজছিলাম—আশা করি তোমাকে দিয়ে সে কাজ হবে। কাল সকাল সাড়ে ন'টার সময় আমার ধর্মতলার অফিসে গিয়ে দেখা করবে, কেমন?

আমার আনন্দ তখন আর দেখে কে? আমি হিরো হবো—আমার অভিনয় দেখবে হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ লোক—তাদের প্রশংসাভরা হাততালি যেন আমি তখনই শুনতে লাগলাম। আনন্দের পাখায় ভর করে আমি যেন অন্য জগতে ভেসে বেড়াতে লাগলাম।

ধর্মতলা ষ্ট্রীটে জে, এফ, ম্যাডানের অফিসে গেলাম তার পরদিন ঠিক সকাল সাড়ে ন'টায়। মিঃ ম্যাডান তাঁর কথা রাখলেন। আমি তাঁর বইয়েতে নায়ক নির্বাচিত হলাম। সেটা হলো ১৯২৪ সাল।

তখন নির্বাক যুগ। খোলা জায়গায় অভিনয় হতো। রাস্তায়, বাগানবাড়ীতে, মাঠে, ঘাটে, বাড়ীর ছাদে শুটিং হতো। ইলেকট্রিকের কোন বালাই ছিল না। এমন কি ক্যামেরাও চলত হাতে ঘুরিয়ে। সুতরাং সূর্যদেবের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হতো ষোল আনা।

বর্তমানে যেখানে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও—ঐখানেই তখন ছিল ম্যাডান স্টুডিও।

ওখানেও 'সেট' খাড়া করে ইনডোর শুটিং হতো। সকাল থেকে বেলা ৩।৪টা পর্যন্ত কাজ হতো। প্রথম দিন শুটিং করতে গিয়ে, আমাকে বেশ একটু বিব্রত হতে হয়েছিল। আমার নায়িকা ছিলেন পেসেন্স কুপার—অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন দাদাভাই সরকারী, মাঃ নিশার, মাঃ মোহন, শেরিফা প্রভৃতি। আমি যাচ্ছি নায়িকার বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে। নায়িকার ছিল দুটো বিরাট কুকুর। আমাকে দেখেই তো তারা তেড়ে এল। কুকুর দুটোকে আমি শান্ত করে নায়িকার ঘরে ঢুকব—এইরকম ছিল নির্দেশ। কুকুরকে সামলাবো কি—আমিই বেসামাল হয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম। জাহাঙ্গীর ম্যাডানই ছবিখানা পরিচালনা করছিলেন—তিনি ওধার থেকে চিৎকার করে উঠলেন—cut, cut। তারপর কুকুর দুটোকে ডেকে তাদের সঙ্গে খানিক খেলা করার পর আমার ভয় ভাঙলো এবং সিনটাও শেষ হলো।

ছবি শেষ হতে প্রায় ৩।৪ মাস সময় লেগেছিল। আমাদের কর্মক্ষেত্রটা ছিল হাসিখুশীভরা একটি বিরাট পরিবার। ভালমন্দ খাওয়ার দিকে আমার ছোটবেলা থেকেই খুব লোভ—যেদিন শুটিং থাকত—সেদিন লাঞ্চের সময়টা আমার খুব আনন্দেই কাটত। সত্যিকথা বলতে কি, এই লাঞ্চের দিকে শুধু আমার কেন, অনেকেরই মন পড়ে থাকত। জে. জে'র বাড়ী থেকে সকলের জন্যে লাঞ্চ তৈরী হয়ে আসত। প্রত্যেক দিনই প্রচুর রকমারি খাবার। বেশ আনন্দেই কাটত সে সময়টা।

ছবি শেষ হলে পর আবার সেই পুরোনো কর্মক্ষেত্র কে. সি. বাসু এণ্ড কোং-তে ফিরে গেলাম। পুরোনো জায়গায় ফিরে এলে কি হবে, কাজে বিশেষ মন লাগে না। অফিসে যারা যারা ছিল, সকলের কাছেই আমি যে একটা সিনেমার হিরো—একটা কেষ্টবিষ্টু—এটা বেশ ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করতাম। ক্ষিতীশকাকা দেখলেন, আমার তো ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সিনেমায় নামা মানেই তো তখনকার দিনে গোল্লায় যাওয়া। আমার মা-বাবাকে তখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই জানাই নি। ক্ষিতীশকাকা ভ্রাতুষ্পুত্রের মঙ্গল কামনায় আমাকে কলকাতায় রাখা আর সঙ্গত মনে করলেন না। তিনি ভাবলেন যে, কলকাতা থেকে আমাকে সরিয়ে দিলেই আমার মন থেকেও সিনেমার নেশা সরে যাবে। তাই ক্ষিতীশকাকা আমায় পাঠিয়ে দিলেন ধানবাদে কাজকর্মের তদারক করতে।

এইখানে তখন মিলি (সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়), তার বাবা-মা, বড়দিদি (ডলিদি)

এবং ছোট বোন 'বেবি' (ভাল নাম ইলা) ছিল। মিলিদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের বরাবরই খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। ছোটবেলায় যখন আমার বয়স ৮।৯ বছর তখন তাদের রাঁচীর বাড়ীতে প্রচুর খেলাধূলা করেছি। মিলির বাবা ছিলেন শিক্ষাব্রতী জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা মনীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মনীন্দ্রবাবুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তাই বায়ু পরিবর্তনের জন্য ধানবাদে এসেছিলেন। ভলিদির সঙ্গে বিখ্যাত শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর বিয়ে হয়।

ধানবাদে আমার পিসতুতো দাদা ভূতোদার (শরৎচন্দ্র ধর) বাড়ীতে আমি থাকি। ক্ষিতীশকাকার নির্দেশ ছিল রোজ আমাকে সাইকেল করে ঝরিয়া যেতে হবে—সেখানে সব তদারক করে আবার ফিরে আসতে হবে। রোজ যাওয়া আসায় এই দশ মাইল পথ সাইকেল চালাতে চালাতে আমি বিরক্ত হয়ে পড়লাম। তাই তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে সটান চলে যেতাম মিলিদের বাড়ী। সমস্ত দিন সেখানে বসে তাস খেলা আর হৈ-হল্লা, গল্পগুজব হতো। গল্প বলতে তো খালি সিনেমার গল্প। আমি কি রকম ভাবে অভিনয় করলাম, কবে কি ঘটনা ঘটেছিল, তারই সালঙ্কার বর্ণনা। আমার বলার ধরন দেখে মিলি আর ভলিদি, বিশেষ করে মিলি সিনেমায় নামবে বলে ক্ষেপে উঠল। মাসীমা (মিলির মাকে আমি মাসীমা বলতাম) সেকেলে লোক—বাড়ীর মেয়ের সিনেমায় নামার কথা শুনে আমাকে তেড়ে এলেন: না না মধু, এসব ভাল নয়। ভদ্রঘরের মেয়েরা সিনেমায় নামবে কি? সিনেমার গল্প বাপু তুমি আর ওদের সামনে করো না।

ব্যস, তারপর থেকে আর মাসীমার সামনে কোন সিনেমার গল্প হতো না।

ছোটবেলায় যখন মিলিরা পাটনায় ছিল, তখন থেকেই তার অভিনয়ের দিকে ঝোঁক। একবার মনে আছে, আমার বড়দিদির (লোকসভার ভূতপূর্ব সদস্য সুষমা সেন—পাটনার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, পরে জজ, ডঃ পি. কে. সেনের স্ত্রী) বাড়ীতে ট্যাবলোতে (Tableau) "রামায়ণ" অভিনয় হয়। তাতে মিলি সেজেছিল 'সীতা' আর আমি সেজেছিলাম 'রাম'। খুব ভাল হয়েছিল নাকি সে অভিনয়।

যাই হোক, বেশ কিছুদিন এই রকম আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটার পরে ক্ষিতীশকাকা আবিষ্কার করলেন যে, কাজ বিশেষ কিছুই হচ্ছে না—ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে। ভূতোদা তলে তলে সব জানিয়ে দেওয়ায় কাকা একদিন আমাকে তলব করলেন কলকাতা ফিরে যেতে। অতএব আবার পুনর্মূষিকো ভব। অর্থাৎ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।

পূজোর ছুটিতে আবার রাঁচী গেলাম।

বিখ্যাত শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি বাড়ী ছিল রাঁচীতে। প্রায়ই পূজোর ছুটিতে তিনি ও লেডী মুখার্জি রাঁচী যেতেন। স্যার আর. এন. মুখার্জির পরিবারের সঙ্গে আগে থেকেই আমাদের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

যেদিন তিনি সস্ত্রীক রাঁচী পৌছোতেন, সেদিন ঠিক বেলা সাড়ে বারোটার সময় তাঁর দু-তিনজন চাকরকে দিয়ে মস্ত মস্ত থালায় করে নানা রকমের মিষ্টি—যেগুলি বাবা খেতে ভালবাসতেন, বিশেষ করে সন্দেশ, নানারকমের ফল, বাদাম, কিসমিস, আখরোট ইত্যাদি আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন, সে একটা ছোট-খাটো তত্ত্ব বললেও চলে। মনে আছে, মা ঠাট্টা করে বলতেন: তোমার বন্ধু এসে গেছে। বাবা তাতে বলতেন: শুধু আমার বন্ধু কেন, তোমার বন্ধু লেডী মুখার্জিও নিশ্চয়ই সঙ্গে এসেছেন। তবে, তুমি যা ভালবাস—মাছ, তাতো আর কলকাতা থেকে আনা সম্ভব নয়।

তারপর একবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক পাঁচটার সময় তাঁরা আসতেন মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

মা মাঝে মাঝে বাবাকে বলতেন, স্যার আর. এন-কে অনুরোধ করে আমাকে মার্টিন কোম্পানীতে ঢুকিয়ে দিতে। উত্তরে বাবা বলতেন: ছেলেদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও। সুপারিশ করে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলে ওরা মানুষ হবে কি করে? তবে মা'র পীড়াপীড়িতে হয়ত আমার বেলায় ব্যতিক্রম হয়েছিল। কেননা, একদিন স্যার আর. এন আমাকে ডেকে তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আমি গেলাম—তিনি আমায় বললেন: তোমার বাবার কাছে শুনলাম যে, তুমি এখন তোমার এক কাকার সঙ্গে কয়লার ব্যবসা করছ; তা কি রকম চলছে?

আমি বললাম: ব্যবসা মানে কেনা-বেচা—ভাল খদ্দের পেলে কোন কোলিয়ারীর কাছ থেকে কয়লা নিয়ে তাদের সাপ্লাই করি।

তিনি শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন: এটা তো বলতে গেলে দালালের কাজ করছ। তাতে কি ভবিষ্যত কিছু আছে বলে তোমার মনে হয়?

আমি বললাম: ব্যবসার আমি তো কিছু বুঝি না; তবে যখন আর কোন ভাল কাজ পাচ্ছি না, তখন বসে থাকার চেয়ে তো ভাল।

শুনে তিনি শুধু বললেন, হুঁ। তারপর কিছুক্ষণ পরে বললেন: অফিসে কাজ করতে তোমার কি রকম লাগবে? ধর, যদি তোমাকে "মার্টিনে" নি—অবশ্য

প্রথমেই তুমি একটা অফিসার হয়ে বসবে না, সব বিভাগের কাজ তোমায় শিখতে হবে—তবে, কাজ দেখাতে পারলে ভবিষ্যৎ খুব ভাল।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বলে উঠলেন: এখনই তোমার কাছ থেকে আমি জবাব চাইছি না, যখন কলকাতায় ফিরে যাবে তখন আমার সঙ্গে দেখা করো।

চাকরি করতে কোনদিনই আমার মন সাড়া দেয় নি। তাই আমি যখন কলকাতায় ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, তখন আমার কথাবার্তায় আমার মনের দুর্বলতা ধরা পড়ে গেল তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে। লোক চিনতে তাঁর ভুল হতো না। এতখানি অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে তিনি কখনো বাঙালী শিল্পপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্যের খ্যাতি লাভ করতে পারতেন না। তিনি আমাকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই আমার চাকরি করতে মন আছে কি না। বেশ ভাল করে ভেবেচিন্তে জবাব দেবার জন্যে আমায় এক সপ্তাহ সময়ও দিলেন।

চলে এলাম। ভাবলাম এক সপ্তাহ ধরে, কিন্তু মন স্থির করতে পারলাম না। অফিসের নানা আইন-কানুনের কথা ভাবতেই মনটা কেমন বিদ্রোহ করে উঠল। শেষ পর্যন্ত সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, তাঁর সঙ্গে দেখা করি-করি করেও লজ্জায় আর দেখা করতে পারলাম না। সুতরাং কে. সি. বাসু এণ্ড কোম্পানী-তেই কাজ করতে লাগলাম।

একদিন চৌরঙ্গী দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ টুটু ঘোষের সঙ্গে দেখা। টুটু হলো স্বর্গীয় মনমোহন ঘোষের নাতি—আসল নাম মনীষীমোহন ঘোষ। একথা সেকথার পর টুটু বললে, হিমাংশু রায় এসেছেন কলকাতায়। তিনি এক জার্মান চিত্র-নির্মাতার সঙ্গে যুক্তভাবে "লাইট অফ এশিয়া" (বুদ্ধদেবের জীবনী) ছবি তুলবেন—সেজন্য তিনি কয়েকজন শিক্ষিত তরুণ ছেলে খুঁজছেন।

আমার মন তখন সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন অ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশায় মেতে উঠল। আমি টুটুকে জিজ্ঞাসা করলাম: এ ইউনিটে কি আমার একটা চান্স্ হয় না? টুটু সোৎসাহে বলল: তোর চান্সই তো সবচেয়ে বেশী, তুই তো ম্যাডানের একটা ছবিতে হিরো সেজেছিলি। গোলাপ (হিমাংশু রায়ের ডাক নাম) "কন্টিনেণ্টাল" হোটেলে উঠেছে, এখনই চল না, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি'।

গেলাম সেখানে টুটুর সঙ্গে। মনে একটা আশা ও উৎকণ্ঠার ঝড় বইতে লাগল। প্রথম গোলাপদাকে দেখামাত্র কি জানি কেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার

মন ভরে উঠল। যেমন সৌম্য সুন্দর চেহারা, তেমনি সুন্দর কথাবার্তা। আমার বরাত ভাল যে, আমার সঙ্গে কথা বলবার পর আমাকেও তাঁর ভাল লেগে গেল। আমার পরিবারের কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন। আমার কাজ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই—প্রোডাকসন বিভাগে। ইতিমধ্যে গোলাপদা চায়ের অর্ডার দিয়েছেন। চা খেতে খেতে আমাদের অন্তরঙ্গতা আরও ঘনীভূত হলো। তিনি হেসে বললেন: তুমি হিরোর পার্ট করেছ— তা এখানে এ ছবিতে তো বড় কোন রোল নেই তোমার জন্যে, তবে প্রোডাকসন বিভাগের কাজের সঙ্গে একটা ছোট রোল তোমাকে আমি ঠিক করে দেব। মাইনে মাসে ২০০৲ টাকা। সে নিয়োগপত্র আমি আজও সযত্নে রেখে দিয়েছি—আমার জীবনের অমূল্য স্মৃতি হিসাবে। তার তারিখ হলো ৯ই মার্চ, ১৯২৫ সাল। তিনি আরও বললেন: অবশ্য ট্রেন ভাড়া (সেকেণ্ড ক্লাস) এবং যে যে জায়গায় শুটিং হবে, সেখানকার ভাল হোটেলে থাকা—সব খরচটাই কোম্পানী দেবে।

তখন আর আমার আনন্দ দেখে কে—মেজাজ একেবারে শরীফ। আনন্দের আরও একটা বড় কারণ ছিল, কত দেশ-বিদেশ ঘোরা হবে—চাই কি, সাগর পারেও যাওয়া হয়ে যেতে পারে!

বিপদ বাধল বাবা-মার অনুমতি নেওয়া নিয়ে। কি করে তাঁদের সামনে কথাটা তুলব?

উষাদি ও জে. সি-কে বললাম। তাঁরা তো শুনে শুধু খুশীই হলেন না, বরং উৎসাহ দিলেন। জে. সি বললেন, রাঁচীতে গিয়ে বাবা-মাকে ভাল করে বুঝিয়ে বল, আমার মনে হয় তাঁদের আপত্তি হবে না।

ভগবানের নাম স্মরণ করে চলে এলাম রাঁচী। প্রথমে তো বুক ঠুকে বলেই ফেললাম মাকে। আরও বললাম: কে. সি. বাসু এণ্ড কোম্পানীতে কাজ করতে আমার আর মন চাইছে না। দালালের কাজ করছি বই ত' না, সে কাজে কি করে মন লাগে বল! তুমি তো জান, ছোটবেলা থেকেই আমার অভিনয়ের দিকে ঝোঁক—তারপর যদি সুবিধে হয়, গোলাপদাকে বলে পরে ক্যামেরার কাজও শিখব। কে. সি. বাসু এণ্ড কোম্পানীতে থাকার চেয়ে এতে ভবিষ্যৎ অনেক ভাল বলে আমার মনে হয়। সব শুনে মা রাজী হলেন, অভিনয়ের ব্যাপারে বরাবর মা'র উৎসাহ ছিল বেশী। সত্যি কথা বলতে কি, অভিনয় ও মঞ্চের প্রতি ঝোঁক আমার মার কাছ থেকেই পাওয়া। ছেলেবেলায় তিনিই তো ছোট ছোট নাটক নিজে লিখে আমাদের সব ভাইবোনকে দিয়ে সেগুলি অভিনয় করাতেন।

মুস্কিল হলো বাবার মত পাওয়া নিয়ে। বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী লোক, যদিও মনটি ছিল তাঁর খুবই সরল। বাবাকে বলতে তিনি প্রথমে আমার আবেদন ভাল মনে নিলেন না। তিনি ফিল্ম সম্বন্ধে বরাবরই বিরূপ ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি একটিও ফিল্ম দেখেন নি। আমি শেষ পর্যন্ত ফিল্ম লাইনে দুশো টাকা মাইনেতে চাকরি নেব—এটা তাঁর মোটেই ভাল লাগল না। তিনি মনে করতেন এ লাইনে ভবিষ্যৎ বলে কোন কিছু নেই। তা' ছাড়া আমার সম্বন্ধে তিনি বরাবরই একটা উচ্চাশা পোষণ করতেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, আমি যেন এমন কোনও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হই বা স্বাধীনভাবে এমন কোন কর্মে বা ব্যবসায়ে নিজেকে নিয়োজিত করি, যা নিয়ে তিনি অনায়াসেই গর্ব অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু সে যাই হোক, তিনি আমার জিদের কথা ভাল করেই জানতেন—সেজন্যে খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মত দিলেন।

মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতা চলে এলাম। ঠিক এর কিছুদিন আগে সেজদা (অমর বসু বা রাজা বসু নামে পরিচিত) বিলেত থেকে ফিরে এল দাঁতের ডাক্তার হয়ে এবং গ্লোব সিনেমার উপরে লিণ্ডসে স্ট্রীটে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিল। আমি তখন জে. সি-র ওখান থেকে সেজদার কাছে চলে আসি।

কলকাতায় ফিরেই গোলাপদার সঙ্গে দেখা করলাম। বাবা-মার মত নিয়ে এসেছি শুনে গোলাপদা খুব খুশী। তিনি আমাদের সবাইকে দিল্লীতে গিয়ে জড়ো হতে পরামর্শ দিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

দিল্লীতে গিয়ে গোলাপদা যে-প্রোগ্রাম ছকে ফেললেন, তাতে দেখা গেল যে, জয়পুরই হবে আমাদের 'লাইট অব এশিয়া' ছবির প্রধান লোকেশান (দৃশ্যস্থল)। সেখানে মহারাজা মানসিংহের অম্বর-প্রাসাদ, সেখানকার রাজপথ এবং অন্যান্য বহুস্থানে আমাদের শুটিং হবে। আমাদের দলে ছিলেন নিরঞ্জন পাল। মিঃ পালই 'লাইট অব এশিয়ার' চিত্রনাট্য লিখেছেন বিখ্যাত ইংরাজ লেখক ম্যাথু আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' কাহিনী থেকে। আর ছিল গীতা ঘোষ, টুটু ঘোষ এবং জয়গোপাল পিলে—এরা সব প্রোডাকশন বিভাগে। বিখ্যাত শিল্পী চারু রায় ছিলেন শিল্প-নির্দেশক। প্রফুল্ল রায় বুদ্ধের ভাই দেবদত্তের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে নির্বাচিত হলেন এবং ঠিক হলো যে সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রোডাকশন বিভাগের কর্মকর্তাও (ম্যানেজার) হবেন। শুদ্ধোধনের অংশে নির্বাচিত হলেন বিখ্যাত শিল্পী সারদা উকিল এবং দুটি স্ত্রী চরিত্রে সরোজিনী নাইডুর দুই ভগিনীকে

ঠিক করা হলো : একজন হলেন সুনলিনী দেবী এবং অপরজন হলেন মৃণালিনী দেবী। ক্যামেরাম্যানদ্বয় ও পরিচালক তিন জনেই জার্মান। পরিচালক হলেন ফ্রাঞ্জ অস্টেন —যিনি পরে বম্বে টকীজের হয়ে অনেকগুলি ছবি করেছেন। আর ক্যামেরাম্যানের নাম হলো এস, ভীয়েরসিং এবং কিয়েরমায়ার। সমগ্র ছবিটির প্রোডাকশনের কর্ণধার হলেন হিমাংশু রায় অর্থাৎ গোলাপদা আর তিনিই সিদ্ধার্থের ভূমিকায় রূপ দেবেন।

জয়পুরে পৌঁছেই এক গোল বাধল। পরিচালক মিঃ অস্টেনের মনের মত 'গোপা' পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক মেয়ে দেখা হলো, কিন্তু মিঃ অস্টেনের আর কাউকে পছন্দ হয় না। সুনলিনী দেবী মাদ্রাজ থেকে একটি মেয়েকে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু তাকেও তাঁর পছন্দ হলো না। গোলাপদা পড়ে গেলেন মহা মুস্কিলে।

গোলাপদা মিঃ পালকে তাঁর সমস্যার কথা বলতে তিনি আমাকে ডেকে বললেন : মধু, কলকাতার ব্যাপার আমি তো বিশেষ জানি না ; তোমার সঙ্গে তো কলকাতার এ্যারিষ্টোক্র্যাট সার্কেলের অনেক সুন্দরী মেয়ের নিশ্চয়ই পরিচয় আছে—সেখান থেকে কাউকে খুঁজে বার করতেই হবে। চল তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায়।

ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়—বুঝেও মুখে কিছু বললাম না। অন্ততঃ গোলাপদা এবং মিঃ অস্টেনের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে, আমি সত্যিকারের একজন কাজের লোক। আমি রাজী হলাম, এবং আমি মিঃ পালের সঙ্গে কলকাতা রওনা হলাম।

তখনকার দিনে অভিজাতবংশীয়া মেয়েরা এখনকার মত অত সিনেমা-পাগল ছিল না—আর মেয়েরা কেউ রাজী হলেও তাদের অভিভাবকদের মত পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল। তাই আমরা ঠিক করলাম কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক।

'স্টেটসম্যান'-এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। বহু দরখাস্ত এল—বেশীর ভাগই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, সঙ্গে ছবিও এল। তারই মধ্যে থেকে মিঃ পাল বেছে নিলেন একটি মেয়েকে। মেয়েটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—কিন্তু সে তো নির্বাক ছবি, কথা তো আর বলছে না। মেয়েটির নাম রিনি স্মিথ—কীড স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে থাকতো। মিঃ পাল বললেন যে ভারতীয় পোশাকে মিস স্মিথকে চমৎকার দেখাবে। একে দেখলে মিঃ অস্টেন পছন্দ না করেই পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গে রিনি স্মিথের নাম হয়ে গেল সীতা দেবী। ইনি পরে বহু নির্বাক ছবিতে নেমে সারা ভারতের চিত্রপ্রিয়দের মন জয় করেছিলেন।

সীতা দেবীকে নিয়ে আমরা চলে গেলাম জয়পুর। সঙ্গে সীতা দেবীর মা ও দুই বোনও গেলেন।

মেয়েটিকে দেখে তো গোলাপদার ভালই লাগল। তিনি বললেন: এখন মিঃ অস্টেন পছন্দ করলেই হয়।

মিঃ অস্টেনের কাছে সীতাকে হাজির করার আগে মিঃ পাল বললেন: এভাবে নিয়ে গেলে চলবে না। একে একেবারে আসল কস্ট্যুম পরিয়ে হাজির করা হোক।

তাই হলো—মিঃ অস্টেন প্রথম দেখেই সীতাকে মনোনীত করে ফেললেন। তারপর রিলিজের সময় পাবলিসিটিতে লেখা হলো: রক্ষণশীল অভিজাতবংশীয়া হিন্দু পরিবারের বিদুষী কন্যা—সীতা দেবী।

দীর্ঘদিন প্রস্তুতির পর আমাদের শুটিং আরম্ভ হলো। জয়পুরে তখন প্রচণ্ড গরম—১১০ থেকে ১১৫ ডিগ্রী। প্রথমদিন শুটিং হলো—সিদ্ধার্থের বিবাহের শোভাযাত্রা। সিদ্ধার্থ গোপাকে বিবাহ করে ফিরছেন। সহস্র সহস্র নর-নারী উৎসবসাজে সজ্জিত, তার মধ্যে হাতী, ঘোড়া, উট, সিপাহী নিয়ে সে এক এলাহী ব্যাপার! সমগ্র জয়পুর স্টেটটাই আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বিরাট সৈন্যবাহিনী, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যে কি দুরূহ ব্যাপার—সে বলে বোঝানো যাবে না।

এই সব দৃশ্যে সব সময় দুটি করে ক্যামেরা ব্যবহার করা হতো। মিঃ ভীয়েরসিং এবং মিঃ কিয়েরমায়ার ক্যামেরা চালাতেন। শুটিং-এর পর ডার্করুমে নেগেটিভ টেস্ট করা হতো এবং সেটা পরদিন মিঃ অস্টেন দেখে মনোনীত করতেন। তারপর নেগেটিভ চলে যেত মিউনিক-এ পরিস্ফুটনের জন্যে। আমি ডার্করুমে বসে মিঃ ভীয়েরসিং-এর সঙ্গে টেস্ট ডেভেলাপ করা দেখতাম। ক্যামেরার দিকে প্রথম থেকেই আমার দারুণ আগ্রহ ছিল—পরে অবশ্য আমি ভালভাবে ক্যামেরার কাজ শিখে স্বাধীনভাবে ক্যামেরাম্যান হয়ে ছবি তুলেছি।

আমি, প্রফুল্লদা আর টুটু—তিনজনে ঘোড়ায় চেপে সমস্ত জনতাকে সুশৃঙ্খলায় রাখতে চেষ্টা করতাম। সকাল আটটায় শুটিং শুরু হতো—আটটা মানে কাঁটায়-কাঁটায় আটটা। মিঃ অস্টেন এমনি খুব ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু সময়ানুবর্তিতা এবং নিয়মানুবর্তিতার দিকে তাঁর কড়া নজর ছিল। মিঃ অস্টেন জার্মানীর একজন নামকরা ডিরেক্টর ছিলেন, মিউনিকের এমেলকা স্টুডিওতে অনেক ছবি করেছিলেন।

অবসর সময়ে আমরা সেনাবাহিনীর প্রিয় খেলা পিগষ্টিকিং দেখতে যেতাম। অশ্বারোহীদের অদ্ভুত অশ্ব-চালনা এবং ব্যালান্স এবং তাদের নির্ভুল লক্ষ্যভেদ দেখে দর্শকদের তাক লেগে যেত।

জয়পুরের শুটিং সেরে আমরা দিল্লী, মুসৌরী প্রভৃতি জায়গায় শুটিং করলাম। ক্রমে একদিন 'লাইট অফ এশিয়া'র শুটিং শেষ হলো। এবং আমাদের চাকরির মেয়াদও ফুরিয়ে এল। মিঃ অস্টেন চলে গেলেন জার্মানীতে। সেইখানেই সম্পাদনা হবে। গোলাপদাও সঙ্গে গেলেন। যাবার সময় আমাকে ডেকে বলে গেলেন, যদি আমি মিউনিকে যাই, তবে তিনি সেখানে আমার ফটোগ্রাফী শেখার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। সেটা হল ১৯২৫ সালের জুলাই মাস।

মিঃ পাল ভারতেই থেকে গেলেন। মাসখানেক বাদে তাঁর লণ্ডনে ফেরবার কথা। কারণ তিনি তখন তাঁর ইংরাজ স্ত্রী এবং একমাত্র শিশুপুত্র কলিনকে নিয়ে লণ্ডনেই বসবাস করছিলেন।

আমি ঠিক করলাম যে, মিঃ পালের সঙ্গে আমিও বিলেত যাব। "লাইট অব এশিয়া" ছবিতে কাজ করে আমি তখন বেশ কিছু টাকা জমিয়েছিলাম এই বিলেত যাবার আশায়। ঠিক হলো, মিঃ পাল আর আমি একসঙ্গে লয়েড্স্ ত্রিয়েস্তিনো কোম্পানীর এস. এস. জেনোয়া জাহাজে রওনা হবো। পাশপোর্টের জন্য দরখাস্ত করে আমি রাঁচি চলে গেলাম।

সেখানে পৌঁছে মাকে সব কথা জানাতে তিনি বললেন, বিলেত যাবি, অত টাকা পাবি কোথায়? তোর বাবার হাতে এখন খুব বেশী টাকা নেই; আর থাকলেও তিনি দেবেন না—জানিস তো, সিনেমার কাজকে তিনি কি চক্ষে দেখেন!' বাধা দিয়ে আমি বললাম, টাকার জন্যে আমি তোমাদের বিরক্ত করব না; আমি শুধু তোমাদের মত নিতে এসেছি। টাকা যা আমার কাছে আছে, তাতে ভিয়েনা পর্যন্ত পৌঁছোবার খরচ কুলিয়ে যাবে; সেখানে তো বড়দি আছে। মাও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, সুষমা তো যাবার সময়ে বলেও গেছে: মধু যদি ওখানে যায়, তো আমার অনেকখানি সাহায্য করতে পারবে। অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে আমি ওখানে একলাই তো থাকব। আর যতদিন না ও কোন কাজকর্ম করতে পারছে, ততদিন আমি থাকতে ওর তো কোনো ভাবনা নেই।

মার বরাবরই আপশোস ছিল, তাঁর ছেলেদের মধ্যে আমিই খালি বিলেত যাইনি। কাজেই তিনি খুশীই হলেন। বাবা বললেন, মানুষ যত বেশী বিদেশ ভ্রমণ করে, ততই তার জ্ঞানবৃদ্ধি হয়। তবে ঐ ক্যামেরা, না কিসের কাজ

শিখতে যাচ্ছ বললে, ও ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না—ওর কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি?

উত্তরে আমি বললাম, ভারতে চলচ্চিত্র-শিল্পের একটি বিরাট সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি। শেষ পর্যন্ত আমার আগ্রহ দেখে বাবা আর বাধা দিলেন না।

মাকে ছেড়ে আসতে আমার মনটা রীতিমত ব্যথিত হয়ে পড়ল। যখন তিনি বললেন, শরীরের যত্ন নিস্ বাবা, এবং আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে অনুরোধ করলেন, কিছু গরম কাপড়চোপড় তৈরী করে নিতে আমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাবার জন্যে, তখন আমার চোখ হয়ে উঠেছিল অশ্রুসজল, আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় মন হয়েছিল ভারাক্রান্ত।

১৯২৫ সালের আগস্ট মাসের এক ভোরবেলায় আমরা বোম্বাই ছাড়লাম। বোম্বাই উপকূল ছেড়ে ক্রমশ গভীর সাগরে গিয়ে পৌছলাম—শ্যামল তটরেখা ক্রমে মিলিয়ে যেতে লাগল। বাবা-মা—বিশেষ করে মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, নিজের দেশ—সব ছেড়ে যেতে একটু কষ্ট হয়েছিল বৈকি! কিন্তু সুদূরের হাতছানি, অজানাকে জানবার ইচ্ছা যেন আরও প্রবলতর হয়ে উঠে সেই কষ্টকে দুঃসহ হতে দেয়নি।

যাচ্ছি তো দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হয়ে। বর্ষাকালে আরব সাগরে পড়ে প্রথম কয়েকদিন সামুদ্রিক অসুস্থতা আমাকে একেবারে কাহিল করে দিল। আমার চেয়েও বেশী কাহিল হয়ে পড়লেন মিঃ পাল। উনি এমনিতেই একটু 'নার্ভাস' ধরণের লোক। এই অসুস্থতায় তিনি আরও নার্ভাস হয়ে পড়লেন, অথচ এর আগে বহুবার তিনি বিলেতে গিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীর কেবিন থেকে তিনি আমাকে খালি ডেকে পাঠাতে লাগলেন। আমি যেতেই ছোট ছেলের মত আমার হাত দুটো ধরে বললেন: মধু, আমাকে একলা ফেলে যেও না—আমি তাহলে আর বাঁচব না।

আমি বললাম: আমি এখানে থাকব কি করে? আমি তো সেকেণ্ড ক্লাশে। মিঃ পাল তখন জাহাজের বাড়তি ভাড়াটা দিয়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন। এডেনে পৌছবার পর আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সেই জাহাজে সহযাত্রীরূপে ছিলেন মিঃ কে. সি. চন্দর, আই-সি-এস এবং তাঁর স্ত্রী। তাঁরা অবশ্য ছিলেন স্পেশাল ডি-ল্যুক্স কেবিনে। তাঁদের সঙ্গে ডেকের ওপর আমার আলাপ হয়—এবং আমাকে তাঁরা খুবই স্নেহের চক্ষে

দেখতেন। এই জাহাজে আর একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন—তিনি হচ্ছেন স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন (তখন অবশ্য তিনি স্যার হননি)।

আমরা ডাইনিং সেলুনে এক টেবিলে সব বসতাম। মিঃ এবং মিসেস চন্দরও আমাদের টেবিলেই বসতেন। ক্রমে মিঃ রমনও একই টেবিলে বসতে শুরু করলেন। ঐখানেই ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়। খাবার টেবিলে ওঁর মুখ থেকে আমরা নানা রকম বৈজ্ঞানিক আলোচনা শুনতাম।

এস. এস. জেনোয়া একদিন এসে ভিড়ল নেপল্‌সের বন্দরে। মিঃ পাল খুশীতে উচ্ছল হয়ে বললেন: মধু, সী নেপল্‌স অ্যাণ্ড ডাই। আমিও হাসতে হাসতে বললাম: প্রথমটায় রাজী আছি—কিন্তু পরেরটাতে আমি নেই। তিনি বললেন: মরতে যাব কোন দুঃখে—মরুক আমাদের শত্রু। চল নেমে পড়ি।

নেপলস্ দেখার আমারও খুব ইচ্ছে। জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁদে নেমে পড়লাম। সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায় সেখানকার দৃশ্য দেখলে। ওখান থেকে আমরা চলে এলাম প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতার পীঠস্থান রোমে। এখনও এর প্রতিটি পথেঘাটে শিল্পে ভাস্কর্যে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন রোমক সভ্যতার নিদর্শন—বিশেষ করে সেণ্ট পিটার্স চার্চে। মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি প্রভৃতি শিল্পীদের জগদ্বিখ্যাত বহু ছবি আঁকা রয়েছে কাঁচের ওপর। সব থেকে মন খারাপ হয়ে যায় তখনকার অ্যাম্পি-থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ দেখে। মনে পড়ে গেল, কত শত ক্রীশ্চানকে কি নিষ্ঠুরভাবেই না নির্যাতন করা হয়েছে এখানে।

রোমে কয়েক দিন কাটিয়ে আমরা গেলাম জেনোয়াতে। এই শহরটিও খুব পুরাতন। এখনও প্রাচীন রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন এখানে বর্তমান। সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে মিঃ পাল চলে গেলেন লণ্ডনে। তিনি চলে যাবার পর আমিও ভিয়েনার ট্রেন ধরলাম।

ভিয়েনায় তখন আমার বড়দি (সুষমা সেন) ছিলেন তাঁর দুই ছোট মেয়েকে নিয়ে। ছোট মেয়ের 'রিকেট' হয়েছিল—এখানে ভাল চিকিৎসার সুবিধা না হওয়ায় ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ডাঃ পিরকে ওখানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোলিও এবং স্নায়ু বিশেষজ্ঞ। ভারতবর্ষ থেকে যাবার সময় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং স্যার নীলরতন সরকার বড়দিকে বলেছিলেন যে এ রোগ সারাতে যদি কেউ পারেন তো ডাঃ পিরকেই পারবেন।

ভিয়েনায় পৌছে আমি চক্ষে অন্ধকার দেখলাম। 'লগেজ-ভ্যানে' গিয়ে দেখি যে,

আমার বড় ট্রাঙ্কটা নেই। গার্ডকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে হলো আর এক বিপদ। সে ইংরাজী বোঝে না—আর আমিও জার্মান বুঝি না। এই সময়ে টমাস কুক-এর প্রতিনিধি এসে পড়ায় আমি এই সঙ্গীন অবস্থা থেকে উদ্ধার পাই। সে যুগে Cooks Travel Service (কুক্স ট্রাভল সার্ভিস) সমগ্র ইয়োরোপে সুপরিচিত ছিল এবং তাদের প্রতিনিধিরা ওদেশের প্রায় সব ক'টি ভাষাতেই অবলীলাক্রমে কথা বলতে পারত। টমাস কুক-এর লোক ভালো ইংরাজীতে আমাকে হেসে বললেন: নতুন যাঁরা আসেন, তাঁদের প্রায়ই এ-রকম ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। ইতালী এবং অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে একটি চেক্-পোষ্ট আছে; সেখানে 'পাসপোর্ট' পরীক্ষা করে দেখা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার 'পাসপোর্ট'-টি তাঁর চোখের সামনে খুলে ধরে বললাম: আমার 'পাসপোর্ট'ও সেখানে পরীক্ষা করা হয়েছিল, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন।

—হ্যাঁ, তা' দেখতে পাচ্ছি, তিনি বললেন, তবে যে ভদ্রলোক এটা পরীক্ষা করেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গের লগেজটিকেও পরীক্ষা করিয়ে নিতে বলেছিলেন।

আমি আমতা আমতা করে বললাম: কৈ, সেরকম কিছু তো—

টমাস কুক-এর লোকটি হেসে বললেন: বলেছিলেন নিশ্চয়ই, তবে আপনি তো জার্মান ভাষা বোঝেন না, কাজেই—। যাই হোক, আপনার পাসপোর্টটা আমায় দিন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, যাতে কাল সন্ধ্যের ভেতরেই আপনার ট্রাঙ্ক আপনি ফেরত পান। ভিয়েনাতে কোথায় থাকব জিজ্ঞেস করাতে আমি বড়দির নাম ও ঠিকানা দিলাম। বড়দির নাম করাতে তিনি বলে উঠলেন: আমি তো ওঁকে চিনি। তিনি প্রায়ই আমাদের অফিসে আসেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ বোস, কাল সন্ধ্যের সময় আপনি আপনার ট্রাঙ্ক পাবেন।

আমি আমার সঙ্গের "এটাচী-কেস"টাকে সম্বল করে বড়দির পাঁসিয়োতে গিয়ে উঠলাম (ওদেশে বোর্ডিং হাউসকে "পাঁসিয়ো" বলে)।

বড়দিকে আগে থাকতে কোন খবর না দেওয়াতে তিনি হঠাৎ আমাকে দেখে একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে তিনি বললেন: হ্যাঁরে, এভাবে হুট্ করে এসে পড়লি যে? একটা খবর তো দিতে হয়। কবে আসছিস একটা খবর দিলে স্টেশনে যেতুম, আর এ গণ্ডগোলও হতো না।

বড়দিকে এর আগেই আমি ট্রাঙ্কের কথা বলেছি। আমি বললুম: হ্যাঁ, সেইটেই উচিত ছিল—তা হলে আর আমায় এ ঝামেলায় পড়তে হতো না। তোমাকে একটা "সারপ্রাইজ" দিতে গিয়ে আমিই নাজেহাল হয়ে পড়লুম দেখছি।

আমার বড় জামাইবাবু ডাঃ পি. কে. সেন তখন দেশে। ব্যারিস্টার হিসেবে পাটনায় তাঁর বিরাট পসার-প্রতিপত্তি। হাইকোর্টেও ছুটি হয়নি বলে বড়দি একাই রয়েছেন ভিয়েনায়—সঙ্গে ছিল বড়দির বড়মেয়ে কল্যাণী—তার বয়স তখন মাত্র দশ—আর চাকর আহাদবক্স। আহাদবক্স এখনও দিল্লীতে আছে—'masseuse' হিসেবে প্রচুর নাম করেছে।

বড়দি এই অল্পদিনেই জার্মান ভাষাটা মোটামুটি রপ্ত করে নিয়েছে। আমাকে বললেন: এখানে খুব কম লোকই ইংরাজী বোঝে, সুতরাং জার্মান ভাষাটা অন্তত কাজ চালাবার মত না জানলে ভিয়েনায় ঘুরে বেড়াবি কি করে, আর শহরটাই বা দেখবি কি করে? নে, এই বইখানা পড়, আর এটা সব সময় সঙ্গে রাখবি—তাহলে অনেকটা সুবিধে হবে। এই বলে তিনি আমাকে একখানা চটি বই দিলেন—ইংরাজী থেকে জার্মান ও জার্মান থেকে ইংরাজী। সত্যি, সে বইটা পেয়ে আমার খুব সুবিধে হয়েছিলো ভিয়েনায় বেড়াবার।

ভিয়েনা শহরটি দেখে প্রথমে যেটা আমাকে মুগ্ধ করল সেটা শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। অবশ্য এর আগে আমি নেপল্‌স্‌, রোম ও জেনোয়া শহরগুলি দেখেছি। যদিও দেখবার অনেক কিছু এসব জায়গায় ছিল, কিন্তু সে সব শহরগুলি ভিয়েনার তুলনায় নোংরা। পরে আমার ইউরোপের (জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ইতালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম) প্রায় বড় বড় সমস্ত শহর দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, 'লাইট অব এসিয়ার' মুক্তিলাভের সময়, কিন্তু ভিয়েনার মতন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুবিন্যস্ত শহর সে সময় আর একটিও আমার নজরে পড়ে নি। ভিয়েনার যা কিছু দ্রষ্টব্য জিনিস ছিল সবই দেখলাম। সব থেকে স্মরণীয় জিনিস হলো ভিয়েনার 'অপেরা'। ফ্রান্স, ইতালী, জার্মান প্রভৃতি দেশের প্রসিদ্ধ 'অপেরা'গুলি আমি দেখেছি—তাদের শিল্পচাতুর্য এবং সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু ভিয়েনার 'অপেরা' তাদের থেকেও ভাল। এ যে না দেখেছে তাকে ভাষায় বলে বোঝান যাবে না। মনে হতো যেন কোন স্বর্গরাজ্যে চলে গেছি—যেখানে ভাবের ঐশ্বর্যের কাছে ভাষা হারিয়ে যায়।

দেখতে দেখতে ভিয়েনায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। বড়দিকে বললাম: এবার তো মিউনিকে যেতে হবে। ওখানে গোলাপদা রয়েছেন—উনি আমায় একরকম কথা দিয়েছেন, 'এমেলকা' স্টুডিওতে ক্যামেরার কাজ শেখবার সব বন্দোবস্ত করে দেবেন।

বড়দি বললেন: ঠিক আছে, তবে প্রত্যেক মাসে একবার করে আসিস। দেখছিস তো রাণীর অবস্থা—কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না!

তারপর বড়দি আরও বললেন: আর দেখ—ওরা তোকে কাজ শেখবার সময় কিছু দেবে কিনা তা তো জানা যাচ্ছে না—যা হোক, তোর ওখানে থাকা আর খাওয়ার খরচটাও মাসে মাসে আমি পাঠিয়ে দেব যতদিন না তুই নিজে কিছু রোজগার করতে পারিস।

ভিয়েনা থেকে গোলাপদাকে টেলিগ্রাম করে দেওয়াতে তিনি মিউনিক ষ্টেশনে হাজির ছিলেন।

আমাকে দেখে তিনি এত খুশী হলেন যে, আমি ট্রেন থেকে নামামাত্র আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। এর আগে 'লাইট অব এশিয়া'-র শুটিংএর সময় বা অন্য সময়ও দেখেছি—তিনি খুব গম্ভীর। তাঁর এই রকম উচ্ছ্বাস এর আগে কখনও দেখিনি, তাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পরে ভাবলাম যে অনেকদিন কোন দেশের লোকের মুখ দেখেননি, দুটো প্রাণ খুলে বাংলা কথা বলার মত লোকও পাননি, তাই আজ আমাকে দেখে উচ্ছ্বাসে একেবারে ফেটে পড়েছেন।

স্টেশন থেকে গোলাপদা আমাকে নিয়ে একেবারে সোজা তাঁর প্যাসিওতে গিয়ে উঠলেন। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে দেশের সকলের খবর নিতে লাগলেন। বড়দির কথা—বড়দির মেয়ে এখন কেমন আছে, সব খবরই খুব আগ্রহসহকারে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তারপর কথায় কথায় মিস্টার পালের কথা উঠল,—আমি জাহাজের ঘটনার কথা বললাম—গোলাপদা তো শুনে হেসেই আকুল।

গোলাপদার প্যাসিওটি ছিল শহরের অভিজাত পল্লীতে। দুখানি বড় ঘর—একখানি বসবার ও খাবার এবং অপরখানি শোবার। আমাকে বললেন: ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও—তারপর তোমাকে নিয়ে যাব এমেলকার অফিসে, মিঃ অস্টেনের সঙ্গে দেখা করতে। তোমার আসার কথা আমি ওঁকে আগেই বলে রেখেছি।

ব্রেকফাস্ট খাবার পর গোলাপদা আমাকে নিয়ে গেলেন এমেলকার অফিসে ১৫ নম্বর সোনেনস্ট্রাসে-তে। মিস্টার অস্টেন তখন এডিটিং রুমে 'লাইট অব এশিয়ার' সম্পাদনায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে খুশী হয়ে বললেন: যাক, তুমি তাহলে এলে শেষ পর্যন্ত। তা এখানে কি শিখতে চাও?

আমি বললাম—ক্যামেরার কাজ। ছোটবেলা থেকেই ফটোগ্রাফীর দিকে আমার খুব ঝোঁক।

এই কথা শুনে তিনি বললেন: ভাল কথা—কাল সকালে আমি তোমাকে আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে যাব। আমার হাতে তো এখন কোন ছবি নেই—

কেননা 'লাইট অফ এশিয়া'র সম্পাদনা শেষ না করে আমি অন্য কাজে হাত দিচ্ছি না। তবে তোমাকে আমাদের আর একজন পরিচালক ও প্রধান ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব—যাঁরা এখন ছবি করছেন।

তারপর তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোথায় উঠেছি। আমার হয়ে গোলাপদাই জবাব দিলেন: ও এখন আমার ওখানেই উঠেছে—পরে দেখে-শুনে একটা ভাল পরিবারের মধ্যে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। এখন ওর দরকার একটা ভাল ঘর আর ভাল খাবার।

মিঃ অস্টেন গোলাপদাকে বললেন: আমি আমার সহকারীকে বলে দেব এরকম একটা ঘরের বন্দোবস্ত করে দিতে যাতে সস্তাও হয় অথচ অফিস থেকে দূরেও না হয়।

তারপর আরও কিছুক্ষণ সেখানে থেকে দুচার কথার পর মিঃ অস্টেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোলাপদার প্যাসিওতেই আবার ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে গোলাপদা আমাকে নিয়ে গেলেন এমেলকার অফিসে। সেখানে মিঃ অস্টেন আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে ও গোলাপদাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন স্টুডিওতে। প্রায় ২০ মাইল দূরে গাইসেলগাসটাইগ-এ।

এই প্রথম সত্যিকারের ফিল্ম স্টুডিওর ভেতরে যাওয়ার সুযোগ হলো আমার। এর আগে যা সব শুটিং করেছি সে সব 'আউটডোরে' এবং সূর্যালোকে। এই প্রথম দেখলাম স্টুডিওর ভেতরে কৃত্রিম আলোয় ছবি তোলা। আলোকে ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রিত করে কত উন্নত ধরনের ক্যামেরার কাজ করা যায় সে সম্পর্কেও প্রথম অভিজ্ঞতা হলো।

তিনি একজন পরিচালক ও প্রধান ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন যে, আমি এখানে ক্যামেরার কাজ শিখতে চাই এবং সেইজন্যে আমাকে যেন একটু-আধটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দেওয়া হয়।

মিঃ অস্টেন তখন ওখানকার সবচেয়ে প্রবীণ পরিচালক। তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করত। সুতরাং তাঁর কথায় ওঁরা সহজেই রাজী হয়ে গেলেন এবং আমারও কাজ হয়ে গেল। ঠিক হলো যে, আমি আপাতত প্রতি সপ্তাহে ৬০ মার্ক বা ভারতীয় মুদ্রায় ৫০ টাকার মত পাব। এই টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা গোলাপদার জন্যেই সম্ভব হয়েছিল।

আমি রোজ স্টুডিওতে যেতে আরম্ভ করলাম—ফ্লোরের মধ্যে ঢুকে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা—হাতে-নাতে কোন কাজ করার অধিকার পাইনি।

স্টুডিওর যিনি প্রধান ক্যামেরাম্যান তাঁর কাছেও ঘেঁসতে পারতুম না তবে তাঁর সহকারীকে মাঝে মাঝে অবসর সময়ে জিজ্ঞাসা করতাম লাইটিং-এর বিষয়, কোন লেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে ইত্যাদি। ভদ্রলোক আমায় বুঝিয়ে দিতেন।

এইভাবে কিছুদিন কাজ করার পর একদিন মিঃ অস্টেন আমাকে বললেন: ক্যামেরার কাজ শিখছ ভাল কথা। সেই সঙ্গে ল্যাবরেটরীর কাজটাও শিখে নাও। ভাল ক্যামেরাম্যান হতে গেলে ল্যাবরেটরীর কাজও ভালভাবে জানা দরকার।

তারপর থেকে আমি ল্যাবরেটরীর কাজ শুরু করলাম।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। গোলাপদার প্যাসিওতে ২।৩ দিন থাকার পর আমি একটা জার্মাণ পরিবারে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকবার সুবিধে পেলাম। মিস্টার অস্টেনের সহকারীই এই সুযোগটুকু করে দিয়েছিল। এমেলকা অফিস থেকে বেশী দূরে বাড়ী নয়, মাত্র মিনিট দশেকের পথ। তবে অসুবিধা হলো এই যে, সে পরিবারের কেউই ইংরাজী জানে না। আমি language guide দেখে কষ্টে-স্বষ্টে প্রথম প্রথম চালিয়ে নিতাম। কিছুদিন থাকার পর অবশ্য মোটামুটি কাজ চালাবার মত জার্মাণ ভাষাটা রপ্ত করে নিলাম।

প্রথমদিন স্টুডিও ক্যান্টিনে গেছি লাঞ্চ খেতে। ক্যান্টিন তো নয়, সে যেন এখানকার একটা বিরাট রেস্তোরাঁ। গিয়ে দেখি, টেবিলগুলো সবই ভর্তি হয়ে গেছে—শুধু একটি নিরিবিলি জায়গায় একটি টেবিল খালি পড়ে আছে। আমি গিয়ে বসলুম সেই টেবিলটাতে। কয়েক মিনিট পরে দেখি একটি মেয়ে এসে আমার টেবিলটার কাছে দাঁড়াল। মনে হলো সে যেন আমাকে দেখে একটু অবাকই হলো—কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই 'হেড ওয়েটার' আমার কাছে ছুটে এল। এসেই কি যেন জার্মাণ ভাষায় বলল আমাকে—এত তাড়াতাড়ি করে বলে গেল যে আমি চট্ করে কিছু বুঝতে পারলাম না, এতে বাধা দিয়ে মেয়েটিও তাকে কি একটা বলল। হেড ওয়েটার যেন আমাকে কিছু একটা বলতে যাবে এমন সময় মেয়েটি তাকে একটা চোখের ইশারা করতেই সে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল। আমার কাছে কিন্তু সব জিনিসটাই অস্বস্তিকর মনে হলো। আমি বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে ওদের দিকে তাকিয়ে নিজের সীটে বসেই রইলাম।

মেয়েটি আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে আমায় বিনীতভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করল : আমি কি এই টেবিলে বসতে পারি ?

মেয়েটিকে দেখে মনে হলো—একে যেন কোথায় দেখেছি। হঠাৎ মনে পড়ল, ওকে তো আজই ফ্লোরে দেখেছি একটা ছোট একস্ট্রার ভূমিকায় অভিনয় করতে। আমিও দেখলাম মেয়েটি কিছুটা ইংরাজী বলতে পারে—অতএব আর কিছু না হোক, খানিকটা গল্প তো করা যাবে। সেজন্যে আমি তৎক্ষণাৎ বলে ফেললাম : নিশ্চয়ই পারো।

মেয়েটির অপূর্ব চোখ দুটো আমাকে রীতিমত আকৃষ্ট করল। কিন্তু ভালো করে চেয়ে দেখলাম যে শুধু চোখ জোড়া নয়, সমস্ত চেহারাটায় তার এমন একটা মর্যাদা মেশানো ছিল যে আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্ভ্রম-বোধও জাগে। আর ক্যান্টিনের মধ্যে আমিই ছিলাম একমাত্র ভারতীয় সুতরাং আমিও সকলের কাছে একটা দ্রষ্টব্য জিনিস। তার ওপর মেয়েটি আমার সঙ্গে নিজে থেকে এসে আলাপ করে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে দেখে অনেকেই ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল।

এদিকে খেতে খেতে দুজনের মধ্যে বেশ আলাপ জমে উঠল। মেয়েটির নাম হিলডা। বাবা পোলিস, মা জার্মাণ। এই স্টুডিওতে ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয় করে। এত রূপ যার সে একস্ট্রার ভূমিকায় কেন নামে—ভাবতেই অবাক লাগল।

খেতে খেতে হিলডা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল : তুমি তো ভারতবর্ষ থেকে আসছ, না ?

আমি বললাম : হ্যাঁ, তোমার অনুমান ঠিক।

—তুমি তাহলে নিশ্চয়ই কোন স্টেটের প্রিন্স—বা ঐ জাতীয় কিছু ?

একথা শুনে আমি হাসব কি কাঁদব ঠিক করতে পারলাম না। আর তাকে দোষই বা দিই কি করে ? ওদেশের লোকের ধারণা যে ভারতবর্ষ থেকে যারা ওদেশে যায় তারা রাজা মহারাজা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি তার এ ভুলটা ভেঙ্গে দিয়ে বললাম : না, আমি সে রকম কিছু নই। আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—এদেশে এসেছি কাজ শিখতে।

—কি কাজ ?

—ফটোগ্রাফী।

হিল্‌ডার চোখে এবং কথায় যেন খানিকটা শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি ঝরে পড়ল। বলল : ভাল, ভাল। তা এখানে তুমি ভালই শিখতে পারবে।...কিন্তু

এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কি করে? এরা তো সাধারণ কোন বিদেশীকে হাতে-কলমে কাজ শেখাতে চায় না...তোমাকে খুব ভাগ্যবান বলতে হবে।

আমি বললাম: মানে, মিস্টার অস্টেনের সঙ্গে আমি ভারতবর্ষে কাজ করেছি 'লাইট অব এশিয়া' ইউনিটে। তিনি এবং মিঃ হিমাংশু রায় এই সুযোগটুকু করে দিয়েছেন আমায়।

মেয়েটি খুশী হয়ে বলল: বেশ, বেশ। তাহলে তুমি এখন কিছুদিন এখানে থাকছ তো?

আমি মৃদু হেসে বললাম: সেই রকমই তো ইচ্ছে।

হিলডা বলল: ভালই হলো, আমারও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার সুযোগ হবে। তোমাকে আমি মাঝে মাঝে বিরক্ত করব—তুমি অসন্তুষ্ট হবে না তো?

—অসন্তুষ্ট? না, না মোটেই না—আমি বরং খুশীই হব। বললাম আমি।

এমন সময় লাঞ্চ-শেষের ঘণ্টা পড়ল।

হিলডা বলল: লাঞ্চ-আওয়ার শেষ হয়ে গেছে—চল এবার ফ্লোরে যাওয়া যাক। আবার দেখা হবে, কেমন?

বলেই উঠে ফ্লোরের দিকে চলে গেল।

আমিও উঠলাম—দেখি ইতিমধ্যেই ক্যান্টিন প্রায় খালি হয়ে এসেছে। ওদের লাঞ্চের সময় মাত্র আধ ঘণ্টা—কিন্তু এই সময়টা যে কোথা দিয়ে চলে গেল জানতেই পারলাম না।

ফ্লোরে ঢুকতেই আমাদের প্রধান ক্যামেরাম্যান মিঃ কফ্‌ম্যান আমাকে দেখেই মৃদু হেসে বললেন: কি বোসে, কি রকম লাঞ্চ খেলে?

আমি সহজভাবেই বললাম: কেন, ভালই।

মিঃ কফ্‌ম্যান ইংরাজী একরকম ভালই বলতেন। যদিও তিনি খাস জার্মাণ তবে বহু দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন তিনি। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি—আর বেশ রসিক লোক। তিনি বললেন: ওরকম সঙ্গী পেলে যা খাবে তাই ভাল লাগবে।

তাঁর মুখে একটা দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটে উঠল। আমি সলজ্জভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন: হিল্‌ডার সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?

আমি বললাম: আজই ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ হল।

—জানো—ও কে ?

—হ্যাঁ—মানে,—ও তো একটি 'একস্ট্রা' মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করছে। ফ্লোরে দেখেছি মাত্র।

—ওটা তো ওর আসল পরিচয় নয়।

—তবে ?

—ওটা ওর শখ—ওর আসল পরিচয় অন্য।

আমার কৌতূহলের আর অবধি রইল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম—সে পরিচয়টা কি ? আমার কি জানতে কোন বাধা আছে ?

কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি বললেন: মোটেই না—বরং তোমার জানা উচিত। একটু হেসে বললেন: উনি হলেন এমেলকার একজন ডিরেক্টারের স্ত্রী।

একটা বোমা ফাটলেও বোধহয় আমি অতটা অবাক হতাম না। আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। আমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে মিঃ কফ্ম্যান বললেন: এতে ভয় পাবার কি আছে ? তবে একটু সাবধানে চলো।

তারপর তিনিই আমায় বললেন যে, ঐ টেবিলটায় কেউ বসে না। ওটা ওর জন্যেই রিজার্ভড্।

এতক্ষণে ক্যান্টিনের ওয়েটারের ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত স্পষ্ট হয়ে গেল।

শুটিং-এর পরে আমি হিল্ডার কাছে গিয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম: আমাকে মাপ করবেন। আমি জানতাম না যে ওটা আপনার রিজার্ভড্ টেবিল। ভবিষ্যতে এরকম ভুল আর হবে না।

হিল্ডা হেসে উত্তর দিল: না, না—কিছু না। আমি কিছুই মনে করিনি। এই সামান্য ব্যাপারে তোমার এত কিন্তু করার কি আছে ? তোমাকে বোধহয় কেউ কিছু বলেছে ?

আমি চুপ করে রইলাম।

হিলডা মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল: যাক, কাল আবার লাঞ্চের সময় দেখা হবে—হ্যাঁ, ঐ টেবিলে কিন্তু। তুমি সোজা ঐ টেবিলে চলে আসবে, কেমন ?

তারপর থেকে ক্যান্টিনে হিলডার সঙ্গে প্রায়ই এক টেবিলেই বসে খাই আর আলাপটাও ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকে।

একদিন সন্ধ্যার পর স্টুডিওর কাজ শেষ করে বাড়ীর দিকে রওনা হয়েছি। শীতটা সবে পড়তে শুরু করেছে, আর আমি তো একটু শীত কাতুরে, তাই

ওভার-কোটটা গলা পর্যন্ত তুলে দিয়েছি। এমন সময় একটা বিরাট গাড়ী নিঃশব্দে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

ফিরে তাকাতেই দেখি, হিলডা গাড়ী থেকে আমায় হাতের ইসারায় ডাকছে। আমি কাছে যেতেই গাড়ীর দরজাটা খুলে দিয়ে বললে: কতদূর যাবে? চল, তোমায় পৌছে দিই।

আমি বললাম: আমি তো থাকি এমেলকার আপিস সোনেনস্ট্রাসে-এর কাছে, তুমি কি ওদিকে যাবে?

হিল্‌ডা বলল: হ্যাঁ, আমিও ঐদিকেই যাব। এস, এস, দেরী করো না।

অগত্যা আমি গাড়ীতে উঠে বসলাম। হিলডা ড্রাইভারকে বলল আমার বাড়ীর ঠিকানা। গাড়ী চলতে লাগল।

এই লিফট্‌টা পেয়ে অবশ্য আমি খুশীই হলাম, তবু ভদ্রতার খাতিরে আর একবার বললাম: মিছিমিছি তুমি আমার জন্য এতটা কষ্ট করলে—আমি তো ট্রামেই অনায়াসে চলে যেতে পারতাম।

হিল্‌ডা হাসল—এ সেই হাসি যাতে দুনিয়া জয় করা যায়। আমার সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা তীব্র শিহরণ বয়ে গেল। হাসতে হাসতেই বলল সে: ট্রাম তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না—অন্যদিন যেও।

এরপর প্রায়ই ছুটির পর হিলডা গাড়ী করে আমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে যেত।

একদিন গাড়ীতে বসেই সে আমায় জিজ্ঞাসা করল: ছুটির পর বাড়ী গিয়ে কি কর?

আমি বললাম: কি আর করব? আমার তো বিশেষ জানাশোনা লোকজন কেউ নেই—আর এদেশের কোথায় কি আছে, তাও জানি না। মাঝে মাঝে মিঃ হিমাংশু রায়ের ওখানে যাই, কিংবা কোনদিন সিনেমায়—আর নয়ত বিয়ার গার্ডেনে যাই—বিয়ার খাই। মাঝে মাঝে ডান্সেও যাই—তাতেই বেশ খানিকটা সময় কেটে যায়।

হিলডার মুখে-চোখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল। সে বলল:—সে কি? তুমি এখনও আমাদের দেশের কিছুই দেখনি? আমাদের দেশে কি দ্রষ্টব্য জিনিস কিছুই নেই?

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম: না না, তা থাকবে না কেন? এত বড় দেশ সম্বন্ধে কি আমি এমন কথা বলতে পারি? তবে একজন সঙ্গী-সাথী না পেলে একা-একা যেতে ঠিক মন লাগে না।

—ওঃ এই কথা? আচ্ছা, আমি এইবার তোমায় সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব, কেমন?

তারপর থেকে প্রায়ই কোনোদিন মিউজিয়াম, কোনোদিন আর্ট গ্যালারী, আবার কোনোদিন বা মিউজিক্যাল কনসার্ট-এ যেতাম।

হিল্ডা আমাকে একদিন নিয়ে গেল পিনাকোথেক আর্ট গ্যালারী দেখাতে। পৃথিবীর সাতটি আর্টগ্যালারীর মধ্যে এটি অন্যতম। কি বিরাট এবং বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের সমাবেশ সেখানে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের শিল্প-সম্পদে পরিপূর্ণ। রেমব্রাণ্ট, মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল, লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি, এল গ্রেকো, টিটিয়ান, ভেলাসক্, রুবেন এবং আরও বহু শিল্পীর প্রতিভার জ্বলন্ত স্বাক্ষরে পরিপূর্ণ সে স্থান। এতদিন মিউনিকে থাকা সত্ত্বেও এসব আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল—এ কথা ভাবতেই লজ্জা পেলাম।

হিল্ডার কিন্তু এইসব শিল্পীদের চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান ছিল—আসলে তাকে একজন শিল্পরসিক বলা যায়। সে আমাকে প্রতিটি ছবির স্টাইল, তার বৈশিষ্ট্য—একজন শিল্পীর সঙ্গে আর একজনের পার্থক্য কোথায়, এ সমস্তই খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগল। অবশ্য একটা মোটামুটি আইডিয়া পেতে আমাকে চারদিন ধরে যেতে হয়েছিল হিল্ডার সঙ্গে এই পিনাকোথেক আর্ট গ্যালারীতে।

আর একটা জায়গায় আমাকে নিয়ে গেল হিল্ডা—সেটা হল Carriage Museum। এখানে পুরাতন ব্যাভেরিয়ান শাসকরা কত বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর গাড়ী ব্যবহার করতেন তার একটি অদ্ভুত সংগ্রহ ছিল। গাড়ীগুলির মডেল কাষ্ঠনির্মিত এবং অপূর্ব কারুকার্যবিশিষ্ট।

এ-ছাড়াও অন্যান্য মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী, বোটানিকাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, রাষ্ট্রীয় অপেরা হাউস, থিয়েটার এবং মিউনিকের আরও যে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ছিল সবই হিল্ডা আমাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাল।

ক্রমে এমন হয়ে উঠল যে, প্রত্যেক দিনই হিল্ডার সঙ্গে কোথাও না কোথাও যাওয়া চাই-ই—চাই। হিলডা সবদিন স্টুডিওতে না এলেও টেলিফোনে যোগাযোগ হয়—সুতরাং আমাদের দেখা হওয়ার বাধা কোন সময়ই হয় না। একদিন হিলডা আমায় জিজ্ঞেস করল: আচ্ছা, তুমি এখানে কি শিখতে এসেছ?

আমি বললাম: ফটোগ্রাফী।

—ফটোগ্রাফী? তোমাকে তো দেখি শুধু ফ্লোরের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে।

—ক্যামেরাম্যান তো আমাকে বলেছে এখন শুধু লাইটিং কিভাবে হয় তাই দেখতে।

—ওঃ বুঝেছি। হিলডা ক্ষুব্ধস্বরে বলল।

—কি বুঝেছ? আমি একটু কৌতুহলের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম। হিল্ডা আস্তে আস্তে বলতে লাগল: মানে এরা কাউকে হাতে-কলমে কাজ শেখাতে চায় না। নেহাৎ খাতিরে পড়ে তোমাকে এইটুকু অনুগ্রহ করেছে। যাই হোক, আমি বলে দেব তাকে।…বলেই একটু থেমে আবার বলল: একটা কাজ করা যাক।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাতে হিল্ডা বলল: —চল আমরা একদিন শহর থেকে বাইরে কোথাও পিকনিকে যাই। সেদিন এই ক্যামেরাম্যান মশাইকেও নিমন্ত্রণ করা যাবে। সেইদিনই তার কাছে কথাটা পাড়ব। যেন একটু আগ্রহ নিয়ে তোমায় শেখায়—নইলে শুধু দেখে দেখে আর কত শিখবে?

—ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। বলে আমি কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

শুভস্য শীঘ্রম্। সুতরাং ঠিক তার পরের রবিবারেই হিলডা ক্যামেরাম্যান মিঃ কফ্‌ম্যানকে নিমন্ত্রণ করলে পিকনিকে যাবার জন্যে। বলা বাহুল্য, হিল্ডার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার শক্তি তার ছিল না।

রবিবার সকালবেলায় আমি হিল্ডা ও মিঃ কফ্‌ম্যান—এই তিনজনে চলে গেলাম মিউনিক থেকে সামান্য একটু দূরে এক পল্লীগ্রামে। হাসি-গল্পে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল দিনটা, বুঝতেই পারলাম না। ক্যামেরাম্যান মিঃ কফ্‌ম্যানকে এক ফাঁকে হিল্ডা আমার বিষয় বলে দিল—তিনি কথা দিলেন যে যতটা সম্ভব তিনি আমায় সাহায্য করবেন।

মিঃ কফ্‌ম্যান আমাকে বললেন: বোসে, তুমি যদি সত্যি ফটোগ্রাফী শিখতে চাও তাহলে একটি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মুভী ক্যামেরা কিনে ফেল। প্র্যাকটিস করার পক্ষে খুব সুবিধে হবে। তোমাকে এখন তো আমি স্টুডিওতে ক্যামেরা চালাতে দিতে পারি না, বরং তোমার নিজস্ব একটা হোম ক্যামেরা থাকলে—লেন্স, এক্‌স্‌পোজার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান হবে—আর আমিও তোমাকে বোঝাতে পারব। আর যেটায় তোমার সব থেকে বেশী উপকার হবে সেটা হলো হাতে ক্যামেরা চালাবার স্পীড অর্থাৎ যাকে বলে Cranking Speed।

আমি বললাম: আপনার নির্দেশ সত্যিই খুব ভাল—কিন্তু ক্যামেরা কেনার মত টাকা কোথায় আমার কাছে? আমি তো স্টুডিও থেকে যা টাকা পাই তাতে সমস্ত খরচ চালিয়ে আর কিছুই বাঁচে না।

হিল্‌ডা চট্‌ করে বলে ফেলল: সেজন্যে তুমি ভেবো না বোস, তোমার ক্যামেরা আমি খুব সস্তায় জোগাড় করে দেব। আর তোমার কাছে যদি এখন টাকা না থাকে তো তুমি আমায় পরে দিও।

সত্যিই কয়েক দিন পরে হিল্‌ডা আমায় একটি Secondhand Pathe Camera জোগাড় করে দিল অসম্ভব কম দামে। পরে জেনেছিলাম যে, ক্যামেরাটা হিল্‌ডাই কিনে দিয়েছিল, পাছে আমি বিনামূল্যে নিতে 'কিন্তু' করি, তাই এই ছলনাটুকুর আশ্রয় নিয়েছিল।

তারপর থেকে সেই প্যাথে ক্যামেরা সঙ্গে করে প্রায়ই পিকনিকে বা বেড়াতে যেতাম—নিজে ল্যাবরেটরীতে 'develop' করতাম—এবং পরে মিঃ রুকম্যানের মতামত নিতাম। তিনি খুব সুন্দরভাবে ভুলগুলি সংশোধন করে দিতেন।

যতই দিন যায়, হিল্‌ডার বন্ধুত্ব এবং তার আকর্ষণ আমাকে দুর্নিবারভাবে টানতে থাকে। বন্ধুত্বের গণ্ডী পেরিয়ে আমরা তখন প্রেমের পথে পা বাড়িয়েছি।

ভারতবর্ষ বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে হিল্‌ডার অদম্য কৌতূহল। একদিন তাকে কথায় কথায় বললাম: টেগোর যে স্কুল করেছেন শান্তিনিকেতনে—সেই স্কুলেই আমার লেখাপড়ার শুরু।

হিল্‌ডার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করল: তুমি টেগোরকে সামনা-সামনি দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখেছি বইকি! শুধু দেখা কি—তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছি। আমাদের বাড়ীতে তিনি কতবার এসেছেন। আমার বাবাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন।

—সত্যিই, তোমাকে আমার হিংসে হয়। আচ্ছা, তুমি টেগোরের গান জান?

—হ্যাঁ, কিছু কিছু জানি বৈ কি!

—তাহলে আমাকে শোনাও না একদিন, শোনাবে? ছেলেমানুষের আবদারের মত শোনাল তার কথা।

—বেশ তো, কবে শুনবে বল?

হিল্ডা মনে মনে কি যেন ভেবে নিল, তারপর বলল, আসছে শনিবার। তুমি আমার ওখানে ডিনার খাবে, কেমন? সেইদিন শুনব। তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো?

—না, না, অসুবিধে কেন হবে? আমি সাগ্রহে বললাম।

এই প্রথম সে আমায় তার ফ্ল্যাটে নিমন্ত্রণ করল।

শনিবার দিন সন্ধ্যার একটু পরেই আমি হিল্ডার ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির; কিন্তু ফ্ল্যাটের ভিতর ঢুকে তো আমি একেবারেই তাজ্জব বনে গেলাম। তার স্বামী যে বড়লোক একথা আমি জানতাম, কিন্তু এত বিরাট বড়লোক তা জানা ছিল না। তিনি এমেলকা স্টুডিওর অন্যতম ডিরেকটার তো ছিলেনই—তার উপর তাঁর ছিল বিরাট সিগার ও সিগারেটের ব্যবসা—লোকে তাঁকে বলত 'টোবাকো কিং'। শহরের অভিজাত পল্লীতে বিরাট সুসজ্জিত ফ্ল্যাট—ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র যা আছে তা কোনও রাজা-মহারাজার ঘরেও থাকে কিনা সন্দেহ।

ডিনার খাওয়ার পর পিয়ানো বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানা গান গেয়েছিলাম—তার মধ্যে 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা-মাটির পথ' গানটা আমার আজও বেশ মনে আছে। সেদিন ডিনারে হিল্ডা তার এক বান্ধবী ও তার ফিঁয়াসেকে নিমন্ত্রণ করেছিল। হিল্ডার স্বামীকে দেখলাম না—জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে তার স্বামীকে প্রায়ই ব্যবসার খাতিরে বাইরে থাকতে হয়। আজও তিনি কোথায় বাইরে গেছেন।

হিল্ডার এই বান্ধবীটির পিয়ানো বাজনায় অদ্ভুত দখল। 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা-মাটির পথ' গানটি গাওয়ার পরে তিনি আমায় অনুরোধ করলেন আর একবার গাইতে।

আমি যখন গানটি দ্বিতীয়বার গাইছিলাম তখন দেখি মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে 'নোটেশান' (স্বরলিপি) তৈরী করে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে আমায় অনুরোধ করছেন আর একবার গাইতে। আমি গানের লাইনগুলি দুবার তিনবার করে গাইলাম। গান গাওয়া যখন আমি শেষ করলাম তখন তিনি বললেন: আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তবে দয়া করে গানটা কি আর একবার গাইবেন? আমি আপনার সঙ্গে বাজাব।

আমি বললাম: সে কি? আপনি এরই মধ্যে পুরো গানটা তুলে নিয়েছেন?

তিনি মৃদু হেসে বললেন: চেষ্টা করে দেখিই না একবার।

গানটা আমি আবার গাইলাম—ভদ্রমহিলা নির্ভুলভাবে বাজিয়ে আমাকে তাক লাগিয়ে দিলেন। গান গেয়েছি বাড়ীতে হারমোনিয়মের সঙ্গে, কিংবা শান্তিনিকেতনে এসরাজের সঙ্গে, কিন্তু পিয়ানোয় এমন একটা হারমনির সৃষ্টি হল—যা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে।

একজন বিদেশীর পক্ষে এত তাড়াতাড়ি শিখে নির্ভুল বাজানো যে সঙ্গীতে কতখানি দখল থাকলে হয়, তা সঙ্গীত-রসিকরা বুঝতে পারবেন।

কিছুদিন পরে একদিন গোলাপদা আমাকে ডেকে বললেন :—হ্যাঁরে মধু, তোর ব্যাপারটা কি ?

আমি প্রথমটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম : কিসের ব্যাপার গোলাপদা ?

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন : আরে ওই হিল্‌ডা—হিল্‌ডার সঙ্গে বড় বেশী মেলা-মেশা করছিস—এই নিয়ে অনেক কানাঘুষা চলছে।

আমি শুকনো গলায় বললাম : বারে, সেই তো আমার সঙ্গে এসে যেচে আলাপ করলে। বাড়ীতে ডিনারের নেমন্তন্ন করে, নিজের গাড়ীতে করে নিয়ে বেড়ায়। আমি কি আগে জানতাম যে, সে এমেলকা কোম্পানীর এক ডিরেক্টারের স্ত্রী—স্টুডিওতে যখন প্রথম দেখলাম তাকে তখন সে একটা এক্‌স্ট্রা—

গোলাপদা বললেন : আরে বাপু, ও স্টুডিওতে আসে শখের খাতিরে, রুটির তাগিদে নয়। যাক, সাবধানে চলো। বিদেশ, বিভুঁই—একটা কিছু কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসো না।

বাড়ীতে ফিরে রাত্রে ব্যাপারটা ভাল করে তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনো সমস্যারই সমাধান হলো না।

স্টুডিওতে লাঞ্চের সময় একবার ভাবলাম যে, ক্যান্টিনে আজ আর খেতে যাবো না—গেলেই তো হিল্‌ডার সঙ্গে দেখা হবে। দেখা হলে কথা বলতেই হবে—এবং সে যদি বলে সন্ধ্যার সময় চলো কোনোখানে বেড়িয়ে আসি—তখন আর না বলবার শক্তি থাকবে না আমার।

ঠিক হলোও তাই। লাঞ্চের সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল—ততই মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল। শেষে সংযমের বাঁধ আর রইল না।

ঢুকেই দেখি—হিল্‌ডা বসে আছে আমাদের সেই প্রিয় জায়গাটিতে। তার উৎসুক চোখের চাউনি আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার সেই বড় বড় চোখের স্বপ্নময় চাউনিকে আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। সব সঙ্কল্প ভেসে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় গোলাপদা তাঁর প্যাসিওতে আমায় ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি মিঃ পালও এসেছেন। গোলাপদা বললেন : 'লাইট অফ এশিয়া' রিলিজ হচ্ছে ইউরোপের সব জায়গায়। তোমাকে কালই বেরিয়ে পড়তে হবে। তোমাকে যেতে হবে ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও জার্মানীর বিশেষ বিশেষ স্থানে। প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে প্রিমিয়ারের সব বন্দোবস্ত করতে হবে।

আগে এই কাজের জন্যে গোলাপদার প্রচুর খোসামোদ করতাম। কিন্তু, গোলাপদা যখন যাবার জন্যে তৈরী হতে বললেন, তখন যেন সমস্ত উৎসাহ উবে গেল। গোলাপদা আবার ছিলেন এসব বিষয়ে ভীষণ কড়া লোক। কাজের সময় তাঁর কাছে কোন ওজর আপত্তি চলত না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে তৈরী হয়ে নিতে হলো।

আমার সঙ্গে এমেলকার প্রচারসচিবও গেলেন। লোকটির পড়াশোনা আছে—২।৩টি ভাষায় বেশ ভালো দখল আছে। কণ্টিনেণ্টের মজা হলো—কেউ যদি ফ্রেঞ্চ জানে তবে তার কোথাও কোনো অসুবিধে হবে না। ইনি ফ্রেঞ্চ জানতেন, ল্যাটিন জানতেন, ইংরাজী জানতেন—আর জার্মান তো জানতেনই।

বেশ বুঝলাম, হিল্‌ডার কাছ থেকে গোলাপদা আমাকে সরিয়ে নিতে চান। হিল্‌ডাকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলাম—একটু বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি—ফিরতে কিছুদিন দেরী হবে। হিলডা মনঃক্ষুণ্ণ হল বুঝতে পারলাম—কিন্তু উপায় নেই।

প্রথমেই এলাম ভেনিসে। সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায় সেখানকার দৃশ্য দেখলে। এতকাল ভেনিসের সঙ্গে পরিচয় ছিল সেক্সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিসে'র মাধ্যমে। শহরের বেশীর ভাগই জলে ভর্তি। যেখানেই যেতে হয়—নৌকা করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওদেশে নৌকাকে বলে গণ্ডোলা আর মাঝিদের বলা হয় গণ্ডোলিয়ার। প্রেমিক-প্রেমিকাদের স্বর্গোদ্যান হল এই ভেনিস। গণ্ডোলিয়ার বিচিত্র সুরে গান গাইতে গাইতে চলেছে—তার মধ্যে তরুণ-তরুণীর প্রণয়কুজন দেখলে অতি বড় বেরসিকের প্রাণেও শিহরণ জাগে।

এই ভেনিসে যেদিন প্রথম 'লাইট অব্ এশিয়া' মুক্তি লাভ করল, সেদিন সমস্ত সহর জুড়ে এমন এক সোরগোল উঠল যা অভূতপূর্ব।

এমেলকার পাব্‌লিসিটি ম্যানেজার বললেন—মিঃ বোসে, আর ভাবনা নেই, 'লাইট অব্ এশিয়া' লেগে গেছে, সারা কন্‌টিনেণ্টে এ ছবি নির্ঘাৎ হিট করবে—এই আমি বলে রাখলুম—

ভেনিস থেকে আমরা অষ্ট্রিয়াতে গেলাম। ভিয়েনা থেকে তিনি চলে গেলেন

প্রাগে, আর আমি চলে গেলাম বুডাপেস্টে। কথা রইল যে আমরা আবার মিউনিকে এসে মিলব।

প্রতি জায়গাতেই ছবির ইন্টারভ্যালের সময় আমাকে বক্তৃতা দিতে হতো। বক্তৃতার একটা মোটামুটি খসড়া তৈরী করেছিলাম, সেইটাই সব জায়গায় বলতাম। বলতাম অবশ্য জার্মান ভাষায়। সবটাই ছবির পাবলিসিটি। এই ছবি করতে কত পরিশ্রম করতে হয়েছিল ইত্যাদি। ভারতবর্ষ এবং ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতাম। বক্তৃতা দেবার সময় আমাকে পাগড়ী পরতে হতো—যেরকম পাগড়ী ভারতীয় রাজন্যবর্গ পরে থাকেন। অর্থাৎ তখন প্রায় সব ইউরোপবাসীর ধারণা যে ইউরোপে যারা আসে তারা দেশীয় রাজা-মহারাজা ছাড়া আর কেউ নয়। বক্তৃতার বেশীর ভাগই বলতে হতো সীতা দেবী সম্বন্ধে। ভারতের হিন্দু রমণীরা সাধারণতঃ অসূর্যম্পশ্যা—পর-পুরুষের সঙ্গে অভিনয় করার জন্যে রক্ষণশীল অভিজাতবংশীয়া মহিলা পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু অনেক কষ্টে এই শিল্পীটিকে রাজী করানো গেছে।

তারপর রসিয়ে রসিয়ে মজাদার করে বলতাম কেমন করে ১১০° ডিগ্রি গরমে জয়পুরে বালির ওপর শুটিং করতে করতে কত লোকের জীবন বিপন্ন হয়েছিল। কথাগুলো লোকে অবাক বিস্ময়ে শুনত আর ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত। শুধু তাই নয়, সীতা দেবী ও গোলাপদার জন্যে দর্শকদের মধ্য থেকে কত যে উপহার আসত তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

বুদাপেস্টে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। ছবির উদ্বোধনের দিন শো'র পরে আমার হোটেলে একটি বিরাট ডিনার পার্টির আয়োজন হলো। হোটেলটির নাম হল হোটেল ডুনা পালাটো। নিমন্ত্রণ করা হলো ওখানকার সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিকে। তার মধ্যে রাজনীতিক আছেন, সাংবাদিক আছেন এবং বিশিষ্ট নাগরিকও আছেন। ডিনারের পর হোটেলের বিল দিতে গিয়ে আমার চক্ষুস্থির! পকেটে হাত দিয়ে দেখি পকেট শূন্য। ক্লোক্-রুমে গিয়ে ওভারকোটটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম—কিন্তু কোথায় মণি-ব্যাগ? ব্যাগের মধ্যে প্রচুর টাকা ছিল; আমার যে তখন কি বিপন্ন অবস্থা, তা' বলে বোঝানো যায় না। একে বিদেশ, বিভূঁই—তারপর একটু আগেই বুদাপেস্টের শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের প্রশংসার জয়মাল্য লাভ করেছি। আর পরমুহূর্তেই কপর্দকশূন্য অবস্থা—হোটেলের এত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাওয়ানোর পর তার বিল দিতে পারছি না! ঐ শীতের মধ্যেও আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল।

লজ্জার মাথা খেয়ে হোটেলের ম্যানেজারকে বুঝিয়ে সব ব্যাপারটা বলে কিছুক্ষণের সময় নিলাম চেয়ে। ভদ্রলোক ব্যাপারটা বুঝলেন, বিশ্বাসও করলেন। আমি তারপর দিন সকালে উঠে গিয়েই টমাস কুকের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে আমার বিপদের কথা জানালাম।

যতক্ষণ আমি কথা বলছিলাম, ততক্ষণ তিনি স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল যে, তিনি আমার কথাগুলো যেন কিছুই বিশ্বাস করছেন না। আমি মরীয়া হয়ে বললাম: আমি এক বর্ণও মিথ্যে বলছি না। দেখুন, আমার পকেটে কয়েক মার্ক মাত্র পড়ে আছে। এই দেখুন আমার পাসপোর্ট, ভিসা—আপনি আমাকে একদিনের জন্যে এই টাকাটা দিয়ে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান—আমি টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি এমেলকা কোম্পানীকে—সেখান থেকে আপনার টাকা ঠিক এসে যাবে। আপনাকে হয়ত এভাবে বিব্রত করতাম না—কিন্তু আজকেই আমাকে বুদাপেস্ট ছেড়ে ভিয়েনা যেতে হবে। জানেন তো—আমাকে 'লাইট অফ এশিয়া' ছবির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হচ্ছে।

এইবারে তাঁকে একটু হাসতে দেখলাম। বললেন: আমি আপনার সব কথাই বিশ্বাস করেছি। কাল হোটেলে আপনি যে ডিনার দিয়েছিলেন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু আমি কোম্পানীর টাকা তো এভাবে দিতে পারি না—পার্সোনাল এ্যাকাউণ্ট থেকে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। যখন সুবিধা হবে দিয়ে দেবেন। এই বলে তিনি একখানা চেক কেটে দিলেন।

জীবনে বহুবার টাকা-পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপারে বহু বিপদে পড়েছি—কিন্তু ভগবানের এমনই একটা আশীর্বাদ আছে আমার ওপর যে, ঠিক শেষ মুহূর্তে তাঁর মঙ্গল হস্ত আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। এ আশীর্বাদটুকু তাঁর না থাকলে আজ আমি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম বলা যায় না।

এরপর বুডাপেষ্ট থেকে এলাম ভিয়েনায়।

এই সময় অষ্ট্রিয়া থেকে জার্মাণী আসার বা জার্মাণী থেকে অষ্ট্রিয়া যেতে হলে 'ভিসা'র প্রয়োজন হত। সীমান্ত স্টেশনের নাম ছিল 'পাসাও'।

ভিয়েনা থেকে যখন মিউনিক যাচ্ছি সেই সময় পাসাও স্টেশনে একটা ঘটনা ঘটল। যখন 'ভিসা' পরীক্ষা করবার জন্য পাসাও স্টেশনে স্থানীয় অফিসার এলেন তখন দেখা গেল যে 'ভিসা'র তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়িতে অনবধানতাবশতঃ আমি সেটা মোটে খেয়ালই করিনি।

যদিও কয়েকবার যাওয়া আসার ফলে ওখানকার অফিসারদের মোটামুটি মুখ চেনা হয়ে গিয়েছিল এবং ঐ ভুলটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়, কিন্তু তবু আমাকে নামতে হলো। আইনকে তো তাঁরা অমান্য করতে পারেন না।

গেলাম স্টেশনমাস্টারের কাছে—তাঁকে আমার অসুবিধার কথা জানালাম। কিন্তু তিনিও দেখলাম, আইনের বাইরে কিছু করতে চান না। শেষে তাঁকে বললাম—যে আমি হিমাংশু রায়ের ইউনিটের লোক—এবং তাঁর 'লাইট অফ এশিয়া' ছবিতে কাজ করেছি।

এই কথাটা বলামাত্র একেবারে ম্যাজিকের মত কাজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন-মাস্টারের ব্যবহার বদলে গেল সম্পূর্ণভাবে। কারণ তখন 'লাইট অব এশিয়া' এবং হিমাংশু রায়ের নাম সারা দেশে এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে যে তাঁর সমস্ত ইউনিটকে ওদেশের প্রত্যেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত।

তিনি বললেন: ঠিক আছে, ভুল যখন হয়েই গেছে তখন না হয় তুমি আজকের রাতটা আমার ওখানেই থাক—কাল 'ভিসা' ঠিক করে নিয়ে চলে যেও। আমরা তো আইনকে অমান্য করতে পারি না।

আমি দেখলুম যে তর্ক করা বৃথা, সুতরাং কি আর করা যাবে! সে রাত্রে স্টেশনমাস্টারের বাড়ীতেই অতিথি হয়ে থাকলাম।

স্টেশনমাস্টার লোকটি ভাল, তিনি এক সময় বললেন: তুমি 'মোজার্টের' নাম নিশ্চয়ই শুনেছো?

আমি বললাম: নিশ্চয়ই—অমন বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীত-স্রস্টার নাম কে না শুনেছে?

স্টেশনমাস্টার বললেন: কাছেই Salzburg—ওখানেই মোজার্টের জন্মস্থান—ইচ্ছা করলে কাল সকালে ওটা দেখে আসতে পার—তারপর ভিসা ঠিক করে নিয়ে চলে যেও।

আমি বললাম: ধন্যবাদ! এরকম একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির জন্মস্থান দর্শন করা তো ভাগ্যের কথা।

সকালে মোজার্টের জন্মস্থান সালজবুর্গ ঘুরে এলাম—তারপর টমাস কুকের অফিস থেকে ভিসা ঠিক করে নিয়ে মিউনিক রওনা হলাম।

মিউনিকে এসে এমেলকার পাবলিসিটি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হলো। বার্লিনে তখন ছবির প্রিমিয়ার হবে, তারই জন্য প্রচারের সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে দুজনে বার্লিনের দিকে যাত্রা করলাম।

বার্লিনে গিয়ে দেখি গোলাপদা সেখানে নিজে এসে হাজির। সঙ্গে মিঃ পালও আছেন। শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেলে সবথেকে দামী 'স্যুইট' নিয়ে রয়েছেন। তাঁকে দেখলে মনে হবে যেন কোন ভারতীয় রাজকুমার এসেছেন বার্লিনে প্রমোদ-ভ্রমণে। চাল চলনে কথাবার্তায় এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন যে, মনে হতো তিনি যেন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে—সবচেয়ে ওপরতলার মানুষ।

আমার 'ট্যুরে'র বিষয় তাঁকে সবিস্তারে বললাম। চারিদিকে এমন অভূতপূর্ব সাফল্য—কাগজে কাগজে সুখ্যাতি—তার ওপর প্রায় সব জায়গার দর্শকদের মধ্যে থেকে পাওয়া গেছে নানা রকমের উপহার হিমাংশু রায় ও সীতা দেবীর জন্যে। এসব দেখে তো গোলাপদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন: Madhu, you have done a great job। একটু থেমে তিনি বললেন: এইবার বার্লিনে কি কাণ্ড করি দেখ না! বার্লিন প্রিমিয়ারে Von Hindenburg আসছে।

—ভন্ হিণ্ডেনবুর্গ? রাইখের প্রেসিডেণ্ট? বল কি গোলাপদা? আমি বিস্ময়ে ফেটে পড়লুম।

গোলাপদা বললেন: হঁ্যা—ঠিকই বলছি।

বার্লিনে 'লাইট অফ এশিয়া'র প্রিমিয়ার হলো।

এরপর নৈশভোজ। সহরের কেন, পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সমাবেশ হলো এই ভোজে।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন জার্মানীর তদানীন্তন ভাগ্যবিধাতা ভন্ হিণ্ডেনবুর্গ; কৌতুক-সম্রাট চার্লি চ্যাপলিন, বিশ্ববন্দিতা পোলা নেগ্রী, বিখ্যাত চরিত্রাভিনেতা এমিল জ্যানিংস প্রভৃতি। এঁদের সঙ্গে পরিচয় হওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা। এমেলকা এবং ইউফা স্টুডিওর সব ডিরেকটার, শিল্পী এবং টেকনিসিয়ান সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মিঃ পাল, মিঃ অস্টেন তো ছিলেনই। হিল্ডাও এই উপলক্ষ্যে বার্লিন এসেছিল তার স্বামীর সঙ্গে।

প্রত্যেককে আমরা একটি করে অ্যালবাম উপহার দিলাম—মরক্কো বাঁধানো সোনার জলে নাম লেখা, মধ্যে 'লাইট অফ এশিয়া'র প্রায় পঞ্চাশখানি স্থিরচিত্র। খুব সুন্দর হয়েছিল জিনিষটি। প্রত্যেকেই ছবির খুব প্রশংসা করলেন। বার্লিনে 'লাইট অফ এশিয়া' এমন দুর্দান্ত চলেছিল যে, তখনকার দিনের 'থিফ অফ বাগদাদ' ছবির রেকর্ডকেও ম্লান করে দিয়েছিল।

নিমন্ত্রিতরা একে একে চলে গেলেন। তারপর হিল্ডা তার স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। চমৎকার লোক—একটু বয়স হয়েছে—কথাবার্তা, ব্যবহার,

অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত এবং অমায়িক। সমস্ত রাত্রি ধরে সেই হোটেলেই খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান হৈ-হল্লা চলল। হিল্ডাকে কতদিন পরে দেখতে পেয়েছি—সুতরাং আনন্দটা যেন আমারই সবচেয়ে বেশী।

কিন্তু পৃথিবী কারও আনন্দ বা বিষাদের মুখ চেয়ে তো চলে না, চলে নিজের গতিবেগে। সুতরাং আমাকেও দু'দিন পরেই বার্লিন ছেড়ে মিউনিকে চলে যেতে হলো। এই সময় মিউনিকে এলেন মিঃ অ্যালফ্রেড হিচ্‌কক। মিঃ হিচ্‌কক তখনই চিত্র-পরিচালকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি তখন লণ্ডনের Gainsborough Studio-র হয়ে একখানি ছবি করছিলেন—মিউনিকে এসেছিলেন কতকগুলি বহির্দৃশ্য তুলতে—সঙ্গে ছিলেন তাঁর নায়িকা নীতা নালডি এবং ইটালীয়ান ক্যামেরাম্যান ভেন্টিমেগলিয়া। তিনি একজন দোভাষী খুঁজছিলেন। ইংরাজি ও জার্মানী ভাষা জানে এমন একজন লোকের সাহায্য না পেলে এদেশে ছবি করা তাঁর পক্ষে মুস্কিল হয়ে পড়ছিল। গোলাপদা আমাকে ডেকে বললেন: মধু, তুই এ কাজটা কর। এরকম চান্স খুব কমই আসে।

গোলাপদা'র কথায় আমি প্রথমটা সায় দিতে পারলাম না। আমার গলায় প্রতিবাদের সুর ফুটে উঠল। আমি বললাম: এটা কি বলছেন গোলাপদা? আমি এসেছি ফটোগ্রাফী শিখতে—আর শেষে কিনা আমায় দোভাষীর কাজ করতে হবে?

গোলাপদা আমাকে বুঝিয়ে বললেন: আরে বুঝছিস না,—এইভাবে হিচ্‌ককের ইউনিটে ঢুকে তো পড়—তারপর ওরই ইউনিটে ক্যামেরার কাজ শিখতে পারবি। হিচ্‌কক লোক খুব ভাল—তাকে খুশী রাখতে পারলে তোকে আর ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করতে হবে না। কথাটা আমার মনে লাগল।

আমি তখন বললাম: আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন।

এইভাবে মিঃ হিচ্‌ককের ইউনিটে দোভাষীর কাজ করতে লাগলাম।

আসলে গোলাপদা'র উদ্দেশ্য ছিল যে, কোনরকমে হিলডার হাত থেকে আমায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেইজন্যেই একরকম জোর করেই তিনি মিঃ হিচ্‌ককের সঙ্গে আমায় জড়িয়ে দিলেন।

মিঃ হিচ্‌কক, কি জানি কেন, আমাকে প্রথম থেকেই খুব স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। মিঃ হিচ্‌ককে একদিন সাহস করে আমি আমার মনের ইচ্ছেটা জানালাম। তিনি খুশী হয়ে বললেন: এতো খুব ভাল কথা—আমি আমার ক্যামেরাম্যান ভেন্টিকে বলে দিচ্ছি।

আসলে তার নাম ছিল ভেন্টিমেগ্লিয়া—কিন্তু তাকে সবাই ডাকত 'ভেন্টি' বলে।

চমৎকার লোক এই ভেন্টিমেগ্লিয়া। সত্যি কথা বলতে কি ইনিই আমার ফটোগ্রাফীর আসল গুরু। আমি 'রিফ্লেকটার' ধরতাম—মাঝে মাঝে তিনি ক্যামেরা চালাতেও দিতেন আমায়, তখন ক্যামেরা মোটরে চলতো না—হাতে চালাতে হতো। মুভি ক্যামেরাতে প্র্যাকটিস করার ফলে আমার 'ক্র্যাঙ্কিং স্পীড' ঠিক রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার কাজ দেখে খুসী হয়ে ভেন্টিমেগ্লিয়া বলেছিলেন—বোস, তুমি আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে চল। কিছুদিনের মধ্যে তোমাকে আমি পুরোপুরি ক্যামেরা-ম্যান তৈরী করে দেব।

মাসখানেকের মত এই ইউনিটে আমি ছিলাম এবং হাতেকলমে কাজ শিখেছিলাম।

তারপর একদিন মিঃ হিচ্‌ককের কাজ শেষ হয়ে গেল—যাবার সময় আমাকেও তিনি লণ্ডনে নিয়ে যেতে চাইলেন—কিন্তু আমি গেলাম না, কারণ তখন আমার মনের অবস্থা হলো : হিল্‌ডাকে ছেড়ে থাকব কি করে? তবু মিঃ হিচ্‌কক এমন ভদ্রলোক যে গাড়ীতে উঠবার সময় আমাকে বলে গেলেন যে, লণ্ডনে যদি কখনও যাই, তবে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। ১৯৫৮ সালে তিনি কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন, লাইটহাউসে তখন তাঁর ছবি 'টু ক্যাচ এ থিফ' এবং 'দি ব্ল্যাক ক্যাট'-এর বিশেষ প্রদর্শনীতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করায় তিনি প্রথমটায় আমাকে চিনতে পারেননি—কিন্তু শেষে যখন আমি আমার বিস্তারিত পরিচয় দিলাম তখন আমায় জড়িয়ে ধরে ঠিক পুরাতন বন্ধুর মতই ব্যবহার করলেন।

আমি যে মিঃ হিচ্‌ককের সঙ্গে লণ্ডনে যেতে চাইলাম না—এতে কিন্তু গোলাপদা মোটেই খুশী হলেন না, যদিও মুখে তিনি বিশেষ কিছুই বললেন না।

এরপর মিঃ পাল ফিরে গেলেন লণ্ডনে। আমি আবার এমেলকা স্টুডিওতেই ফিরে এলাম এবং যে কাজ করছিলাম, সেই কাজেই আবার লেগে পড়লাম।

দেখতে দেখতে বড়দিন এসে পড়ল। ইংলণ্ডের চেয়ে জার্মানীতেই বড়দিন এবং নববর্ষের বেশী ধুমধাম। জার্মানীতে বড়দিনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে 'প্যাশান প্লে'। এই 'প্যাশান প্লে' হচ্ছে একটি অদ্ভুত জিনিস। যীশুখৃষ্টের জীবনী নিয়ে নাটকাভিনয়ের নামই হল 'প্যাশান প্লে'। প্রতি দশ বছর অন্তর এই নাটকাভিনয় হয়। যারা এতে অভিনয় করেন সেই অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের অমানুষিক নিষ্ঠা এবং নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে ন'বছর যাপন করার পরে তবে অভিনয় করার

অধিকার পায়। কিন্তু মাত্র ওই একবারই। যিনি যীশুখৃষ্টের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবেন তাকে হতে হবে একেবারে আনকোরা নতুন, এবং পরেও আর কোনও নাটকে অভিনয় করতে পারবেন না। অভিনয়টি অনুষ্ঠিত হয় মিউনিক থেকে ট্রেনে করে একরাত্রের পথ 'ওবেরোমের্গাঁও' নামে একটি ছোট গ্রামে। হাজার হাজার খ্রীস্টান নর-নারী সে অভিনয় দেখেন। সে অনুষ্ঠান একবার দেখলে সারা জীবনেও তা ভোলা যাবে না।

"প্যাশান-প্লের" রিহার্সাল দেখতে গিয়েছিলাম আমি, হিল্‌ডা, তার এক বান্ধবী ও বান্ধবীর ফিঁয়াসে এবং আরও দুজন মহিলা। এরাও ছিল হিল্‌ডার বান্ধবী। বেরুবার সময় আমার ল্যাণ্ড-লেডীর মেয়ে গার্ডাও ধরে বসল যে, সেও যেতে চায়। এই মেয়েটির বয়স ছিল প্রায় চৌদ্দ—কিন্তু অদ্ভুত ভাল মেয়ে। ঠিক দাদার মত সে আমায় শ্রদ্ধা করত।

সকাল বেলায় সে আমায় ব্রেক-ফাস্ট খাইয়ে স্কুলে যেত—স্কুল থেকে ফিরে বাড়ীতে আমার জামা-কাপড় ঠিক করে দেওয়া, খেতে দেওয়া ছাড়াও এটা-সেটা টুকিটাকি কাজ করে দিত। সে এমন করে ধরল যে তাকেও সঙ্গে না নিয়ে পারলাম না।

ইদানীং ডিনার তো প্রায় বাইরেই খেতাম হিল্‌ডার সঙ্গে। আগে থেকে বলা থাকত না। গার্ডা রাত্রে আমার জন্যে আমার ঘরে ডিনার চাপা দিয়ে রেখে দিত। সকালে উঠে যখন দেখত যে আমি ডিনার খাইনি, তখন তার কাছে রীতিমত বকুনি খেতে হতো খাবার নষ্ট করেছি বলে।

মনে আছে, হিল্‌ডার সঙ্গে আমার বড়দিনটা খুব আমোদেই কাটলো।

সেই বছর সেই ১৯২৫-এর নববর্ষের আগের দিন অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর হিল্‌ডার স্বামী মিউনিকে এক শ্রেষ্ঠ হোটেলে এক বিরাট নৈশভোজ দিলেন। সেই পার্টিতে আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম, গোলাপদাও উপস্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্যের নিয়ম হলো যে, লম্বা টেবিলের দুই সীমান্তে বাড়ীর কর্তা ও গৃহিনী বসবেন—তাঁদের পাশে থাকবেন যে যেমন শ্রেণীর লোক তাঁরা। হিল্‌ডার টেবিলের এক পাশে এমেলকার সর্বোচ্চ কর্ণধার, আর এক পাশে আমি। এটা অনেকের কাছেই আশ্চর্য মনে হলেও মুখে সকলেই অসম্ভব সৌজন্য প্রকাশ করেছিল।

এমেলকার কর্ণধার আমাকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বললেন যে, তাঁর অনেক দিনের বাসনা একবার ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবর্ষ

সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়েছেন এবং মিঃ হিমাংশু রায় ও মিঃ অস্টেনের কাছে শুনেছেন। আমি 'টাগোরে'র শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলাম জেনে—'টাগোরে'র সম্বন্ধে অনেক-কিছু প্রশ্ন করলেন।

খাওয়া-দাওয়া প্রচুর হলো। রাত্রি ক্রমশ বাড়তে লাগল—সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল রাত্রি বারটার জন্যে অর্থাৎ নববর্ষকে আবাহন করবে বলে।

ওদেশের নিয়ম হলো নববর্ষ শুরু হবার আগে অর্থাৎ রাত্রি ১২টা বাজার কিছুক্ষণ আগে নববর্ষের নাচ আরম্ভ হয়। এ নাচে স্বামী-স্ত্রী বা প্রণয়ীযুগল এক সঙ্গে নাচবে। অর্থাৎ যুগলে মিলে পুরাতন বৎসরকে বিদায় দিয়ে আহ্বান করবে নতুন বৎসরকে। আমার তখন ধারণা ছিল যে, আজকের দিনে তো আর হিল্‌ডাকে নৃত্য-সঙ্গিনী হিসাবে পাওয়া যাবে না, সুতরাং আনন্দটা মাঠে মারা যাবে কেন—আমি আর একটি মেয়েকে বলে রেখেছিলাম। তারও বোধহয় কোন সঙ্গী ছিল না—তাই সেও রাজী হয়েছিল।

ঠিক যখন নববর্ষের বাজনা বেজে উঠল, সবাই তৈরী হলো নাচের জন্য, এমন সময় হিল্‌ডা আমায় হঠাৎ বলল: এস, নাচবে না?

আমি একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললাম: হ্যাঁ নাচব—তবে তোমার সঙ্গে ড্যান্স করব কি করে আজ?

—কেন?

—আজকে তোমার এই নাচের সঙ্গী হবেন তো তোমার স্বামী!

—হুঁঃ, বাদ দাও ওর কথা। নাও ওঠ—বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে ড্যান্স-ফ্লোরের দিকে এগিয়ে গেল।

আমি দেখলাম হিল্‌ডা যখন একবার জিদ ধরেছে, তখন এখানে কিছু বলতে যাওয়া মানে একটা বিশ্রী দৃশ্যের অবতারণা করা। বাধ্য হয়ে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে হিল্‌ডার সঙ্গে আমি এগিয়ে গেলাম। যাবার সময় দেখি হিল্‌ডার স্বামী এই দিকেই আসছিলেন, কিন্তু আমাদের দুজনকে ড্যান্স ফ্লোরের দিকে যেতে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, আর এদিকে এলেন না।

হিল্‌ডাকে বললাম: দেখ, কাজটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না—সকলে কি ভাবছে বল তো?

হিল্‌ডা ঘাড়টা একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল: ভাবতে দাও—আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। আর তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, সে তো আমার স্বামীকে আমি বলেছি।

বলে আমাকে আরো নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করল।

একে শ্যাম্পেনের নেশা, তার ওপর হিল্‌ডার এই কথা—আমি হিতাহিত জ্ঞান হারালাম।

নাচ শুরু হয়ে গেল। নববর্ষকে আহ্বান জানানো হলো বারটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে।

নাচের শেষে আরম্ভ হলো সকলকে শুভ কামনা জানানো।

হিল্‌ডার স্বামী এসে আমাদের নববর্ষের শুভ কামনা জানালেন, তারপর এক সময় তিনি আমার পিঠে মৃদু করাঘাত করে বললেন: মিঃ বোস, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে—তুমি একবার আসতে পারবে কি? আমি লাউঞ্জে অপেক্ষা করছি।

আমি বেশ একটু নার্ভাস হয়ে পড়লাম। হঠাৎ মনে হলো ডুয়েল লড়তে বলবে নাকি? হিল্‌ডাকে বললাম: তোমার স্বামী আমার সঙ্গে জরুরী কথা বলতে চান। যাওয়া উচিত?

হিল্‌ডা বলল: নিশ্চয় উচিত। তোমার কোন ভয় নেই। আমার স্বামী খুব ভালো লোক। আর আমি তো তাঁকে সবই বলেছি।

—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। বলে লাউঞ্জের দিকে গেলাম। মনের ভিতরটা একটা অসম্ভব উত্তেজনায় কাঁপছিল।

আমি যেতেই হিল্‌ডার স্বামী দাঁড়িয়ে উঠে আমায় অভ্যর্থনা করে পাশে বসালেন। বেয়ারাকে ডেকে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলেন।

বেয়ারা শ্যাম্পেন নিয়ে এসে টেবিলে রেখে গেল। আমার দিকে একটি গ্লাস এগিয়ে দিয়ে আমার গ্লাসে তাঁর গ্লাস ঠেকিয়ে নববর্ষের শুভ কামনা আবার জানালেন। তারপর গ্লাসটি নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন: আমি হিল্‌ডার কাছে সবই শুনেছি। হিল্‌ডা তোমাকে ভালবাসে—আর তুমিও তাকে ভালবাস। আমারও যথেষ্ট বয়স হয়েছে—আমার বয়স এবং অভিজ্ঞতায় আমি সবই বুঝি। তোমরা যখন পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসো—তখন আমার তোমাদের দুজনের মধ্যে একটা বাধা হয়ে থাকাটা ঠিক নয়—আর তার ফলও ভাল হয় না। হিল্‌ডাকে আমি মুক্তি দিয়ে দেব।

আমি তাঁর শান্ত সংযত এবং ভদ্র কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমি তো ভেবেছিলাম ভদ্রলোক বেশ রাগারাগি করবেন। এ নিয়ে পৃথিবীতে কত রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে গেছে। আর এ ভদ্রলোকের মুখে একটা অভিযোগের স্বরও শুনতে পেলাম না। বরং খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ব্যবহার!

খুবই অবাক লাগল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর শ্রদ্ধাও হলো।

তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন: কিন্তু একটা কথা—আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম—আবার কি বলবেন শোনবার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

তিনি বলতে লাগলেন: তুমি এখন ছেলেমানুষ—ভারতবর্ষ থেকে এই দূরদেশে এসেছ কাজ শিখতে। মিঃ হিমাংশু রায়ের কাছে শুনেছি তোমার বাড়ীর অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়। এ অবস্থায় একবার ভেবে দেখেছ কি, কতখানি বিরাট দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চলেছ তুমি? অবশ্য প্রেমে পড়লে মানুষ অগ্রপশ্চাৎ ভাবে না, বিশেষ করে তরুণ তরুণীরা। তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। কথাগুলো শুনে যেন ক্ষুণ্ণ হয়ো না। আমি তোমার বড় ভাইয়ের মত।

ভদ্রলোকের কথাবার্তার মধ্যে অন্তরঙ্গতার সুর আমার মনকে স্পর্শ করল। আমি বললাম: না না, ক্ষুণ্ণ হবো কেন? আপনি বলুন।

—বেশ তাহলে শোন। হিল্‌ডাকে দেখে তুমি এতদিনে নিশ্চয় বুঝেছ যে ও কি রকম প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে। কখনও কোন জিনিষের অভাব ওকে বোধ করতে হয় না, অবশ্য ওর নিজেরও যথেষ্ট টাকা-কড়ি আছে। ওকে যদি তুমি বিয়ে কর তাহলে অর্থের কষ্ট হয়ত তোমাদের হবে না। কিন্তু তোমাকে তো তোমার স্ত্রীর ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে।

আমি বললাম: তা কেন? আমিও তো রোজগার করব। ওর টাকা আমি নিতে যাব কেন?

তিনি হেসে বললেন: মিঃ বোস, তুমি ছেলেমানুষ। Ambition আছে, খুব ভাল কথা। কিন্তু যে পেশা তুমি নিতে চলেছ—ক্যামেরাম্যানের—তাতে কত উপায় করতে পারবে তুমি? আর তা ছাড়া ভাল উপায় করবার মত অবস্থা হতে তোমার অনেক সময় লাগবে—ততদিন তুমি চালাবে কি করে? তোমার ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়ে তোমাকে তোমার স্ত্রীর সাহায্য নিতেই হবে। আর এটাও জেনে রাখ বোস—তোমাকে আমি বড় ভাইয়ের মতই বলছি, কেননা তোমার চেয়ে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। এখন না হোক, দুদিন পরে—স্ত্রীর অর্থে বেঁচে থাকা মানে, চরম লাঞ্ছনা ভোগ করা। এটা, কোন আত্মসম্মান জ্ঞান-বিশিষ্ট লোক মোটেই কামনা করে না।

সত্যিই—আমি তো এদিকটা একেবারেই চিন্তা করিনি। আজ এই কথাগুলো নতুন করে আমার মনের দরজায় আঘাত করল। আমি চুপ করে রইলাম।

তিনি আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন : আমার কাছ থেকে তুমি যে কোনো সাহায্য চাও পাবে—যদি চাও বার্লিনে উফা (Ufa) ষ্টুডিওতে আমি তোমার ভাল কাজ যোগাড় করে দিতে পারি। তুমি হিল্‌ডাকে ভালবেসেছ, ঠিক আছে—তোমাদের প্রেম বেঁচে থাক—কিন্তু বিয়ে করে নিজের দুর্গতিকে ডেকে এনো না। আমি তোমাকে কোনো রকম জোর করছি না—তুমি যা ভাল মনে কর তাই কর। তুমি যে-দিকে চূড়ান্ত বিবেচনা করবে—সেই দিকেই আমি তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এখন কিছু বলবার দরকার নেই—পরে আমার অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করে আমায় বলো।

হিল্‌ডার স্বামীর কাছ থেকে কখন যে বিদায় নিয়েছি আমার খেয়াল নেই। আমার মনের মধ্যে তখন দুনিবার দ্বন্দ্ব চলেছে। যখন ড্যান্স-হল্‌-এর মধ্যে ঢুকলাম, দেখি সামনেই গোলাপদা। তিনি যেন আমার প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমাকে দেখেই বললেন—কি মধু, তোর কী হয়েছে? বাড়ি যাবি না?

আমার মন তখনও হিল্‌ডার কাছেই পড়ে রয়েছে। বললাম—আপনি যান গোলাপদা। আমার একটু দেরি হবে—

গোলাপদা হাসলেন। বুঝতে পারলেন সব। বললেন, ঠিক আছে--কাল সকালে আমার প্যাসিওতে গিয়ে দেখা করিস, কাজ আছে। চলি—

বলে গোলাপদা চলে গেলেন।

রাত শেষ হতে তখন আর বেশী দেরী নেই। হোটেলের নিমন্ত্রিতদের ভীড় ক্রমশঃ পাতলা হয়ে আসছে। আমি এসে বসলাম হিল্‌ডার কাছে—সে আমার জন্যেই তখন পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল।

হিল্‌ডা জিজ্ঞেসা করল : অনেকক্ষণ ধরে তো খুব কথা বলছিলে দেখলাম—এত কি কথা হলো?

আমি আনুপূর্বিক সব বলে গেলাম।

হিল্‌ডা শুনে বলল : ঠিক আছে, আমার সমস্ত টাকা আমি তোমার নামে লিখে দিচ্ছি। তাহলে তো আর তোমার কোনো ক্ষোভের কারণ থাকবে না?

আমি চুপ করে রইলাম।

হিল্‌ডা আবার জিজ্ঞেস করলে—এই, কথা বলছো না যে? উত্তর দাও—

বললাম—আমি কী করবো বুঝতে পারছি না—

হিল্‌ডা বললে—তাহলে আর বুঝেও দরকার নেই তোমার; আজ নিউ-ইয়ার্স ডে, লেট্‌ আস্‌ সেলিব্রেট্‌—

ক্রমে রাত আরো নিবিড় হলো।

বাড়ী ফেরার সময় ঠিক হলো যে আজ এই হোটেলেই আমরা নববর্ষের লাঞ্চ খাবো এক সঙ্গে।

ভোর বেলায় হিল্ডা আমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

বাড়ী ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু ঘুম এলো না। সব সময়ই হিল্ডা আর তার স্বামীর কথাগুলো মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সকাল বেলায় গার্ডা এসে ঘরে কফি দিয়ে গেল। আমাকে শুভ নববর্ষ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল: হের বোসে, কি রকম নববর্ষের ডিনার খেলে কাল রাত্রে?

আমি হেসে বললাম: খুব ভাল।

—তা, আজ লাঞ্চ এখানে খাবে তো, না নেমন্তন্ন আছে?

আমি বললাম: না, আজ লাঞ্চ বাইরেই খাব।

—ওঃ, তুমি কি ভাগ্যবান! বলে গার্ডা হাসতে হাসতে চলে গেল। আমিও আর শুয়ে না থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম গোলাপদার প্যাসিওর উদ্দেশ্যে।

এখানে প্যাসিও সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। প্যাসিও ঠিক হোটেল নয়—একটা ২।৩ ঘরের ফ্ল্যাট, কিন্তু যাবতীয় খাবার সরবরাহ করবে সে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, অথচ দামে অনেক সস্তা। হোটেলে একটা ২।৩ ঘরের স্যুইট নিয়ে থাকতে গেলে যা খরচ, তার থেকে এখানে অনেক কম। অনেকটা বোর্ডিং হাউসের মত।

আমাকে দেখে গোলাপদা খুশী হলেন। বললেন: যাক, আসতে পেরেছিস তাহলে?

আমি হেসে বললাম: না আসার কি আছে?

তিনিও হেসে বললেন: বলা তো যায় না—হিল্ডা-হিল্ডা করে তুই যেরকম পাগল হয়ে উঠেছিস, তাতে সে তোকে না ছাড়তেও পারতো। তা যাক, কাল দেখলাম হিল্ডার স্বামী তোর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করছে—কি ব্যাপার বল তো?

আমি তখন সমস্ত বলে গেলাম তিনি যা যা বলেছেন।

গোলাপদা বললেন: ওঁকে খুব ভদ্রলোক বলতে হবে। সত্যিই তো—একজন স্ত্রীলোকের হাত-ধরা হয়ে থাকলে তোর প্রেস্টিজটা থাকবে কোথায় শুনি? তোর বাড়ীর কথা একবার ভেবে দেখেছিস?

আমি চুপ করে রইলাম।

গোলাপদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন : হিল্‌ডাকে বিয়ে তো করবি ঠিক করেছিস, তা তোর মাকে জানিয়েছিস এ-কথা ?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—না।

—তা জানাবি কেন ? বাবাকে না হয় জানাতে পারলি না সাহস নেই বলে, কিন্তু মাকে জানাস নি কেন ? অর্থাৎ মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে এই একটা মেয়ের জন্যে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে এসে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাস ? আজ মায়ের জন্যেই তুই বিলেতে আসতে পারলি—আর জীবনের এই চরম সিদ্ধান্তটা তুই মাকে জানাতে পারলি না ?

আমি অপরাধীর মত মুখ নীচু করে বসে রইলাম। আমার মনের সঙ্কল্পের সুদৃঢ় প্রাচীরে যেন চিড় খেয়ে গেল হঠাৎ। এতদিন আমি আর হিল্‌ডা একটা সোজা রাস্তা ধরে চলছিলাম, হঠাৎ এখন সে রাস্তাটা যেন দুদিকে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। কোন্‌ দিকে যাব—সেইটাই হলো প্রশ্ন। একদিকে হিল্‌ডা—অন্য দিকে মা, আর একদিকে প্রখর আত্মমর্যাদা। কোন পথ বেছে নেব ? একটা সাংঘাতিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগলাম—কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলাম না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে গোলাপদা আবার বললেন : শোন, আমার কথা রাখ। এখন হিল্‌ডার স্বামীর কাছে যাওয়া যাক্‌। ভদ্রলোক তোকে বার্লিনে Ufa Studio-তে কাজ ঠিক করে দেবে বলেছে, তুই মিউনিক ছেড়ে সেইখানেই চলে যা—আমি বলছি তাতেই তোর মঙ্গল হবে—

—কিন্তু গোলাপদা !—আমি শেষ চেষ্টা করলাম কণ্ঠে প্রতিবাদের ক্ষীণ সুর তুলে !

কিন্তু গোলাপদা-কে আমি কী বলে বোঝাবো ! গোলাপদা-র কাছে যে আমি কতভাবে ঋণী সে কি আমি জানি না ! তিনি শুধু তো আমার বন্ধুই নন্‌, আমার অগ্রজোপম যে !

গোলাপদা আমাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন—নে, আর অমত করিস নি। আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। চল্‌—

বলেই টেলিফোন তুলে হিল্‌ডার স্বামীকে জানালেন যে, আমরা আসছি তাঁর অফিসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।

আমাকে কোন কথা বলার আর অবসর দিলেন না।

ঘণ্টাখানেক পরে হিল্‌ডার স্বামীর অফিসে আমরা গিয়ে হাজির হতেই তিনি আমাদের খুব সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন : একটু ড্রিঙ্ক চলবে তো ?

গোলাপদা বললেন : হলে মন্দ হয় না—তবে সকাল বেলা—এই যা। আমার দিকে ফিরে বললেন—অবশ্য এদের তো কথাই নেই—কোন সময়ই 'না' বলে না।

হিল্‌ডার স্বামী বললেন : আজ তো অফিস ছুটি—শুধু তোমাদের জন্যেই আমি আর আমার সেক্রেটারী এসেছি কিছুক্ষণের জন্য। আজকের এই ঠাণ্ডার দিনে 'ফ্রেঞ্চ লিকারে' শরীরটা বেশ একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবে, কি বল ?

বলে তাঁর নিজস্ব 'সেলার' থেকে ফ্রেঞ্চ লিকার বের করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। এতক্ষণে পরিবেশটা বেশ সহজ হয়ে এল।

এরপর হিল্‌ডার স্বামী জিজ্ঞেস করলেন : কি মিঃ বোসে, কি ঠিক করলে ?

গোলাপদা আমাকে কোন কথা বলার সুযোগই দিলেন না—আমার হয়ে বললেন : ঠিক করার আর কি আছে ? ও আজই মিউনিক ছেড়ে চলে যাবে।

হিল্‌ডার স্বামীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন : ভাল কথা। খুব খুশী হলাম শুনে। এখন বল কোথায় যাবে—বার্লিনে ?

আমি চুপ করে রইলাম—শুধু একটু ঘাড় নাড়লাম।

হিল্‌ডার স্বামী বললেন : ঠিক আছে। ওখানকার (উফা) স্টুডিওর একজন ডিরেক্টারকে আমি একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। ওখানে তোমার কাজের সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। বলেই তিনি তাঁর নিজস্ব সেক্রেটারীকে ডেকে একটা চিঠি বলে গেলেন এবং রাত্রের ট্রেনে বার্লিনের একটা সিটও রিজার্ভ করতে বলে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সেক্রেটারী চিঠি টাইপ করে নিয়ে এলো—সঙ্গে একখানা বার্লিনের টিকিট। চিঠিটা সই করে হিল্‌ডার স্বামী আমাকে দিলেন।

দুই-এক কথার পর ওখান থেকে বিদায় নিয়ে গোলাপদার প্যাসিওতে ফিরে এলাম। গোলাপদা বললেন : এইখানেই লাঞ্চ খেয়ে নে।

আমি বললাম : কিন্তু আমি যে হিল্‌ডাকে কথা দিয়েছি—ওর সঙ্গে হোটেলে লাঞ্চ খাব।

গোলাপদা বললেন : না, না, আর ওখানে যেতে পাবে না।

আমি অনুনয়ের সুরে বললাম : গোলাপদা, তাহলে ওকে অন্তত একটা টেলিফোন করে জানিয়ে দিই—নইলে ও বেচারী আমার জন্যে যে অপেক্ষা করে বসে থাকবে।

গোলাপদা আদেশের সুরে বললেন: না—ওর কথা মন থেকে একেবারে মুছে ফেল। ও-দিকে আর নয়।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে গোলাপদার ঘরে একটা 'ডিভানে' গা এলিয়ে দিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘুম নেই—তারপর কি সাঙ্ঘাতিক ঝড় যে মনের মধ্যে বয়ে যাচ্ছিল তার প্রতিক্রিয়ায় দেহে ও মনে দারুণ অবসাদ ঘনিয়ে এসেছিল। একটু শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম মনে নেই—হঠাৎ গোলাপদার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, গোলাপদা বলছেন: কি রে, সন্ধ্যে হয়ে এল যে, ওঠ্। ট্রেনের আর বেশী দেরী নেই।

সত্যিই তখন চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

গোলাপদার সঙ্গে বোর্ডিং-এ এলাম। আমার হয়ে ল্যাণ্ড-লেডীকে গোলাপদা বললেন, ওকে একটু বিশেষ কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে—তাই জিনিষপত্রগুলো নিতে এলাম আমরা।

ল্যাণ্ড-লেডী বললেন: কোথায় যাবে?

গোলাপদা কোনো সঠিক জবাব না দিয়ে বললেন: তুমি তো জানো আমাদের 'লাইট অফ এশিয়া' ছবি চলছে জার্মানীর প্রায় সব জায়গাতেই—কোনো একটা বিশেষ জায়গায় তো নয়। অনেকগুলো জায়গায় ট্যুর করতে হবে। সে সব প্রোগ্রাম আমি আমার প্যাসিওতে গিয়ে করে দেব।

ওখান থেকে সোজা ষ্টেশন। আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গোলাপদা বললেন—ওখানে পৌছে কি হলো সব খবর দিয়ে আমাকে চিঠি লিখিস—আর মনস্থির করে থাকবি। পাগলামি করবি না, বুঝলি?

ট্রেন ছেড়ে দিল।

পরদিন সকালবেলাতেই বার্লিন পৌছালাম।

স্টেশনেই ব্রেকফাস্ট সেরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে গেলাম 'উফার' অফিসে। সুন্দর শহর এই বার্লিন—ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, বেশ সাজানো গোছানো। তার ওপর বড়দিন ও নববর্ষের জন্য সাজসজ্জাগুলি তখন পর্যন্ত লোকের চোখকে আনন্দ দিচ্ছিল।

অফিসে পৌছে যাঁর নামে চিঠি ছিল সেই ডিরেক্টার মশায়ের কাছে চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলাম।

একটু পরেই আমাকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে সামনের একটি চেয়ারে বসতে বললেন। ভদ্রলোকের একটু বয়স হয়েছে, মনে হয় পঞ্চাশের কিছু বেশীই হবে—বেশ দোহারা চেহারা—একটা সৌম্য ভাব মুখের মধ্যে বর্তমান।

ভাঙা-ভাঙা ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি জার্মান বলতে পার ?

আমি বললাম : হ্যাঁ—সামান্য-সামান্য পারি।

মৃদু হেসে ডিরেক্টর মশায় তখন বললেন : তাহলে কথাবার্তা জার্মানেই হোক, কি বল ?

আমি বললাম : বেশ তো। আমার কোনো আপত্তি নেই।

তারপর তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন। কতদিন জার্মানীতে এসেছি—এমেলকায় কতদিন ছিলাম—ওখানে কোন বিভাগে কাজ করেছি এবং আসলে কি শিখতে চাই ?

আমি তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললাম : ক্যামেরার কাজ শিখতে চাই।

শুনে তিনি বললেন : খুব ভাল কথা। আমি তোমাকে সব শেখার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। এরপর তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে ডাকলেন এবং স্টুডিওর ম্যানেজারের নামে একখানা চিঠি ডিক্‌টেশন দিলেন। সেক্রেটারীর নোট নেওয়া হয়ে গেলে কাছাকাছি একটা প্যাসিওতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে বললেন।

সেক্রেটারী ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেয়ারাকে ডেকে আমাদের দুজনের জন্যে কফির অর্ডার দিলেন। কফি খেতে খেতে আমার সঙ্গে নানারকম আলাপ শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ পরে সেক্রেটারী চিঠি টাইপ করে নিয়ে এল—আর খবর দিল যে আমার থাকার জায়গা ঠিক হয়েছে।

তখন ডিরেক্টার মশায় চিঠিটা সই করে আমার হাতে দিয়ে বললেন : তুমি তাহলে এখন প্যাসিওতে গিয়ে বিশ্রাম কর—রাত্রে ট্রেন জার্নি করে এসেছ। তারপর লাঞ্চ খেয়ে তৈরী থেকো—আমার এখান থেকে একজন লোক তোমাকে স্টুডিওর ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যাবে।

এরপর ডিরেক্টার মশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার জন্য নির্দিষ্ট প্যাসিওতে এলাম। উনি একজন লোক আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন, সে আমার ঘরের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়ে গেল।

আগের দিনের উত্তেজনা, তার ওপর রাত জেগে ট্রেন জার্নি—শরীরটা খুবই অবসন্ন মনে হচ্ছিল—জামা কাপড় ছেড়েই আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলাম কিন্তু ঘুম এলো না। নানা রাজ্যের চিন্তা এসে মনের মধ্যে ভীড় করে দাঁড়াল এবং যতকিছু চিন্তা সব হিল্‌ডাকে কেন্দ্র করেই।

এদিকে লাঞ্চের সময় হয়ে এল। লাঞ্চ খেয়ে তৈরী হয়ে নিলুম। যথাসময়ে সেই লোকটি এসে আমায় নিয়ে গেল উফা স্টুডিওতে। স্টুডিওর ম্যানেজার চিঠি পেয়ে আমাকে বললেন—ও, তুমিই ক্যামেরার কাজ শিখতে চাও?

আমি বললাম: হ্যাঁ—যদি আপনারা আমায় সে সুযোগ দেন—

ম্যানেজার বললেন: তোমাকে আমি আমাদের প্রধান ক্যামেরাম্যান কার্ল ফ্রয়েণ্ডের ইউনিটে দিয়ে দিচ্ছি। বলে তিনি তাঁর সহকারীকে ডেকে আমার সম্বন্ধে যথোপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

কার্ল ফ্রয়েণ্ড তখনকার দিনের কন্‌টিনেন্টের সব চেয়ে বড় ক্যামেরাম্যান। তিনি তখন বিখ্যাত ডিরেক্টর Fritz Lang-এর 'মেট্রোপলিস' ছবিটি তুলছিলেন। এখানে "মেট্রোপলিস" ছবি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। শুধু তখনকার দিনে কেন এতাবৎ নির্মিত ফিল্ম-শিল্পের ইতিহাসে "মেট্রোপলিস" একটি বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ ছবি। এই ছবিতে প্রথম দেখানো হয় মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিদ্রোহ এবং শেষে উভয়পক্ষের আপোস। ছবির যে নায়ক, সে হলো শিল্পপতির পুত্র, সে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শ্রমিকদের দলে যোগদান করে। সেখানে সে বিদ্রোহী শ্রমিকদের নেত্রীর সংস্পর্শে আসে এবং তার প্রেমে পড়ে। মালিক-শ্রমিকের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে চিত্রজগতে এই বোধহয় প্রথম ছবি।

ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে পর্দায় এই-ই প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যখন কলকাতা শহরে এই 'মেট্রোপলিস' ছবিটি প্রথম প্রদর্শিত হয়, তখনই সুযোগ হয় সম্পূর্ণ ছবিটা দেখবার। আজো কতকগুলো দৃশ্য স্পষ্ট মনে আছে। বিশেষ করে যেখানে যন্ত্রমানব (Robot) যাকে দেখতে ঠিক নায়িকার মত—সে শ্রমিকদের উত্তেজিত করছে, এবং শ্রমিকরা সেই বিরাট ফ্যাক্টরির মেসিন-পত্র ভেঙে চুরে তচ্‌নচ্‌ করে শেষে বাঁধের জল ছেড়ে দিল লক্‌গেট খুলে দিয়ে। এই অবিবেচনার ফলে তাদেরই স্ত্রীপুত্রকে যখন সেই প্রবল জলোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করলো তখনই হলো চূড়ান্ত নাটকীয় পরিণতি!

এতে কার্ল ফ্রয়েণ্ডের ক্যামেরার কাজ হয়েছিল অনবদ্য।

যাই হোক, উফা স্টুডিও থেকে ফিরে এসে সেইদিনই গোলাপদাকে চিঠি লিখে

জানিয়ে দিলাম যে আমার ভাগ্য ভার্ল—ক্রিজ ল্যাং-এর ইউনিটে কাজ শেখার সুযোগ পেয়েছি। বড়দিকেও চিঠিতে এই সুখবরটা জানিয়ে দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বার্লিনের ঠিকানাটাও দিয়ে দিলাম।

সেই দিন আর একখানি চিঠি লিখলাম মিউনিকে আমার ল্যাণ্ডলেডীকে—তাকে লিখে দিলাম যে লণ্ড্রীতে যে সমস্ত জামা কাপড় কাচতে দিয়েছিলাম সেগুলি তাড়াতাড়ি এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে।

কিন্তু সেই চিঠি লেখার ফলে আমার জীবনাকাশে আবার এক অভাবনীয় আলোড়ন দেখা দিল।

তার দুদিন পরে ভোরবেলা—তখনও ঘুম থেকে উঠিনি—হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাত। বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠল—কোথায় সকালবেলাটা একটু আরাম করে ঘুমোব—না, কে আবার জ্বালাতে এল এই সাত-সকালে? কোন রকমে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়াতে জড়াতে দরজা খুলেই দেখলাম—হিল্‌ডা!

আমি কি স্বপ্ন দেখছি? আমার মুখ দিয়ে শুধু একটা কথাই বেরুল: তুমি?

সে মৃদু হেসে বলল: হ্যাঁ আমি। ভূত নই। কিন্তু এখন কি আমি ভেতরে আসতে পারি?

আমি এতদূর অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তাকে ভিতরে আসতে বলতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলাম। লজ্জিত হয়ে বললাম: হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই—এস—

সে ভিতরে এসে একটা চেয়ারে বসে বলল: তুমি খুবই অবাক হয়ে গিয়েছো আমাকে দেখে—না?

আমি বললাম: তা একটু হয়েছি বৈকি! আমি যে এখানে আছি, তা তুমি জানলে কি করে?

—কেন, তোমার ল্যাণ্ডলেডীর কাছ থেকে। তোমার খোঁজ নেবার জন্যে রোজই তো ওকে টেলিফোন করি—কাল টেলিফোন করতেই উনি তোমার ঠিকানাটি দিয়ে দিলেন। আর ঠিকানা পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে রাত্রের ট্রেনে চেপে বসলাম। আর আজ বার্লিন পৌছেই সোজা তোমার এখানে চলে এসেছি। তুমি ভাবলে মিউনিক থেকে পালালেই তুমি আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে?

আমি একটু আমতা-আমতা করে বললাম: না—না—পালাবো কেন? মানে তাড়াতাড়িতে—

বাধা দিয়ে হিল্‌ডা বলল: আমি সব জানি—আমার স্বামী আমায় সব বলেছেন। এখন তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই তোমার কি বলবার আছে?

আমাদের এতদিনের জল্পনা-কল্পনা—ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন—সব কি এমনিভাবে ধুলোয় মিশে যাবে ?

হিল্‌ডা কথাগুলো বলে গেল খুব সহজভাবে—খুব যে একটা অনুযোগ, অভিযোগ, মান-অভিমান রাগ—কিছুই নেই। তার এই সহজ কথাবার্তায় আমার অপ্রস্তুত ভাবটা অনেকটা কেটে গেল।

ক'দিন থেকে মনের সঙ্গে কি সাংঘাতিক সংগ্রাম করে হিল্‌ডার আর আমার মাঝে একটা প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছিলাম—এখন তাকে আবার সামনে দেখে সব সংকল্প ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল। কথা দিলাম সন্ধ্যায় তার হোটেলে গিয়ে দেখা করব।

আবার শুরু হল আমাদের অবাধ মেলামেশা। আজ সিনেমা, কাল অপেরা, পরশু অন্য কোথাও বেড়ানো। একদিন গেলাম বিখ্যাত মঞ্চ প্রযোজক ম্যাক্স রাইনহার্ডের প্রযোজনায় 'মিড্‌সামার নাইটস্‌ ড্রিম' দেখতে। স্বপ্নকে যে মঞ্চে এভাবে রূপ দেওয়া যায় তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

হিল্‌ডা একদিন জিজ্ঞেসা করলে: তুমি তো কার্ল ফ্রয়েণ্ডের ইউনিটে, না ?

আমি বললাম: হ্যাঁ—

—তার সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় হয়েছে ?

—তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াবারই সাহস হয়নি এখনও—তো আলাপ! কি যে বল?

—আচ্ছা ঠিক আছে, তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তাকে একদিন ডিনারে নেমন্তন্ন করছি। —হিল্‌ডা বেশ সহজভাবেই বলল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: তোমার সঙ্গে তার আলাপ আছে ?

—হ্যাঁ, তা একটু আছে বৈকি! বলে হিল্‌ডা মৃদু হাসল।

তার দু'তিন দিন পরেই হিল্‌ডা একদিন আমাকে বলল: কাল কার্ল আসছে আমার এখানে ডিনার খেতে, তুমিও এসো।

যথারীতি ডিনারের সময় হিল্‌ডা কার্ল ফ্রয়েণ্ডের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। এতদিন এতবড় একজন প্রতিভাধর ব্যক্তিকে শুধু দূর থেকেই দেখেছি—এখন তার পাশে বসে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম।

কার্ল ফ্রয়েণ্ড বললেন: হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে পড়ছে বটে। ফ্লোরের একধারে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। —তা কিছু শিখতে-টিখতে পারছ ?

আমার হয়ে হিল্‌ডাই জবাব দিল: দেখে দেখে আর কত শেখা যায় ? তুমি মাঝে মাঝে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিলে তবু বেচারী কিছু শিখতে পারে।

কার্ল ফ্রয়েণ্ড আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: আচ্ছা, আমি আমার প্রধান সহকারীকে বলে দেব এইবার থেকে সে তোমাকে লাইটিং, লেন্স আর এক্সপোজার সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেবে।

আমি এর থেকে বড় সৌভাগ্য কল্পনাও করতে পারি না। আমি কার্ল ফ্রয়েণ্ডকে আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম।

খেতে খেতে তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন: তুমি আমার কোনো ছবি দেখেছ?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম যে আমার সে সৌভাগ্য এখনও হয়নি।

হিল্‌ডা বলল: তোমার 'লাস্ট লাফ্‌' 'Last Laugh' ছবিটা আমারও দেখা হয়নি। ওটা একদিন দেখা যায় না?

কার্ল ফ্রয়েণ্ড বললেন: আচ্ছা, আমি দু'-এক দিনের মধ্যেই বন্দোবস্ত করছি। তুমিও এসো, কেমন?

আমি বললাম: নিশ্চয়ই যাবো।

একদিন 'লাস্ট লাফ্‌' ছবিখানি দেখাবার বন্দোবস্ত করলেন কার্ল ফ্রয়েণ্ড। কয়েকজন টেকনিসিয়ান, কার্ল ফ্রয়েণ্ড, হিল্‌ডা ও আমি। ছবিতে প্রধান অভিনেতা ছিলেন এমিল্‌ জ্যানিংস। এতে তিনি হোটেলের এক প্রধান পোর্টার-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—সে অভিনয় আমি আজও ভুলতে পারিনি। এমিল্‌ জ্যানিংস ছিলেন সেই জাতের অভিনেতা যিনি প্রত্যেকটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে পারতেন।

অপূর্ব ছবি—অপূর্ব তার কলাকৌশল। কার্ল ফ্রয়েণ্ডের ক্যামেরার কাজ দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকতে হয়।

ছবি দেখার পর কার্ল ফ্রয়েণ্ড, হিল্‌ডা ও আমি হিল্‌ডার হোটেলে ফিরে গেলাম।

ছবি সম্বন্ধে বহু আলোচনা হলো।

কয়েকটা দিন খুব হৈ-চৈ-এর মধ্যে কেটে গেল।

আমি আর হিল্‌ডা যখন ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নে মশগুল, এমন কি দু'জনের বিয়ের তারিখটা পর্যন্ত পাকাপাকি ঠিক করা হয়ে গেছে, এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই বড়দির কাছ থেকে এল একখানি টেলিগ্রাম—এল রাণীর গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আগেই বলেছি—বড়দি ভিয়েনায় ছিলেন রাণীর চিকিৎসার জন্যে। একরকম আমারই ভরসায় বড়দি ওখানে ছিলেন।

আমি মিউনিকে থাকতে বড়দির কাছে প্রায়ই যেতাম। হঠাৎ এমন কি বাড়াবাড়ি হলো ঠিক করতে না পেরে সেই দিন রাত্রেই রওনা হলাম ভিয়েনার উদ্দেশ্যে।

রওনা হবার আগে হিল্ডার সঙ্গে দেখা করে টেলিগ্রামটি দেখালাম। দিদির কথা হিল্ডা সব জানতো এবং দিদি কেন ভিয়েনায় রয়েছেন তাও সে জানতো। টেলিগ্রামটি তাকে দেখাতেই হিল্ডা বলল: এটা ঠিক দিদির টেলিগ্রাম তো? তার কথায় যেন একটা সন্দেহের স্বর বাজছে। অবশ্য সন্দেহ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়—কারণ একবার না বলে-কয়ে চলে এসেছিলাম। এবারও সেরকম একটা চাল চালছি কি না কে জানে?

আমি তখন তাকে বুঝিয়ে বললাম, এ টেলিগ্রামের মধ্যে কোনো কারসাজি নেই।

হিল্ডা জিজ্ঞাসা করল: কবে ফিরবে?

আমি বললাম: যত তাড়াতাড়ি পারি আমি ফিরে আসব। তুমি কিচ্ছু মন খারাপ করো না, লক্ষ্মীটি!

অনেক কষ্টে হিল্ডাকে বুঝিয়ে গেলাম স্টুডিওতে। সেখান থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে সেই রাত্রেই ভিয়েনার ট্রেন ধরলাম। হিল্ডা স্টেশনে গেল। আমাকে বিদায় দেবার সময় স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তার চোখ দুটি ছলছল করছে। সে ধরা গলায় বলল: পৌঁছেই সব ব্যাপার জানিয়ে চিঠি দিও কিন্তু।

ট্রেন ছেড়ে দিল—যতক্ষণ দেখা যায়, দেখলাম হিল্ডা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রুমাল নাড়ছে।

ক্রমে হিল্ডার অপেক্ষমান মূর্তি মিলিয়ে গেল—কিন্তু আমার মনের মধ্যে তার চেহারা ভেসে উঠল আরও স্পষ্টভাবে। বিভিন্ন চিন্তার জালে আমি জড়িয়ে পড়লাম—এদিকে ট্রেন ছুটে চলল ভিয়েনার পথে অন্ধকারের বুক চিরে।

পরদিন সকালে ভিয়েনায় পৌঁছে বড়দির বাড়ীতে গিয়ে দেখি সাংঘাতিক ব্যাপার। বড়দি তখন প্যাসিও থেকে ভিকেনবুর্গ গ্যাসে (Wiekenburg Gasse)তে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ছিলেন। রাণী বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে বাড়ী মাথায় করছে—তার দুটি পা প্লাস্টার করা—নড়াচড়া একেবারে বন্ধ। তার এই অসহ্য যন্ত্রণা দেখে বড়দি ভীষণ নার্ভাস হয়ে খালি পায়চারী করছেন। যে ডাক্তার রাণীকে দেখছিলেন তিনি 'রিকেট' বা পোলিও রোগ সম্বন্ধে নামকরা বিশেষজ্ঞ। তিনি এই ব্যবস্থা করে গেছেন। এখন তাঁকে রাণীর

যন্ত্রণার বিষয় বলায় তিনি বলছেন: ওরকম যন্ত্রণা একটু হবে। এটুকু কষ্ট সহ্য না করলে এ রোগ সারবে না।

সত্যিই রাণীর কষ্ট চোখে দেখা যায় না। বড়দি বললেন: যেমন করে হোক ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এসে প্লাস্টার কাটিয়ে দিতে। দরকার নেই রোগ সারিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি ছুটলাম ডাক্তারের বাড়ী। ডাক্তারকে এই কথা বলতে তিনি তো রীতিমত বিরক্ত হয়েই আমাকে বললেন: তোমরা এসেছ ডাক্তারের কাছে রোগের চিকিৎসার জন্যে—ডাক্তারের নির্দেশ না মানলে চলবে কি করে? এ রোগের এই চিকিৎসা।

আমি অনেক অনুনয় বিনয় করে বুঝিয়ে বললাম: আপনি দয়া করে এসে প্লাস্টারটা কেটে দিন—ওর যন্ত্রণা আমরা আর চোখে দেখতে পারছি না। আমি কথা দিচ্ছি—আপনার এতে কোনো দায়িত্ব নেই।

অনেক কষ্টে তাঁকে রাজী করিয়ে বাড়ীতে নিয়ে এসে প্লাস্টার কাটিয়ে দেওয়ার পর রাণী অনেকটা সুস্থ বোধ করল।

বড়দি বললেন: এদেশে আর নয়। আমি আজই চলে যাব এখান থেকে—তুই আমায় লণ্ডনে পৌঁছে দিয়ে আয়। তুই এখনি যা টমাস কুকের অফিসে।

আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম: একটুতেই অতটা উত্তেজিত হলে কি চলে? তুমি স্থির হও—আর একবার ডাঃ পিরকে-কে দেখাও না! তিনি কি বলেন দেখ। তাছাড়া লণ্ডনে যেতে হলে আগে থেকে সব বন্দোবস্ত করতে হবে—কোথায় গিয়ে উঠবে তার ঠিক করতে হবে।

বড়দি সমান উত্তেজিতভাবেই বললেন: সে বিষয়ে তোকে ভাবতে হবে না—সে সব বন্দোবস্ত আমি আগেই করেছি। এখানে আর এক দণ্ড নয়। আমার এখানে একটুও থাকতে মন নেই।

আমি আপত্তি করবার চেষ্টা করতেই বড়দি বললেন,—ওসব মিথ্যে ওজর রাখ্। আসল ব্যাপার হলো তোর হিল্ডা। ঠিক আছে, তুই হিল্ডাকে নিয়েই থাক্—আমি একাই যাব। বলে রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে রাস্তায়।

যাহোক, বড়দির চাপে সেইদিন রাত্রেই সকলে ভিয়েনা ছাড়লাম এবং ব্রাসেলস্ (বেলজিয়াম) হয়ে অস্টেণ্ডে এসে পৌঁছালাম। সেখান থেকে জাহাজে উঠলাম। একে শীতকাল, তারপর নর্থ সী খুব অশান্ত—ফলে সকলেরই শরীর খারাপ হলো।

কোন রকমে ডোভারে এসে তো পৌঁছালাম।

রওনা হবার আগে হিল্ডাকে সমস্ত ঘটনা খুলে লিখে দিয়েছিলাম—আর এও

জানিয়েছিলাম যে ফিরতে হয়ত আমার দু'-এক দিন দেরী হবে। সে যেন কোনো চিন্তা না করে। দিদির এ বিপদে কর্তব্য হিসাবেই বল আর মানবতার দিক দিয়েই বল—এটুকু না করলে তো চলে না। যাই হোক, আমি নিশ্চয়ই খুব শিগ্‌গীর ফিরে যাচ্ছি।

ডোভার থেকে ট্রেনে করে এসে পৌঁছালাম লণ্ডনে। গিয়ে উঠলাম স্যার তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন পালিতের বাড়ীতে। লোকেন পালিত বাড়ীটি কিনেছিলেন তাঁর স্ত্রী মেবেল পালিতের নামে। তিনি মারা যাবার পরে তাঁর স্ত্রী এই বাড়ীটিকে একটি বোর্ডিং হাউসে পরিণত করেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে মিসেস পালিতের জানা-শোনা কোন পরিবার হঠাৎ গিয়ে পড়লে এইখানেই উঠতেন এবং বেশ অল্পখরচে কয়েকদিনের মত থাকা যেত। থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালই ছিল। এদেশ থেকে যাঁরাই গেছেন তাঁদের প্রায় অনেকেরই এই বাড়ীটির সঙ্গে পরিচয় ছিল।

এই বাড়ীর ছাদের ঘরে (এ্যাটিকে) আমি থাকৃতাম্। এখানে আমার সঙ্গী ছিল ডব্লিউ. সি. বনার্জির নাতি ভারত বনার্জি,—ব্যারিষ্টার আর. সি. বনার্জির বড় ছেলে।

লণ্ডনে এসে ডাক্তারের বন্দোবস্ত করতে ১০।১২ দিন কেটে গেল। স্যার আর্থার জোনস্ তখন এখানে নামকরা বিশেষজ্ঞ—তাঁর কাছেই রাণীকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। বড়দিও খানিকটা শান্ত হলেন।

এর মধ্যে একদিন গেলাম গেইনস্‌বরো স্টুডিওতে। স্টুডিওতে যেতেই দেখা হলো ভেণ্টিমেগলিয়ার সঙ্গে। তিনি বললেন তাঁর ইউনিটে যোগ দিতে। কিন্তু আমার তখন মন পড়ে আছে বার্লিনে। আমি বললাম—তাতো সম্ভব নয়! উফাতে আমি কাজ করছি যে—আমাকে সেখানে ফিরে যেতেই হবে।

দিদিকে এসে ভেণ্টির কথা বলায় দিদি বললেন : এই তো ভাল। মিথ্যে মিথ্যে জার্মানীতে গিয়ে কি হবে? মিঃ হিচ্‌ককের দলে তো ভালই কাজ শিখবি।

অর্থাৎ বড়দি আমায় কাছছাড়া করতে চান না। আরও একটা কারণ, সেখানে গেলেই তো আমি আবার হিল্‌ডার খপ্পরে পড়ব। আমারও হলো মুস্কিল—জার্মানী ফিরে যাব বললেই তো হয় না—আমার হাতে টাকা-পয়সা কিছুই নেই। বড়দির কাছে হাত পাততে হবে। এতে আরও মুষড়ে পড়লাম।

হিল্‌ডাকে সব খুলে চিঠি লিখলাম। কিন্তু দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল—হিল্‌ডার কাছ থেকে কোন জবাবই এল না। আবার চিঠি দিলাম, তবুও কোন

উত্তর নেই। ৪।৫ খানা চিঠি দেবার পরও কোন উত্তর না পেয়ে শেষে টেলিগ্রাম করলাম। তারও কোন উত্তর এল না। হিল্‌ডার এই অপ্রত্যাশিত নীরবতা আমাকে শেষ পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলল।

এদিকে বড়দি খালি বলছেন আমায় ভেণ্টির সঙ্গেই কাজ করতে। বড়দির কথা আর এড়াতে না পেরে শেষে মিঃ হিচ্‌ককের ইউনিটেই ফিরে গেলাম এবং ওখানে একটি ছবির বাকী অংশটুকুতে ভেণ্টির সহকারীরূপেই কাজ করলাম। ছবির কাজ শেষ হলে ভেণ্টি বললে কিছুদিন পরে গরমের সময় দক্ষিণ ফ্রান্সে তাদের নতুন ছবির কাজ আরম্ভ হবে—তখন যেন আবার যোগাযোগ করি। আমি তাকে টমাস কুকের ঠিকানায় আমায় চিঠি দিতে বললাম।

এই সময় লণ্ডনে ছিলেন মিঃ নিরঞ্জন পাল। মিঃ পালের স্ত্রী ইংরাজ মহিলা। মিসেস পালকে আমরা বৌদি বলতাম। ইংরেজ হয়েও এমন স্বামী-অন্তপ্রাণ মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। স্বামীর সুখে-সুখী, দুঃখে-দুঃখী—যাকে বলি আমরা সহধর্মিণী, মিসেস পাল ছিলেন ঠিক তাই। কয়েক বছর পরে মিঃ পাল যখন ভারতবর্ষে ফিরে আসেন. বৌদি ছেলে কলিনকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে চলে এলেন। কলিন তখন খুব শিশু। সেই থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে এইখানেই রয়ে গেছেন।

দিন তো কাটতে লাগল। কিন্তু এর পরেই হয়ে পড়লাম বেকার। হাতে কোনো কাজকর্ম নেই, টাকা-পয়সাও নেই। অনেকদিন হিল্‌ডারও কোনো খোঁজ-খবর পাই নি—ভীষণ মনমরা হয়ে গেলাম। হাসি-খুশী স্ফূর্তি সব যেন কোথায় উবে গেল।

এর কয়েকদিন পরেই গোলাপদা মিউনিক থেকে এলেন লণ্ডনে—তখন ১৯২৬ সালের এপ্রিল-মে মাস হবে। 'লাইট অফ এশিয়া' মুক্তি পাবে লণ্ডনে—তারই তোড়জোড় করতে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গোলাপদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম হিল্‌ডার কথা। গোলাপদা বললেন: ওর কোনো খবরই আমি জানি না—তবে শুনেছি সে মিউনিকে নেই।

ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমি আর এ বিষয় নিয়ে তাঁকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে পারলাম না।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে তিনি বললেন: এখন ওসব বিষয় না ভেবে ছবির রিলিজটার বিষয় ভাবে' দেখি। শোনো, আমি কি প্ল্যান করেছি।

গোলাপদা যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে যে, 'লাইট অফ এশিয়া' ফিলহারমোনিক হলে মুক্তি পাবে, শহরের গণ্যমান্য লোকেরা নিমন্ত্রিত হবেন। একে বুদ্ধদেবের

জীবনী, তায় তোলা হয়েছে ভারতবর্ষে—এবং তুলেছেন জার্মান কলাকুশলীর দল। সুতরাং এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে জিনিসটা সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়, অথচ সকলের বেশ ভালো লাগে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কি প্ল্যান ভেবেছেন শুনি?

গোলাপদা বললেন, উদ্বোধন অনুষ্ঠান হিসেবে স্টেজের ওপর একটি বিরাট বুদ্ধের মূর্তি থাকবে—ধূপ ধুনো জ্বলবে আর কয়েকজন সুন্দরী মেয়ে নাচের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধ বন্দনা করবে। এর মিউজিকের ব্যবস্থা এবং মেয়েদের সংগ্রহের বন্দোবস্ত তোমায় করতে হবে।

আমি বললাম: মেয়ে না হয় কোনো মতে যোগাড় করলাম। গেইনসবরো স্টুডিওর প্রোডাকশান ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ আছে, তাকে বললে মেয়ে যোগাড় করা কষ্টকর হবে না। কিন্তু তারা তো ভারতীয় নাচ জানে না—সে নাচ তাদের শেখাবে কে? আমি কি নাচ জানি?

মিঃ পাল হাসতে হাসতে বললেন: দেখ বাপু, নাচ জানার কোনো দরকার নেই। কয়েকটি ভাল মেয়ে যোগাড় করতে পারবে তো?

আমি বললাম: হ্যাঁ—তা পারব।

—ব্যস, তাহলেই হলো। এই মেয়েদের 'costume' পরিয়ে স্টেজের ওপর ছেড়ে দিয়ে বলবে: তোমরা একটু এই ভাবে হাতটাত নাড়বে—শেষকালে বুদ্ধের মূর্তির কাছে গিয়ে প্রণামের ভঙ্গীতে দাঁড়াবে। আর ভেতর থেকে আমরা সবাই মিলে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—সংঘং শরণং গচ্ছামি—ধর্মং শরণং গচ্ছামি' সুর করে গাইতে থাকব। কয়েকজন মিউজিসিয়ানকে নিয়ে এসে এই সুরটা তুলে দিলেই হয়ে গেল। এখানকার দর্শক কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।

মিঃ পাল যে রকম রসিয়ে রসিয়ে সহজভাবে কথাগুলো বলে গেলেন তাতে আমরা প্রথমটা হেসে উঠলেও শেষ পর্যন্ত সেই ভাবেই কাজ করলাম এবং এতে ছবির প্রিমিয়ার দারুণ সাফল্যমণ্ডিত হলো।

প্রত্যেক কাগজে 'লাইট অফ এশিয়া' এবং তার সঙ্গে হিমাংশু রায় ও সীতা দেবীর প্রচুর সুখ্যাতি বেরুতে লাগল।

কয়েকদিন পরে গোলাপদা চলে গেলেন।

এ ক'দিন তবু একটা কাজ-কর্ম এবং হৈ-চৈর মধ্যে ডুবে ছিলাম—কিন্তু গোলাপদা চলে যাবার পরই আবার নিঃসঙ্গতা যেন মনের মধ্যে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসল।

মাঝে মাঝে বড়দির সঙ্গে অবশ্য থিয়েটার দেখতে যেতাম। শেক্সপীয়রের নাটক ছাড়া আরও অনেক নাটক দেখেছি। ডেম সীবিল থর্নডাইক, ফ্লোরা রব্‌সন, হেনরী এইনলী, মারী টেম্পেস্ট, আইভর নোভেলো প্রভৃতি বিখ্যাত বৃটিশ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মঞ্চে অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এর মধ্যে ডেম সীবিল থর্নডাইকের অভিনীত বার্ণার্ড শ'র 'জোয়ান অফ আর্ক'-এ 'জোন' আমি কখনও ভুলতে পারব না। স্যাভয় থিয়েটারে জন গিলগুডের 'টেম্পেস্ট' আর একটি মনে রাখার মত স্মরণীয় অভিনয়। যতক্ষণ থিয়েটার বা সিনেমা দেখতাম ততক্ষণ বেশ ভুলে থাকতাম—তারপরই আবার সব বেসুরো হয়ে যেত।

একদিন গাওয়ার স্ট্রীটে ভারতীয় ছাত্রাবাসে বিখ্যাত মঞ্চাভিনেতা ও অভিনেত্রী স্যার জনষ্টন ফর্‌বস্‌ রবার্টসন ও ডেম এলেন টেরীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। দুজনেই তখন মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। স্যার ফর্‌বস্‌ রবার্টসনের বয়স তখন প্রায় পঁচাত্তর বছর আর এলেন টেরীর প্রায় আটাত্তর। স্যার ফর্‌বস্‌ রবার্টসন অনেকদিন আগেই অবসর নিয়েছেন আর ডেম এলেন টেরী নিয়েছেন আগের বছর।

প্রথমে মানপত্র পাঠের পর স্যার ফরবস্‌ রবার্টসন অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠলেন। তিনি বললেন : অভিনয় অবশ্য আমি অনেকদিন ধরে করছি—লোককে সামান্য আনন্দ দিতে পেরেছি বলে আমি গর্বিত। কিন্তু আমার চেয়ে আরও ভাল অভিনেতা আছেন। তবে আমার পাশে যে শিল্পীটিকে দেখছেন এঁর মত অভিনেত্রী আর তৈরী হয়েছে কি না সন্দেহ! আমি ছোটবেলা থেকে এঁর অভিনয় দেখছি,—আমি এঁর সত্যিকারের অনুরাগী ভক্ত। এঁর 'ওফেলিয়া' দেখলে জীবনে আর তা ভোলা যাবে না। ডেম এলেন টেরীর 'ওফেলিয়া' আর স্যার হেনরী আরভিং-এর 'হ্যামলেট' চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ছাত্ররা তখন ধরে বসল তাঁরা দুজনে শেক্সপীয়ার থেকে একটা অংশ অভিনয় করে দেখান।

স্যর ফর্‌বস্‌ রবার্টসন হেসে বললেন : সেটা তো সম্ভবপর নয়। তবে সামান্য একটা অংশ 'রোমিও জুলিয়েট' থেকে আমি আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি।

বলে তিনি 'রোমিও জুলিয়েট' থেকে একটা অংশ আবৃত্তি করে শোনালেন। এবং ডেম টেরীর সঙ্গে 'হ্যামলেট' থেকে ৪।৫ মিনিটের মত একটা অংশ আবৃত্তি করলেন। ডেম এলেন টেরী করলেন 'ওফেলিয়া' এবং স্যার ফর্‌বস্‌ রবার্টসন 'হ্যামলেট'।

এই গাওয়ার ষ্ট্রীটে আর একজন মঞ্চ-যাদুকরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম—তিনি হচ্ছেন মিঃ অস্কার অ্যাশ। বিখ্যাত 'চু চিন চাউ' নাটকের প্রযোজক। জনপ্রিয়তা ও বিরাটত্বের দিক দিয়ে 'চু চিন চাউ' সর্বকালের একটি স্মরণীয় নাটক। কিন্তু এরপর যখন তিনি আরও আড়ম্বরসহকারে "Cairo" প্রযোজনা করলেন তখন অত জাঁক-জমক খরচপত্র সত্ত্বেও নাটক একেবারে জমল না—ফলে মিঃ অ্যাশ সাংঘাতিক মার খেলেন। শেষে তাঁকে দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।

এর মধ্যে বড়দি মিসেস পালিতের বোর্ডিং হাউস ছেড়ে এসে উঠলেন ল্যাঙ্কাস্টার গেট হোটেলে। আমি আর বড়দির সঙ্গে না থেকে পিকাডিলি সার্কাসের কাছে অতি সাধারণ একটা সস্তা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করলাম।

এতে অনিয়মের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। প্রায়ই জ্বর হয়, সেই সঙ্গে পেটে ব্যথা অথচ ডাক্তার দেখাবার পয়সা কোথায়? বড়দির কাছে আর কত চাইব? মাঝে মাঝে শম্ভু দত্ত নামে আমার এক বিশেষ বন্ধু এবং তার ড্যানিস স্ত্রীজোর করে তাদের ঘরে নিয়ে যেত। সেদিন খাওয়া দাওয়া খুব জোরদার হতো। শম্ভু দত্ত ছিল 'লাইট অব এশিয়া' প্রোডাকসনে আমার সহকর্মী। ছবির পরে সে বিলেতে তার ড্যানিস স্ত্রীর কাছে ফিরে যায়, এবং কাজকর্ম জুটিয়ে নিয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকে। এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল।

তখন আমি পিকাডিলি সার্কাসের লায়ন্স রেস্তোরাঁর একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করি। খাওয়া-দাওয়া তো নামে মাত্র—বেশির ভাগ সময়ই 'ড্রিঙ্ক' নিয়েই পড়ে থাকি। একদিন একটি মেয়ে এসে আমার টেবিলে বসল। এরা সেই ধরণের মেয়ে, যাদের বলা হয় Street-walker বা পথচারিণী। এদের সব সময় রাস্তায় চলাফেরা করতে দেখা যায় এবং সেইরকম কাপ্তেন পেলে 'শিকার' ধরে। আমার টেবিলে এসে বসতেই আমি তাকে সবিনয়ে জানালাম যে, আমার পকেটে পয়সাকড়ি কিছু নেই, এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে বসেই খাবার অর্ডার দিল—বেশ ভাল ভাল খাবার। আমি যতই প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করি, ততই সে হেসে বলে: তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমার সঙ্গটা কি এতই তেতো যে আমাকে সহ্য করতে পারছ না?

আমি মরীয়া হয়ে বললাম: তোমার সঙ্গ আমার খারাপ লাগছে না, কিন্তু খারাপ লাগছে এই ভেবে যে, ওয়েটার যখন বিল নিয়ে এসে দাঁড়াবে, তখন যে আমার বিল মেটাবার সামর্থ্য থাকবে না। সত্যি বলছি, তুমি আমায় বিশ্বাস কর।

সে হেসে বলল: ওঃ, এই কথা, ওর জন্যে ভয় কি? আমি তো রয়েছি। একজন বন্ধুর জন্যে কি আমি এটুকুও করতে পারি না? আজ তোমার কাছে নেই—কাল যখন থাকবে, তখন তুমি আমাকে দিয়ে দিও। আর যদি তুমি নাই দিতে পারলে, তাতেই বা কী?

অতঃপর আর আপত্তি করবার কিছু রইল না। দুজনে পেট ভরে খুব খেলাম। শেষকালে সে ওয়েটারকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিয়ে আমাকে বলল: ড্রিঙ্কের মাত্রা তোমার বেশী হয়ে গেছে, চল তোমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি। আমাদের তোমরা যা-ই মনে করো না কেন, আসলে আমরাও তো মানুষ!

সে একটা ট্যাক্সি করে আমায় বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গেল। যাবার সময় তার বাড়ীর ঠিকানাটাও দিয়ে গেল।

যদিও তার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয়নি, তবুও বহুবার সেই নামহীন গোত্রহীন মেয়েটির কথা মনে হয়েছে, আর ভেবেছি, কেন এই অযাচিত করুণা, কেন এই প্রীতি? মনে হয়েছে, সেও কি আমারই মত বিপর্যস্ত আর বিভ্রান্ত? সেও কি আমারই মত এককণা প্রীতি আর ভালবাসার অভাবে কাঙ্গাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কে জানে! মানুষের সংসারে কত মানুষ আর কত তার বৈচিত্র্য! সারাজীবন ধরে আমি শুধু মানুষকে দেখেছি আর মানুষের বিধাতাকে প্রশ্ন করেছি—এ কেমন করে হয়? কিন্তু আজো এর উত্তর পাইনি।

বড়দির কাছে কয়েকদিন যেতে পারিনি, কোন খবরই নিতে পারিনি তাঁর। একদিন তিনি এসে হাজির। আমাকে ঐ অবস্থায় একটা অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে পড়ে থাকতে দেখে ব্যথিত হৃদয়ে বললেন: তুই এখানে এ-অবস্থায় থাকলে তো মরে যাবি। বন্ধু নেই, বান্ধব নেই—একা এইরকম অসুস্থ অবস্থায় তোর থাকা চলবে না। চল আমার হোটেলে। বলে তিনি জোর করে ল্যাঙ্কাস্টার হোটেলে আমায় নিয়ে গেলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তখন বোধহয় আগস্ট মাস।

হোটেলে গিয়ে বড়দি আমায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে বড়দিকে বললেন: শারীরিক অনিয়ম, অত্যাচার ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই এর এই অসুখ। Lungs-এর অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। এভাবে থাকলে টি. বি. হয়ে যেতে পারে। তবে এখুনি যদি সুইজারল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে এ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

আমি শুনে বললাম : আমি কোথাও যাব না—দেশে ফিরে যাব। মার কাছে গেলেই আমার সব অসুখ সেরে যাবে।

বড়দি বললেন : এই দুর্বল শরীর নিয়ে এতটা পথ একলা যাবি কি করে? তার চেয়ে বরং আমার কাছে থেকে কিছুদিন বিশ্রাম নে, চিকিৎসা করা। তারপর একটু সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে যাস।

সত্যি, আমার শরীরের অবস্থা তখন খুবই খারাপ—প্রায় আধ মণ ওজন কমে গেছে—সুটগুলো এত ঢিলে হয়ে গেছে যে, তার মধ্যে আমার মত দুটো মানুষ ঢুকতে পারে। বড়দি আমায় আসতে দেবেন না—আর আমিও থাকব না—এই রকম দোটানার মধ্যে পড়ে যখন আমি হাঁফিয়ে উঠেছি, ঠিক সেই সময় প্রসিদ্ধ ইম্প্রেসারিও বন্ধুবর স্বর্গীয় হরেন ঘোষের সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল।

কি একটা কাজের জন্য হরেন লণ্ডনে গিয়েছিল—সেখানকার কাজ সেরে সে কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে ফিরে আসবে। আমি তাকে ধরে বললাম : যেমন করে হোক, আমাকে সঙ্গে করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে।

হরেন প্রথমটায় রাজী হয়নি, কিন্তু অনেক কষ্টে তাকে রাজী করালাম। তার কাছে যা টাকাকড়ি ছিল তাতে কোনোরকমে দু'খানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটা হলো। তৃতীয় শ্রেণীতে আসা খুব কষ্টকর, কিন্তু আসতে তো আমাকে হবেই। মার্সেইলস্ থেকে জাহাজ ছাড়বে।

বড়দিকে কোনরকমে রাজী করিয়ে আমি লণ্ডন ছাড়লাম। ল্যাঙ্কাস্টার হোটেল থেকে আমি ও হরেন বড়দির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

রাস্তায় একবার টমাস কুকের অফিসে নামলাম। সেখানে গিয়ে দেখি আমার নামে দুখানা চিঠি এসে পড়ে আছে অনেকদিন থেকে।

একটি চিঠি হলো ভেন্টিমেগলিয়ার কাছ থেকে, সে লিখছে দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে। তাদের নতুন ছবির কাজ আরম্ভ হচ্ছে, আমি যেন এখুনি গিয়ে কাজে যোগদান করি। আর একটি হলো আমার মিউনিকের ল্যাণ্ডলেডীর কাছ থেকে। তাতে সে লিখছে যে হিল্ডার কোনো খবর নেই। সেই যে বার্লিন গিয়েছিল, তারপর আর সে মিউনিকে ফিরে আসেনি। অনেকরকম গুজব শোনা যাচ্ছে : কেউ বলছে যে, সে বার্লিন থেকে নাকি পোল্যাণ্ডে ফিরে গেছে তার বাপ-মায়ের কাছে। আবার কেউ বলছে যে, সে নাকি আত্মহত্যা করেছে।

এই দু'খানি চিঠি পেয়ে আমার মাথার ভেতরটা যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম।

হরেন আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে সান্ত্বনা দিয়ে বলল: এখন আর এসব বিষয় ভেবে লাভ কী? যা হবার তা হয়েছে। এখন চল ট্রেনের সময় হয়ে এল, বলে আমাকে একরকম জোর করেই ট্যাক্সিতে নিয়ে গিয়ে তুলল।

লণ্ডন থেকে আমরা প্যারিসে এলাম। হাতে তখন দু-চার দিন সময় আছে। হরেন আগে থেকেই ঠিক করেছিল যে, প্যারিসে সে দু'-এক দিন থাকবে, সেখান থেকে মণ্টি কার্লো হয়ে মার্সেইলস্ যাবে।

প্যারিসে পৌঁছে হরেন আমার মনটা খানিকটা চাঙ্গা করে তুলবার আশায় প্যারিসের যা কিছু দ্রষ্টব্য স্থান সব দেখাতে নিয়ে বেরুল। দেখলাম আইফেল টাওয়ার, নোত্রেদাম, প্যারিস অপেরা, প্যারিসের মুলাঁ রুজে। এসব দেখার পর এলাম মণ্টি কার্লোতে—দেখলাম, বিখ্যাত জুয়াখেলার আড্ডা, যেখানে 'রুলে' খেলা হয়। খেলবার মত পয়সা অবশ্য কাছে ছিল না, শুধু জায়গাটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যেই যাওয়া।

দেখতে দেখতে এই অত্যল্প সময় ফুরিয়ে গেল। আর মায়া না বাড়িয়ে মণ্টি কার্লো থেকে মার্সেইলসে এসে আমরা জাহাজে চেপে বসলাম। তারপর এক সময় রাতের অন্ধকারে মার্সেইলস্ বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে দিল। এতদিনের হাসিকান্না-মিশ্রিত ইউরোপ থেকে ভারতের দিকে জাহাজ রওনা হলো। এইখানেই আমার জীবনের একটি অধ্যায়ের যবনিকাপাত। মনের অজান্তে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। জাহাজ ক্রমে বন্দরের সীমারেখা ছাড়িয়ে তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের বুকে দোল খেতে খেতে এগিয়ে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে আমিও স্মৃতির সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এই একটা বছর ইউরোপে কি করেছি তার হিসেব নিকেশ করতে লাগলাম। আমি যে সুযোগ পেয়েছিলাম তা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। উফা স্টুডিওতে বিশ্ব-বিখ্যাত কার্ল ফ্রয়েণ্ডের সান্নিধ্যে থেকে হাতে কলমে কাজ শেখার সুযোগ আমার ভাগ্যে হয়েছিল। তারপর মিঃ হিচ্‌ককের ইউনিটে ভেণ্টিমেগ্‌লিয়ার মত ক্যামেরাম্যান-এর কাছে কাজ শেখার সৌভাগ্য যে কোন ব্যক্তির স্বপ্নাতীত—তাও আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। এ দুটোর যে কোন একটিতে লেগে থাকলে আজ আমার জীবনের ধারাটাই হয়ত বদলে যেত।

কিন্তু কেন এইসব সুযোগ হারালাম? এ ধরণের সুযোগ তো জীবনে বারবার আসে না। সৌভাগ্যের হাতছানি দূর থেকে দেখা দিয়েও আবার মিলিয়ে গেল

কেন? নারীর প্রতি মোহই কি এর একমাত্র কারণ? কিন্তু তাই বা বলি কি করে? এই সুযোগ যে এসেছিল, এর মূলেও তো ছিল নারীরই আগ্রহ; হিল্ডার সাহায্য না পেলে এ-সুযোগ আমার জীবনে আসত কি করে? আজ জীবন-সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে তাই মনে হচ্ছে, বিধাতার অদৃশ্য হস্তই আমার জীবনের সকল সাফল্য এবং অসাফল্য, উত্থান ও পতনের মূলে কাজ করে গেছে। বার্লিনে কাজ করবার সময়ে রানীর অসুখের সংবাদ দিয়ে বড়দির কাছ থেকে যদি সেই সর্বনাশা টেলিগ্রামটি আমার কাছে না যেত, তাহলে আমার জীবন আজ কোন্ খাতে বইত কে জানে। সেই যে সেদিন স্বাস্থ্যহীন, সম্বলহীন হয়ে ভবিষ্যতের সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিরাশার বোঝা বয়ে আবার আমায় ভারতবর্ষে ফিরে আসতে হয়েছিল, তার জন্য দায়ী করব কাকে?

একে অসুস্থ শরীর, তার উপর তৃতীয় শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার হয়ে আসছি, সুতরাং অবস্থা অত্যন্ত সাংঘাতিক। আসলে অসুখটা হল পেটে, সব সময় অসহ্য যন্ত্রণা, কিছু খেতে পারি না, তার ওপর বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুল ও কড়ে আঙুলের কাছে দুটো ফোড়া হয়েছিল, ফলে চলাফেরা করতে কষ্ট হতো। এর ওপর আবার রোজ সন্ধ্যার সময় জ্বর।

জাহাজে উঠে ফোড়াদুটো ফেটে গেল। জাহাজের ডাক্তারকে দেখালাম—তিনি এসে দেখলেন, ফোড়াদুটো ভাল করে ড্রেস করে দিলেন। কিন্তু আমার শারীরিক অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন: আপনি জাহাজে ওঠবার সময় ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করলেন কি করে? আপনাকে তো জাহাজে নেওয়াই ঠিক হয়নি। আপনি পুরো রাস্তাটা যাবেন কি করে?

আসলে আমার ছিল বৃটিশ পাশপোর্ট, আর সে-পাশপোর্টে এত জায়গার 'Visa' ছিল যে, জাহাজে উঠবার সময় কর্তৃপক্ষ আমাকে ট্যুরিস্ট মনে করে আর বেশী কড়াকড়ি করেনি।

জাহাজ এসে পোর্ট-সেড-এ থামল কয়েকঘণ্টার জন্যে। আমি আর হরেন জাহাজে বসে না থেকে শহরটা একবার ঘুরে একটু বেড়িয়ে এলাম।

কিন্তু মুস্কিল হলো যখন এডেনে এসে জাহাজ থামল। দেখি, আমাদের জাহাজের ডাক্তার জাহাজের ক্যাপ্টেনকে আমার কাছে নিয়ে এসে ফরাসী ভাষায় কি সব বলাবলি করছে। ক্যাপ্টেন আমার কাছে এসে ভাঙা-ভাঙা ইংরাজীতে বললে: আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিঃ বোস, ডাক্তারের কাছে তোমার বিষয় যা শুনলাম, তাতে

তো আমি আর তোমাকে জাহাজে রাখতে পারি না। তোমাকে এডেনে নেমে যেতে হবে।

আমার তো মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আমি তীব্র প্রতিবাদ করে বললাম : তা কি করে সম্ভব? আমাদের হাতে টাকা পয়সা নেই—এই অসহায় অবস্থায় এডেনে নামিয়ে দিলে আমরা ইণ্ডিয়াতে ফিরব কেমন করে! এতটা পথ যখন আমি আসতে পেরেছি. তখন এটুকু-ও কোন রকমে চলে যাব।

ক্যাপ্টেন বললে : তা হয় না মিঃ বোস। এরপর আরব সমুদ্র খুব rough—এখন মনসুনের সময়—তার ওপর জাহাজ কলম্বো যাচ্ছে। তুমি তৃতীয় শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার—ডাক্তারের মতে তুমি কিছুতেই এই ধকল সহ্য করতে পারবে না। সুতরাং আমি তোমার দায়িত্ব নিতে পারব না। তুমি যদি এমনিতে না নামো, তাহলে তোমাকে জোর করে নামিয়ে দিতে বাধ্য হব আমি। আশা করি এমন অপ্রিয় কাজ আমায় করতে হবে না। তার চেয়ে এডেনে কয়েকদিন থেকে, সুস্থ হয়ে, পি-এণ্ড-ও জাহাজে বম্বেতে যেও।

এর পর আর কোন কথা চলে না। নামলাম এডেনে। হরেনও আমার সঙ্গে নামল। পোর্টের কাছাকাছি একটি হোটেলে গিয়ে উঠলাম। আর কোনো উপায় না দেখে মাকে টেলিগ্রাম করলাম আমাদের দু'জনের যাওয়ার ভাড়াটা টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার করে পাঠাতে। ইতিমধ্যে টমাস কুকের সাহায্যে পি এ্যাণ্ড ও অফিসে গিয়ে আমরা দু'খানি সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিট বুক করলাম।

হরেন শহর দেখে বেড়াতে লাগল। আমার কিন্তু বাইরে বেরুনো আর হয়ে ওঠে না। পায়ের ঘা থেকে পুঁজ পড়া আর বন্ধ হয় না। তার ওপর এডেনে যা ধুলো—শুধু রাস্তা নয়, ঘর পর্যন্ত ধুলোয় ভর্তি হয়ে যায়, কারণ এখানে 'লু' চলে। রাস্তায় বেরুলেই ধুলোয় পা ভর্তি হয়ে যায় আর সেই ধুলো পরিষ্কার করতে প্রাণান্ত। যাই হোক ঘরের মধ্যেই থাকি, আর মার কাছ থেকে টাকা আসার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করি।

একদিন দেখি আমার পাশের ঘরে কতকগুলো ব্রিটিশ নাবিক এসে খুব হট্টগোল বাধিয়েছে। তারা আমায় একলা চুপচাপ ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল : কি ব্যাপার? তুমি এরকম একলা চুপচাপ ঘরের মধ্যে শুয়ে কেন?

আমি বললাম আমার অসুখের কথা।

সব শুনে তাদের মধ্যে একজন বললে : পেটে ব্যথা? ও কিছু নয়—আমি ওষুধ দিচ্ছি—একদিনেই ঠিক হয়ে যাবে। বলে সে আমায় সাদা পাউডারের মত

খানিকটা গুঁড়ো কি একটা খাইয়ে দিলে। খেতে যেন একেবারে নুন-গোলা। পরে জেনেছিলাম যে সেটা আর কিছু নয়—Epsom salt.

সে নাবিকটি বললে : আর ভাববার কিছু নেই, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর আমায় বেশ খানিকটা 'Rum' খাইয়ে দিল। অনেকদিন পরে আবার হৈ-চৈর মধ্যে পড়ে মনটা বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

হরেন বেরিয়েছিল—ফিরে এসে আমাকে বেশ হাসিখুশী দেখে বলল : কি ব্যাপার ? আজ এত স্ফূর্তি কিসের ?

আমি সব ব্যাপারটা বললাম।

হরেন বলল—এই সেরেছে। 'সেলার'-দের কাণ্ড তো—দেখ আবার কিছু হিতে বিপরীত না হয়।

শেষরাত্রি থেকে পেটে দারুণ মোচড় দিতে শুরু করল। দুপুর নাগাৎ দেখি শরীর অনেকটা সুস্থ এবং পেটের ব্যথাও অনেকটা কমে গেছে।

আনন্দের আতিশয্যে আমি সেই নাবিকটিকে একথা বলতেই সে বলল : এ তো আমি জানি। আমরা এত দেশ ঘুরে বেড়াই—এ সব অসুখের ওষুধ আমার বেশ ভাল রকম জানা আছে।

ভগবানের কি অশেষ করুণা। নইলে একদল বিদেশী নাবিক, যারা ঘর-বাড়ী সব ছেড়ে সাগরদোলায় দোল খেতে খেতে দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা আমার জন্যে ভাবতে গেল কেন ?

এর মধ্যে একদিন মার টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার এসে গেল। আমরাও বম্বের টিকিট কেটে ফেললাম

এই টাকা পাঠাতে মাকে যে কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল—সেটা আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি।

যাই হোক, এতদিনে দুঃখের রাত্রির অবসান হোল।

পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানীর পরবর্তী বোম্বাইগামী জাহাজে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সমুদ্র খুবই অশান্ত এবং অকরুণ। তবে এবারে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলাম বলে অতটা কষ্ট হয়নি। দিন পাঁচেক কোন মতে জাহাজে কাটিয়ে একদিন বোম্বাই এসে পৌছালাম। এবং আশ্চর্যের বিষয়, বোম্বাই এসে পৌছুতেই দেখলাম জ্বর একদম ছেড়ে গেছে. পেটের ব্যথাও আর নেই—তবে পায়ের ফোড়া থেকে তখনও পুঁজ পড়ছে।

দেশের মাটিতে পা দিয়ে আর তখন কোন কষ্টই কষ্ট বলে মনে হলো না। কাল-বিলম্ব না করে সেইদিনই বম্বে মেলে চেপে বসলাম। তার আগে অবশ্য মাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলাম।

চক্রধরপুরে গাড়ী বদল করে আমি রাঁচীর গাড়ী ধরলাম—আর হরেন সোজা চলে এল কলকাতায়।

রাঁচীতে বাড়ী পৌছেই দেখি মা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, সঙ্গে আছেন মেজবৌদি এবং বৌদির বাবা ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র।

শুধু যে বিয়ের সূত্রেই ডাঃ মিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তা নয়, তিনি ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষের জামাতা। মনমোহন ঘোষের পরিবারের সঙ্গে আমাদের বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

আমাকে দেখে মা জড়িয়ে ধরলেন—তাঁর দুই চোখে নেমে এল জলের ধারা—। এ-আনন্দের অশ্রু, যেন বহুদিন পরে হারানো মানিক ফিরে পেয়েছেন। শুধু বললেন: হ্যাঁরে, কি চেহারা নিয়ে গিয়েছিলি, আর কি চেহারা নিয়ে ফিরে এলি? যাক বাবা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছিস—এই ঢের।

বাবাকে প্রণাম করতেই তিনি আমার শরীরের এই অবস্থা দেখে শুধু চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন। এমনিতেই তিনি কথাবার্তা কম বলতেন—তারপর আমাকে যে এই অবস্থায় দেখবেন, সেটা তিনি কল্পনাও করেননি।

ডাঃ মিত্র বললেন: শরীরের ওপর দিয়ে এই ক'টা দিন খুব অত্যাচার গেছে—এখন আর কোন কথা নয়, স্নান-খাওয়া করে বিশ্রাম কর। তারপর বিকেলে সব কথা হবে।

আমারও ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছিল। আমিও তাই বেশ করে স্নান করে এসে খেতে বসলাম। মা আমায় সামনে বসে খাওয়াতে লাগলেন। যেসব জিনিস খেতে আমি ভালবাসি, দেখি সেগুলি নিজের হাতে তৈরী করেছেন। এতদিন সারা ইউরোপের এত ভাল ভাল হোটেলে কত কি খেয়েছি, কিন্তু মার হাতের রান্নার কাছে সেগুলো কিছুই নয়।

তারপর যখন দোতলায় দক্ষিণ দিকের আমার প্রিয় ঘরটিতে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম, তখন এতদিন মনের মধ্যে যে একটা নিরাশার ভাব গুমরে ফিরছিল তা যেন কোন্ যাদুস্পর্শে মিলিয়ে গেল, হিল্ডার কথাও সাময়িকভাবে মন থেকে মুছে গেল।

একটা ভারমুক্ত মন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেকক্ষণ একটানা ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ মার ডাকে ঘুম ভাঙল। চেয়ে দেখি ঘরের মধ্যে ডাঃ মিত্র ও তাঁর সহকারী নানা যন্ত্রপাতি ও ওষুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি তাঁদের দেখে উঠে বসতে যেতেই ডাঃ মিত্র বললেন: উঠবার দরকার নেই, শুয়ে থাক—আমি তোমার পা-টা একটু দেখব।

তিনি পা-টা পরীক্ষা করে বললেন: কিছু ভয় নেই, তোমার পায়ের ফোড়া ছুদিনেই সেরে যাবে। আমি ছোট্ট একটু অপারেশন করব।

আমি সভয়ে বললাম: অপারেশন? কিন্তু লাগবে যে!

—কিচ্ছু লাগবে না, তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। বলে তাঁর সহকারীকে ইসারা করলেন আমায় ক্লোরোফর্ম দিতে।

যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখি তিনি আমার পা ব্যাণ্ডেজ করছেন। ব্যাণ্ডেজ করতে করতে মাকে বললেন: দেখুন মিসেস বোস, your son has got a cat's life। নইলে এর পা এত অনিয়ম সত্ত্বেও যে সেপ্টিক হয়ে যায়নি—এইটেই miracle।

ডাঃ মিত্রের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক আত্মীয়তা থাকা ছাড়াও মানুষ-হিসাবে তিনি আদর্শ চিকিৎসক ছিলেন। কারণ, চিকিৎসকের যা সবচেয়ে বড় গুণ, সহানুভূতি ও সমবেদনা—সেটা তাঁর ভেতর পুরোমাত্রায় ছিল। রাঁচীতে তিনি এসেছিলেন বেড়াতে, ডাক্তারী করতে নয়। এখানে উনি প্রতি বছরই পূজোর সময়ে আসতেন, কারণ কাঁকের কাছে গোঁদায় উনি নিজে বাড়ী করেছিলেন। বেড়াতে এসেছেন, সেইজন্য তিনি তাঁর কোনো যন্ত্রপাতিই নিয়ে আসেননি। কিন্তু আমার ঐ অবস্থা দেখে নিজে থেকে রাঁচীর জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে অপারেশনের যন্ত্রপাতি এবং একজন জুনিয়র ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে অপারেশন করে দিলেন, এবং আমি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত রোজ সকালে গাড়ী করে এসে আমায় 'ড্রেস' করে দিয়ে যেতেন।

মার ও বৌদির সেবাযত্নে এবং ডাঃ মিত্রের চিকিৎসার গুণে মাসখানেকের মধ্যেই আমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠলাম। আর একজনের কথা এখানে মনে পড়ছে। তিনি হচ্ছেন মার সবচেয়ে ছোট বোন—তাঁকে আমরা সুশীলামাসী বলতাম। তিনি বিয়ে করেননি এবং বরাবর মার সঙ্গেই থাকতেন। আমাকে সারিয়ে তুলতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় যতদিন শয্যাশায়ী ছিলাম, অর্থাৎ পায়ের ঘা-টা যতদিন শুকোয়নি, ততদিন খুবই একটা মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। খালি মনে হতো, সত্যিই যদি পায়ের আঙুলদুটো কেটে বাদ দিতে হয়!

অবশ্য ডাঃ মিত্রের কথাই ঠিক হলো—মাসখানেকের মধ্যেই ঘা শুকিয়ে গেল এবং আমার শরীরও ক্রমশঃ ভাল হতে লাগল। আমার মন থেকে যেন একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল। কিন্তু শরীর সুস্থ হতেই ভাবনা হলো: এখন করব কি? কোন কাজ নেই, কর্ম নেই—চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে না। জার্মানী ও লণ্ডনের ঘটনাগুলো মনের মধ্যে এসে আবার ভিড় করতে লাগল। এক-এক সময় মনটা গভীর নৈরাশ্যে ভরে যেত। আমার এ মনমরা ভাব মায়ের চোখ এড়াল না। তিনি আমার মনটাকে অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যে একদিন বললেন: পূজোর তো বেশী দেরী নেই, এই সময় একটা নাটক অভিনয়ের চেষ্টা কর না—তোর তো গান-বাজনা অভিনয়ের দিকে খুব ঝোঁক আছে।

আমি বললাম: কি অভিনয় হবে?

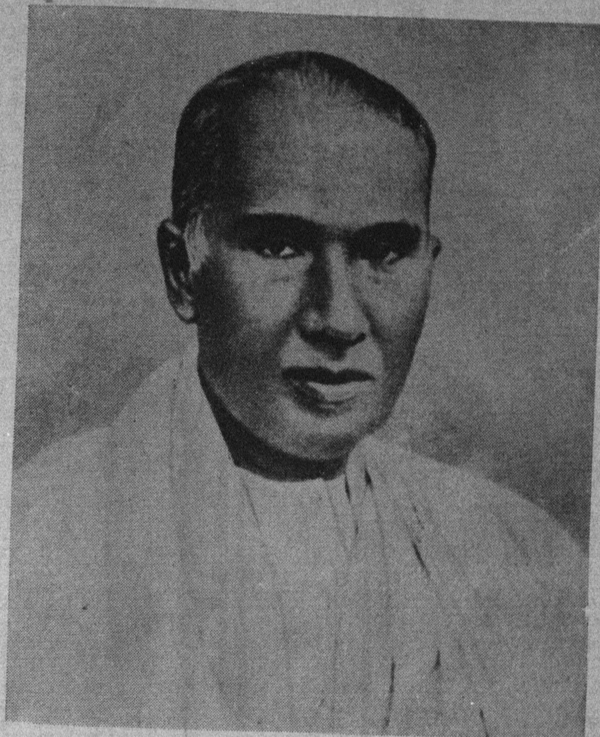
মা বললেন: কেন 'প্রহ্লাদটা' কর না। আমার একটা নাটক লেখা আছে। সেইটাকেই একটু মেজে ঘসে দেখ না চেষ্টা করে।

কথাটা আমার মনে লাগল। আমি মার লেখা নাটকখানি পড়লাম। দেখলাম গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা। জায়গায় জায়গায় সংলাপগুলি আরও সহজ ও সরল করে দেড় ঘণ্টার অভিনয়োপযোগী করা হয়েছে।

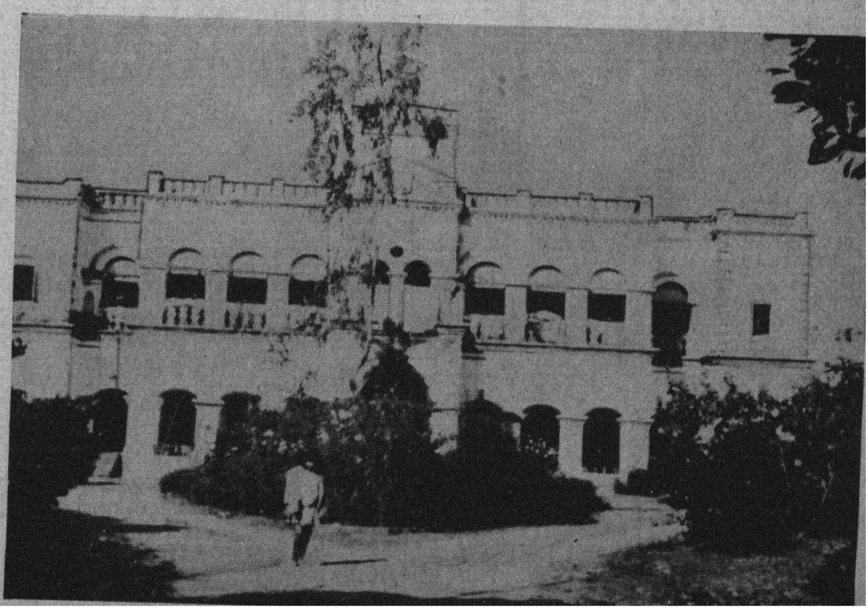
দেখতে দেখতে পূজো এসে পড়ল—রাঁচীতে আবার লোকের ভিড় শুরু হলো। মেজদি এল তাঁর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে। এল সেজদা এবং মীরাবৌদি। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, আমি বিলেতে থাকতেই সেজদার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। এঁরা ছাড়া আরও অনেকে এসেছিল—অর্থাৎ আমাদের বাড়ীতে 'ন স্থানম্ তিলধারণম্'।

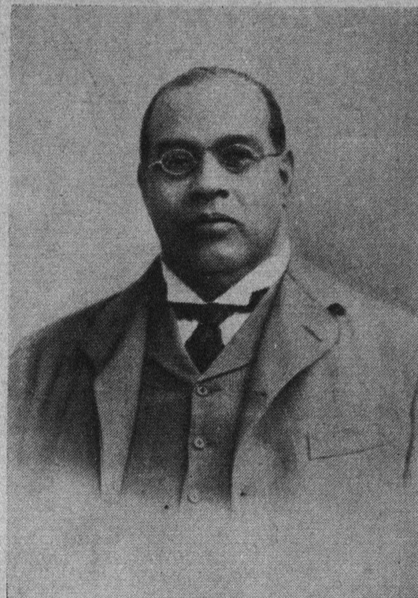
বাড়ীতে এত লোকজনের ভিড় সত্ত্বেও বাবা কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম এতটুকু এদিক-ওদিক করেননি—ঠিক একই ধারায় চলতে লাগল। তাঁর খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনো, বই-লেখা, বাগান-পরিচর্যা, বিশ্রাম প্রভৃতি। যদিও বাবা খুব রাশভারী লোক ছিলেন, তবু তিনি খুব ভালবাসতেন সব সময় তাঁর বাড়ী পরিপূর্ণ হয়ে থাকুক ছেলেমেয়ে, জামাই, নাতি-নাতনীতে এবং তাঁদের কোলাহল-কলরবে বাড়ী মুখরিত থাকুক।

আবার আরম্ভ হয়ে গেল টি-পার্টি ও পিকনিকের হিড়িক। এই সময় ককটেল-পার্টিরও একটু-আধটু চলন হয়েছে। অবশ্য সেটা দুই একটি অবাঙ্গালী পরিবারের

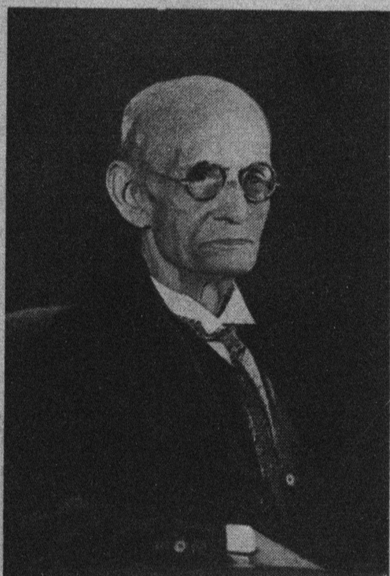


প্রমথ নাথ বসু





রমেশ চন্দ্র দত্ত



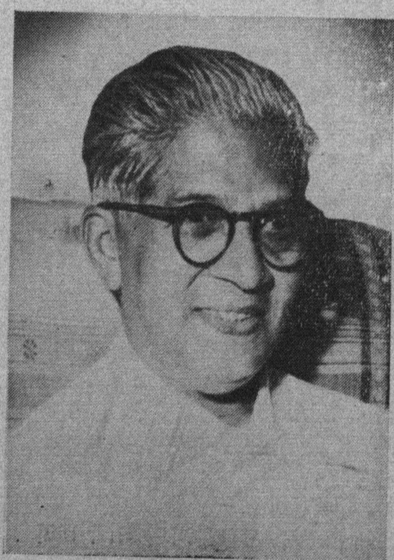
ক্ষিরোদ বিহারী দত্ত



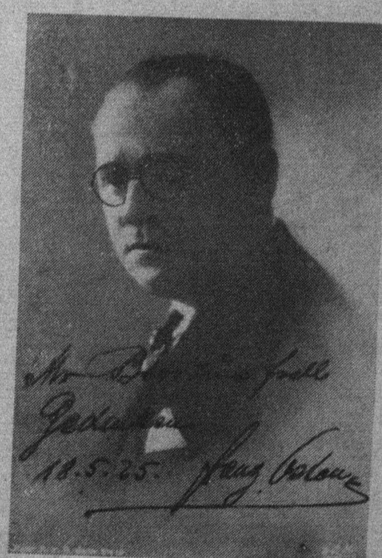
জ্যোতিষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়



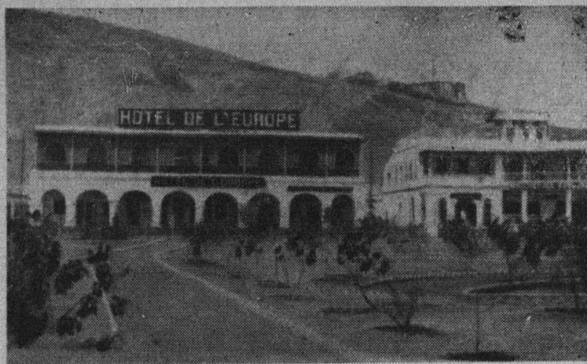
হিমাংশূ রায়



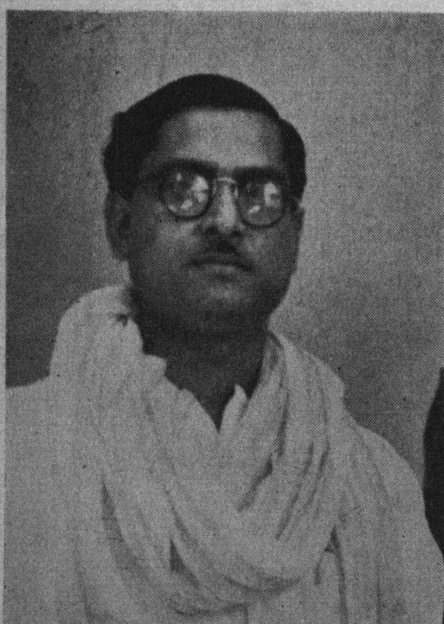
নিরঞ্জন পাল



ফ্রাঞ্জ অস্টেন



এডেনের হোটেল



হরেন ঘোষ



ডাঃ মৃগেন্দ্র লাল মিত্র



মধু বসু
(বিলাত যাবার সময়ে গৃহীত ফটো—১৯২৫ সাল)

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমার মনে আছে, মেজর ধানজীভাই একটা ককটেল পার্টি দিয়েছিলেন। মেজর ধানজীভাই ছিলেন রাঁচী মেণ্টাল হাসপাতালের ভারতীয় বিভাগের সর্বময় কর্তা। ইউরোপীয় বিভাগের কর্তা ছিলেন তখন কর্ণেল বার্কলে হিল।

বাবা ও মা অবশ্য কোনদিন কোন ককটেল পার্টিতে যোগদান করেননি—এই পার্টিগুলো ছিল বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়ের জন্যে।

একদিন আমরা সকলে বসে ডিনার খাচ্ছি, বাবা হঠাৎ জিজ্ঞেসা করলেন: এতদিন তো খালি টি-পার্টির কথাই শুনে এসেছি, এখন আবার শুনছি ককটেল পার্টি—এটা আবার কি জিনিস?

কে যেন উত্তর করল: কলকাতায় আজকাল টি-পার্টির আর রেওয়াজ নেই, পুরোনো হয়ে গেছে, এখন এসেছে ককটেল পার্টি। এখন এটাই খুব চালু, বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন: কিন্তু ককটেল মানেটা কি?

সে আম্‌তা আম্‌তা করে উত্তর দিল: ককটেল হল—মানে ওটা একরকম drink আর কি!

—ড্রিঙ্ক মানে? কোন মাদকদ্রব্য নিশ্চয়ই—যেমন হুইস্কি, ব্রাণ্ডি?

তাতে কে যেন উত্তর করল: ককটেল মানে ঠিক হুইস্কি, ব্রাণ্ডি নয়, তবে কয়েকটা ড্রিঙ্কের সংমিশ্রণ আর কি! আসলে এটা মেয়েদের পানীয়।

মেয়েদের পানীয় শুনে বাবা চমকে উঠে বললেন: তা আজকাল মেয়েরাও সকলের সামনে বসে মদ খায় নাকি?

এর উত্তর কেউ দিল না, আমরা সবাই চুপচাপ খেয়ে যেতে লাগলাম। আমাদের সব চুপচাপ দেখে তিনি বললেন: রাঁচীতে তো তোমাদের এই ককটেল না কি বললে—এ-সবের বালাই আগে ছিল না। আমি তো বরাবর দেখে আসছি কত জায়গায় টি-পার্টি হয়—ভাল খাওয়া-দাওয়া হয়, গান-বাজনা হয়, আবৃত্তি হয়, বেশ খানিকটা আনন্দের মধ্যে দিয়ে সময় কেটে যায়। কিন্তু এ-আপদ আবার এসে জুটল কবে থেকে? এই যদি তোমাদের আধুনিক সমাজের নমুনা হয়, তাহলে তো দেখছি এর ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকার। মেয়ে-পুরুষে সবাই মিলে যদি পার্টিতে এইরকম মদ্যপান করে, তাহলে এ-সমাজ টিঁকবে কতদিন?

দেখলাম যে ককটেল পার্টির ব্যাপারটা বাবার মনে খুব একটা আঘাত দিয়েছে।

'প্রহ্লাদ' অভিনয়ের তোড়জোড় শুরু করে দিলাম। মেজদির ছোট মেয়ে সুন্তু অর্থাৎ সুনীতার গানের গলাটি ছিল ভারী মিষ্টি। তখন তার বয়স বছর বার হবে। তাকেই ঠিক করলাম প্রহ্লাদের ভূমিকায়। প্রথম রিহার্সালেই তার পার্ট বলার ধরণ এবং অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো যে, তার মধ্যে একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে। তাকে কোন জিনিস একবার দেখিয়ে দিলেই সে সেটা বুঝতে পারে এবং অভিনয়ের মাধ্যমে চমৎকার ফুটিয়ে তোলে।

রিহার্সাল চলতে লাগল, আমি নিলাম 'শ্রীকৃষ্ণের' ভূমিকা। সুন্তুর বড় বোন সুজাতাকে একটি বিশেষ ভূমিকা দিলাম এবং অন্যান্য ভূমিকাগুলি আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দেওয়া হলো।

প্রহ্লাদের ভূমিকাটি প্রায় প্রতি দৃশ্যেই, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, সেইজন্য আমার সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়ল সুন্তুর ওপর। 'প্রহ্লাদ' নাটকের মধ্যে গান ছিল অনেকগুলি এবং প্রত্যেকটি গানই সে এমন সুন্দরভাবে গেয়েছিল যে, তার 'তাল-লয়' জ্ঞান দেখে, যিনি খোল বাজাচ্ছিলেন তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। তিনি তো বিশ্বাসই করতে চান না যে, সুন্তু কোন ওস্তাদের কাছে গান শেখেনি, কারণ একটি ১২ বছরের মেয়ের পক্ষে এমন অপূর্ব গান গাওয়া সম্ভব নয়।

ক্রমে অভিনয়ের দিন এগিয়ে এল। আমাদের বাড়ীর ওপরের বারান্দায় একধারে তক্তাপোষ লাগিয়ে স্টেজ তৈরী হলো, সামনে পর্দা দিয়ে স্ক্রীন হলো, আর দেবদারুর পাতা দিয়ে স্টেজ সাজান হলো। লম্বা বারান্দা—তক্তাপোষের সামনে প্রায় ১০ ফুট ছেড়ে চেয়ার সাজানো হলো বারান্দার শেষ পর্যন্ত—প্রায় ৫০।৬০ জন বসতে পারে, এত জায়গা হলো।

ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময় অভিনয় আরম্ভ হলো। অভিনয় দেখে সকলেই খুব প্রশংসা করলেন; বিশেষ সুন্তুর প্রশংসায় তো প্রত্যেকে পঞ্চমুখ।

এইভাবে পূজা কেটে গেল। এই ক'দিন অভিনয় এবং তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে ডুবে থেকে অনেকটা মনের জোর ফিরে পেলাম। যাঁরা রাঁচীতে এসেছিলেন, তাঁরা একে একে চলে যেতে শুরু করলেন। আমাদের বাড়ীও ক্রমশঃ খালি হয়ে গেল। আমি মাকে বললাম: এখন তো আমার শরীর বেশ সুস্থ হয়েছে, আর কোন গণ্ডগোল নেই—সুতরাং আর রাঁচীতে চুপচাপ বসে না থেকে কলকাতায় গিয়ে ফিল্ম লাইনে একটা কাজকর্মের চেষ্টা করি।

মা সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন। আসলে আমি যে আমার মানসিক নৈরাশ্যের ভাবটা কাটিয়ে উঠেছি, আবার আমার মনোবল ও আস্থা ফিরে পেয়েছি

এবং ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের আশায় বুক বাঁধতে চলেছি, এটাই বুঝতে পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন।

আমি মেজদি ও তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কলকাতায় চলে এলাম। এসে উঠলাম একেবারে মেজদির ২৩ নং রে স্ট্রীটের বাড়ীতে।

শ্রীমতী সরলা রায়ের (মিসেস পি. কে. রায়) কথা আগেই বলেছি। তিনি কলকাতায় কার কাছে শুনেছেন যে রাঁচীতে আমরা 'প্রহ্লাদ' অভিনয় করেছিলাম এবং সকলেই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। তিনি একদিন আমাকে ও মেজদিকে ডেকে পাঠালেন।

আমরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি প্রস্তাব করলেন কলকাতার স্টেজে একবার 'প্রহ্লাদ' অভিনয় করতে—এটা অবশ্য হবে তাঁর মহিলা সমিতির চ্যারিটির উদ্দেশ্যে। মেজদি ও আমি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলাম। আমি তো বলতে গেলে স্রেফ 'ফুলে' উঠলাম, কারণ আমার স্টেজ প্রোডাকশান কলকাতার দর্শকরা দেখবে—এর থেকে বড় সৌভাগ্য তখন আমার কল্পনার বাইরে।

'প্রহ্লাদ' মাত্র দেড়ঘণ্টার নাটক, সেইজন্যে আমি ঠিক করলাম 'ট্যাবলো'-তে 'রামায়ণ'-টাও অভিনয় করব যা এর আগে একবার আমি পাটনায় বড়দির বাড়ীতে করেছিলাম। মিলি (সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়) নেমেছিল 'সীতা'র ভূমিকায় আর আমি ছিলাম 'রাম'। মিলি তখন কলকাতায় ছিল না, সুতরাং 'সীতা'র ভূমিকা সুস্তুর বড় বোন সুজাতাকে দেওয়া হলো এবং আমি 'রাম'। অন্যান্য ভূমিকাগুলি আমাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদেরই দেওয়া হলো। 'প্রহ্লাদের' ভূমিকালিপি অবশ্য একই ছিল। অভিনয়টি হলো গ্লোব থিয়েটারে ৭ই জানুয়ারী, ১৯২৭।

নাট্যজগতে এই আমার প্রথম পদক্ষেপ এবং প্রথম প্রচেষ্টাই যেরকম সাফল্যলাভ করেছিল, তাতে আমার আশাতিরিক্ত উৎফুল্ল হওয়ারই কথা। 'রামায়ণ' এবং 'প্রহ্লাদে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে তখনকার কালের 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকা কি লিখেছিল, সেটা তুলে দিলাম:

"Yesterday evening the entertainment in aid of the Mahila Samiti was produced. The first half of the programme featured series of tableaux from the 'Ramayana'—with incidental music of Indian origin harmonised in Western Orchestra by Mr. T. Frangopoulo the music director and the Producer Mr. Modhu Bose. The way in which the scenes were grouped gave to an appreciative audience a series of excellent pictures......the second half of the programme was devoted to a representation of a play 'Prahlad'. In this Miss Sunita Ray evoked much applause by her very able acting and singing......she was ably supported by

Miss Reba Roy. Modhu Bose as Sri Krishna and Miss Sujata Roy as the Queen gave outstanding performances. The whole entertainment which was produced by Mr. Modhu Bose was most enjoyable ...and one cannot but be grateful for a most artistic and graceful performance.

THE ENGLISHMAN 8.1.1927.

'ইংলিশম্যানের' এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমার মনের মধ্যে একটা নতুন প্রেরণার সঞ্চার করল। ভাবতে লাগলাম যে, ভদ্র, শিক্ষিত এবং আধুনিক সমাজ থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে এইরকম নিয়মিতভাবে কলকাতায় নাটক অভিনয় করলে কিরকম হয়। শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে প্রতিভার অভাব হবে না এবং ভালভাবে নাটক প্রযোজনা করলে দর্শকেরও অভাব হবে না। মনের মধ্যে এই চিন্তাটা ঘুরতে লাগল বটে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এ নিয়ে আর বিশেষ চেষ্টা করলাম না। তবে সেদিনের সেই স্বপ্ন মনের মধ্যে থেকে একেবারে মুছে গেল না—সেই স্বপ্নই একদিন সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে-কথা পরে বলব।

'প্রহ্লাদে'র অভাবিত সাফল্যে মিসেস্ পি. কে. রায়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো, তাঁর 'মহিলা সমিতি' বেশ কিছু টাকা পেল। এসব খুবই আনন্দের বিষয় কিন্তু চ্যারিটি শো করলে তো আর আমার দিন চলবে না। তাই একটা কাজের চেষ্টা করতে লাগলাম।

জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে একদিন ক্যাপ্টেন কুণাল সেন মেজদির বাড়ীতে এসে হাজির। কুণালদা হলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাতি। আগেই বলেছি কুণালদা ও তাঁর দাদা ক্যাবলাদা (সুনন্দ সেন, বার-এট-ল) আমার দাদা ও মেজদার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

কুণালদা ভারত সরকারের ডাক বিভাগে বড় চাকরী করতেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময়ে মিলিটারীতে নাম লিখিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন ডাক বিভাগের তরফ থেকে। সেখান থেকেই তিনি ক্যাপ্টেন খেতাব লাভ করেন।

মেজদির ওখানে আমাকে দেখে কুণালদা বললেন: তুমি তো জার্মানী থেকে ক্যামেরার কাজ শিখে এসেছ—একটা ফিল্ম তুলতে পারবে?

আমি জিজ্ঞেস করলুম: কিসের ফিল্ম?

উত্তরে কুণালদা বললেন: আমাদের গভর্ণর লর্ড লিটন যাচ্ছেন কুচবিহারে বাঘ শিকার করতে। দেখ, যদি এই শিকারের একটা ফিল্ম তুলতে পার, তাহলে আমি সব বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

আমি খুব উৎসাহ নিয়ে বললাম : কি রকম ?

কুণালদা বললেন : আমি যদি ইন্দিরা মহারাণীকে বলি যে, এই বাঘ-শিকারের একটা ফিল্ম করতে হবে, তাহলে আমার মনে হয়, মহারাণী রাজী হয়ে যাবেন, বিশেষ করে গভর্ণরের জন্যেই যখন এই শিকারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ইন্দিরা মহারাণী ছিলেন বরোদার গাইকোয়ারের কন্যা। কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল এঁর। মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মারা গেলে ইন্দিরা মহারাণী কুচবিহার রাজ্যের 'রিজেন্ট'রূপে সমস্ত কার্য পরিচালনা করেছিলেন—কারণ বর্তমান মহারাজা তখন ছিল নাবালক।

কুণালদা এবং মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন মামাতো-পিস্‌তুতো ভাই—কাজেই কুচবিহার রাজপরিবারের সঙ্গে কুণালদার যথেষ্ট হৃদ্যতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। আর মানুষ হিসেবেও কুণালদা ছিলেন অত্যন্ত ভাল। খুব আমুদে লোক ছিলেন তিনি ; হাসি, ঠাট্টা এবং সরস আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের মাতিয়ে রাখতে পারতেন। সেইজন্যে সবাই তাঁকে খুব ভালবাসত। তাঁর আর একটা গুণ ছিল—তিনি খুব ভাল গান গাইতে পারতেন।

তাঁর এই দিলখোলা আমুদে স্বভাবের জন্য মহারাণী ইন্দিরাদেবী তাঁকে খুব ভালবাসতেন। কুণালদা জানতেন যে, তাঁর কোন কথা মহারাণী ঠেলতে পারবেন না ;—সেইজন্যেই তিনি এত জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন কুচবিহারের ব্যাঘ্র-শিকারের 'ডকুমেণ্টারী' ফিল্ম তোলার কথা। তিনি আমাকে এ কথাও বলেছিলেন যে, এই কাজের জন্যে আমাকে ভাল টাকাও পাইয়ে দেবেন।

একেবারে পূর্ণভাবে দায়িত্ব নিয়ে স্বাধীনভাবে ছবি তোলার কাজ আমার এই প্রথম। সেইজন্যে আমি একটু আমতা-আমতা করে বললাম : এর আগে তো স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিনি কখনও—আমি কি পারব ? তার উপর লাটসাহেবের বাঘ-শিকার ?

কুণালদা আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন : খুব পারবে—খুব পারবে। নার্ভাস হয়ে পড়ছ কেন ? এ সুযোগ হাতছাড়া করো না।

কুণালদার কথায় আমি খানিকটা ভরসা পেয়ে রাজী হয়ে গেলাম। জার্মানীতে যে Pathe ক্যামেরা কিনেছিলাম, সেই ক্যামেরা এবং একজন সহকারীকে সঙ্গে করে নির্দিষ্ট দিনে কুচবিহার রওনা হয়ে গেলাম।

কুচবিহার থেকে ১০।১২ মাইল দূরে একটি গভীর জঙ্গলে আমাদের ক্যাম্প পড়ল। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার—সে-কি এলাহী কাণ্ড! রোজ সকালে হাতীতে চড়ে বেরুতাম। এই জঙ্গলের বিশেষত্ব ছিল, বড় বড় ঘাসে প্রায় মানুষ কেন হাতী পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যেতো। হাতীর ওপর হাওদাতে আমি ক্যামেরা ঠিক করে তৈরী থাকতাম। লর্ড লিটন ও মহারাণী ইন্দিরা দেবীর হাতীর ঠিক পেছনেই আমাদের হাতীটা যেতো। আমার সঙ্গে ছিল সাবেদ আলি—কুচবিহার মহারাজার অস্ত্রাগারাধ্যক্ষ। সাবেদ আলির বয়স হয়েছিল—সে তখন চাকরী থেকে অবসর নিয়ে পেন্‌সন্ পাচ্ছিল। এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও তার হাতের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। ডান-হাত, বাঁ-হাত—দু'হাতেই সমান লক্ষ্য।

হাতীতে যেতে যেতে সাবেদ আলি আমায় জিজ্ঞেস করলো: আপনি বন্দুক চালাতে জানেন স্যার ?

আমি বললাম: না, কখনও তো ছুঁড়িনি।

সে বললে: আচ্ছা, আপনাকে আমি শিখিয়ে দেব। তারপর বলেছিল: এ-আর কি শিকার করা স্যার! শিকার করতে যেতেন আগের মহারাজা নৃপেন্দ্র-নারায়ণ। তাঁর সঙ্গে যেতেন গোবরডাঙ্গার জমিদার জ্ঞানদা মুখুজ্যে ও কে. চৌধুরী (ব্যারিস্টার) এঁরা সব। এখনকার মত তাঁরা এত হাতী-ঘোড়া লোক-লস্কর নিয়ে যেতেন না—মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটেই যেতেন।

—বল কি সাবেদ আলি—পায়ে হেঁটে ? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—হ্যাঁ স্যার, পায়ে হেঁটে। তাঁরা ছিলেন আসল শিকারী। কি হাতের টিপ ছিল! আর আজ-কাল শিকার মানে তো খালি ফুর্তি।

এই ধরনের নানা গল্প করত সাবেদ আলি।

একদিন 'লাঞ্চ' খাওয়ার পর যথারীতি বেরুনো হয়েছে ব্যাঘ্র মশায়ের সন্ধানে।

এমন সময় অনেক লোকের হল্লা আর ক্যানেস্তারা বাজানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম।

সাবেদ আলিকে জিজ্ঞেস করলাম: এ কিসের শব্দ ?

সাবেদ আলি বলল: বাঘ দেখা গেছে—তাই বীটাররা বাজনা বাজিয়ে ওকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে—ঐ যে দেখছেন, সামনের জায়গায় ঘাসগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ঐ ফাঁকা জায়গাটায় লাটসাহেবের সামনে বাঘটাকে আনবে। আপনি ক্যামেরা রেডি করে রাখুন স্যার।

এমন সময় হঠাৎ বীটারদের গণ্ডী ভেদ করে বাঘটা লাফ দিয়ে পড়ল ঠিক

আমাদের সামনের সেই খোলা জায়গাটায়। বাঘটাকে অত সামনে দেখে লিটন সাহেব ঘাবড়ে গেছেন। বাঘটা তাক করছে গভর্নরের হাতীর মাথা লক্ষ্য করে লাফ দেবে কি না! এই সময় শুনতে পেলাম মহারাণী ইন্দিরা বলছেন:

Your Excellency, shoot, shoot—

আমি তো ক্যামেরা চালাতে শুরু করে ছিলাম—হঠাৎ সাবেদ আলি আমার হাতে বন্দুকটা গুঁজে দিয়ে বললে: ক্যামেরা ছেড়ে দিয়ে এবার বন্দুকটা চালান স্যার।

আমি বললাম: সে কি? আমি বন্দুক চালাব কি? আমি তো সবে তোমার কাছে শিখছি।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ আপনাকেই চালাতে হবে—আর দেরী করবেন না। দেখছেন না লাটসাহেব কি রকম নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। এই যে ফুটোটা দেখছেন—এর ভেতর দিয়ে দেখে টিপ করুন, তারপরে ট্রিগারটা টিপে দিন। নিন, আর দেরী করবেন না—

আমি মরীয়া হয়ে টিপলাম ট্রিগার, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা সাংঘাতিক গর্জন করে একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে পাশের একটা জলার ধারে গিয়ে পড়ল ছিটকে। আমার বলতে যতটা সময় লাগল তার শতাংশের একাংশ মাত্র সময় লেগেছিল সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে—অর্থাৎ কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র।

আনাড়ীর মার হলে কি হবে—গুলিটা লেগেছিল বাঘটার মাথার ব্রহ্মতালুতে। সেই আমার প্রথম শিকারে যাওয়া—আর প্রথমটাতেই এরকম সাফল্য।

বন্দুকের আওয়াজ শুনে মহারাণী ইন্দিরা দেবী পাশ ফিরে দেখতেই আমার হাতে বন্দুকটা দেখতে পেলেন। তিনি হাত দিয়ে ইসারা করে আমায় তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন। আমি আমার হাতি থেকে নেমে একটি ছোট হাতিতে চড়ে তাঁর কাছে গেলাম।

মহারাণী বললেন: তুমি তো বেশ ভালো বন্দুক ছোঁড!

আমি তাঁদের কাছে মার্জনা চেয়ে বললাম: আপনাদের অনুমতি না নিয়ে বন্দুক ছুঁড়েছি বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু না ছুঁড়েও উপায় ছিল না—আর এক সেকেণ্ড দেরী করলেই বাঘটা আপনাদের হাতীর ওপরে লাফ দিত। আমায় মাফ করবেন।

মহারাণী বললেন: না, না, তুমি ঠিকই করেছ। আর একটু দেরী করলে হয়ত বিপদ ঘটতে পারত। যাই হোক the skin is yours.

ততক্ষণে ব্যাঘ্র মশায়ের তর্জনগর্জন সব শেষ।

লর্ড লিটন ও মহারাণী ফিরে গেলেন সেদিনকার মত। আমি তখন গিয়ে মৃত ব্যাঘ্রের পেটের ওপর দাঁড়িয়ে উত্তরকালের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একখানা ছবি তুলে ফেললাম।

ক্যাম্পে ফেরবার সময় সাবেদ আলিকে জিজ্ঞেস করলাম: আচ্ছা, সাবেদ সাহেব, তুমি এমন ওস্তাদ থাকতে আমাকে দিয়ে বন্দুক ছোঁড়ালে কেন?

সাবেদ আলি বলল: লাট সাহেবের শিকার—আমি মারলে তো আমার চাকরী যেত। কিন্তু আর যদি আপনি একটু দেরী করতেন তাহলেই বাঘটা লাফ দিতো—তখন লাট সাহেব আর মহারাণীর কি অবস্থা হতো বুঝতে পারছেন?

আমি বললাম: এক গুলিতেই কি রকম অত বড় বাঘটাকে কুপোকাৎ করে দিলাম, দেখলে তো?

—ওটা স্যার beginners luck—ও রকম হয়। হাসতে হাসতে বললে সাবেদ আলি।

সাবেদ আলি বেশ ইংরাজী বলে মাঝে মাঝে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: সাবেদ আলি, তুমি তো বেশ ইংরাজী বল—কোথায় শিখলে এত?

সাবেদ আলি বললে: আমাকে শিখতে হয়েছে স্যার। সায়েবদের সঙ্গে মোটামুটি বলতেও পারি—আর ওরা যা বলে তা বুঝতেও পারি। মহারাজা নৃপেন্দ্র-নারায়ণ আমাকে শিখিয়েছিলেন। কত বড়লাট ছোটলাট এখানে শিকার করে গেছে—

আমি হাসতে হাসতে সাবেদ আলিকে বললাম: যাক, তুমি আমার শিকারের গুরু সাবেদ আলি। অতএব গুরুদক্ষিণা হিসাবে বাঘের চামড়াটা তুমিই নাও।

সাবেদ আলি খুশী হয়ে বলল: থ্যাঙ্কিয়ু স্যার।

তারপর আরও এক সপ্তাহ ধরে শিকারে গিয়েছিলাম এই দলের সঙ্গে। লর্ড লিটনের ছেলে একটি বাঘ মেরেছিল লাফ দেবার মুখে—তার হাতের নিশানা ছিল খুব ভালো। আমি ক্যামেরায় তুলেছিলাম বাঘের সমস্ত 'মুভমেণ্টটা'। সঙ্গে আরও অনেক রাজা মহারাজা ছিলেন, তাঁদের নামগুলো আজ ঠিক মনে পড়ছে না।

শিকার শেষ হলে লর্ড লিটন বলেছিলেন: কি রকম ছবিটা হলো একবার দেখতে চাই।

আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে ম্যাডান কোম্পানীর চার্লস ক্রীডের ল্যাবরেটারীতে ফিল্মটা develop করলাম—ঠিকমত এডিট (edit) করে ঐ ল্যাবরেটারীতে নিজেই প্রিণ্ট করলাম।

তারপর একদিন রাজভবনে লাট পরিবার ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত বিশেষ ব্যক্তিকে এবং মহারাণী ইন্দিরা দেবীকে ছবিটা দেখানো হলো—এবং দেখে সকলেই বেশ খুশী হলেন।

Government House

Calcutta 9th March. 1927.

This is to certify that Mr. M. Bose took an excellent Cinema film during the visit of his Excellency the Governor of Bengal and Lady Lytton to Cooch Behar in February 1927. The film was shown at Government House and His Excellency was much pleased with it.

Sd/-J. Mackenzie, Lieut. Col.
Military Secretary.

তার কিছুদিন পরেই খবর পেলাম যে রেঙ্গুনে একটি ফিল্ম কোম্পানী একজন ক্যামেরাম্যান চায়। কুচবিহার শিকারের ছবি তুলে তখন নিজের মনে যথেষ্ট সাহস হয়েছে। আমি বুক ঠুকে দিলাম এক আবেদন পত্র, মঞ্জুর হয়েও গেল। কোম্পানীটির নাম ছিল ইস্টার্ণ ফিল্ম কোম্পানী। সেখান থেকে লোক এসে আমার সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করল।

—১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে আমি রেঙ্গুন যাত্রা করলাম।

এখনকার মত তখন বর্মা যাওয়ার কোন হাঙ্গামা ছিল না—পাশপোর্ট প্রথা চালু হয়নি, কারণ ভারত ও বর্মা সবটাই তো তখন ব্রিটিশ অধিকারে ছিল।

এখানকার অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলেই বার্মিজ। আর তখন তো নির্বাক যুগ—সুতরাং কথাবার্তা বলার কোন ঝামেলা ছিল না। বেশীর ভাগ শুটিং হতো ম্যাণ্ডালেতে। শুটিং-এর পর ওখানকার ল্যাবরেটরীতে আমি ডেভেলাপ করতাম এবং আমিই প্রিণ্ট করতাম।

তখন রেঙ্গুনে ছিলেন মিঃ জাস্টিস এস. এন. সেন (সুরেন্দ্রনাথ সেন) রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ। বিয়ে করেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা সুজাতা দেবীকে। জাষ্টিস সেন ছিলেন বাবার বিশিষ্ট বন্ধু মিঃ পূর্ণচন্দ্র সেনের (পি.

সি. সেন) বড় ছেলে। মিঃ পি. সি. সেন ওখানকার সরকারের একজন পদস্থ চাকুরে ছিলেন। ওখানে তাঁর বিরাট ব্যবসাও ছিল, আর এই ব্যবসার দৌলতে প্রচুর টাকা পয়সা করেছিলেন। এঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

রেঙ্গুনে আর একটি পরিবারের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্ঞাতিভাই রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ জে. আর. (জ্যোতিষরঞ্জন) দাশের পরিবার। মিঃ দাশ বিবাহ করেছিলেন মিঃ পি. সি. সেনের মেজ মেয়ে শ্রীমতী সুশীলা দেবীকে। এঁদের বাড়ীতে প্রতি শনি ও রবিবার টেনিস খেলা হতো। এই দুই পরিবারের প্রীতি ও ভালবাসায় সুদূর রেঙ্গুনে আত্মীয়বন্ধুহীন অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কখনও একলা বোধ করতাম না।

জুন মাস—আমাদের ছবি তখন শেষের মুখে। এমন সময় লণ্ডন থেকে গোলাপদার এক চিঠি পেলাম যে তাঁরা ঐ বছরের শেষ নাগাৎ নতুন ছবি আরম্ভ করবেন—সুতরাং যদি আসতে চাও তবে চলে এস। গোলাপদার ইউনিটে আবার কাজ করব, এই আনন্দে আমার মনটা নেচে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি টেলিগ্রামে আমার সম্মতি জানিয়ে দিয়ে কোম্পানীকে তিন মাসের নোটিশ দিয়ে পদত্যাগপত্র দাখিল করে দিলাম—সে তারিখটা আমার আজও মনে আছে—২৭শে জুন, ১৯২৭। তারপর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা চলে এলাম।

এই সময়ে গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী সরলা রায়, (মিসেস পি. কে. রায়) তখন স্কুলের গৃহনির্মাণ তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে খুব চেষ্টা করছিলেন। স্কুলটি তখন ল্যান্সডাউন রোডের একটি বাড়ীতে ছিল। তিনি একদিন আমাকে ডেকে একটা চ্যারিটি শো করে স্কুলের বিল্ডিং ফাণ্ড-এর জন্য কিছু টাকা তুলে দিতে বললেন। স্টেজ প্রোডাকশানের দিকে আমার বরাবরই একটা ভীষণ ঝোঁক ছিল।

আমার মেজদিও আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগল। কিন্তু কি অভিনয় হবে এই নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা চলল। শেষে ঠিক হলো ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলিবাবা" অভিনয় করা হবে এবং অভিনয় করবে সব ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা।

মেজদি তাঁর মেয়ে সুজাতা ও সুনীতাকে (সুন্তু) দিল। এর আগেই 'প্রহ্লাদে' আমি সুন্তুর অদ্ভুত অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছি। সেজন্য তাকেই আমি "মর্জিনা"র ভূমিকায় ঠিক করলাম, যদিও তখন তার বয়স চোদ্দ বছরের বেশী হবে না। আমার মনে কেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, যদিও এই ভূমিকাটি অভিনয়

করা খুবই শক্ত—কারণ নাচে গানে অভিনয়ে শিল্পীকে সমান পারদর্শিনী হতে হবে, তবুও সে ভালই করবে। সুন্তু আমার সে আশা ও বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছিল।

মেজদির বড় মেয়ে সুজাতাকে আমি "সাকিনা"র ভূমিকায় নির্বাচন করলাম। মিলির (সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়) তখন বিয়ে হয়েছে এবং স্বামীর সঙ্গে কলকাতাতেই থাকত। তার স্বামী তাকে সব সময়েই অভিনয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিত, সেজন্য আমি তাকে "ফতিমা"র ভূমিকায় নির্বাচন করলাম। আমাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু পালোয়ান হালদারকে (মঞ্চে "গৌরী ওঝা" নাম নিয়েছিল) দিলাম "আলিবাবা"র ভূমিকা। "কাশিম" এবং "হুসেনে"র ভূমিকা দুটি দেওয়া হলো যথাক্রমে বন্ধুবর হরেন ঘোষের ছোট ভাই ধীরেন ঘোষকে এবং আমার বিশেষ বন্ধু সত্যেন ঘোষকে (যিনি মণ্টি ঘোষ নামে সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন)। "কুনাল"দা ছিলেন বিরাট লম্বা-চওড়া মানুষ আর তাঁর কণ্ঠও ছিল গুরু-গম্ভীর—তার ওপর তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সেজন্য "দস্যুসর্দার"-এর ভূমিকাটি তাঁকেই দেওয়া হলো।

টুকলু অর্থাৎ প্রীতিকুমার মজুমদার হলো সম্পর্কে কুনালদার ভাই, তিনিই একদিন সঙ্গে করে তাকে নিয়ে এলেন আমাদের ওখানে। টুকলুর বয়স তখন খুব কম—বছর চব্বিশেক হবে। কুনালদা বললেন যে টুকলু বৃদ্ধের হাবভাব ঢং এবং কথা বলার ভঙ্গী, এমন কি কণ্ঠস্বর পর্যন্ত অদ্ভুত রকম অনুকরণ করতে পারে। আমি তো প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারিনি যে, বয়েসে যে এত তরুণ, সে কি করে এক বৃদ্ধের ভূমিকা নিখুঁতভাবে অভিনয় করতে পারবে! যাই হোক, টুকলুকে আমি "বাবা-মুস্তাফা"র ভূমিকায় রিহার্সাল দেওয়ার পর দেখলাম যে সত্যিই সে ভাল অভিনয় করছে বুড়ো মুচির ভূমিকায়। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নির্বাচন করে ফেললাম। টুকলুর ভাই কল্যাণ মজুমদার এবং আরও কয়েকজন যুবককে করা হলো দস্যুর দলভুক্ত লোকেরা—এদের মধ্যে কেউ আমাদের আত্মীয়, কেউ বা বন্ধু। আমি নিলাম 'আবদাল্লার' ভূমিকা।

কিন্তু মুস্কিল হলো 'ব্যালের' মেয়ে নিয়ে। একে 'আলিবাবার' মত বই, যেটার কোন কোন অংশ তখনকার রক্ষণশীল সম্প্রদায় অশ্লীল বলে মনে করতেন। তার ওপর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে অভিনয় করবে—এতো তাঁদের ধারণার বাইরে।

কুনালদা, মেজদি এবং আমাকে তাঁর কাকা শ্রীসরল সেনের কাছে প্রস্তাব করে

দেখতে বললেন। শ্রীসরল সেন ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের চতুর্থ পুত্র। তাঁর দুই মেয়ে সাধনা ও নীলিনার মধ্যে বিরাট প্রতিভা ছিল—যদিও তাদের বয়স তখন খুব কম, তবুও 'ব্যালে'তে তাদের মানিয়ে যাবে সুন্দরভাবে। শ্রীসরল সেন বিবাহ করেছিলেন রেঙ্গুনের মিঃ পি. সি. সেনের এক মেয়ে নির্মলা দেবীকে। সকলের কাছে তিনি 'নেলী' নামে পরিচিতা। আমি তাঁকে নেলীদি বলেই ডাকতাম, কারণ মিঃ পি. সি. সেনের ছেলেমেয়েরা আমার দাদা ও দিদিদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

একদিন মেজদি ও আমি শ্রীসরলচন্দ্র সেনের বাড়ীতে গেলাম। 'লিলি কটেজ' (কমল কুটির)-এর সংলগ্ন জমিতে তিনি বাড়ী করেছিলেন। তাঁর বাড়ীতে যেতেই শ্রীসেন এবং তাঁর স্ত্রী নির্মলা দেবী মেজদিকে ও আমাকে খুব সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সাধনা ও নীলিনাকে দেখলাম—সাধনার বয়স প্রায় চোদ্দ হবে আর নীলিনার প্রায় এগার।

মেজদি যখন বললে যে তার মেয়েরাও "আলিবাবা"তে অভিনয় করছে এবং রিহার্সাল হবে তারই বাড়ীতে, তখন সাধনার মা ও বাবা খুব আনন্দের সঙ্গেই মত দিলেন তাঁদের মেয়েদের 'ব্যালে'তে নামবার।

এরপর আমরা গেলাম কুনালদার দাদা, ক্যাবলাদার কাছে। তিনি এবং তাঁর স্ত্রীও রাজী হয়ে গেলেন তাঁদের বড় মেয়ে মনীষাকে আলিবাবার 'ব্যালে'তে নামতে দিতে। এর পর আমরা পেলাম উষাদির মেয়ে গীতাকে এবং ইন্দিরাকে (ইন্দিরা বোস)। ইন্দিরার পরিবারের সঙ্গেও আমাদের পরিবারের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল।

যাক্, পাঁচজন মেয়ে ঠিক হয়ে গেল—'ব্যালে' সমস্যা মোটামুটি মিটল।

শিল্পী নির্বাচন শেষ করে, মেজদির বাড়ীতে 'রিহার্সাল' শুরু হয়ে গেল। শ্রীমতী রেবা রায় নাচগুলির পরিকল্পনা এবং শেখাবার ভার নিল। মিঃ টি. ফ্রাঙ্কো-পোলো ও আমি পাশ্চাত্য 'অর্কেস্ট্রার' সঙ্গে 'আলিবাবা'র কতকগুলি গান ও নাচের মূল সুরগুলি হারমোনাইজ করলাম।

শিল্পী শ্রীচারু রায় পোষাক-পরিচ্ছদের পরিকল্পনা করলেন ও অন্যান্য শিল্প-নির্দেশের ভার নিলেন।

আমার এতদিনের স্বপ্ন—যে আমাদের নিজেদের একটা নাট্য-সম্প্রদায় হবে, যেখানে প্রগতিশীল অভিজাতবংশীয় ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে অভিনয় করবে সেটাই আজ সফল হতে চলেছে। প্রথমে ঠিক করেছিলাম যে এই নাট্য-সংস্থার নাম দেব 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়াস', কিন্তু সকলে পরামর্শ দিল যে "এমেচার" কথাটা উল্লেখ করা বিশেষ দরকার, নইলে কোন বাপ-মা তাদের মেয়েকে আমাদের দলে দিতে রাজী

হবে না। সুতরাং নাম হলো 'ক্যালকাটা এমেচার প্লেয়ার্স' (সি-এ-পি) এবং প্রায় ছ' বছর পরে 'ক্যালকাটা এমেচার প্লেয়ার্স' নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স'।

আমাদের "আলিবাবা"র মহলা হতো এম্পায়ার থিয়েটারে। ঐ সময়ে ম্যাডাম অ্যানা পাভলোভা সদলবলে এসেছিলেন কলকাতায় এবং এম্পায়ার থিয়েটারেই তিনি 'শো' দিচ্ছিলেন। প্রতিদিন সকালে তাঁর 'ব্যালে'রও মহলা হতো ঐখানেই। বেলা দশটার মধ্যে তাঁর মহলা শেষ হয়ে যাবার পরে আমাদের মহলা শুরু হতো। এরই মধ্যে একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল। ম্যাডাম পাভলোভার দলের ম্যানেজার ছিলেন মিঃ লেভিটফ্ নামে জনৈক ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। আমাদের মহলা শেষ হবার পরে তিনি একদিন এসে বললেন, "ম্যাডাম পাভলোভা আপনার সঙ্গে একটু কথা কইতে চান।"

"বেশতো, কোথায় কথা কইবেন? কখন?" বলতেই তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ঐ এম্পায়ার থিয়েটারেরই রয়্যাল বক্সে; সেখানে তিনি ছিলেন একা।

নর্তকীরাণী পাভলোভাকে অভিবাদন করতেই তিনি বললেন, "আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি আপনার মহলা দেখেছি, এর জন্যে প্রথমেই আমি আপনার ক্ষমা চাইছি।"

"না, না, সে কি কথা! আপনি আমাদের মহলা দেখেছেন, এর জন্যে উল্টে আমিই অনুগৃহীত বোধ করছি", জবাব দিলাম আমি।

"এখন আপনাকে যে জন্যে ডেকেছি সেই কথাই বলি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন উদয়শঙ্করের সঙ্গে আমি "রাধাকৃষ্ণ" নামে একটি ব্যালে তৈরী করেছি। কিন্তু যে কারণেই হোক, উদয়শঙ্কর এখন দলে নেই। আপনার দলের মহলা দেখে মনে হচ্ছে আপনি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তা হলে আমার "রাধাকৃষ্ণ" ব্যালেটি বেশ সুন্দর হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য এর জন্যে আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব।" তাঁর প্রস্তাব শুনে আমি রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেলাম। তিনি আবার বললেন, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আপনার মেয়েদের হিন্দু পোষাক পরিয়ে আমি ওদের ছবি তুলব—আলিবাবার পোষাকে নয়।" তাঁর কথামত কাজও হয়েছিল। গ্র্যাণ্ড হোটেলে বি. জোসেফো নামে একজন রুশ ফোটোগ্রাফারের স্টুডিও ছিল। শ্রীমতী পাভলোভার নির্দেশ অনুযায়ী সি. এ. পি. ব্যালের কয়েকটি গ্রুপ ফোটো তিনি তুলেছিলেন। কথা হলো, দেশে ফিরে গিয়ে ম্যাডাম পাভলোভা আমাদের সম্প্রদায়ের সেখানে যাবার বন্দোবস্ত করবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য,

তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পায়নি। এখান থেকে ফিরে যাবার কিছুদিন পরেই তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এখানে ম্যাডাম পাভলোভার নৃত্যকলা সম্পর্কে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা ব্যালেরিনা রূপে তিনি বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এম্পায়ারে তাঁর "ডাইয়িং সোয়ান" নাচ শেষ হবার পরে একদিন দর্শকরা এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, কয়েক সেকেণ্ড সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে বিরাজ করছিল এক অখণ্ড-নীরবতা। এর পরে চমক ভাঙতে দর্শকদের উচ্ছ্বসিত করতালি শ্রীমতী পাভলোভাকে বারংবার দর্শকদের অভিবাদন করতে বাধ্য করেছিল। সে করতালিধ্বনি যেন কিছুতেই শেষ হতে চাইছিল না।

১৭ই জানুয়ারী, ১৯২৮ সালে ভূতপূর্ব এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমানে রক্সি) আমাদের 'আলিবাবা' মঞ্চস্থ হলো। কিন্তু ঠিক অভিনয়ের আগে আর এক বিপদের সম্মুখীন হতে হলো আমায়। যাঁরা পুরাতনপন্থী এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায় তাঁরা ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের এই মিশ্র অভিনয়ে তুমুল প্রতিবাদ জানালেন—বিশেষ করে যখন অভিনয় করা হচ্ছে আলিবাবার মত বই। তাঁরা অভিনয়ের দিন হাউসের সামনে কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শন করলেন। শেষে অনেক কষ্টে অনেক অনুনয় বিনয় করে চ্যারিটি শো'র দোহাই দিয়ে এই বিক্ষোভকারীদের শান্ত করা হয়। পরে এই নিয়ে তাঁরা অনেক পত্রপত্রিকায় তীব্র সমালোচনাও করেন, কিন্তু আমি তাতে দমিনি। এইভাবে সি. এ. পি. অর্থাৎ ক্যালকাটা এমেচার প্লেয়ার্সের জন্ম হয়।

এই অভিনয়ে অংশ নিয়েছিল—

মর্জিনা···সুনীতা রায়, আবদাল্লা···মধু বসু, ফতিমা .সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, সাকিনা···সুজাতা রায়, আলিবাবা...গৌরী ওঝা (পালোয়ান হালদার), কাশিম ···ধীরেন ঘোষ, হুসেন···মণ্টি ঘোষ, বাবা মুস্তাফা·· প্রীতিকুমার মজুমদার, দস্যু সর্দার...ক্যাঃ কুনাল সেন

সি. এ. পি. ব্যালে :

সাধনা সেন, ইন্দিরা বোস, মণীষা সেন, গীতা মুখোপাধ্যায় ও নীলিনা সেন।

এই অভিনয়টি হয়েছিল 'গোখেল মেমোরিয়াল' স্কুলের সাহায্যকল্পে। শ্রীমতী সরলা রায় এবং কার্যকরী সমিতির সভ্যদের চেষ্টায় হাউসের প্রতিটি আসন বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তদানীন্তন বাংলার রাজ্যপাল স্যার স্ট্যানলী জ্যাক্সন ও লেডী জ্যাক্সন ছিলেন এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক।

সি. এ. পি'র প্রথম মঞ্চাভিনয় দেখে তখনকার বিখ্যাত সমালোচকেরা যা বলেছিলেন, তার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"Alibaba" a Bengali opera produced by Mr. Modhu Bose and presented by the Calcutta Amateur Players, at the Empire Theatre last evening was received with unrestrained expressions of delight by a large audience which included the Hon. Lady Jackson and prominent members of Indian and European society. The setting and costumes were gorgeous and the acting delightful".

—THE STATESMAN, Calcutta, 18-1-28.

"There was a very fair attendance which was treated to able acting, scenery which was above the average and a grand mis-en-scene that did great credit to Mr. Modhu Bose, the Producer. Miss Sunity Roy as 'Morjina' gave an out slanding performance. She has real dramatic genius and for a girl of her age, her performance was wonderful. Mrs. Suprova Mookherjee sustained the difficult part of 'Fatima' with great credit. Modhu Bose was a very good Abdulla' The Calcutta Amateur Players, the organisers, deserve the greatest gratitude from an audience who spent a thoroughly enjoyable evening."

—"THE ENGLISHMAN," Calcutta, 18-1-28.

The public will be given another opportunity to witness the performance of 'Alibaba' which the Calcutta Amateur Players staged with so brilliant success on Tuesday last. Great credit is due to Mr. Modhu Bose for the general production."

—"FORWARD," Calcutta, 22-1-28.

"......ক্ষমা চাইছি! সম্ভ্রান্ত বাঙালীপুরুষ ও মাহিলাগণ এম্পায়ারে "আলিবাবা" অভিনয় করবেন শুনে গতবার আমরা যে মত প্রকাশ করেছিলুম, নিশ্চয়ই তা সমীচীন হয়নি—গেল রবিবারে তাঁদের অভিনয় দেখবার আগে আমাদের ধারণাই ছিল না যে "আলিবাবা'র মত নাটকের আপত্তিকর অংশ যেভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে তাতে অতি বড় নীতিবাগীশেরও রুচি আহত হবার উপায় ছিল না। অথচ এই নাটকেরই সুর সাধারণ রঙ্গালয় কতখানি কুৎসিত করে তুলেছে। "নাচঘর" (১৩ই মাঘ, ১৩৩৪)

"......আজকের দিনে বাংলার সম্ভ্রান্ত সমাজের যাঁরা ললিতকলা হিসাবে অভিনয়-শিল্পের অনুশীলনেও উৎসাহী হয়েছেন তাঁরাও এই যুগনন্দিত নাট্যের মর্যাদা রক্ষা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নি। নাট্যশালাকে যাঁরা বিতৃষ্ণা ও সন্দেহের চোখে দেখেন তাঁরা যাই বলুন, এই অভিনয়-আয়োজনে ক্যালকাটা এমেচার প্লেয়ার্স যে সৎসাহস দেখিয়েছেন মুক্তকণ্ঠে তার সাধুবাদ না করে আমরা থাকতে পাচ্ছি না। আর সুদক্ষ পরিবর্জনের ফলে এই নাটিকাখানি যেভাবে অল্প সময়ের মধ্যে অভিনয় উপযোগী হয়ে উঠেছে, তাতেও এর প্রযোজক মিঃ মধু বসুর তীক্ষ্ণ রসবোধ সূচীত হয়েছে......যে দুইটি চরিত্র আমাদের মানসপটে একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তারা ফতিমা ও মর্জিনা :...ফতিমার ভূমিকার জন্য মিসেস সুপ্রভা মুখার্জীকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি......মর্জিনার অভিনয়ে এমন একটা সচঞ্চল ছন্দ ও সহজ গতি ছিল যাতে নাট্যবাদী মাত্রেই চমৎকৃত না হয়ে পারেন না......অল্পবয়স্কা বালিকা সুনীতা রায় যেভাবে নৃত্যনৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাতে এ আশা অনায়াসেই করা যায় যে, নৃত্যকলা বাংলার সম্ভ্রান্ত সমাজের মধ্যে স্থায়ীভাবেই স্থানলাভ

করেছে……মর্জিনা শুধু চরণ ছন্দেই সুনিপুণা নন, তাঁর কণ্ঠেও অমৃতের আভাষ আছে।…এই নবীন উৎসাহীদের নাট্যসাধনা জয়যুক্ত হোক আমরা এই কামনা করি।"

……"আত্মশক্তি" (১৭-২-১৯২৮)

"…মর্জিনার ভূমিকায় মিস্ সুনীতা রায় যখন দুইটি সুন্দর সম্মার্জনী হাতে করিয়া নৃত্যসহ গাহিতে আরম্ভ করিলেন—"এত্তা বড়া বাড়ীমে এত্তা জঞ্জাল" তখন সমস্ত রঙ্গমঞ্চ যেন যাদুমন্ত্র সহকারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল এবং বালিকার নৃত্য-চাঞ্চল্য যেভাবে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল তাহা সত্যই উপভোগ্য—তারপর আবদাল্লার ভূমিকায় মিঃ মধু বোস যখন মর্জিনার নৃত্যসাথী হইলেন তখন সে যে দৃশ্যের সৃষ্টি হইল তাহা বাস্তবিকই অব্যক্ত। 'আলিবাবা' নাটকে এই দুইটি চরিত্রই ইহার প্রাণ এবং ইহারা উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে।"

—'নবযুগ'

'আলিবাবা' অভিনয়ের অভাবিত সাফল্যের পরে যখন আমি নতুন কিছু করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, ঠিক সেই সময়ে গোলাপদা এলেন সেপ্টেম্বর মাসে—অবশ্য ওঁর আসার খবর আমি আগেই পেয়েছিলাম। তখন আমি আর গোলাপদা সোজা দিল্লী হয়ে উদয়পুরে চলে গেলাম। দলের ইউনিটে তখন আর কেউ ছিল না। এইবার যে ছবিটি হবে তার নামকরণ হয়েছে 'পাশার দান' বা 'থ্রো অফ এ ডাইস'।

ভারত সরকারের সঙ্গে গোলাপদা কথাবার্তা বলে ব্যবস্থা করেছিলেন যে, এই দেশীয় রাজ্যগুলিতে শুটিং-এর সময় যেন সবরকম সাহায্য পাওয়া যায়। তখনকার দিনে দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর ভারত সরকারের প্রচুর আধিপত্য ছিল। প্রত্যেক জায়গাতেই একজন পলিটিক্যাল এজেন্ট থাকতেন। উদয়পুর, জয়পুর, মহীশূর প্রভৃতি সমস্ত জায়গায় এই সমস্ত পলিটিক্যাল এজেন্টের সুপারিশে লোকলস্কর, সৈন্য, হাতী ঘোড়া সবরকম সাহায্যই আমরা পেয়েছিলাম।

মাঝে মাঝে গোলাপদা যখন বেশ খোসমেজাজে থাকতেন তখন নানা গল্প হতো। কখনও বিলেতের কথা, কখনও জার্মানীর কথা। আর একজনের কথা যতই গোলাপদা পাশ কাটিয়ে যেতে চাইতেন, ততই তার সুন্দর মুখখানা রঙীন গোলাপ হয়ে সামনে ভেসে উঠতো। সে আর কেউ না—হিল্ডা, সেই হারানো হিল্ডা। মাঝে মাঝে দেবিকারাণীর বিষয়ও শুনি তবে তখন পর্যন্ত তাকে চোখে দেখিনি। তখনও তাঁদের বিয়ে হয়নি। দেবিকারাণীর মাতামহ ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়—তিনি বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দেবিকার পিতামাতা কর্নেল এম. এন. চৌধুরী ও মিসেস চৌধুরী রাঁচীতে প্রায়ই আসতেন এবং আমাদের বাড়ীতেও আসতেন মা-বাবার কাছে।

একদিন গোলাপদার ঘরে বসে কিছু চিঠিপত্র টাইপ করছিলাম। এমন সময় গোলাপদা হঠাৎ বলে উঠলেন: ও মধু, তোকে একবার স্টেশনে যেতে হবে—আজ দেবিকা আসছে। আমার একটা খুব জরুরী কাজ আছে, নইলে আমিই যেতাম।

আমি বললাম: আমি তো কখনও তাকে দেখিনি—চিনব কি করে?

গোলাপদা মৃদু হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন: It is impossible to miss her। তাকে দেখলে তুই ঠিক চিনতে পারবি। এরপর আর কথা চলে না।

গেলাম স্টেশন। ট্রেন এল—সত্যিই গোলাপদা যা বলেছিলেন ঠিক তাই। এ রকম একটি অসাধারণ মহিলাকে দেখেই চিনে নিলাম। আমি গিয়ে আমার পরিচয় দিলাম। আমার পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমায় চিনতে পারল। পরে দেবিকার কাছে শুনেছিলাম যে গোলাপদা আমার বিষয় ফলাও করেই বলেছিলেন তার কাছে। স্টেশন থেকে হোটেলে আসবার পথে লণ্ডন সম্বন্ধে অনেক কথা হলো।

দেবিকা আসতে আমার বেশ খানিকটা কাজ বেড়ে গেল। নানা কাজকর্মে গোলাপদা ব্যস্ত থাকতেন—সুতরাং আমাকেই বেরুতে হতো প্রায় রোজই দেবিকাকে নিয়ে। উদয়পুরে এবং উদয়পুরের কাছাকাছি বহু জায়গা আছে—যা দেখলে রাজস্থানের অনেক কিছু মনে পড়ে যায়।

আস্তে আস্তে কলাকুশলীরা এবং শিল্পীরা সব আসতে লাগলেন। প্রথমে এলেন মিঃ অস্টেন এবং তাঁর সঙ্গে দুজন ক্যামেরাম্যান মিঃ সুনেম্যান ও মিঃ ভিয়েরসিং। তারপর কলকাতা থেকে এল নায়িকা সীতা দেবী ও তার মা, চারু রায় ও তাঁর স্ত্রী মায়া রায় এবং প্রফুল্ল রায়। প্রমোদনাথ রায় (যিনি পি. এন. রায় নামে খ্যাত) এলেন লণ্ডন থেকে। তিনি ছিলেন গোলাপদার জ্ঞাতি ভাই। চারুদা প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—এবং ছিলেন শিল্প-নির্দেশক। মায়া বৌদি একটি ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। প্রফুল্লদা একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—তাছাড়া মিঃ অস্টেনের সহকারীরূপে কাজ করতে লাগলেন। প্রমোদদা ছিলেন প্রোডাকশান বিভাগে। আমি মিঃ অস্টেনের দ্বিতীয় সহকারীরূপে কাজ করতে লাগলাম। মিঃ অস্টেন জানতেন যে, আমি ক্যামেরাম্যান হতে চাই—সুতরাং তিনি প্রধান ক্যামেরাম্যান মিঃ সুনেম্যানকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন যাতে আমাকে কম্পোজিশান, ক্যামেরা-অ্যাঙ্গেল এবং কোন সিনে কিরকম

রিফ্লেকটার ব্যবহার করতে হয় এসব যেন ভাল করে বুঝিয়ে দেয়। মিঃ অস্টেন সত্যি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

ইউনিটে এত লোক হলো যে, উদয়পুরের বিরাট স্টেট হোটেলেও স্থান সঙ্কুলান হলো না। তখন হোটেলের সামনে খোলা মাঠে তাঁবু খাটিয়ে অনেকের থাকার বন্দোবস্ত হলো। আমি আর প্রফুল্লদা থাকতাম একটা তাঁবুতে। আমাদের পাশের তাঁবুতে প্রমোদদা থাকতেন।

মিঃ অস্টেন, প্রধান ক্যামেরাম্যান মিঃ স্থনেম্যান, প্রফুল্লদা ও আমি কয়েকদিন বেরিয়ে শুটিং-এর জন্য 'লোকেশান' নির্বাচন করে এলাম। তারপর একদিন শুটিং আরম্ভ হলো। উদয়পুরের মহারাণা উদয়পুরে আমাদের যা যা দরকার সব ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমরা উদয়পুর প্রাসাদ, জগ্‌নিবাস, চিতোর দুর্গের ভিতর, হল্‌দিঘাট (যেখানে রাণা প্রতাপের সঙ্গে বিখ্যাত হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল) প্রভৃতি স্থানে শুটিং করলাম। স্থানীয় সিপাহী, শান্ত্রী, হাতি, ঘোড়া সবই প্রয়োজনমত পেলাম। উদয়পুরের রাণাকে এই প্রথম দেখলাম।

একদিন শুনলাম মহারাণা বন্যশূকর শিকারে যাবেন। সকালবেলাতেই মিঃ অস্টেন, স্থনেম্যান ও ভিয়েরসিং লোকজন নিয়ে প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করছেন—আমাকেও যেতে হলো। আমি গোলাপদাকে জিজ্ঞেস করলাম: ব্যাপার কি?

গোলাপদা বললেন: মহারাণা যাবেন বন্যশূকর শিকারে—সেইসময় গোটা শিকার-পর্বটা তুলতে হবে। অর্থাৎ মহারাণার শিকারে যাত্রা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সমস্ত।

ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে মহারাণা বেরুলেন কালো ঘোড়ায় চড়ে। কালো ঘোড়ার ওপর শুভ্র পোষাক পরে মহারাণা বসেছিলেন। তখন মহারাণার বয়স হয়েছিল যথেষ্ট, কারণ তাঁর দাড়ি পর্যন্ত ধব্‌ধবে। তাঁর পিছন পিছন অশ্বপৃষ্ঠে বিচিত্র সাজে যখন সিপাহীশান্ত্রীরা তীব্রবেগে প্রাসাদের ফটক থেকে বেরুলো—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আমাদের গাড়ীও তৈরী ছিল—ওখানকার 'শট' নেওয়ার পর আমরাও অনুসরণ করলাম মহারাণাকে। সমস্ত শিকারটাই আমরা তুলতে সমর্থ হয়েছিলাম। এরপর আমরা একদিন উদয়পুরের শুটিং শেষ করে চলে এলাম দিল্লীতে।

দিল্লীতে শুটিং হলো লাল কেল্লার বাহিরে এবং ভেতরে, দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাসে, কুতুবমিনারের কাছে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে। শুটিং-এর সময় যদিও আমি প্রোডাকশানে প্রফুল্লদার সহকারী হিসেবে কাজ করতাম, তবু মাঝে মাঝে ক্যামেরাম্যান মিঃ স্থনেম্যানের কাছ থেকে ক্যামেরা সম্বন্ধে নানাবিষয় জেনে নিতাম।

তিনিই আমাকে রিফ্লেক্টার-এর ব্যবহার কিভাবে করতে হয় তা হাতে-কলমে শিখিয়েছিলেন। লং শট, ফুল শট ও ক্লোজ-আপের জন্য বিভিন্ন ধরণের রিফ্লেকটার ব্যবহার করা হতো। লং শটে ছিল রূপোলী মোটা কাগজ, ফুল-শটে ছিল রূপোলী মোটা কাপড় এবং ক্লোজ-আপে ব্যবহার করা হতো সোনালী মোটা কাপড়। এসব কাপড় এবং কাগজ জার্মানী থেকেই আনা হয়েছিল। একসঙ্গে অনেকগুলি রিফ্লেকটার ব্যবহার করা হতো—কারণ তখন তো বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহারই ছিল না। সেইজন্যে যারা রিফ্লেকটার ধরতো তাদের রীতিমত ট্রেনিং দিতে হতো—আর এরা ইউনিটে বরাবর থেকে যেতো।

একদিন দিল্লীতে লাল কেল্লায় শুটিং হচ্ছে—এমন সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যেটার জন্যে আমি দায়ী না হলেও তার প্রতিক্রিয়া আমার জীবনের গতিটাকেই বদলে দিল।

তখন শীতকাল—ডিসেম্বর মাস। রোজ সকাল ন'টায় শুটিং সুরু হতো। আজ কুতুবমিনার, কাল হুমায়ুনের কবর, কোনদিন দেওয়ানী আম, কোনদিন দেওয়ানী খাস, কোনদিন বা দিল্লী লালকেল্লার আশেপাশে বিভিন্ন স্থানে শুটিং-এর লোকেশান থাকত। প্রফুল্লদা আর আমি ভোর পাঁচটায় উঠতাম। দিল্লীতে ডিসেম্বর মাসে ভোর পাঁচটা যে কি তা যারা থেকেছে তারাই জানে। তারপর যেদিন বেশী একস্ট্রা থাকত, সেদিন তো আমাদের প্রাণান্তকর ব্যাপার।

প্রথমে বাসে করে কিংবা নিজেদের গাড়ীতে করে সাতটার মধ্যে তাদের সকলকে নির্দিষ্ট লোকেশানে নিয়ে যেতে হতো। তারপর তাদের সাজ-পোষাক, মেক-আপ, অলঙ্কারাদি পরানো, অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হতো। এই সব সাহায্য করার জন্য ছজন সহকারী আমাদের ছিল। ঠিক সাড়ে আটটার সময় মিঃ অস্টেন, দুই ক্যামেরাম্যান এবং অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আসতেন। যেখানে শুটিং হবে, সেখানে আমরা আগে থেকেই ক্যামেরা রিফ্লেকটর প্রভৃতি খাটিয়ে তৈরী হয়ে থাকতাম—মিঃ স্নেম্যান ও মিঃ ভিয়েরসিংহ এসে সেগুলিকে সব সাজিয়ে ফেলতেন।

মিঃ অস্টেনের ন'টা মানে ঠিক ন'টা—ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় শুটিং আরম্ভ হতো। সেদিন একটা খুব বড় দৃশ্য নেওয়া হবে—প্রচুর 'একস্ট্রা' জমায়েত হয়েছে। সমস্ত একস্ট্রাকে পোষাক পরিয়ে তৈরী করে সেটে পাঠাতে পাঠাতে একটু দেরী হয়ে গেল।

'সেটে' গিয়ে দেখি সাংঘাতিক কাণ্ড—মিঃ অস্টেন ভীষণ রেগে গেছেন এবং প্রফুল্লদাকে জার্মান ভাষায় অবিশ্রাম বকাবকি করে যাচ্ছেন। প্রফুল্লদাও সমানে

ইংরাজীতে উত্তর করে যাচ্ছেন। প্রফুল্লদা মিঃ অস্টেনের সহকারী এবং প্রোডাকশান ম্যানেজার—তার ওপর একটা বিশেষ ভূমিকায় অভিনয়ও করছেন! এমন কি ব্যাপার হলো যার জন্যে মিঃ অস্টেন এত রেগে গেছেন! পরে বুঝলাম যে আর্টিস্টদের সেটে আসতে দেরী হয়েছে বলেই মিঃ অস্টেন এত রেগে গেছেন। প্রফুল্লদা যত উত্তর দেন, মিঃ অস্টেন তার থেকে আরও এক ডিগ্রী জোরে চেঁচিয়ে বকাবকি করেন। শেষে দেখলাম প্রফুল্লদা একসময় রেগে মেগে 'সেট' থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

যাবার সময় প্রফুল্লদা গোলাপদার হাতে শুটিং স্ক্রিপটখানি দিয়ে চলে গেলেন।

আমি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমাকে মিঃ অস্টেন ডেকে বললেন: বোসে, তুমি স্ক্রিপট্‌টা নাও। 'শট'গুলোর কোনটা ও-কে, কোনটা এন-জি লিখে যাবে আর প্রত্যেক 'সিনের' কতগুলো 'টেক' হলো তাও লিখে রাখবে। সেই সঙ্গে স্থনেম্যানের কাছ থেকে 'ফুটেজটা' টুকে রাখবে।

শুটিং-এর শেষে মিঃ অস্টেনকে যখন স্ক্রিপট্‌ ফেরৎ দিতে গেলাম তখন তিনি বললেন: আজ সন্ধ্যার সময় হোটেলে আমার ঘরে এস—বলেই গোলাপদার সঙ্গে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার সময় মিঃ অস্টেনের ঘরে ঢুকতেই তিনি আমায় তাঁর পাশে বসতে বললেন। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বললেন: কাল থেকে তুমি আমার সহকারী হয়ে কাজ করবে। আর প্রফুল্ল রায়ের যে 'রোল'টা করার কথা, সেটাও তোমাকে করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে গোলাপদা বললেন: সেই সঙ্গে প্রোডাকশান ম্যানেজারের কাজটাও করতে হবে। মোট কথা প্রফুল্লর কাজগুলি সবই তোমাকে করতে হবে। তুমি তোমার কাজগুলো সব ঠিকভাবে বুঝে নাও—এতে যদি তোমার আরও এ্যাসিস্ট্যাণ্টের দরকার হয় তাহলে বলো, তার ব্যবস্থা করে দেব।

আমি গোলাপদাকে জিজ্ঞেস করলাম: কিন্তু প্রফুল্লদা—আমায় বাধা দিয়ে গোলাপদা বললেন: প্রফুল্ল আজই কলকাতা চলে গেছে। মিঃ অস্টেনের সঙ্গে ওর বনিবনা হলো না। কি আর করা যাবে!

এই দারুণ শীতে সব থেকে মুস্কিল হতো সীতা দেবীকে নিয়ে। এমনিতেই তার ঘুম ভাঙতে দেরী হয়, তার ওপর আবার শীতকাল। প্রায়ই শুটিংয়ে আসতে দেরী হতো। এদিকে মিঃ অস্টেন ঘড়ির কাঁটা ধরে সব কাজ করেন। তিনি তো একদিন রেগেমেগে আমায় হুকুম দিলেন যে, ঠিক সকাল সাড়ে সাতটায় সীতার

ঘরে ধাক্কা দেবে, পাঁচমিনিট অপেক্ষা করবে। তার ভেতরে যদি সে তৈরী হয়ে বেরিয়ে না আসে তো ঘরে ঢুকে তাকে যে অবস্থায় পাবে সেই ভাবেই 'সেটে' এনে হাজির করবে।

সেদিন দিল্লীর লাল কেল্লার মধ্যে শুটিং—প্রচুর 'একষ্ট্রা'র সমাবেশ হয়েছে। সীতা দেবীকে নিয়ে যখন আমি লোকেশানে গিয়ে পৌছলাম তখন দেখি মিঃ অস্টেন ক্যামেরাম্যান দুজনকে কোনখান থেকে 'শট' নেওয়া হবে—তাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এদিকে আর এক বিভ্রাট! গোলাপদা তখন পর্যন্ত 'সেটে' আসেননি।

কি হলো তার? তাঁর তো সাধারণত দেরী হয় না। গোলাপদাকে না দেখতে পেয়ে মিঃ অস্টেনের মেজাজ ক্রমশঃ তিরিক্ষি হয়ে উঠছে। তিনি বললেন: হোটেলে গিয়ে দেখ—এত দেরী হচ্ছে কেন?

আমরা সকলেই সুইস হোটেলে (পুরাতন দিল্লী) থাকতাম। আমি তাড়াতাড়ি হোটেলে পৌছে তাঁর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখি যে ঘর বাইরে থেকে বন্ধ—অর্থাৎ তিনি ঘরে নেই। তাঁর বেয়ারা বলল: সাহেব খুব সকালে উঠে বেরিয়ে গেছেন।

—একলা গেছেন? না সঙ্গে আর কেউ ছিল? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—পাশের ঘরের মেমসায়েবও ছিলেন।

—কোথায় গেছেন জান? কিছু বলে গেছেন?

বেয়ারা ঘাড় নেড়ে জানাল: না সাহেব।

খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ! চারিদিকে সোরগোল পড়ে গেল। জানা-শোনা যে ক'টা জায়গা ছিল কাছাকাছি সব দেখলাম—কোথাও পাওয়া গেল না। আমাদের অনেকগুলো ট্যাক্সি ও প্রাইভেট গাড়ী নেওয়া ছিল—তাদের ড্রাইভারদের জিজ্ঞেস করায় একজন বলল: সে রায় সাহেবকে কুতুবমিনারের দিকে যেতে দেখেছে—সঙ্গে এক মেমসাহেব আছেন।

ছুটলাম কুতুব মিনারের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখি ডাক-বাংলোর বারান্দায় বসে গোলাপদা ও দেবিকারাণী ব্রেক-ফাস্ট খাচ্ছেন। আমাকে দেখে হেসে গোলাপদা বললেন: তুমি এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছ? জানলে কি করে যে আমরা এখানে আছি?

আমি বললাম: সে যেমন করে হোক জেনেছি। আপনি এখানে—আর এদিকে শুটিং আটকে আছে; চলুন, চলুন—

গোলাপদা বললেন: আজ তো যেতে পারব না।

—তার মানে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেসা করলাম। তাকিয়ে দেখি দেবিকাও মৃদু-মৃদু হাসছে।

দেবিকাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিল, বলল: আজ যে আমরা এনগেজ্‌ড হয়েছি—

গোলাপদা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন: So this is the day of celebration, not of shooting. মিঃ অস্টেন বোধহয় খুব রেগে গেছে, না?

আমি বললাম: হ্যাঁ, তা একটু রেগেছে বটে—তবে আপনি তো শুধু আর্টিস্ট নন—প্রোডিউসারও, সুতরাং—

গোলাপদা কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন: আমি জানি আমার আজ বেশী কিছু কাজ ছিল না—সুতরাং আমাকে ছাড়াও শুটিং হতে পারে। যাক, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি মিঃ অস্টেনকে—তুমি তাকে গিয়ে দাও—তিনি সব বুঝতে পারবেন। কিছু বলবেন না।

বলে, একটা প্যাডে ক'লাইন লিখে, খামের ভেতরে পুরে আমায় দিলেন। আমি সেই চিঠি নিয়ে এসে মিঃ অস্টেনকে দিলাম। তিনি পড়ে হেসে বললেন: বুঝলাম। সত্যিই আজ মিঃ রায়ের খুব বেশী কাজ ছিল না। তবে তিনিই তো প্রোডিউসার, তিনি না এলে আমি কোনদিনই শুটিং আরম্ভ করি না। আজ তাঁকে ছাড়াই করতে হবে দেখছি।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সুইস হোটেলে গোলাপদা ও দেবিকারাণীর এই এনগেজমেণ্ট উপলক্ষে খুব হৈ-চৈ হলো এবং অধিক রাত্রি পর্যন্ত প্রচুর পান-ভোজন চলল।

তারপর থেকে গোলাপদাকে সকালে ঠিক সময় ঘুম থেকে উঠিয়ে 'সেটে' হাজির করা একটা মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

তারপর একদিন এল আমার সেই ভূমিকা অভিনয়ের পালা।

ভূমিকাটা হলো আমি শুয়ে আছি—আমার বিপক্ষের লোক একটা সাপ গায়ের মধ্যে ছেড়ে দেবে—সাপটা আমার গা বেয়ে উঠে গলার কাছে এসে ফণা তুলে মুখে ছোবল দিতে যাবে এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে যাবে—আর আমি তাকে ধরে ফেলবো মাথার কাছটা। সাপের কথা শুনেই তো গা শির-শির করে—তার ওপর গায়ের ওপরে ছেড়ে দেবে! আমার তো ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল।

গোলাপদা বললেন: কোনো ভয় নেই—এ সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গা—কাছেই বেদে রয়েছে—সে গ্যারাণ্টি দিয়েছে কোন ভয় নেই। নইলে আমি কি রাজী হই? মানুষের প্রাণ নিয়ে আমি ছেলেখেলা করব?

আমি শুকনো মুখে বললাম : তবু গোখ্‌রো সাপ তো!

গোলাপদা বললেন : আচ্ছা, আমি এর ব্যবস্থা করছি। বলে তিনি খানিকটা 'লিকার' ব্র্যাণ্ডি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন : এক চুমুকে মেরে দাও, আর কোন ভয় নেই।

তাঁর কথামত খেয়ে নিলাম। শরীরটা বেশ গরম হয়ে গেল।

মেক-আপ্ করে সেটে এসে হাজির হলাম। শুটিং-এর আগে আর এক গ্লাস খাইয়ে দিলেন গোলাপদা। ব্র্যাণ্ডিটা এত কড়া যে মাথার ভিতরটা কি রকম করতে লাগল। আমি তো দুর্গা বলে শুয়ে পড়লাম, এমন সময় সাপুড়ে এসে তার চুবড়ি থেকে বার করল একটি বিরাট গোখরো সাপ।

শুটিং-এর আগে গোলাপদা আবার সাপুড়েকে জিজ্ঞেস করলেন : দেখ বাপু, সাপ ঠিক আছে ? কোন ভয়-টয় নেই তো!

সাপুড়ে আশ্বাস দিয়ে বললো : না সাহেব দেখুন না—বলে তার নিজের হাতে সাপের ছোবল খেল।

ঠিক শুটিং-এর আগে মিঃ অস্টেন আর একবার আমাকে সব বুঝিয়ে দিলেন কি কি করতে হবে। আমার তো তখন তুরীয় অবস্থা। মিঃ অস্টেন চেঁচিয়ে বললেন : স্টার্ট ক্যামেরা—

ক্যামেরা চলতে লাগল। আমার বিপক্ষ দলের একজন লোক এসে আমার জামার ভেতর সাপটা ছেড়ে দিয়ে গেল।

আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা দারুণ শির-শির ভাব বয়ে যেতে লাগল—অথচ আমার নড়াচড়া বারণ—কারণ আমি তো ঘুমুচ্ছি।

সাপটা গায়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে প্রথমবার কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডিরেকটার চেঁচিয়ে উঠলেন—cut-cut—ও হলো না—

অর্থাৎ সাপটার যেভাবে আসবার কথা সেভাবে এলো না। সুতরাং আবার নিতে হবে।

তখন আমি খানিকটা ধাতস্থ হয়েছি।

দ্বিতীয়বারও সাপটা ঠিক জায়গা দিয়ে বেরুল না। অতএব আবার!

তৃতীয়বারের বার সাপটি ঠিক গলার কাছ থেকে বেরিয়ে ফণা তুলে দাঁড়াল। ছোবল দিতে যাবে এমন সময় আমি তার মাথার কাছটা চেপে ধরলাম—এবং সাপটাকে টিপে ধরে দূরে ছুঁড়ে দিলাম।

এবারের 'টেক'টা ও-কে হলো। গোলাপদা ছুটে এসে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন : সাবাস্।

ভূমিকাটির নাম হচ্ছে : কীর্তিকার।

সেদিনকার শুটিং শেষ হলো।

হোটেলে ফিরতেই মিঃ অ্যালন ক্যাম্পবেলের কাছ থেকে একটি বেয়ারা এসে একখানি খাম আমায় দিয়ে গেল। মিঃ ক্যাম্পবেল ছিলেন এই চিত্রনির্মাতা ব্রিটিশ ইনস্ট্রাকশনাল ফিল্মসের প্রতিনিধি। খুলে দেখি তার মধ্যে দুশো টাকা আছে আর তার সঙ্গে একটা ভাউচার—লেখা রয়েছে : আজকের এই ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তোমার পুরস্কার।

বুঝলাম—এটা গোলাপদার নির্দেশেই হয়েছে। খুশী হলে গোলাপদা এই রকম কাজের লোকদের বাড়তি টাকা পাইয়ে দিতেন। কাজটা সুষ্ঠুভাবে হলে তার জন্যে লোককে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করতে তিনি কোনদিন পিছ্পাও হননি। এইভাবে বেশ মনের আনন্দে দিন কাটতে লাগল।

এই ছবিতে বাংলাদেশের আর একজন বিখ্যাত শিল্পী অভিনয় করেছিলেন—তিনি হলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী। তিনি অন্য একটি হোটেলে থাকতেন—চারুদাও সেই হোটেলে থাকতেন। সময় পেলেই তাঁর কাছে বসে নানা গল্প করতাম। এর আগে কলকাতায় স্টার থিয়েটারে 'কর্ণার্জুনে' তাঁর 'কর্ণ' দেখেছি—খুব ভালো লেগেছিল। অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছিলাম।

চারুদা একটা বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় তো করতেনই—তাছাড়া তিনি ছিলেন শিল্পনির্দেশক—পোশাক-পরিচ্ছদও তাঁরই ঘরে তাঁর তত্ত্বাবধানে তৈরী হতো।

এইভাবে দিল্লীর শুটিং শেষ হলো। দিল্লী ছাড়বার আগে আমাদের সকলকে মাইনে দেওয়া হলো। মিঃ অ্যালান ক্যাম্পবেল আমাকে ডেকে বললেন : বোস, এই মাস থেকে তোমার মাইনে হলো হাজার টাকা। সহকারী পরিচালক, প্রোডাকশান ম্যানেজার ও কীর্তিকারের ভূমিকাভিনেতা হিসেবে তুমি এই টাকা পাবে। আমি আগে পাচ্ছিলাম ৪০০্ টাকা—সুতরাং এই অভাবিত মাহিনা বৃদ্ধিতে মনটা খুশীতে নেচে উঠল।

তারপরে আমরা এলাম মহীশূরে। মহীশূর রাজপ্রাসাদ, বৃন্দাবন গার্ডেনস, শিবসমুদ্রম, চামুণ্ডী হিল প্রভৃতি জায়গায় শুটিং-এর পরে 'থ্রো অফ্ এ ডাইস'-এর কাজ শেষ হলো। তখন মার্চের মাঝামাঝি, ১৯২৯ সাল।

ইতিমধ্যে গোলাপদা ও দেবিকার রোমান্সও বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠল।

ছবির শুটিং শেষ হয়ে যাওয়ায় আমাদের চাকরি খতম্ হয়ে গেল। ইউনিটের সকলেই একে একে চলে গেলেন—ছবির 'নেগেটিভ'ও 'লাইট অফ এশিয়া'র মত চলে গেল জার্মানীতে পরিস্ফুটন ও মুদ্রণের জন্য।

চারুদা বললেন: এতদূর যখন এলাম—চল আমরা দাক্ষিণাত্যটা ভালো করে ঘুরে দেখে যাই।

আমি বললাম: অতি উত্তম কথা। আমাদের তো নিমন্ত্রণই করেছিল পূবায়া সিস্টার্স—চল আগে মারকারা (Marcara) যাই।

মারকারা হলো কূর্গ প্রদেশে—। যেখান থেকে এসেছেন জেনারেল ক্যারিয়াপ্পা, জেনারেল থিমায়ার মত সেনানায়করা। কূর্গ প্রদেশটাই হলো রণকুশলীদের দেশ।

একদিন আমি আর চারুদা মহীশূর থেকে বাসে করে মারকারার দিকে রওনা হলাম।

পূবায়া সিস্টার্স ছিল তিন ভগ্নি। নাচে, গানে, অভিনয়ে তারা ছিল অত্যন্ত পারদর্শিনী, 'থ্রো অফ এ ডাইস' ছবিতে তারা ছোট ছোট ভূমিকায় কাজও করেছিল। তারা আমাকে ও চারুদাকে নিমন্ত্রণ করেছিল তাদের দেশে যাবার জন্যে। আমরা মারকারায় গিয়ে উঠলাম ডাক-বাংলোয়। খুঁজে খুঁজে ওদের বাড়ীতে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখি ওদের বাড়ীর গেট দিয়ে একজন মহিলা বন্দুক উঁচিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছেন। মনে হলো তিনি ভীষণ রেগে গেছেন এবং একটা খুন-খারাপী হতে আর দেরী নেই। এই দেখে চারুদা বললেন: কি মধু—এখন কি এ বাড়ীতে ঢোকা ঠিক হবে? ভদ্রমহিলা যে রকম বন্দুক উঁচিয়ে বেড়াচ্ছেন তাতে আমাদের পৈতৃক প্রাণটা থাকবে তো?

আমি বললাম: বাইরে একটু দাঁড়িয়ে দেখাই যাক না কি ব্যাপার? সে রকম বেগতিক দেখলে যঃ পলায়তি—

দুজনে এই রকম আলোচনা করছি এমন সময় পূবায়া সিস্টার্সেরই একজন বাড়ীর ভেতর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে: আরে কি সৌভাগ্য আমাদের—আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

চারুদা বললেন: আসছি, কিন্তু তার আগে বল, এখুনি এক ভদ্রমহিলা বন্দুক উঁচিয়ে বেরিয়ে গেলেন, তিনি কে—কি ব্যাপার?

মেয়েটি হেসে বলল : ও আমার বড়দি—ঐ দিকটায় একটা পাগলা কুকুর বড় উৎপাত শুরু করেছে—তাকে মারতে গেল। ও কিছু নয়।

আমি বললাম : তোমার দিদি বন্দুক চালাতে জানে ?

মেয়েটি হেসে বলল : তার মানে ? বন্দুক চালাতে আমরা সবাই জানি। ছোটবেলা থেকেই ওতে আমরা খুব অভ্যস্ত।

—তাই নাকি ? বলে আমরা বাড়ীর ভেতরে ঢুকলাম।

পুবায়া ভগ্নিত্রয় আমাদের খুব আদর-যত্ন করল। ওখানে আমরা 'কুর্গী' নৃত্য দেখলাম। 'কুর্গী' নৃত্য ও বাদ্য অন্যান্য দেশীয় নৃত্য থেকে বেশ খানিকটা স্বতন্ত্র এবং তার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে।

মারকারায় কয়েকদিন থাকার পর আমরা গেলাম ম্যাঙ্গালোর। তারপর ম্যাঙ্গালোর উপকূল ধরে কানানোর, টেলিচেরী, কোচিন, এরনাকুলাম থেকে বাসে করে এলাম ত্রিবান্দ্রম। ত্রিবান্দ্রম থেকে মাদুরা—তারপর ত্রিচিনপল্লী হয়ে মাদ্রাজ। এইভাবে দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান সহর আমরা দেখলাম। সঙ্গে চারুদা থাকায় আমার সুবিধা হলো এই যে, তিনি শিল্পী মানুষ, দাক্ষিণাত্যের শিল্পকলা ও স্থাপত্য সম্বন্ধে বুঝবার কোন অসুবিধা ছিল না। বরং তাঁর শিল্প সম্বন্ধে বেশ ভালো পড়াশোনা থাকায় আমি অনেক কিছু শিখতে পারলাম।

মাদ্রাজে কয়েকদিন থেকে আমরা কলকাতা রওনা হলাম। ১৯২৯-এর এপ্রিলের শেষাশেষি।

কলকাতায় ফিরে এসে একদিন গেলাম মিঃ জাহাঙ্গীর ম্যাডানের সঙ্গে দেখা করতে। "এ থ্রো অফ্ এ ডাইস"-এর শুটিং নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো। সব শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—এখন কি করবে ঠিক করেছ ?

আমি বললাম : ক্যামেরাম্যানের কাজ।

তিনি হেসে বললেন : কেন, অভিনেতা হওয়ার শখ মিটে গেছে ?

আমি বললাম : হ্যাঁ—ক্যামেরার কাজ শেখবার জন্যেই জার্মানীতে গিয়েছিলাম। দেশে ফিরে এসে কুচবিহার স্টেটে বাঘ শিকারের একটা ডকুমেন্টারী ছবি তুললাম। তারপর রেঙ্গুনে একটি ছবির ক্যামেরাম্যানের কাজও করেছি। 'এ থ্রো অফ্ এ ডাইস' ছবিতে যদিও আমি ডিরেক্টার ফ্রাঞ্জ অস্টেনের এ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে কাজ করেছি, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় আমি ক্যামেরাম্যান মিঃ স্নেম্যানের সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম।

জাহাঙ্গীরজী বললেন : আচ্ছা, তুমি পরশুদিন এসো, তোমার কথা আমি মিঃ রুস্তমজীকে বলব—তারপর তাঁর কাছে নিয়ে যাব তোমায়। এই বিষয়ে তিনিই তো সব দেখাশোনা করেন।

রুস্তমজী দোতিওয়ালা জে, এফ, ম্যাডান-এর জামাই। ম্যাডান কোম্পানীর যা কিছু সুনাম, প্রসার, প্রতিপত্তি—সব এই রুস্তমজীর জন্যে। সুতরাং সব বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চরম।

যথাসময়ে জাহাঙ্গীরজী আমাকে রুস্তমজীর কাছে নিয়ে গেলেন।

রুস্তমজী সব শুনে বললেন : ক্যামেরাম্যান হয়ে কি করবে? ক্যামেরাম্যান তো আমাদের অনেক রয়েছে—মার্কনি, জ্যোতিষ সরকার, যতীন দাস, মংলু; তার চেয়ে ডিরেক্শান লাইনে এস। আমাদের মাত্র দুজন ডিরেক্টার রয়েছেন—গাঙ্গুলী (প্রিয়নাথ) আর ব্যানার্জি (জ্যোতিষ)। আমাদের দরকার একজন ডিরেক্টারের।

আমি বললাম : ডিরেকসান তো কখনও দিইনি—আমি কি পারব?

জাহাঙ্গীরজী বললেন : না পারবার কি আছে? কি এমন আছে এতে? অতবড় জার্মান ডিরেক্টার ফ্রাঞ্জ অষ্টেনের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে কাজ করেছ, আর কাজ শেখোনি?

আমি বললাম : হ্যাঁ শিখেছি, তবে—

জাহাঙ্গীরজী বললেন : ঠিক আছে, দরকার হলে আমি তোমায় সাহায্য করব। বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পগুলি তো সব জ্যোতিষবাবু আর গাঙ্গুলী মশায় (প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী) একটার পর একটা চিত্ররূপ দিয়ে যাচ্ছেন। তুমি বাংলাদেশের অন্য একজন নামকরা লেখকের গল্প যোগাড় কর দেখি। তারপর দেখা যাবে।

রুস্তমজীও এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

কার গল্প নেব? এই কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে এলাম। আমি তখন মেজদির বাড়ীতে ২৩নং রায় ষ্ট্রীটে থাকি। সেইখানেই আমার আলাপ হয় কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে। প্রমথেশ থাকত মালেন ষ্ট্রীটে—রায় ষ্ট্রীটের খুব কাছে, সুতরাং সন্ধ্যার সময় প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসত এবং মাঝে মাঝে আমিও ওর বাড়ীতে যেতাম। বেশীর ভাগ সময় তার সঙ্গে ফিল্ম সম্বন্ধে আলোচনা হতো। দু'-চারদিন আমার সঙ্গে 'গিরিবালা'র শুটিংও দেখতে গিয়েছিল।

আমি দেখতাম যে, ফিল্ম লাইন সম্বন্ধে তার দারুণ আগ্রহ। সে প্রায়ই বলত এই লাইনটাকেই সে পেশা হিসাবে নেবে। অবশ্য এর কিছুদিন পরেই প্রমথেশকে নির্বাক ছবির পর্দায় প্রথম দেখা গেল অভিনেতা হিসেবে, পরে প্রযোজক হিসেবে,

তারপর পরিচালক হিসেবে। শেষজীবনে সে ক্যামেরাম্যানের দায়িত্বও নিয়েছিল।

গল্পের বিষয় চিন্তা করতে করতে ভাবলাম, রবীন্দ্রনাথের একটা গল্পের চিত্ররূপ দিলে কেমন হয়! তাঁর তো এখনও কোন গল্পের চিত্ররূপ হয়নি।

তাঁর ছোট গল্পগুলি দেখতে দেখতে 'মানভঞ্জন' গল্পটি আমার বেশ মনে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ইংরাজীতে অনুবাদ করে জাহাঙ্গীরজীকে শোনালাম। তাঁর গল্প বেশ পছন্দ হলো। তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব বন্দোবস্ত করতে।

গেলাম একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তাঁর সেই প্রিয় ছাদের ঘরটিতে বসে ছবি আঁকছিলেন তখন। তাঁকে গিয়ে প্রণাম করতেই অনেকদিন পরে আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন: সেই যে শান্তি-নিকেতন থেকে চলে এলে, তারপর বোধহয় আর যাওয়া হয়নি?

আমি সবিনয়ে বললাম: আজ্ঞে না, এই ক'বছর তো ছবির ব্যাপারে নানা জায়গায় ক্রমাগত ঘুরতে হলো, সেজন্যে আর যাওয়ার সুবিধে হয়ে ওঠেনি।

তারপর আমি আমার আসল উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করলাম।

তিনি বললেন: এসব ব্যাপার তো আমার সলিসিটর দত্ত এণ্ড সেন দেখাশোনা করে—তাদের সঙ্গে দেখা করলে তারা সব ঠিক করে দেবে।

তারপর আমি বললাম: গল্পটি তো ছোট—আপনি যদি খানিকটা বাড়িয়ে-টাড়িয়ে দেন তো বড় ভাল হয়।

তিনি বললেন: তুমি একটা মোটামুটি খসড়া কর, তারপর আমি দেখে দেব।

এরপর একদিন ম্যাডান কোম্পানীর সঙ্গে বিশ্বভারতীর চুক্তিপত্র সই হয়ে গেল।

আমি গল্পটি কিছু কিছু বাড়িয়ে চিত্রনাট্য তৈরি করলাম। তারপর গুরুদেবকে সেটা দেখাতে তিনি জায়গায় জায়গায় সংশোধন করে 'সংলাপ' লিখে দিলেন। এই উপলক্ষে আমাকে কয়েকবার শান্তিনিকেতনেও যেতে হয়েছিল।

এতদিন পরে সেখানে গিয়ে দেখি যে, সেই আগের শান্তিনিকেতন আর নেই, এখন অনেক বড় হয়েছে, প্রচুর উন্নতি হয়েছে। সেদিনকার 'ব্রহ্মচর্য বালক বিদ্যালয়' নাম বদলে এখন 'শান্তিনিকেতন' হয়েছে। কিন্তু নিয়মকানুনগুলি সব আগের মতই রয়েছে। বিশেষ করে সন্ধ্যার সময় গানের আসর আরও জমজমাট হয়েছে। গুরুদেব গানের লাইনগুলি বলে যাচ্ছেন আর দিনুদা (দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এসরাজ

নিয়ে সেগুলিকে সুরে ফেলছেন। এ এমন একটা পরিবেশ, যার কোন তুলনাই হয় না।

একদিন গুরুদেব আমাকে বললেন, 'মানভঞ্জন' নামটা বদলে অন্য একটা কিছু দিতে। আমি বললাম: নায়িকা 'গিরিবালা'র নামে নামকরণ করলে কেমন হয়?

তিনি সম্মতি দিলেন।

যাই হোক, 'গিরিবালা'র চিত্রনাট্য তো শেষ হলো।

জাহাঙ্গীরজী ও রুস্তমজীর শুনে ভালই লাগল।

জাহাঙ্গীরজী বললেন: বোস, নতুন কোনো 'হিরো'র সন্ধান কর। সব ছবিতেই দুর্গাদাস আর দুর্গাদাস। একটু চেঞ্জ হোক।

আমি বললাম: দেখি চেষ্টা করে।

আমি নতুন হিরোর সন্ধানে লেগে রইলাম। অনেককে বললাম—শেষে একদিন বন্ধুবর সুধীরেন্দ্র সান্যাল একটি নতুন ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এলো। বেশ চেহারা, তার বয়স খুব কম। অবশ্য এর আগে ম্যাডানেরই একটা ছবি ('সতী-লক্ষ্মী')তে সে কাজ করেছিল। সে আমাকে তার জীবনের ইতিহাস বলল। সে আগে পুলিশে কাজ করত, কিন্তু অভিনয়ের দিকে তার ঝোঁক বেশী বলে সে পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

আমি ঠাট্টা করে বললাম: পুলিশ থেকে একেবারে আর্টিস্ট?

এই শিল্পীটি আর কেউ নয়, আমাদের বহু ছবির নামকরা নায়ক—পরে চরিত্রাভিনেতা হিসাবেও যথেষ্ট নাম করেছিল—ধীরাজ ভট্টাচার্য।

জাহাঙ্গীরজী ধীরাজকে দেখে বললেন: হাঁা, একে দিয়ে চলবে।

তারপর নায়িকার সমস্যা। তখন নির্বাক যুগ—বেশির ভাগ ছবিতেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের দেখা যেত। এখনকার মত তখন অভিজাতবংশীয়া মেয়েদের সিনেমায় নামার রেওয়াজ ছিল না। কয়েকজনকে দেখার পর আমি নির্বাচন করলাম মিস্ বনি বার্ড নাম্নী একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে। পরে তার নামকরণ করলাম ললিতা দেবী। একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নেমেছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র। আর একটি ছোট ভূমিকায় নেমেছিলেন শান্তি গুপ্তা।

'গিরিবালা'র শুটিং শুরু হলো। বর্তমানের ইন্দ্রপুরী স্টুডিও ছিল তখনকার ম্যাডান স্টুডিও। শুটিং সব বাইরেই হতো, কারণ, স্টুডিওর ভিতরে আলো নিয়ে শুটিং তখনও চালু হয়নি।

একদিন শুটিং করছি আমি স্টুডিওর বাইরে। বাইরেই 'সেট' সাজানো হয়েছে। আমি আমাদের জার্মান ক্যামেরাম্যান মিঃ স্নেম্যানের কাছ থেকে রূপোলী ও সোনালী রিফ্লেক্টর -এর কাপড়গুলো নিয়ে নিয়েছিলাম, তাই দিয়ে নতুন করে রিফ্লেক্টর তৈরি করিয়েছিলাম। শুটিং-এর সময় সূর্যের অবস্থান বুঝে রিফ্লেক্টর কিভাবে দিতে হবে এই নিয়ে ক্যামেরাম্যান যতীন দাসের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রুস্তমজী সেটে এসে দেখেন যে, আর্টিস্টদের সামনেও যেমন আলো ফেলা হয়েছে, তেমনি পেছন দিকেও আলো ফেলা হয়েছে। তখন তিনি অবাক হয়ে বললেন: লোকে তো দেখবে আর্টিস্টের মুখ, তা পেছনে রিফ্লেক্টর দিচ্ছ কেন?

আমি তাঁকে বোঝালাম যে, যেমন আর্টিস্টকে সামনে থেকে আলো দিতে হয়, তেমনি পেছন থেকে আলো না ফেললে ব্যাক-গ্রাউণ্ড থেকে তাকে আলাদা করা যায় না। একে বলে ব্যাক্ লাইটিং।

রুস্তমজী বললেন: কে দেখছে অত? লোকে আর্টিস্টদের মুখ দেখতে চায়। মিছেমিছি সময় নষ্ট—। বলে চলে গেলেন।

তারপর একদিন গেছি ৫নং ধর্মতলা স্ট্রীটে ম্যাডানের অফিসে। গিয়ে দেখি তাঁদের সেই কাঁচের ঘরে রুস্তমজী, জাহাঙ্গীরজী ও তাঁর ভাই বার্জোরজী বসে আছেন। আমাকে দেখে রুস্তমজী জিজ্ঞেস করলেন: শুটিং ক্যায়সা হুয়া? কুছ্ভি নিক্লা? —কুছ্ভি নিক্লা, এ-কথার মানেটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি বোকার মত ফ্যাল্ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলাম।

জাহাঙ্গীরজী আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন: আরে, এর আগে একদিন অন্য একটা ছবির শুটিং হলো সমস্ত দিন—ল্যাবরেটারী থেকে যখন ফিল্ম বেরুলো, তখন দেখা গেল কিছুই Exposed হয়নি। ক্যামেরাম্যানকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হলো, কি ব্যাপার? সে বলল: বোধ হয় Shutter পড়ে গিয়েছিল, সেটা কারু নজরে পড়েনি।

আমি হেসে বললাম: না, না—সে ভয় নেই। শুটিং যখন হয়েছে, তখন কিছু না কিছু নিক্লাবে নিশ্চয়ই।

এইখানে রুস্তমজী সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা দরকার। রুস্তমজীই ছিলেন ম্যাডান কোম্পানীর প্রাণ। তাঁর জন্যেই ম্যাডান কোম্পানী এতবড় হতে পেরেছিল। গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলে প্রথমে তাঁরা ছবি দেখাতে শুরু করেন। ছবি দেখাবার আগে ছবির পর্দাটা জল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হতো। লোকের কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা

এঁরাই ক্রমশঃ ক্রমশঃ জাগিয়ে তুললেন, তারপর তাঁবু উঠে গিয়ে সিনেমাগৃহ হতে লাগলো এবং কালক্রমে সারা ভারতে প্রায় একশতটি চিত্রগৃহের মালিক হয়ে বসলেন ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড। চিত্রপ্রদর্শন ছাড়া চিত্র-নির্মাণের দিকেও এগিয়ে এলেন তাঁরা। প্রচুর ছবিও করলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর টাকাও করলেন। এ সমস্তই হয়েছিল রুস্তমজী দোতিওয়ালার কর্মদক্ষতার গুণে।

এতবড় ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও এঁর মনটি ছিল অত্যন্ত সরল ও উদার। তাঁর কর্মচারীদের অভাব অভিযোগ কিছু শুনলে, সাধ্যমত তার প্রতিকার করতেন। ম্যাডানের অফিসের সঙ্গেই ৫নং ধর্মতলাতেই জে. এফ. ম্যাডানের একটি Provision Stores ছিল। তাঁর হুকুম ছিল ম্যাডানের কর্মচারীরা এখানে গিয়ে শুধু সই করে দিলেই যে কোনো জিনিস পেতে পারে। পরের মাসে মাইনে নেবার সময় মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে। কিন্তু দেখা যেতো বেশীর ভাগ সময়ই তা আর কাটা হতো না।

একদিন একটা শুটিং-এর কথা মনে পড়ে। Necessity is the mother of invention—তারই একটা উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

সেদিন শুটিং হচ্ছে পার্ক স্ট্রীটে ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের অফিস ঘরে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—নায়ক দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে একজন লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। আমি ভেবে দেখলাম যে, এটা ট্রাক্ শট্ হলে ভাল হয়। কিন্তু হবে কি করে? তখনও আমাদের এখানে 'ট্রলীর' প্রচলন হয়নি। অথচ দেখেছি, 'থ্রো অফ এ ডাইস' ছবি তোলবার সময় মিঃ স্যনেমান 'ট্রলী' দিয়ে শট্ নিয়েছেন। তখন যতীন দাস ও আমি একটা মতলব বের করলাম। ডাঃ মিত্রের বাড়ী থেকে একটা কার্পেট চেয়ে নিলাম, সেই কার্পেটের ওপরে ক্যামেরাটা বসালাম। আর্টিস্টদের চলাফেরার গতির সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোককে বললাম টানতে। তাতে 'ট্রলী'র মতই এফেক্ট্ হলো।

আর একদিনের কথা।

রাজা প্রফুল্লকুমার ঠাকুরের আলম বাজারের বাগান বাড়ীতে শুটিং হচ্ছে। গাড়ীবারান্দার ওপর মস্ত বড় চাতাল, সেইখানে ছবির একটি দৃশ্য তোলবার ব্যবস্থা চলেছে। দৃশ্যটি হচ্ছে চাঁদনী রাতের। নায়িকা গিরিবালা চাতালের ওপর একলা বসে স্বামীর বাড়ী ফেরবার জন্যে অপেক্ষা করছে। নিশুতি রাত—হঠাৎ সে শুনল পায়ের আওয়াজ; ফিরে দেখল, স্বামী তারই দিকে এগিয়ে

আসছেন। দেখে তার চোখ-মুখে ফুটে উঠল আনন্দের আভাস।—গ্রীষ্মের কড়া রোদে বসে আছে আমাদের হিরোইন বনি বার্ড, থেকে থেকে ঘাম ঝরছে, আর আল্‌তো করে তা' মুছে ফেলছে, মেক-আপ যাতে না খারাপ হয়ে যায়, এমনভাবে। তার ওপর রিফ্লেক্টার দেওয়া হয়েছে তার চোখের ওপর। সে আলোয় ভালো করে তাকানোই মুস্কিল; অথচ তাকে বলা হচ্ছে, চোখ-মুখে আনন্দের ভাব ফুটিয়ে তুলতে। বেচারা কিছুতেই চোখ খুলতে পারছে না রিফ্লেক্টারের দিকে তাকিয়ে; তবু তাকে চেষ্টা করে প্রয়োজনীয় ভাব ফুটিয়ে তুলতে হলো শেষ পর্যন্ত। ভাবি, সে-যুগে সূর্যালোকে আর্টিস্টরা কি কষ্ট সহ্য করেই না অভিনয় করতে বাধ্য হতো। সে-যুগে চাঁদনী রাতের দৃশ্যগুলি প্রিণ্ট করা হতো নীল রং-এর পজিটিভ ফিল্মে। এই দৃশ্যটিও সেইভাবে প্রিণ্ট করায় এমন সুন্দর এফেক্ট হয়েছিল যে, গুরুদেব পর্যন্ত খুশী হয়ে প্রশংসা করেছিলেন।

এইভাবে গিরিবালার শুটিং একদিন শেষ হলো। টেরিটি বাজারে ছিল ম্যাডানের ল্যাবরেটরী; শুটিং-এর পরে নেগেটিভ্ কি রকম হলো তা দেখতে যেতাম রোজ। এইখানেই ছিল ম্যাডানের সব ছবির পরিবেশন-কেন্দ্র এবং তার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়।

এই সময় আমি সাধনাদের বাড়ী প্রায়ই যেতাম—তখন তার বয়স হবে, পনেরো কি ষোল। ছোট বয়েস থেকেই অভিনয়ে এবং নাচ-গানে তার অসম্ভব আগ্রহ ছিল। তাদের স্কুলের যখন কোন 'ফাংশান' হতো, তখন আমি নানাভাবে তাকে সাহায্য করতাম—এবং সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দু' জনের মধ্যে বেশ একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল।

১৯৩০ সাল—'গিরিবালার' সমস্ত কাজ শেষ করে ছবিটির মুক্তির প্রতীক্ষা করছি। এমন সময় স্থির করলাম, গুরুদেবের "দালিয়া" মঞ্চস্থ করব। গুরুদেব তখন বিদেশে, আমি বিশ্বভারতীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসে তদানীন্তন বিখ্যাত নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে নাট্যরূপ দেওয়ালাম। সেই নাট্যরূপ অনুযায়ী রিহার্সাল শুরু হলো। সাধনাকেই ঠিক করলাম নায়িকা 'তিন্নির' ভূমিকায়। গুরুদেবের অনেকগুলি গান 'দালিয়া'তে সন্নিবেশিত হলো। তার মধ্যে কতকগুলি গান যেমন—'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী' 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ', 'না, না গো না, কোরনা ভাবনা', 'আবার এসেছে আষাঢ়' আমি এবং টি. ফ্রাঙ্গোপোলো harmonise করলাম। কিন্তু গুরুদেব তো নেই—

কাকে শোনাব? এর আগে গুরুদেবের গান কখনও harmonise হয়নি—তাই ভয় ছিল—ঠিক হলো কি-না। অনুমোদন পাবার জন্যে গেলাম বিবি মাসীর কাছে। বিবি মাসী হলেন ইন্দিরা দেবী। বিবি মাসী নিজে ভাল গাইতে পারতেন এবং পিয়ানোয় তাঁর হাত ছিল খুব সুন্দর। গুরুদেব তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং শুনেছি গুরুদেবের কতকগুলি গানের সুরও তিনি করেছিলেন। 'দালিয়া'র harmonised গানগুলি শুনে তিনি খুব খুশী হলেন।

১৬ই এপ্রিল ১৯৩০ সালে 'দালিয়া' নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ হলো।

প্রযোজনা ও পরিচালনা: মধু বসু, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা—চারু রায়, পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রা: টি. ফ্রাঙ্কোপোলো, দেশীয় অর্কেস্ট্রা: মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য। মিহিরকিরণ হচ্ছেন তিমিরবরণের অগ্রজ, অত্যন্ত গুণী লোক।

'দালিয়া'র ভূমিকালিপি: তিন্নি—সাধনা সেন, দালিয়া—মধু বসু, বুড়ো জেলে —প্রীতিকুমার মজুমদার, জুলেখা—ইন্দিরা রায়, রহমৎ শেখ—ক্যাঃ কুনাল সেন।

সমালোচকরা 'দালিয়া' দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন:

Dr. Tagore's "Dalia" produced by Mr. Modhu Bose and presented by the Calcutta Amateur Players at the New Empire Theatre last evening, was well received by a large gathering. Miss Sadhana Sen, a girl yet in her teens, who appeared in the role of Amina, scored a distinct triumph. Her acting was all that could be desired and she captivated the audience by a graceful display of dances. A special word of praise is due to Capt. Kunal Sen who, as Rahmat Sheik, looked a typical Pathan chief. The scenic arrangement and orchestral music were perfect.

—STATESMAN. 17-4-30

"It is a well-known fact that Tagore's plays are very seldom attempted in the first instance except by the great Poet himself—for the simple reason that the average producer does not dare to interpret Tagore unless Tagore himself has already shown the way. It rested with Modhu Bose to take the initiation and choose 'Dalia' and we must congratulate him heartily on his great success. Mr. Bose has caught the spirit of the story of Dalia exactly, and under his direction every artiste has given a first class rendering of his or her part—From every point of view the performance and the presentation was of a very high order.

—ADVANCE. 20-4-30.

"Produced by Mr. Modhu Bose, it ("Dalia") has been acclaimed as one of the brightest entertainments of the season."

—THE BENGALEE. 20-4-1930.

"বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে গত বুধবার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' অভিনয় দেখিতে যাইয়া সত্যই তৃপ্ত হইয়া আসিয়াছি। এই নাটকের সাফল্যের জন্য আমরা প্রযোজক শ্রীমধু বসুকে অভিনন্দিত করিতেছি···কুমারী সাধনা সেনের লীলায়িত ছন্দে নৃত্য ও প্রাণঢালা অভিনয় অতি চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।"

—'শিশির'—১৯শে এপ্রিল ১৯৩১

'ডালিয়ার' অভিনয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হয়েছে খুব আর্টিস্টিক আবেষ্টনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটিকে রূপ দেবার চেষ্টায়। এর শিল্পী নির্বাচনে কুশীলবদের সাজ-পোশাকে এবং বিভিন্ন দৃশ্যের পারিপার্শ্বিক সৃষ্টিতে এমন একটা স্নিগ্ধতা আছে যে, চোখকে আরাম দেয় ও মনকে খুশী করে। এজন্যে প্রধানত সমস্ত প্রশংসা 'দালিয়ার' প্রযোজক শ্রীযুক্ত মধু বসুর··· —'নবশক্তি'—২৫শে এপ্রিল ১৯৩০

শ্রীযুক্ত মধু বোসের প্রযোজনায় নিউ এম্পায়ারে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প 'দালিয়া'র নাট্য-সংস্করণটি অভিনীত হয়ে গেল সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা ও পুরুষদের দ্বারা···শিল্পী চারু রায় নির্দেশিত সাজসজ্জা শ্রীযুক্ত মধু বোস ও মিঃ ক্রাঙ্গোপোলো প্রদত্ত ইংরাজী ধাঁচে (harmonised) বাংলা সুর-যোজনা, এবং পাত্র-পাত্রীদের মার্জিত অভিনয়-বৈশিষ্ট্য—এই ক'টি বিষয়ে বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল এবং এইখানেই হয়েছিল এর অভিনবত্ব ও সার্থকতা। নাট্য-পূজারী হিসেবে প্রত্যেকেই আপন আপন অভিনয়ে আমাদের সোৎসাহ সহানুভূতি লাভ করলেও, আমরা যথার্থই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি 'আমিনা'র ভূমিকায় কুমারী সাধনা সেনের অভাবিত নাট্য-নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে। আবৃত্তি, নৃত্য, গীত, মূক ও মুখর ভাবাভিব্যক্তি, তাঁর প্রতিটি জিনিষ হয়েছিল প্রথম শ্রেণীর শিল্প-সাধিকার মত।'

···'নাচঘর'—৩.৫—১৯৩০

এর কিছুদিন পরে গুরুদেব বিদেশ থেকে ফিরে এলেন।

এদিকে 'গিরিবালা'র মুক্তি-দিবস ঘোষিত হলো ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমান 'উত্তরা)'। গুরুদেবকে প্রথম দিনই আমি নিয়ে এলাম ছবি দেখাতে। দোতলার একটি বক্সে গুরুদেব বসে ছবি দেখতে লাগলেন। আমি খুব অস্থির এবং উত্তেজিতভাবে কাছাকাছি ঘুর-ঘুর করতে লাগলাম।

ছবি শেষ হলে তিনি আমায় আশীর্বাদ করে বললেন যে, তাঁর ভালই লেগেছে। নরেশ মিত্র একটি দুষ্ট লোকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—নরেশ বাবুর অভিনয়ই গুরুদেবের সব থেকে ভাল লেগেছিল। পরিচালকরূপে প্রথম আসরে নেমে যে সকলকে খুশী করতে পেরেছিলাম, সবার ওপরে গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়েছিলাম, তাতেই মনে বেশ জোর পেলাম।

'গিরিবালা' বেশ কিছুদিন চলেছিল ক্রাউন সিনেমায়। কাগজে কাগজে সুখ্যাতি বেরিয়েছিল প্রচুর।

একদিন সিনেমায় গেছি, সেখানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল জয়গোপাল পিল্লের সঙ্গে। জয়গোপাল 'লাইট অফ্ এশিয়া'র ইউনিটে ছিল একজন শিল্পী হিসেবে। ফটোগ্রাফীর দিকেও তার খুব আগ্রহ ছিল। সে আমাকে দেখে অভিনন্দন জানিয়ে বললে: মধু তোমার 'গিরিবালা' আমি দেখেছি—আমার খুব ভালো লেগেছে।

আমি বললাম : তোমার ভাল লেগেছে শুনে খুব আনন্দ হলো, কেননা আমি জানি তুমি ভাল সমালোচক।

—তা এখন নতুন কি করছ ? জিজ্ঞাসা করল জয়গোপাল।

আমি বললাম : আপাততঃ কিছুই করছি না। ম্যাডান থিয়েটারের সঙ্গে আর একটি ছবির ডিরেকশানের কথাবার্তা চলছে, তবে এখনও কনট্রাক্ট হয়নি।

—পাঞ্জাব যাবে ? বলল জয়গোপাল।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : পাঞ্জাব কেন ?

তখন সে সব ভেঙে বললে যে, লাহোরে একটা ফিল্ম কোম্পানীর পত্তন করেছে সে—পাঞ্জাব ফিল্ম কোম্পানী। তার মালিক হলেন লাহোরের একজন বড় ব্যবসায়ী—হরিরাম শেঠী। জয়গোপাল হলো টেকনিক্যাল ডিরেকটার। প্রথম ছবির জন্য একটি গল্পও ঠিক করা হয়েছে। খাইবার পাসের মধ্যে দিয়ে আফ্রিদী, মাসুদ এবং অন্যান্য উপজাতীয়রা যে 'ক্যারাভ্যান' লুট করে, তাকে কেন্দ্র করে এক রোমান্সের সৃষ্টি—তাই নিয়ে গল্প। ছবির নাম হলো "খাইবার ফ্যালকন"। শেষে জয়গোপাল আমায় জিজ্ঞেস করল : দেবে এই ছবির ডিরেকশন, মধু ? টাকার দিক থেকে ম্যাডান থিয়েটারের কাছে কি পাবে জানি না, তবে তার চেয়ে অনেক বেশী তো পাবেই, তাছাড়া অনেক নতুন দেশ দেখবার সুযোগ পাবে। লাহোর থেকে শুরু করে, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার, কোহাট, খাইবার পাস, ম্যরি, শ্রীনগর এবং কাশ্মীরের আরো যে সব ভাল ভাল জায়গা দেখবার আছে, সবই কোম্পানীর খরচে দেখতে পারবে।

'লাইট অফ্ এশিয়া'র শুটিং-এর সময় থেকে জয়গোপালের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এবং নতুন নতুন দেশ দেখবার আমার যে একটা দারুণ নেশা আছে সেটা সে ভাল করেই জানত। সুতরাং আমি যদি 'খাইবার ফ্যালকন' ছবির ডিরেকশন দিতে রাজি হই, সে শুধু দেশ দেখবার প্রেরণায়, বেশী টাকা পাব বলে নয়। যা হোক, আমি জয়গোপালের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম এবং এর কিছুদিন পরেই পাঞ্জাব ফিল্ম কোম্পানীর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে ফেললাম।

আমার কনট্রাক্ট হয়ে যাবার পর জয়গোপাল আমাকে বললে : মধু, একজন নায়িকা তো ঠিক করতে হয়, লাহোরে হিরো পাওয়া যাবে কিন্তু চরিত্রোপযোগী নায়িকা পাওয়া মুস্কিল হবে।

আমি বললাম : চেষ্টা করে দেখি।

ফট্ করে জয়গোপাল বলে উঠল : তোমার 'গিরিবালা'য় নায়িকা যে করেছে—ললিতা দেবী, তাকে ঠিক করে ফেল না ! তাকে তো আমার বেশ ভালই লাগল।

আমি জানতাম যে ললিতা দেবী অর্থাৎ বনি বার্ড ম্যাডানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ এবং চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত অন্য কোথাও কাজ করতে পারবে না। আর তখন চিত্রনির্মাতা বলতে তো ম্যাডান কোম্পানীই, তারা তাদের আর্টিস্টকে কখনও 'ধার' দেবে না অন্য কোম্পানীকে। আমি জয়গোপালকে এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম : তুমি যখন বলছ তখন আমি রুস্তমজীকে বলব নিশ্চয়, তবে কতদূর কি হবে বলতে পারি না।

পরদিন সকালবেলাতেই ম্যাডানের অফিসে গেলাম রুস্তমজীর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখি যথারীতি রুস্তমজী, বার্জোরজী, জাহাঙ্গীরজী, ও ফ্রামজী সেই কাঁচের ঘরে বসে আছেন। আমাকে দেখেই ফ্রামজী চেঁচিয়ে উঠলেন : আরে এস, এস—মিঃ বোস এস। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। আমি এই মাত্র জাহাঙ্গীরকে বলছিলাম তোমাকে একটা খবর দেবার জন্যে।

আমি এই রকম একটা অভ্যর্থনা পেয়ে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলাম, কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : কি ব্যাপার ? হঠাৎ আমার সঙ্গে কি এমন জরুরী দরকার ?

তখন ফ্রামজী বললেন : দেখ, আমি জার্মানী যাচ্ছি কিছু সিনেমার যন্ত্রপাতি কিনতে। তুমি তো বেশ কিছুদিন মিউনিক ও বার্লিনে কাটিয়ে এসেছ, আমাকে ২।১ টা ভাল অথচ সস্তা হোটেলের নাম বলতো। আমার এক বন্ধু সম্প্রতি জার্মানী থেকে ফিরেছে, সে বললে Travel Agent-রা যে সব হোটেল ঠিক করে দেয়, সেগুলোর চার্জ বড় বেশী।

মিউনিকের নাম শুনেই বুকের মধ্যে কি রকম করে উঠল। হঠাৎ কতকগুলো পুরোনো স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করে এলো। এতদিন পরে হিল্ডার স্মৃতি আবার নতুন করে মনের মধ্যে জেগে উঠল। যদি শুধু একটা খবর পেতাম যে সে বেঁচে আছে, ভাল আছে, তাহলে মনে অনেক শান্তি পেতাম। অবশ্য আমি মনে প্রাণে কখনও বিশ্বাস করিনি যে হিল্ডার মত মেয়ে কোনোদিন আত্মহত্যা করতে পারে··· যার অতখানি মনের জোর······

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে ফ্রামজী বললেন : এই তো বছর তিনেক আগে তুমি মিউনিক, বার্লিন থেকে এলে, আর এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে ?

ফ্রামজীর কথায় আমার সম্বিত ফিরে এল, আমি তাড়াতাড়ি বললাম : না, না ভুলিনি—মনে করবার চেষ্টা করছিলাম কোন হোটেলের নাম বলব, আর আমি তো

কখনও হোটেলে থাকিনি। তার চেয়ে আমি বরং পারচালক ফ্রাঞ্জ অস্টেনের নামে আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। তাঁর কাছে আপনি অনেক সাহায্য পাবেন। মিঃ অস্টেন চমৎকার লোক এবং আমাকে খুব ভালবাসেন। এমেলকার অফিসে গেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। এখন তিনি "A Throw of a Dice"-ছবির সম্পাদনা করছেন।

ফ্রামজী বললেন: আরে, ওখানে তো আমাকে যেতেই হবে, কারণ, ছবিখানার পরিবেশনা নেব ঠিক করেছি। সেই সম্বন্ধে কথা বলতে হবে, তার পাবলিসিটির বন্দোবস্তও করতে হবে।

এমেলকা অফিসের কথা উঠতেই হিল্‌ডার স্বামীর কথা মনে পড়ে গেল। আমি ফ্রামজীকে বললাম: আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে···যদি রাখেন···

ফ্রামজী বললেন: অত কিন্তু-কিন্তু করছো কেন? আমার সঙ্গে এতটা ফর্মালিটি কেন? যদি কোনো জিনিস আনবার ইচ্ছে থাকে, তবে বলো না, আমি নিশ্চয় নিয়ে আসব।

আমি বললাম: না-না কোন জিনিসের দরকার নেই। তবে 'এমেলকা'র একজন ডিরেকটারের নামে আমি একটা চিঠি দেব, যদি তাঁর হাতে দিয়ে দেন, আমি খুব বাধিত হব। তাঁর বাড়ীর ঠিকানায় আমি দু'তিন খানা চিঠি দিয়েছিলাম, পরে টেলিগ্রামও করেছিলাম, কিন্তু কোন জবাব পাইনি। তাঁর মত ভদ্রলোক খুব কমই দেখা যায়, সুতরাং মনে হয় আমার চিঠি বা টেলিগ্রাম তিনি পাননি। হয়তো পুরোনো বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও উঠে গেছেন। যা হোক, দয়া করে 'এমেলকার আপিসে তাঁর খোঁজ করবেন, যদি মিউনিক ছেড়ে অন্য কোন জায়গায় গিয়ে থাকেন সেখানকার ঠিকানা নিয়ে আমার এই চিঠিটা সেই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।

ফ্রামজী বললেন: তুমি নিশ্চিন্ত থেকো বোস, যদি তিনি মিউনিকে থাকেন তাঁর হাতেই তোমার চিঠি দেব এবং যদি মিউনিক ছেড়ে অন্য জায়গায় চলেও গিয়ে থাকেন তাহলে সেখানকার ঠিকানা এমেলকার আপিস থেকে জেনে তোমার চিঠি পাঠিয়ে দেব।

আমি ফ্রামজীকে ধন্যবাদ জানালাম। তাতে তিনি বললেন: ধন্যবাদের কি আছে, এইটুকু তোমার জন্যে করতে পারব না, আর যখন আমি মিউনিকে যাচ্ছি। যাহোক তুমি মিঃ অস্টেনের এবং তোমার বন্ধুর চিঠি, দু' তিন দিনের

মধ্যে দিয়ে যেও, আমি দিন পাঁচেক পরেই বোম্বে যাচ্ছি, সেখান থেকেই জাহাজে চড়ব।

কাল কিম্বা পরশু আপনাকে চিঠি দু'টো দিয়ে যাব, আমি বললাম। তারপর রুস্তমজীর কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি বেশ খুশমেজাজে আছেন, আমাকে দেখেই বললেন: তোমার তো জয়জয়কার বোস। কাগজে কাগজে 'গিরিবালা' এবং তোমার প্রশংসা। ক্রাউন সিনেমায় এখনও প্রায় প্রত্যেকদিনই Full House.

আমি বললাম: সবই আপনার জন্যই হয়েছে।

আমার জন্যে মানে? বললেন রুস্তমজী। তুমি এ ছবির ডিরেকশন দিয়েছ। আমি আর কি করেছি?

আমি বললাম: আপনার জন্যই ত আমি ডিরেক্টার হলাম, আমি ত প্রথমে এসেছিলাম ক্যামেরাম্যান হবার জন্য।

—ওঁ তাই বল, হাসতে হাসতে বললেন রুস্তমজী।

আমি দেখলাম এই সুযোগ—পাঞ্জাবের কণ্ট্রাক্ট এবং ললিতার কথা বলবার।

রুস্তমজী বললেন: বোসো বোসো, কি ব্যাপার, অনেকদিন আসনি।

তাতে জাহাঙ্গীরজী বলে উঠলেন: মধু যে এখন খুব ব্যস্ত ওর ফিয়াঁসেকে নিয়ে, আপনি শোনেন নি, মধুর বাক্‌দানের কথা?

—না ত', আমায় তো তোমরা কেউ বলনি, বললেন রুস্তমজী। তা কার সঙ্গে বাকদান হলো?

জাহাঙ্গীরজী বললেন: আপনি তো দেখতে গেলেন না মধুর 'ডালিয়া' নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। তাতে যে মেয়েটি নায়িকার ভূমিকা নিয়েছিল—সাধনা সেন, তার সঙ্গে। ওর অভিনয়, নাচ ও গান দেখে স্বতঃই মনে হচ্ছিল যে, ওর ভেতরে ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা আছে, If her talents are developed she will be a very great artiste one day.

আমি রুস্তমজীকে এইবার পাঞ্জাব ফিল্ম কোম্পানীর কণ্ট্রাক্ট-এর কথা বললাম।

রুস্তমজী বলে উঠলেন: তুমি তো আমাদের হয়ে টেগোরের 'ডালিয়া' করবে বলেছ জাহাঙ্গীরকে। তুমি চলে গেলে এ বই করবে কে? 'গিরিবালা'র এমন সাফল্যের পর টেগোরের গল্প আমি অন্য কারুর ওপর ভরসা করতে পারি না।

আমি বললাম, পাঞ্জাব ফিল্ম-এর ছবি ৫।৬ মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর ফিরে এসে 'ডালিয়া' করব। এরই মধ্যে 'ডালিয়া'র চিত্রনাট্যও লেখা শেষ করব। রুস্তমজীকে কিছুটা চিন্তিত দেখে বললাম: ভারতের এদিকটা, মানে পাঞ্জাব

ও কাশ্মীর আমার দেখা হয়নি—অন্যের খরচায় দেখা হয়ে যাবে। নতুন দেশ দেখার এ রকম সুযোগ আবার কবে আসবে জানি না।

শুনে রুস্তমজী হেসে বললেন: তোমার দেশ ভ্রমণ করার একটা নেশা আছে দেখছি—এই কিছুদিন আগে বার্মায় গেলে—তারপর হিমাংশু রায় প্রোডাকসনের সঙ্গে উদয়পুর থেকে শুরু করে মহীশূর এবং দক্ষিণ ভারত ঘুরে এলে, এখন আবার চল্লে পাঞ্জাব, সেখান থেকে কাশ্মীর। তা বেশ যাও। কিন্তু ৫।৬ মাসের মধ্যে ফিরে আসবে তো?

শেষ কথাটা জাহাঙ্গীরজীর কানে গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন: ডিসেম্বরে মধুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে শুনলাম—সুতরাং ও ঠিক আসবে। আর দেশ দেখার যতই নেশা থাক না কেন—ওর প্রাণটা তো এখানে পড়ে থাকবে।

তারপর রুস্তমজীকে ললিতার কথাটা বলে বসলাম। রুস্তমজী তখন জাহাঙ্গীর-জীকে ললিতার কথা বললেন। জাহাঙ্গীরজী ম্যাডান থিয়েটারের ফিল্ম প্রোডাক-শনের কর্মকর্তা ছিলেন। উনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তিনি রুস্তমজীকে বললেন: মধু যখন অনুরোধ করছে, তখন দিন অনুমতি, আর ললিতাও আমাদের কোন ছবিতে এখন কাজ করছে না—সুতরাং এখানে বসে না থেকে সেও ঘুরে আসুক—আমাদেরও কিছু টাকা বেঁচে যাবে।

বেশ হাসিখুশীর মধ্যে দিয়ে অনুমতি পাওয়া গেল। আসবার সময় ফ্রামজীকে আবার বলে এলাম যে, চিঠি দুটি দু' একদিনের মধ্যেই দিয়ে যাব।

ওখান থেকে ফিরে জয়গোপালকে অনুমতির কথা বলতেই সে খুব খুশী হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ললিতার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করে ফেলল।

সাধনার সঙ্গে আমার যে বাক্‌দান হয়ে গেছে, সে কথা আগেই বলেছি। সাধনা ও তার মা, বাবাকে জানালাম যে 'খাইবার ফ্যালকন' ছবিটা শেষ করে এসেই বিবাহ হবে—খুব সম্ভব ডিসেম্বরের মাঝামাঝি।

রাওয়ালপিণ্ডি যাবার আগে ফ্রামজীকে দু'খানা চিঠি দিয়ে এলাম—একটা মিঃ অস্টেনের নামে, আর একটি হিল্‌ডার স্বামীর নামে। হিল্‌ডার স্বামীকে যে চিঠি দিয়েছিলাম তাতে লিখেছিলাম আমার ডিরেক্টার হবার সংবাদ এবং সেই সঙ্গে আমার আসন্ন বিবাহের খবর। আরও লিখেছিলাম, হিল্‌ডার খবরটা যেন শিগ্‌গির পাই—সে কোথায় আছে এবং কেমন আছে। মেজদির রায় স্ট্রীটের বাড়ীর ঠিকানাতে জবাব দিতে বলেছিলাম।

জয়গোপাল ও আমি প্রথমে গেলাম রাওয়ালপিণ্ডি। আমাদের সঙ্গে আমাদের আর একজন বন্ধু গেল—গীতা ঘোষ। গীতাও "লাইট অফ এশিয়া" প্রোডাক্‌শনে আমাদের সঙ্গে ছিল। ফটোগ্রাফীর দিকে তার খুব আগ্রহ ছিল। জয়গোপাল তাকে প্রথম 'চান্স' দিল ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করবার। আমাদের দলে আর একজন ক্যামেরাম্যান ছিল—তার নাম মণি সাণ্ডেল।

আমি জয়গোপাল ও গীতা রাওয়ালপিণ্ডির ফ্ল্যাশম্যানস্ হোটেলের একটা "কটেজে" থাকতাম। ওখানে গিয়ে 'খাইবার ফ্যালকনে'র চিত্রনাট্য রচনা শুরু করলাম। রাওয়ালপিণ্ডিতে তখন প্রচণ্ড গরম সুতরাং চলে গেলাম এ্যাবটাবাদে। তখন ফলের 'season'—দুপুর বেলা আপেল পেয়ারা ও নাসপাতি গাছের নীচে বসে চিত্রনাট্য লিখতাম এবং গাছ থেকে পাকা আপেল, পেয়ারা, নাসপাতি ছিঁড়তাম আর আমরা খেতাম। তার পরে গেলাম মারী এবং সেখান থেকে একবার শ্রীনগরও ঘুরে এলাম। সেপ্টেম্বর মাসে চিত্র-নাট্য শেষ হলো এবং আমরা রাওয়ালপিণ্ডিতে ফিরে এলাম।

'লোকেশান' দেখতে আমি একাই গেলাম—আমার সঙ্গে গেল আমাদের প্রোডাক্‌শন ম্যানেজার। প্রথমে গেলাম পেশোয়ার। সেখান থেকে 'খাইবার পাস' দিয়ে লণ্ডিখানা, তারপর পেশোয়ারে ফিরে এসে গেলাম কোহাট। সেখান থেকে এলাম ঝেলম ডিস্ট্রিক্ট-এ এবং সেইখানেই একটি স্থান নির্বাচন করলাম। দৃশ্য প্রায় সব জায়গাতেই এক। চারিদিকে পাহাড়, আর তার নীচ দিয়ে রুক্ষ, কঙ্করময় পথ চলে গেছে—জনবসতি খুব কম। নির্বাচিত স্থানটির নাম হলো "চুয়া সাইদন শাহ"। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে। এই স্থানটি নির্বাচনের প্রধান কারণ হলো যে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে চুয়া পর্যন্ত বাস চলে। সুতরাং যাতায়াতের সুবিধা হবে। 'লোকেশন' ঠিক করে আমি রাওয়ালপিণ্ডিতে ফিরে এলাম। জয়গোপাল লাহোরের একটি পাঠান ছেলেকে ঠিক করেছিল নায়কের ভূমিকায়—নাম সিকান্দার। নায়িকার ভূমিকায় ললিতা দেবী কলকাতা থেকে এল—সঙ্গে এল তার মা। আর একটি মেয়ে-চরিত্রের জন্য পেশোয়ার থেকে, নবীন নাম্নী একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে ঠিক করলাম।

হরিরাম শেঠী এলো লাহোর থেকে—শুটিং-এর সব বন্দোবস্ত করা হলো।

'চুয়া সাইদন শাহ' যাবার আগে, আমি হিলডার স্বামীর চিঠি পেলাম। চিঠিখানা এসেছিল কলকাতায় রায় স্ট্রীটের ঠিকানায়, মেজদি রি-ডাইরেক্ট করে দিয়েছিল।

চিঠিখানা পড়তেই মনের মধ্যে এতদিন যে একটা বিরাট বোঝা জগদ্দল পাথরের মতো বসেছিল, সেটা সরে গেল। হিল্ডা তার বাপমায়ের কাছে ফিরে গেছে এবং পোলাণ্ডের একজন বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পীকে বিয়ে করেছে। যাক, এতদিন হিল্ডার আত্মহত্যার সংবাদ শুনে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল—যদিও আমি মনেপ্রাণে কখনও বিশ্বাস করতে পারি নি, যে হিল্ডার মত মেয়ে, যার মনের এত জোর, সে কখনও আত্মহত্যা করতে পারে। যা হোক, এতদিনে একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বুকটা হাল্কা হলো।

হিল্ডার স্বামী আরও লিখেছেন যে হিল্ডার সঙ্গে 'ডাইভোর্স' হবার পর তিনি মিউনিক ছেড়ে নানান দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন। বছরখানেক হলো আবার মিউনিকে ফিরেছেন এবং বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখন হোটেলেই থাকেন। সেই হোটেলেই ফ্রামজী ম্যাডানের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। চিঠির শেষে, আমার আসন্ন বিবাহের খবর পেয়ে, আমাকে এবং আমার ফিয়াঁসে সাধনাকে, তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ভারমুক্ত মন নিয়ে রওনা হলাম 'চুয়া সাইডন শাহ'—সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিলাম নতুন ছবির কাজে। এখানে পাহাড়ের ওপর এক ডাক-বাংলো ছিল—সেইখানে আমি, গীতা এবং মণি সাণ্ডেলের থাকবার জায়গা ঠিক হলো। জয়গোপাল যখন আসত, সেও আমাদের সঙ্গেই থাকত। আর একটি বাংলো ঠিক করা হলো—সেখানে ললিতা, তার মা, নবীন এবং তার এক বোন ও সিকান্দর থাকত। আমাদের প্রোডাকশন ম্যানেজারও সেই বাংলোতেই থাকত। একদল আফ্রিদী ও মাসুদ ছিল আমাদের দলে 'একস্ট্রার' ভূমিকার জন্যে। এরা ছাড়া অনেকগুলি ভূতপূর্ব বেলুচ ও পাঠান রেজিমেণ্টের সৈন্যও ছিল। সংখ্যায় প্রায় ৫০।৬০ জন হবে।

চুয়া সাইদন শাহতে 'খাইবার ফ্যালকনে'র শুটিং শুরু হলো। এ ছবির "খাইবার ফ্যালকন" নামকরণ হওয়ার একটু ইতিহাস আছে। খাইবার পাসে যারা 'ক্যারাভ্যান' লুট করত, তাদের সর্দারের কাছে বরাবর একটি করে বাজপাখী—ইংরেজীতে যাকে বলে Falcon থাকত। এই বাজপাখীদের এমনভাবে ট্রেণিং দেওয়া হতো যে, যেখান দিয়েই ক্যারাভান যাক না কেন তারা ঠিক সন্ধান নিয়ে আসত। সর্দার এ বাজপাখী মারফৎ সন্ধান পেয়ে ক্যারাভ্যান লুট করতে বেরুত।

শুটিং এগুতে লাগল।

একদিন রাত্রে ডাক-বাংলোয় আমি আর গীতা বসে ডিনার খাচ্ছি। এমন সময় আমাদের হেডমিস্ত্রী গঙ্গা সিং একটি বন্দুক নিয়ে ঝড়ের মত আমাদের ঘরে এসে ঢুকেই লম্বা সেলাম দিল। তার হাতে বন্দুক দেখে অবশ্য ভয় পাবার কিছু ছিল না, কারণ সীমান্ত প্রদেশে সবার কাঁধেই বন্দুক ঝোলানো দেখতাম। বহু জায়গায় ছোট ছোট বন্দুক তৈরীর কারখানাও দেখেছিলাম।

কিন্তু গঙ্গা সিং-এর মুখ দেখে মনে হলো সে ভীষণ ভয় পেয়েছে।

গঙ্গা সিং বলল: সর্বনাশ হয়েছে সাহেব।

আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: কি, হয়েছে কি ?

গঙ্গা সিং বলল: যে লোকটির হাতে 'একস্ট্রা'দের রেশন দেবার ভার ছিল তাকে আফ্রিদী ও মাসুদের দল একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে জ্যান্ত পোড়াবার ব্যবস্থা করছে।

শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম: কেন, কি করেছে সে ?

গঙ্গা সিং বলল: ওদের অভিযোগ, ধরম সিং নাকি ওদের রেশন যা বরাদ্দ, তার চেয়ে অনেক কম দিয়েছে। তাতে ওরা সন্দেহ করছে যে ও নিশ্চয় চুরি করেছে। সেইজন্যে ওরা বলছে যে চোরের শাস্তি পুড়িয়ে মারা। আপনি একবার আসুন, নইলে ওকে ওরা নির্ঘাৎ পুড়িয়ে মারবে।

এই উত্তেজিত ক্ষুধার্ত জনতার সম্মুখে আমি গিয়ে কি করব ?

গঙ্গা সিং কাতরভাবে বলল: আমি ওদের খুব ভাল করে জানি, ওদের সর্দার আগে মিলিটারীতে ছিল। আপনাকে সে মনে করে ওদের দলপতি অর্থাৎ Commander বলে—সুতরাং আপনি যা বলবেন তা ওরা নিশ্চয় শুনবে।

গীতা এদিকে বেশ ভয় পেয়ে গেছে। সে আমাকে বললে: না, না—মধু, ওখানে যাবার দরকার নেই, এ সিচুয়েশানে তোমার কথা ওরা শুনবে না মোটেই, শেষে তোমাকে শুদ্ধ মেরে বসবে।

আমি নিজেও যে ভয় পাইনি তা নয়। কিন্তু বাইরে সাহস দেখিয়ে বললাম: হাঁা, মারলেই হলো! গঙ্গা সিংকে বললাম: চল দেখি গিয়ে। ডিনার শেষ না করেই উঠে পড়লাম।

গিয়ে যা দেখলাম তাতে তো আমার চক্ষুস্থির।

দেখলাম ধরম সিংকে একটা গাছের সঙ্গে বেশ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে। কাছেই বিরাট আগুন জ্বালানো হয়েছে। তার কাছে একটা প্রকাণ্ড লোহার সিক পড়ে আছে। এই সিকে করে দুম্বাকে পুড়িয়ে ওরা খায়। লোকটা তো এরই মধ্যে ভয়ে আধ-মরা হয়ে গেছে।

আমি ওদের সর্দারকে ডেকে বললাম : একজন জ্যান্ত লোককে তোমরা পুড়িয়ে মারছ ?

সর্দার রাগতভাবে আমার কাছে এসে বলল : আর ও যে আমাদের না খেতে দিয়ে মারছে ! ও আমাদের সকলের রেশন চুরি করেছে—ওকে পুড়িয়ে মারাই উচিত।

আর সকলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল : চোরকে পুড়িয়ে মারাই উচিত। দেখলাম সকলেই দারুণ ক্ষেপে গেছে।

আমি দেখলাম এভাবে ভাল মানুষের মত বললে কোন ফল হবে না, লোকটাকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। বেশ শক্ত হাতে ব্যাপারটাকে সামলাতে হবে।

আমি বললাম : জান, একটা লোককে পুড়িয়ে মারা কত বড় বে-আইনী। এ লোকটাকে আমি এনেছি, আর তোমরা যদি এভাবে একে মেরে ফেল, তবে আমাকেই দায়ী হতে হবে।

দেখলাম সকলে চুপ করে আমার মুখের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম যে খানিকটা ওষুধ ধরেছে। তখন আমি সর্দারকে বললাম, গলাটা বেশ নরম করে : তোমরা আমাকে তোমাদের নেতা বলে মানো তো ! আমি বলছি লোকটাকে ছেড়ে দাও। কাল ভোরেই ওকে রাওয়ালপিণ্ডি পাঠিয়ে দিচ্ছি। এইবার থেকে তোমাদের খাবার যাতে ঠিকমত পাও সে ব্যবস্থা আমি নিজের হাতে করব।

এই কথায় সর্দার খানিকটা নরম হলো। দলের অন্যান্য লোকদের আফ্রিদী ভাষায় কি বলল। তারপর আমাকে বলল : সাহেব, শুধু আপনার কথাতেই ওকে ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু কাল সকালে যেন ওকে আর আমরা দেখতে না পাই।

একজন লোক গিয়ে তার দড়ি কেটে দিল। লোকটা ভয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল। ধরম সিং সে যাত্রা বেঁচে গেল।

গঙ্গা সিংকে আমি বলে দিলাম যে কাল প্রথম বাসেই যেন সে রাওয়ালপিণ্ডি চলে যায়।

মাসুদ ও আফ্রিদীদের মধ্যে একটা জিনিস দেখেছি যে, যাকে তারা নেতা বলে মনে করে তার জন্যে তারা প্রাণ দিতে পারে। শহরের সভ্যতার বাইরে এইসব উপজাতীয় অশিক্ষিত লোকদের মন যেমনি কঠিন এবং দয়ামায়াহীন, তেমনি আবার কর্তব্যপরায়ণ। যাকে তারা গুরু বলে মানে তার জন্যে তারা সব করতে পারে।

দলপতিকে যে তারা কি রকম খাতির করে তার আর একটা উদাহরণ দেওয়াটা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

একদিন আমরা শুটিং করে ফিরবার সময় গাড়ীতে উঠেছি, কিন্তু গাড়ী কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছে না। দেখা গেল যে তেল একদম ফুরিয়ে গেছে। সে জনহীন প্রান্তর থেকে আমাদের ডাক-বাংলো প্রায় ৪।৫ মাইল হবে। এদিকে ডাক-বাংলোয় না পৌছুলে তেলের কোনো ব্যবস্থাই হবে না। গাড়ীকে একমাত্র ঠেলে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই আফ্রিদীরা আমাদের সকলকে অর্থাৎ আমি, গীতা, মণি, বনি বার্ড ও সিকান্দারকে গাড়ীতে বসিয়ে ঐ অতখানি পাহাড়ী রাস্তা তারা ঠেলে নিয়ে গেল হৈ-হৈ করতে করতে হাসিমুখে।

নভেম্বরের শেষের দিকে আমাদের শুটিং শেষ হলো। এদিকে সাধনার সঙ্গে আমার বিয়ের দিন স্থির হয়েছে ১০ই ডিসেম্বর ১৯৩০। হাতে আর বিশেষ সময় নেই। আমাকে কলকাতা ফিরতে হবে অবিলম্বে। আফ্রিদী দলের যে সর্দার ছিল সে কিভাবে খবর পেয়েছিল আমার বিয়ের ব্যাপারটা। সে আমাকে এসে জানাল: আপনারা চলে যাচ্ছেন, আমরা এতদিন আপনার সঙ্গে কাজ করলাম। সেজন্য আমরা আপনাদের একটা বিদায় অভিনন্দন দেব আজ সন্ধ্যার সময়। ঐ সামনের খোলা জায়গাটায় নাচ-গান হবে, আপনারা দয়া করে আসবেন।

তাদের এই সরল মনের সামান্য প্রার্থনাকে আমি 'না' বলতে পারলাম না। আমি রাজী হলাম।

সন্ধ্যার সময় তাদের নির্দিষ্ট স্থানে গেলাম, গিয়ে দেখলাম যে বহুলোক জমায়েত হয়েছে। আমাদের দলের লোক ছাড়াও আশপাশের গ্রাম থেকেও অনেক লোক এসেছে। তারা সব বসেছে চারিদিকে গোল হয়ে, মাঝখানে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। আমাকে তারা বসতে দিল একটা দড়ির খাটিয়ায়। আমার চারদিকে চারজন আফ্রিদী বন্দুক নিয়ে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রইল। তারা সকলেই ভূতপূর্ব সেনাবাহিনীর লোক। আর একটা খাটিয়াতে গীতা, মণি এবং অন্যান্য কর্মী ও শিল্পীরা।

এরপর সুরু হলো নাচ। এ নাচকে ওরা বলে 'খটক্' নাচ। এ নাচটা হলো পুরোপুরি পুরুষদের নাচ। প্রায় ৪০।৫০ জন জওয়ান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আগুনের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচে। এটা হলো উপজাতীয়দের রণ-নৃত্য। এই নাচের মধ্যে এমন একটা শক্তি ও সৌন্দর্যের সমাবেশ আছে যে ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। আগুনের চারিদিকে তারা যখন ঘুরছে, মাঝে মাঝে তাদের সোল্লাস চিৎকার পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—আগুনের লেলিহান শিখায় তাদের

চেহারাগুলি অদ্ভুত দেখাচ্ছে, সঙ্গে হাতের কোষমুক্ত তরবারিগুলি ঝিলিক দিয়ে উঠছে—এই সব দেখতে দেখতে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। স্থানকাল পাত্র ভুলে আমি তন্ময় হয়ে দেখছি—এমন সময় একটা বিরাট দুম্বা (এক জাতীয় মাংসবহুল ভেড়া) এনে আমার সামনে ফেলেই একটা ছুরি বসিয়ে দিল। দুম্বাটা চিৎকার করে উঠল, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে আমি চমকে উঠলাম। শুধু চমকে ওঠা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনের সুরটা এক নিমেষে কেটে গেল—সমস্ত মনটা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল। বিরক্ত হয়ে কাছের প্রহরীটাকে বললাম: এটা এখান থেকে নিয়ে যাও।

প্রহরীটা সসম্মানে বলল: তা হয় না সাহেব—এটা আপনাকে তরোয়াল দিয়ে ছুঁতে হবে।

সর্দার এসে বলল: আপনি আজ আমাদের সম্মানিত অতিথি—যাঁদের আমরা সম্মান করি তাঁদের সামনেই আমাদের দুম্বাটা কাটার রীতি। আপনি তরোয়াল দিয়ে একবার এটাকে ছুঁয়ে দিন। বাস, তাহলেই হবে।

মনে মনে আমি এটা সমর্থন না করলেও তাদের মনে ব্যথা দিতে মন সরলো না। তাদের কথামত তরোয়াল দিয়ে দুম্বাটাকে স্পর্শ করলাম।

তারপর তারা সেটাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, ছালটা ছাড়িয়ে, সিকের উপর তুলে, আগুনের ওপর ঘোরাতে লাগল—অর্থাৎ রোষ্ট হতে লাগল!

এর পরে তাদের নাচ আরও ক্ষিপ্র, আরও উদ্দামগতিতে চলতে লাগল। এরকম একটা অভাবনীয় পরিবেশ আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে।

তারপর খাবার আয়োজন। তণ্ডুরের নান রুটি আর দুম্বার রোষ্ট। অপূর্ব স্বাদ। খাবার আগে বুঝতে পারিনি যে এ খেতে এত ভালো লাগবে। এত নরম ও সুস্বাদু যে মুখে দিতে না দিতেই মাখনের মত গলে যায়। যাই হোক, খুব তৃপ্তি করে আমরা সবাই খেলাম।

যেদিন চলে আসছি সেদিন সর্দার বলল: সাহেব, আপনার বিয়ে—আমরা কি বিয়ে দেখতে পাবো না?

আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম: তোমরা যাবে কি করে? সে কি এখানে? এখান থেকে প্রায় ১৫০০ মাইল দূরে—কলকাতায়।

সর্দার নাছোড়বান্দা—সে বলল, সে আপনি কিছু ভাববেন না। আমরা ঠিক রেলে চেপে চলে যাবো। রেলে তো আর আমাদের ভাড়া দিতে হবে না।

তারা ভেবেছিল যে সীমান্ত প্রদেশের রেলে যেমন তারা ভাড়া-টাড়ার বিশেষ ধার ধারে না—খুশিমত উঠল, নামল—এই রকম হয়ত এদেশেও হবে।

আমি তাকে অনেক করে বুঝিয়ে নিরস্ত করলাম। আমি বললাম : বিয়ের পর শীগ্‌গীর লাহোরে ফিরে আসব—মেম-সাহেবও আসবে—তখন তোমরা আমাদের দু'জনকে সম্বর্ধনা জানিও।

তারা একটু ক্ষুণ্ণ হলো বটে, কিন্তু আর কিছু বলল না।

যাবার দিন তারা অনেক উপহার নিয়ে এল—কম্বল, সতরঞ্চি, মেওয়া প্রভৃতি। তাদের এই সরলতা ও আনুগত্য দেখে তাদের ছেড়ে আসতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল।

একদিন চুয়া সাইদন শাহ ছাড়লাম রাওয়ালপিণ্ডির উদ্দেশ্যে। আফ্রিদী ও মাসুদের দল সেই দীর্ঘ পঞ্চাশ মাইল রাস্তা আমার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে এল পায়ে হেঁটে।

রাওয়ালপিণ্ডিতে আমি ফ্ল্যাসম্যান্স হোটেলে পৌছবার পর তারা আমাকে শেষবারের মত বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেল।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কলকাতায় এসে পৌছুলাম ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে। আগেই বলেছি যে বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছিল ১৩ই ডিসেম্বর। সেই তারিখ অনুসারে সাধনার বাবা প্রেসে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপতে দিলেন এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। আমি যখন কলকাতায় এসে পৌছলাম তখন আমার বন্ধু-বান্ধব সব বলতে লাগল : ১৩ তারিখে বিয়ে করছিস, দিনটা বদলে ফেল এখনো। ঐদিনে বিয়ে করলে জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পাবি।

সকলেই বলতে লাগল এই কথা—শুনে শুনে আমারও মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগল। আমি সাধনার বাবা ও মাকে গিয়ে বললাম যে তারিখটা ১৩-র বদলে যদি ১৫ হয়, তো খুব ভাল হয়।

তাঁরা বললেন : তা এখন কি করে সম্ভব? নিমন্ত্রণ চিঠি ছাপতে গেছে—সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—এখন শেষ মুহূর্তে তারিখ কি করে বদলানো যায়? যাই-হোক, আমি যখন পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম, তখন আমার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁরা ১৩ তারিখ বদলে ১৫ তারিখেই বিয়ের দিন ধার্য করলেন—যদিও ১৩ তারিখ দিনটি ১৫ তারিখের চেয়ে অনেক বেশী শুভ ছিল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বাড়ী 'কমল কুটির'-এর (এখন যেখানে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটুশান) সংলগ্ন জমিতে আমার শ্বশুর সরলচন্দ্র সেন বাড়ী করেছিলেন।

সেখানেই খুব ঘটা করে আশীর্বাদ হলো। অল্পদিন পরেই 'কমল কুটিরে'র সামনের জমিতে বড় সামিয়ানা খাটিয়ে তিন আইন অনুসারে সাধনার ও আমার বিয়ে হলো। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ছাড়া নববিধান সমাজের আচার প্রায় হিন্দু বিবাহের মতই—সেই সাতপাক ঘোরা—শুভদৃষ্টি—প্রচারকের মন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ—মালা বদল ইত্যাদি। বিয়েতে ধুমধাম হয়েছিল যথেষ্ট। মা এলেন রাঁচী থেকে। বাবা অবশ্য আসতে পারেননি কারণ তাঁর তখন যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, সেজন্য রাঁচীর বাড়ী থেকে কোথাও যেতেন না। তিনি তাঁর আশীর্বাদ পাঠালেন।

বিয়ের পরে ২৩নং রায় ষ্ট্রীটে মেজদির বাড়ীতেই উঠলাম। পাশেই ২৪নং রায় ষ্ট্রীট; এই বাড়ীটিও হলো মেজদির শ্বশুর রজনীনাথ রায়ের। বাড়িটা তখন খালি ছিল, সুতরাং বৌভাত খুব ধুমধাম করে ২৪নং রায় ষ্ট্রীটেই হলো। সমস্ত ব্যবস্থাই অবশ্য মা করেছিলেন।

বেনেপুকুরে আমার সেজ ভগ্নিপতি স্যার বি. এল. মিত্রের একটা বাড়ী ছিল—মা সেই বাড়ীটা নিয়েছিলেন। বৌভাতের পর আমরা সেইখানেই উঠে গেলাম। বিয়ের হাঙ্গামা চুকতে বেশ কয়েকদিন গেল।

এর পর একদিন গেলাম ম্যাডানের আফিসে। সেখানে যাবার প্রধান কারণ—'খাইবার ফ্যালকনের' সম্পাদনা শেষ করে এসে 'ডালিয়া' ছবিতে হাত দেব রুস্তমজীকে এই কথা বলা।

৫নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটে ম্যাডানের আপিসের কাঁচের ঘরে অন্যেরা ঢুকতে একটু ইতস্তত করত কিন্তু আমার ছিল অবারিত দ্বার। সেদিন ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম রুস্তমজী খুব উত্তেজিতভাবে গুজরাতী ভাষায় বার্জোরজী, জাহাঙ্গীরজী এবং অন্যদের বলছেন: এইসব গরীব কর্মচারীর আর করিন্থিয়ান থিয়েটারের স্টাফদের মাইনে কমিয়ে দিয়ে এবং কয়েকজনকে ছাঁটাই করে দিলেই কি ম্যাডান কোম্পানীকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে? যেভাবে দেনা করা হয়েছে…এই পর্যন্ত শুনে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। রুস্তমজীর কয়েকটি কথায় যা বুঝলাম তাতে মনে হলো যে, তিনি ম্যাডান কোম্পানীর শোচনীয় অবস্থার কথা বলছেন। পাঞ্জাব যাবার আগে যখন এসেছিলাম তখন তো কিছুই বুঝতে পারিনি—সকলের কাছে হাসিমুখেই বিদায় নিয়েছি। এই ক' মাসের মধ্যে এমন কি ব্যাপার হলো! অবশ্য যখন 'গিরিবালা'র ডিরেকশন দিচ্ছিলাম, তখন দেখেছিলাম দুই একজন অবাঙ্গালী ব্যবসাদারকে কাঁচের ঘরের ভিতর

এবং দু' একবার শুনেওছি তাদের ম্যাডানের ছেলেদের বলতে : পঞ্চাশ হাজার কেন, এক লাখই রেখে দিন—আবার তো দরকার লাগতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে রুস্তমজী খুব উত্তেজিত অবস্থায় টেবিল ছেড়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আমার সঙ্গে দেখা হতেই আমি বললাম : এখন আপনি ব্যস্ত রয়েছেন—আমি না হয় পরে—

আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন : না, না, পরে কেন—এস আমার সঙ্গে। বলে পেছনের দিকে চলে গেলেন।

পেছনে, মস্তবড় বাড়ী। ম্যাডানের সব ছেলেই এই বাড়ীতে থাকতেন এবং রুস্তমজীও এখানে থাকতেন। আমি রুস্তমজীর সঙ্গে তাঁর ফ্ল্যাটে গেলাম। তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে আমায় বসতে বললেন। আমি আমতা আমতা করে বললাম : আজ আপনাকে বড় চিন্তিত দেখছি—এমন কি ব্যাপার হলো, মিঃ রুস্তমজী ?

রুস্তমজী ঠিক কি বলেছিলেন, আজ আর তা হুবুহু মনে নেই, তবে এইটিই আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে ম্যাডান কোম্পানীর আর বেশী দিন নেই। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ রুস্তমজীর চোখে জল এসে গেল। তাঁবু খাটিয়ে ছবি দেখানো থেকে শুরু করে ম্যাডান কোম্পানীর যখন পত্তন হয়,তখন মিঃ জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডান (জে. এফ. ম্যাডান)-এর ছেলেরা সব শিশু। সেই জন্যে মিঃ জে. এফ. ম্যাডান সবই তাঁর জামাই রুস্তমজী দোতিওয়ালার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। রুস্তমজী নিজের বুদ্ধি এবং কর্মদক্ষতায় আস্তে আস্তে একশোটির বেশী সিনেমা তৈরী করেছিলেন সারা ভারতে। তাছাড়া নিজেদের স্টুডিও, নিজেদের প্রোডাকশান এবং ডিস্ট্রিবিউশান, সবই ছিল। এর ওপর জে. এফ. ম্যাডানের Provision Stores. সবই রুস্তমজী নিজের চেষ্টায় এবং কর্মদক্ষতায় করেছিলেন। নিজের হাতে গড়া এতবড় ব্যবসা সমস্ত ধূলিসাৎ হয়ে গেল—এতে তাঁর চোখে জল আসবে না তো কি? সব শুনে তো আমারই চোখে জল এসে গিয়েছিল।

এমন সময় ওঁর চাকর ট্রে করে অনেক কিছু মিষ্টি ও চা নিয়ে এল। ফ্ল্যাটে এসে উনি একবার ভেতরে গিয়েছিলেন, সেই ফাঁকে নিশ্চয়ই বাড়ীর কাউকে বলে এসেছিলেন আমার জন্যে মিষ্টি ও চা পাঠাতে।

ভদ্রলোকের মন তখন দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উত্তেজনায় বিপর্যস্ত ; কিন্তু সেই অবস্থাতেও তিনি ভোলেননি যে, আমি নতুন বিবাহ করবার পরে তাঁর সঙ্গে প্রথম



কুচবিহারে মধু বসু (১৯২৭)



‘আলিবাবা’ [illegible]



সি-এ-পির 'আলিবাবা' মঞ্চাভিনয়ে (১৯২৭) মর্জিনার ভূমিকায় সুনীতা রায়

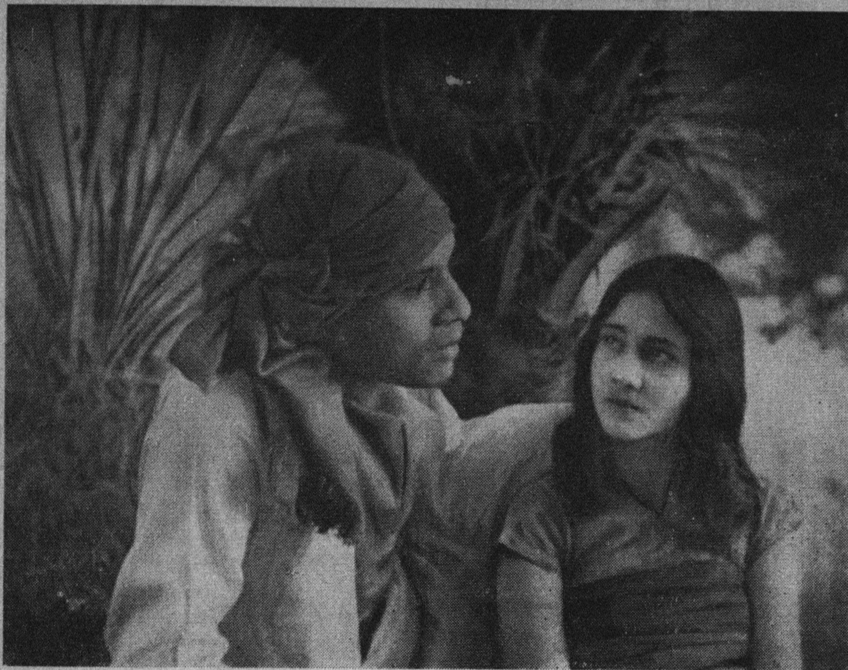




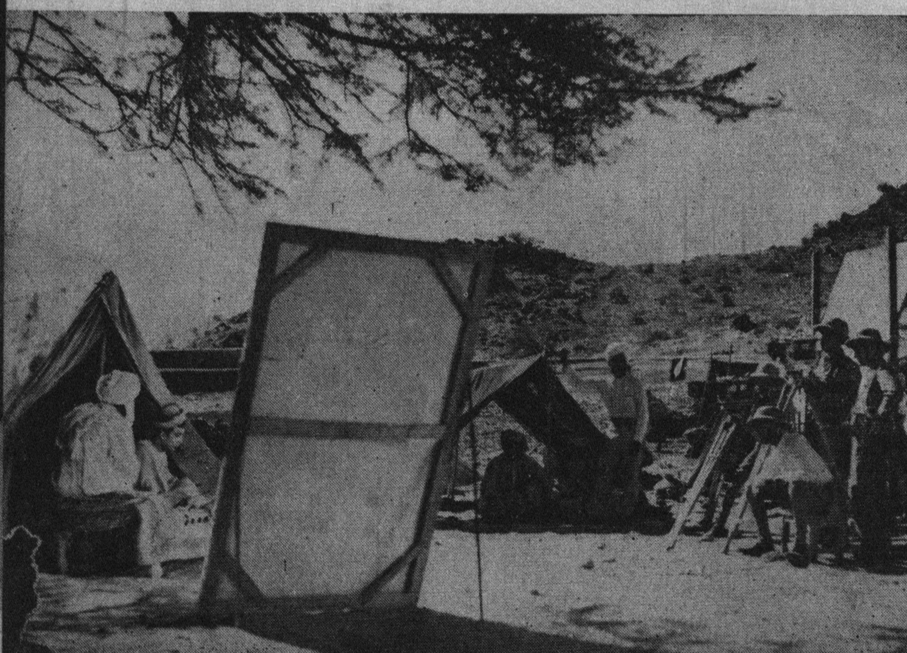
"থ্রো অফ্ এ ডাইস্" চিত্রের একটি দৃশ্যে চারু রায় ও সীতা দেবী



মহীশূরে "থ্রো অফ্ এ ডাইস্" চিত্রের একটি 'লোকেশন' পরিদর্শনকালে



সি-এ-পি'র "দালিয়া" নাটকে (১৯৩০) নাম ভূমিকায় মধু বসু ও 'তিন্নি'র ভূমিকায় সাধনা সেন।



দেখা করতে গেছি। তিনি আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন, আমার দাম্পত্য জীবন যেন সুখের হয় এবং আমার স্ত্রীকেও তাঁর আশীর্বাদ জানাতে বললেন। তাঁর সেই আশীর্বাদ মাথায় করে আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

এর কিছুদিন পরেই মা চলে গেলেন রাঁচিতে। আমি ও সাধনা গিয়ে উঠলাম ওর বাপের বাড়ীতে, এবং লাহোর যাবার তোড়জোড় করতে লাগলাম।

আমার একটি ওভারল্যাণ্ড গাড়ী ছিল—যখন 'গিরিবালা' ছবি তুলি তখন কিনেছিলাম সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড। পাঞ্জাব যাবার সময় গাড়ীটা মেজদির বাড়ীতেই রেখে গিয়েছিলাম। এবার হঠাৎ ঠিক করলাম যে, এই গাড়ী করেই সাধনাকে নিয়ে লাহোরে যাব—'খাইবার ফ্যালকন'-এর বাকী কাজটুকু শেষ করে দিয়ে আসবার জন্য।

তখন সকলেই বলল: এই পুরনো গাড়ী নিয়ে অতদূর যাওয়া ঠিক নয়, কারণ মাঝপথে কিছু কলকব্জা বিকল হলে খুব মুস্কিলে পড়তে হবে। কিন্তু আমার মাথায় তখন এ্যাডভেঞ্চারের নেশা চেপেছে—ওসব হিতোপদেশ গ্রাহ্যই করলাম না। বিষ্টু বলে একজন ভাল মেকানিক ড্রাইভার ঠিক করলাম। ওকে দিয়ে গাড়ীকে আগাগোড়া মেরামত করে নিলাম।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি একদিন বেরিয়ে পড়লাম; সাধনা, আমি, দুজন চাকর ও ড্রাইভার বিষ্টু। বেশ মনে আছে, শীতটা সে বছর বেশ ভালরকমই পড়েছিল। অবশ্য বেরোবার আগে, আমরা বিবাহে যে প্রচুর উপহার পেয়েছিলাম, সেগুলি সব বড় বড় কাঠের বাক্সে প্যাক করা হলো—তাছাড়া, মামাদের কাপড়চোপড় ইত্যাদি তিন চারিটি বড় ট্রাঙ্ক-এর মধ্যে ভরা হলো এবং সমস্ত মাল ট্রেনে করে লাহোরে পাঠিয়ে দিলাম। হরিরাম শেঠীকে লিখে দিলাম, তিনি আমাদের জন্যে যে বাংলো ঠিক করেছেন, জিনিসগুলি সেখানে রাখবার যেন ব্যবস্থা করেন এবং দেখাশুনা করবার জন্যে একটি দরওয়ান নিযুক্ত করেন।

যাবার দিন বিষ্টু কালীঘাটে মার কাছে পূজা দিয়ে এল, মার প্রসাদ আমাদের দিল, ফুলের মালা গাড়ীর বনেটে ঝুলিয়ে দিল, তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি ষ্টিয়ারিং নিলাম—আমার পাশে সামনের সীটে সাধনা আর পিছনে বিষ্টু ও চাকর দু'জন। ছাড়বার আগে সাধনার মা-বাবা বার বার বলে দিলেন: খুব সাবধানে যেও—পথে যে সব বড় জায়গায় থামবে, সেখান থেকে টেলিগ্রাম কোরো—ইত্যাদি।

তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আগেই বলেছি যে, বিয়েতে বাবা আসতে পারেন নি সুতরাং আমরা ঠিক করেছিলাম আগে রাঁচি যাব।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে সোজা চলতে লাগলাম। যেখান থেকে হাজারিবাগের রাস্তা বেরিয়েছে সেখানে সন্ধ্যার সময় পৌছলাম। জায়গাটার নাম যতদূর মনে পড়ছে—'বড়হি'। সেখানকার ডাকবাংলোতে গিয়ে উঠলাম। আমাদের সঙ্গে রাঁধবার লোক ছিল। সাধনা খুব উৎসাহের সঙ্গে তার কাজে লেগে গেল—বেশ একটা বড় গোচের চড়ুইভাতি হলো সেই সন্ধ্যায়। পরদিন সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম এবং হাজারিবাগ হয়ে সন্ধ্যের একটু আগেই রাঁচি পৌছে গেলাম।

নতুন বউ নিয়ে রাঁচি গেছি। বাবা সাধনাকে এই প্রথম দেখলেন; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরই নাতনীকে আমি বিবাহ করায় বাবা খুশীই হয়েছিলেন। তার ওপর সাধনার বয়স ছিল অল্প; তার মধ্যে তখনও ছিল শিশুর চাঞ্চল্য। বাবা তার এই শিশু-প্রকৃতিকে খুব পছন্দ করেছিলেন। সে বেশ ভালো নাচতে জানে শুনে বাবা রহস্য করে বলেছিলেন: আমিও রোজ সকালবেলা নাচি। আমার নাচ দেখতে চাও তো ছাদে এসো ভোরবেলা। সাধনা অবাক চোখে চেয়ে আছে দেখে মা হেসে বললেন: উনি রোজ ভোরবেলা হাত-পা ছুঁড়ে সারা ছাদটা চষে বেড়ান, তারই নাম নাচ।

রাঁচীর বাড়ীতে হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেল। বাড়ীতে মা-বাবা একটা বিরাট পার্টি দিলেন—রাঁচীর কোনো লোক বাদ গেল না। দিন সাতেক সেখানে ছিলাম, প্রায় প্রত্যহই কোথাও না কোথাও আমাদের নিমন্ত্রণ থাকত। বহুদিন বাদে আমাকে পেয়ে রাঁচীর সবাই আমাকে এবং সাধনাকে যে কি আদর যত্ন করেছিলেন, তা ভোলবার নয়। যাই হোক, মা-বাবার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা রাঁচী ছাড়লাম। আবার রামগড় হাজারিবাগ হয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে পড়লাম।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে সোজা চলতে লাগলাম। দুপুরে একটা ডাকবাংলোয় এসে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিলাম, তারপর গাড়ী চালাতে চালাতে রাত্রি হয়ে এলে আবার এক ডাকবাংলোয় এসে রাত্রি যাপন ও নৈশভোজন।

পথে পড়ল সাসারামে শের শাহের সমাধি। গাড়ী থামিয়ে কিছুক্ষণ সমাধিটি দেখলাম। তারপর এসে একেবারে কাশীতে ক্লার্কস্ হোটেল। ওখানে একদিন থাকলাম। বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করলাম। বেশ মনে আছে সে রাত্রিটা ছিল চাঁদনী রাত। দশাশ্বমেধ ঘাটে একদিন নৌকা ভাড়া করে চাঁদনি রাতে কাশীর গঙ্গায়

ওপর অনেকক্ষণ বেড়ালাম। চাঁদনি রাতে যারা নৌকা করে ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা জানেন যে, এ সময় মনটা কি রকম রোমান্টিক হয়ে ওঠে—বিশেষ করে যদি নবপরিণীতা বধূ থাকে পাশে।

কাশী থেকে গেলাম এলাহাবাদে। সেখানেও একটি হোটেলে এসে উঠলাম। সুবিখ্যাত এ. এইচ, হুইলার কোম্পানীর মালিক মিঃ ব্যানার্জি আমাদের আসার খবর পেয়ে আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে এবং খুব যত্ন করে একদিন খাওয়ান। মিঃ ব্যানার্জির সঙ্গে আমাদের অবশ্য আগে থেকেই জানাশোনা ছিল।

এলাহাবাদ থেকে রওনা হয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরই ঘটল বিপর্যয়। প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময়ে হঠাৎ গাড়ীর ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। আর কিছুতেই স্টার্ট নেয় না। গাড়ী থেকে আমি ও বিষ্টু নেমে পড়লাম। বনেট খুলে আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। বিষ্টু খানিকক্ষণ দেখে শুনে বললে: গাড়ী ঠেলতে হবে স্যার। আমি কয়েকজন লোক যোগাড় করে নিয়ে আসছি। বলে বিষ্টু চলে গেল।

একজন লোককে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, জায়গাটার নাম হলো খাগা। অল্প দূরে একটা ডাকবাংলো আছে—এ খবরটাও পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বিষ্টু জনচারেক লোক যোগাড় করে নিয়ে এল। তারা কোন রকমে গাড়ীটা ঠেলে তো ডাকবাংলোয় নিয়ে এল।

ডাকবাংলোয় এসে বিষ্টু আবার গাড়ীকে নিয়ে পড়ল। বিষ্টু ড্রাইভার হলেও সে ছিল একজন পাকামেকানিক। সে আমাকে এসে বলল: স্যার, ডায়নামো পুড়ে গেছে।

—অ্যাঁ, বল কি? আমি তো আঁতকে উঠলাম: তাহলে এখন উপায়?

বিষ্টু বললে: ডায়নামো বদলানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মনে পড়ল, মিঃ ব্যানার্জির এক বন্ধুর মোটরের কারখানা আছে এলাহাবাদে। তার পরদিন সকালে মিঃ ব্যানার্জির সেই বন্ধুর নামে একখানা চিঠি ও টাকাকড়ি দিয়ে বিষ্টুকে এলাহাবাদ পাঠালাম একটি নতুন ডায়নামোর জন্যে।

খাগা থেকে এলাহাবাদ খুব দূর নয়। বিষ্টু সকালের গাড়ীতেই চলে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম: বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সবাই বলেছিল এই পুরনো গাড়ী নিয়ে এতখানি পথ যাওয়া খুব নিরাপদ নয়, বরং বেশ বিপজ্জনক। এখন দেখছি তাদের কথা শুনলেই ভালো হতো। বিষ্টু যদি ডায়নামো না পায়, তাহলে তো ট্রেনে করেই এই মাঝপথ থেকে যেতে হবে। বেশ খানিকটা মুষড়ে পড়লাম।

যাই হোক, ঠাকুরের কৃপায় বিষ্টু ফিরল সন্ধ্যার সময়—অবশ্য একটি ডায়নামো সংগ্রহ করে। তখন আবার মনে আশা ও আগ্রহ ফিরে এল। দ্বিগুণ উৎসাহে রাত্রেই মোটরে ডায়নামো লাগিয়ে ভোরবেলায় আবার রওনা হলুম।

এলাহাবাদ থেকে গেলাম কানপুর—কানপুর থেকে আগ্রা। "থ্রো অফ এ ডাইস"-এর শুটিং-এর সময় আগ্রায় আমি গেছি, তাজমহলও দেখেছি। সাধনার অবশ্য এই প্রথম তাজ দর্শন। তাজমহলকে যতবার দেখা যায়, ততবারই যেন নতুন করে ধরা দেয় চোখে। গুরুদেব বলেছেন: 'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল—এ তাজমহল'—প্রতিটি প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে মিশে আছে ভারতসম্রাট শাহ্‌জাহানের বিরহী আত্মার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

অক্ষয় প্রেমের অবিনশ্বর কীর্তি তাজমহল দেখলাম সাধনাকে নিয়ে। দেখলাম ফতেপুর সিক্রি। তারপর মথুরা হয়ে দিল্লী এসে পৌছালাম। দিল্লীতে সেজদির বাড়ীতে এসে উঠলাম। স্যার বি. এল. মিত্র তখন দিল্লীতে ভাইসরয় ক্যাবিনেটের আইনসচিব। তাঁরা তখন থাকতেন কুইন ভিক্টোরিয়া রোডে।

নতুন দিল্লী তখন সবে তৈরী হচ্ছে—১৯২৫ সালে যখন 'লাইট অফ এশিয়া'র শুটিং করি, তখন চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ, আর মাঝে মাঝে দু' একখানি বাড়ী। এখন ১৯৩১ সালে, ছ' বছর পরে আরও কিছু বাড়ী তৈরী হয়েছে—তবে এখন যেমন নতুন দিল্লী দেখলেই চোখে চমক লাগে তখন তার সিকিও হয়নি।

নতুন বিয়ে করেছি—সেজদি যথেষ্ট আদর যত্ন করলেন। দিল্লীতে যা কিছু দ্রষ্টব্য জিনিস ছিল, সে সমস্ত ঘুরে ঘুরে দেখালাম সাধনাকে। আমার অবশ্য আগেই দেখা ছিল। বিগত দিনের কত সম্রাটের 'তক্তাউস' ছিল এই দিল্লী—হিন্দু, পাঠান, মোগল, ব্রিটিশ, বহু নৃপতির শাসনসমৃদ্ধ দিল্লী। যাঁরা প্রথমবার দেখেন, তাঁদের স্মৃতিপথে এই সব নৃপতির কীর্তিস্তম্ভ উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

সেজদির বাড়ীতে তিন-চারদিন থাকলাম। তাঁর বাড়ীতে তখন অতিথি হয়ে ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত ভারতীয় মহিলা টেনিস খেলোয়াড় লীলা রাও।

তারপর একদিন লাহোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পথে দু'-তিন জায়গায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে থামতে হয়েছিল, তবে আর কোন বিপর্যয় ঘটেনি। শেষে লাহোর পৌছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রায় তিন সপ্তাহ লেগেছিল কলকাতা থেকে লাহোর পৌছুতে। শরীরের ওপর দিয়ে কষ্ট অবশ্য অনেক গেছে, কিন্তু

কোন সময়েই উৎসাহের অভাব হয়নি। এ্যাডভেঞ্চারের নেশা এমনিভাবেই লোককে মাতিয়ে রাখে।

আমি সস্ত্রীক আসছি এ-খবরটা আগেই হরিরাম শেঠীকে জানিয়েছিলাম। তিনি আমাদের জন্যে ফিরোজশাহ রোডে একটি বাংলো ঠিক করে রেখেছিলেন। আমরা গিয়ে পৌছুতেই দেখি হরিরাম শেঠী নিজে, গীতা ঘোষ, জয়গোপাল পিলে এবং অন্যান্য কর্মীরা সকলেই রয়েছেন। তাঁরা আমাদের ফুলের মালা দিয়ে বিরাট সংবর্ধনা জানালেন।

সংবর্ধনা শেষে বাইরে বেরিয়ে দেখি বিষ্টু কয়েকটি ফুলের মালা চেয়ে নিয়ে গাড়ীটাকে পূজো করছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: এটা কি করছ বিষ্টু?

সে হেসে বললে: স্যার, সমস্ত ক্রেডিট তো এরই পাওয়া উচিত। পুরোনো গাড়ী যা সার্ভিস দিয়েছে, স্যার—তাই একে পূজো করছি।

শুরু হোল জীবনের আর এক অধ্যায়। বিবাহিত জীবন।

নতুন সংসার পাতা হলো—মনে কত আশা, ভবিষ্যতের কত রঙীন স্বপ্ন। প্রথম কয়েকদিন গোছগাছ, সাজানো-গোছানো—হাসি, গান, গল্প, বেড়ানোর মধ্যে দিয়ে কেমন কেটে গেল জানতেই পারলাম না। আজ বার্ধক্যের দ্বার-প্রান্তে দাঁড়িয়ে মনে হয় যদি সেই সময়কার রঙীন স্বপ্নময় দিনগুলি আবার ফিরে পেতাম।

লাহোরে পৌছেই বিষ্টুকে ছেড়ে দিলাম—সে কলকাতা চলে এল। আমি তখন নিজেই গাড়ী চালাই। ছবির শুটিং সামান্য বাকি ছিল, তার কাজ লাহোরে এবং তার আশেপাশে শেষ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছবির সম্পাদনাও চলতে লাগল।

ওখানে সে-সময় এক বাঙালী শিল্পী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো—লাহোর সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীসমর গুপ্ত ও শ্রীমতী গুপ্ত। শ্রীগুপ্ত ছিলেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য। আমাদের পরিবারের সঙ্গে এঁর আগেই আলাপ ছিল, এখন সেটা আরও ঘনীভূত হলো। শ্রীগুপ্ত ও শ্রীমতী গুপ্ত প্রায়ই আমাকে ও সাধনাকে নিমন্ত্রণ করতেন তাঁদের বাড়ীতে।

এঁরা ছিলেন সত্যিকারের শিল্পী। ঘরগুলি চমৎকার সাজানো—বাগানটি তো দেখবার মত। দেখলেই মনে হতো শিল্পকলা সার্থক রূপ পেয়েছে এঁদের হাতে।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গিয়ে এল মে মাস। মে জুন মাসে এখানে প্রচণ্ড

গরম—রীতিমত লু' চলে। এখানে শীতকালে যেমন শীত, আবার গরমকালেও তেমনি গরম। দুটোই চরম।

এই সাংঘাতিক গরমে সাধনার খুব কষ্ট হচ্ছিল—তার শরীরটাও ইদানীং ভাল যাচ্ছিল না। ঠিক করলাম, ওকে কলকাতা পাঠিয়ে দিই কারুর সঙ্গে। ভাগ্যক্রমে এক পরিচিত ভদ্রলোক সপরিবারে কলকাতায় আসছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ট্রেনে সাধনাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলাম। ও অবশ্য আমাকে ছেড়ে আসতে খুবই আপত্তি করেছিল। ওকে বোঝালাম যে, পাঞ্জাবের এই প্রচণ্ড গরম ওর কিছুতেই সহ্য হবে না। শেষটা অসুখ-বিসুখ করলে কে দেখবে! এই দূরদেশে আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই—সুতরাং ওর এখন কলকাতা যাওয়াই উচিত। তাছাড়া ওকে আশ্বাস দিলুম, আমি তো ফিরছি মাসখানেকের মধ্যেই।

সাধনাকে তাড়াতাড়ি করে কলকাতা পাঠিয়ে দেবার আরও একটা কারণ ছিল। সেটা কাউকে বলিনি, সাধনাকে তো নয়ই। কিছুদিন থেকে রোজই সন্ধ্যার দিকে আমার অল্প-অল্প জ্বর হচ্ছিল—সকালের দিকে জ্বরটা ছেড়ে যায়। ছোটবেলা থেকেই Sadhona was highly sensitive and had a nervous temperament.—একটুতেই উতলা হয়ে পড়ে, সুতরাং ও যদি জানতে পারে যে, আমার রোজ জ্বর হচ্ছে, তাহলে সেই ভাবনাতে ওর শরীরই ভেঙে পড়বে, একে ত' গরমে ওর নিজেরই শরীর ভাল যাচ্ছিল না।

সাধনা কলকাতায় চলে গেল। এদিকে 'খাইবার ফ্যালকন'-এর সম্পাদনাও প্রায় শেষ। মনে হলো, দু' তিন সপ্তাহের মধ্যে আমিও কলকাতায় যেতে পারব। সেখানে ডাঃ বিধান রায় এবং ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রকে দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করিয়ে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, সাধনাকে নিয়ে রাঁচি চলে যাব—মনে মনে এই ঠিক করলাম। রাঁচিতে মাসখানেক মার কাছে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু···মানুষ ভাবে এক, হয় আর।

যত দিন যেতে লাগল, সন্ধ্যার দিকে জ্বরটা তত বাড়তে লাগল। পাশে এক পাঞ্জাবী পরিবার থাকত, তাদের চেনা এক ডাক্তারকে ডাকলাম। সে ওষুধ দিয়ে গেল কিন্তু বিশেষ কোন কাজ হলো না। জ্বর বাড়তেই থাকে আর দিন দিন নিজেকে দুর্বল মনে হয়।

জয়গোপাল তখন লাহোরে নেই—হরিরাম শেঠীর সঙ্গে দিল্লীতে গেছে নতুন ছবির জন্যে টাকার বন্দোবস্ত করতে এবং সেখান থেকে নানান জায়গায় যাবে ওর ছবির শুটিং-এর জন্যে Location ঠিক করতে। সুতরাং সম্পাদনার বাকী কাজ

আমিই শেষ করলাম। জ্বর নিয়ে পরিশ্রম করাতে শরীর আরও ভেঙ্গে পড়ল। ডাক্তার বলল: আপনাকে একেবারে শুয়ে থাকতে হবে, সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই। আরও কিছুদিন গেল কিন্তু জ্বর আর কমে না। এর পর বুকের এক্স-রে নেওয়া হলো। গলার ডানদিকে কিছুদিন হলো একটু ফুলে উঠেছিল এবং ব্যথাও হয়েছিল। ডাক্তার বললে, আমার সন্দেহ হচ্ছে মিঃ বোস, আপনার গ্লাণ্ডস্ অ্যাফেক্ট করেছে। যা হোক্, আপনি যদি অনুমতি করেন আমি একজন বিশেষজ্ঞকে ডাকতে চাই।

এদিকে টাকাকড়িও ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে, তবু চিকিৎসা তো করাতে হবে। আমি বললাম: আপনি যদি দরকার মনে করেন, নিশ্চয়ই ডাকবেন। বিশেষজ্ঞ এলেন, ভাল করে পরীক্ষা করলেন, এক্স-রে প্লেট এবং অন্যান্য রিপোর্টগুলি দেখলেন। তারপর আমায় বললেন: আপনি যত শীগ্‌গির পারেন লাহোর ছেড়ে কোন ঠাণ্ডা জায়গায় যান; এখানে এই গরমে আর কিছুদিন থাকলে অসুখ আরও বাড়তে পারে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: আমার হয়েছে কি? এতদিন ধরে কেন জ্বর চলছে? এক্স-রে প্লেটে কিছু পেলেন?

বিশেষজ্ঞ বললেন: না, আপনার বুকে কোন দোষ নেই, তবে—বলে একটু থেমে আবার বললেন, আমার মনে হয় আপনার গ্লাণ্ডস্ অ্যাফেক্ট করেছে। যা হোক, আমি আপনার ডাক্তারকে বলে গেলাম আপনার থুতুটা পরীক্ষা করিয়ে আনার জন্যে, তারপর চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

কিছুদিন পরে ডাক্তার থুতুর রিপোর্ট নিয়ে এল এবং বিশেষজ্ঞ যে-সব ইন্‌জেক্‌শন নিতে বলেছেন, তারও প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ নিয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম: থুতুর রিপোর্টে কিছু পাওয়া গেল জ্বরের কারণ?

ডাক্তার একটু আমতা আমতা করে বললে: না, সে রকম কিছু positive পাওয়া যায়নি—তবে···

—তবে কি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—মানে অবহেলা করলে গ্ল্যাণ্ডুলার টি-বি হয়ে পড়তে পারে।

এই কথা শোনার পর আমার মনের অবস্থা যে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সবে মাত্র বিয়ে করেছি—আমার জীবনের সঙ্গে আরও একটি জীবন জড়িয়ে আছে। দু'জনের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা—একসঙ্গে কত কল্পনার জালবোনা, সব একেবারে কি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে? গ্ল্যাণ্ডুলার টি-বি হতেও পারে—এই কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল—নিরাশার গভীর অন্ধকারে একেবারে তলিয়ে গেলাম।

বিশেষজ্ঞকে আবার ডাকলাম; চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো। আমি তাঁকে এও বললাম: আমার এতদিন ধারণা ছিল—টি-বি হয় শরীরের ওপর অত্যাচার করলে, আর নয়ত ভাল খাওয়া-দাওয়ার অভাবে, অর্থাৎ mal-nutrition হলে। এ দুটোর কোনটাই তো হয়নি আমার। বরং বিয়ে করে যখন লাহোরে পৌঁছলাম, তখন সবাই বলেছে বিয়ের জল আমার গায়ে লেগেছে, আমার অমন স্বাস্থ্য তারা বহুদিন দেখেনি। তবে কেন?

ডাক্তার আমাকে বললেন: আপনার তো টি-বি হয়নি; আপনার বুক তো পরিষ্কার। তবে আপনার গ্ল্যাণ্ড যে affect করেছে তার অন্য কারণ থাকতে পারে। এ-রোগ উত্তরাধিকার সূত্রেও আসে। যাহোক্, চিন্তার কোন কারণ নেই মিঃ বোস।

এই বলে তিনি আমার নিত্যকার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখতে লাগলেন।

কিন্তু সত্যিই কি আমার চিন্তা অনর্থক? এ কি দুর্দৈব? কোথায় ভাবলাম ভালবেসে বিয়ে করে দাম্পত্য জীবন আমাদের কি সুখের মধ্যে দিয়েই না অতিবাহিত হবে! রোমান্সের সাগরে কত আনন্দের ঢেউই না আমাদের স্বর্গের পানে তুলে ধরবে। কিন্তু বিবাহিত জীবন শুরু হতে না হতেই কোথা থেকে এ দুষ্টগ্রহ আমাতে ভর করল? নিয়তির একি নিষ্ঠুর খেলা!

নানান চিন্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। হঠাৎ বিশেষজ্ঞের কথায় আমার চমক ভাঙ্গল—শুনলাম তিনি বলছেন: আপনার ট্রিটিং ফিজিসিয়ান বলছিলেন যে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় আপনার পরিবারের বিশেষ বন্ধু—তাহলে আর আপনার ভাবনা কিসের? ডাঃ বি. সি. রায়-এর মত ডাক্তার ভারতবর্ষে খুব কম আছে। সুতরাং আপনি যত শীগ্‌গির পারেন কলকাতায় চলে যান। সেখানে আপনার স্ত্রী আছেন, আত্মীয়স্বজন আছেন—ভাল চিকিৎসা তো হবেই। তা ছাড়া ভাল সেবা-যত্ন হবে। এখানে এই গরমে একলা পড়ে থেকে কি লাভ?

এই বলে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

এই গরমে এখানে একলা পড়ে আছি কেন, সে কথা বিশেষজ্ঞকে কি করে বলব? হরিরাম শেঠীকে দিল্লীতে লিখলাম টাকার জন্য।

রোজই আশা করছি হরিরাম শেঠীর কাছ থেকে টাকা আসবে।

জয়গোপাল পিলেও লাহোরে নেই—নতুন ছবি আরম্ভ করেছে এবং রাজপুতানার নানান লোকেশানে শুটিং করছে। বিরাট বাংলোতে আমি ও আমার এক চাকর ছাড়া কেউ নেই। আমার পাশে যে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি থাকতেন, তাঁকে বললাম: আমার গাড়ীটা যদি বিক্রী করে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তা'হলে আমার খুবই উপকার হয়। কিন্তু দেখলাম যে তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ গা করলেন না।

একে আর্থিক অবস্থা চরম সঙ্গীন হয়ে পড়েছে; তার ওপর একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিছানায় পড়ে পড়ে থেকে দম বন্ধ হয়ে আসছে। মানসিক অস্থিরতা বেড়েই চলল।

এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, সাধনাকে চিঠি লিখতেও কষ্ট হয়—কোন রকমে ক'লাইন লিখে শেষ করি। ওকে জানাই যে, আমি খুব শীগ্‌গিরই ফিরছি। কিন্তু এ মিথ্যে অভিনয় আর লুকোচুরি ভাল লাগে না; অথচ আসল কথাটাও জানাতে পারি না। চিন্তা—চিন্তা—এই চিন্তাই আমাকে সদাসর্বদা পাগল করে দিতে লাগল। মনের এই অবস্থায় বারে বারে মনে হতে লাগল যে, এ জীবন আর রেখে লাভ নেই—একে শেষ করে দেওয়াই ভাল। যে মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমার তখন কাটছিল, তা বলে বোঝান মুস্কিল। এক ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ এর কল্পনাও করতে পারবে না।

ঠিক এই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

সন্ধ্যের সময় চুপচাপ শুয়ে আছি। রাত্রি প্রায় ৮টা হবে। এমন সময় দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল এবং আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল। অবাক হয়ে গেলাম, ভেবে ঠিক করতে পারলাম না যে আমার জানাশোনা এমন কে আসবে এ সময় যে আমার নাম ধরে ডাকতে পারে? আমার চাকরটা গিয়ে দরজা খুলতেই শুনলাম আগন্তুক জিজ্ঞেস করছে: বোস সাহেব আছেন?

চাকর জানাল যে আমি অসুস্থ। তাতে সেই আগন্তুককে আবার বলতে শুনলাম: বল গিয়ে কলকাতার বন্ধু গণেশ মুখার্জি এসেছে।

গণেশ!

হ্যাঁ, গণেশকে চিনি বৈকি! সে আমার অনেক দিনের বন্ধু। সে হঠাৎ এখানে কি মনে করে?

চাকর আমাকে গণেশের আসার খবর জানাতেই আমি বললাম তাকে ভিতরে নিয়ে আসতে।

গণেশ ঘরে ঢুকেই আমার অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে তো ভাবতেই পারেনি যে আমি এই রকম অসুস্থ। সে দিল্লীতে সেজদির বাড়ীতে গিয়েছিল—সেখানে সে খবর পায় যে আমি লাহোরে আছি। কোন শৈলাবাসে যাবে বলে গণেশ বেরিয়েছিল—কিন্তু আমি লাহোরে আছি জেনে সে শৈলাবাসে না গিয়ে এখানে চলে এসেছে। সঙ্গে সুটকেশ, বিছানা। কয়েক মিনিট নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল: তোর কি হয়েছে রে? একেবারে Skeleton হয়ে গেছিস্? এইতো মাস ছ'য়েক আগে বিয়ের সময় দেখলাম—তখন তোর কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য—আর একি? একেবারে চেনাই যায় না। সেজদিও তো কিছু বললেন না তোর অসুখের কথা?

আমি বললাম: কাউকেই আমি জানাই নি।

সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল: কেন? এ তোর ভারী অন্যায়!

আমি বললাম: জানিয়ে কি হবে? সবাইকে বিব্রত করা বৈ ত' নয়। আর তাছাড়া যে রোগ হয়েছে তা আর লোককে জানাই কি করে বল?

বলে আমি গণেশকে বললাম ডাক্তার কি বলেছে।

সে তখন আমায় বললে: না—না এতো ভাল কথা নয়। আমি কালই তোকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

বলে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমাকে নানারকম সাহস দিল, উৎসাহ দিল। নানা গল্পগুজবের মধ্যে আমার মনের ভারটাও অনেক কমে গেল। বন্ধুর সান্ত্বনায় এবং উৎসাহে এতদিনের মনের পুঞ্জীভূত নৈরাশ্য কেটে গিয়ে যেন খানিকটা আলোর আভাস দেখা গেল। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন একটা ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডকে আঁকড়ে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করে, আমিও তেমনি গণেশকে পেয়ে তার উৎসাহে এবং সমবেদনায় মনে একটা সাহস ফিরে পেলাম। একটু আগেই যে নিজেকে শেষ করে দেবার একটা অদম্য ইচ্ছা জেগে উঠেছিল, এখন সেটা মিলিয়ে গিয়ে ভেসে উঠল বাঁচবার একটা প্রেরণা। মনটা আকুল হয়ে উঠল সাধনা ও মার কাছে ফিরে যাবার জন্যে।

আমি গণেশকে বললাম: কলকাতায় যে যাব, তার আগে এতগুলো ঘরের জিনিসপত্তর, দু'-তিনটা আলমারি-ভরা কাপড়, তাছাড়া কাঁচের বাসন এবং রূপোর সব জিনিস, সেগুলি সব প্যাক করে কলকাতায় পাঠাতে হবে তো!

—এর জন্যে এত ভাবছিস্ কেন, ওসব আমি করে দেব, বললো গণেশ।

আমি বললাম: তা আমি জানি ভাই। তুই যদি এ সময়ে না আসতিস,

আমি একা এই শরীর নিয়ে শেষ পর্যন্ত কি যে করতাম···গণেশ বাধা দিয়ে বলে উঠল : নে, থাম। ওসব কথা ভুলে যা। কাল থেকেই আমি সব জিনিসপত্তর প্যাক করা আরম্ভ করছি। তিন-চারদিনের মধ্যে যাতে মালগুলো কলকাতায় পাঠাতে পারি, তার ব্যবস্থা করছি। আমি বললাম : কিন্তু এ-সবের জন্যে বেশ কিছু টাকার দরকার তো গণেশ—তাছাড়া তিন মাসের বাড়ী ভাড়া, ডাক্তার ও ডাক্তারখানার বিল, আরও ছোটখাট অনেক খরচা আছে, তার ওপর ট্রেনের টিকিট—সমস্ত বাবদ বেশ কিছু মোটা টাকার দরকার। থাকার মধ্যে সম্বল তো একখানি গাড়ী। কাল থেকে ওটাকে বিক্রী করবার চেষ্টা দেখ দেখি।

গণেশ বলল : আচ্ছা দেখছি। হাঁ, ভাল কথা, তুই তো বলেছিলি তোর বন্ধু মিঃ জয়গোপাল পিলে লাহোরে আছে। সে তোর খবরটবর রাখে না ?

আমি বললাম : জয়গোপাল লাহোরে থাকলে আজ কি আমাকে এই বিপদে পড়তে হতো ? কিছুদিন হলো সে তার ছবির শুটিং-এর জন্যে পাঞ্জাবের নানান জায়গায় ঘুরছে। আমাদের কোম্পানীর মালিক হচ্ছেন হরিরাম শেঠী, তিনিও অনেকদিন এখানে নেই, দিল্লী চলে গেছেন, এমনই আমার দুর্ভাগ্য। দিল্লীতে তাঁকে দু'খানা চিঠি লিখেছি, কিন্তু কোন জবাব আসেনি। আমার মনে হয়, তিনি দিল্লীতে নেই ; হয়ত জয়গোপাল যেখানে শুটিং করছে, সেখানে চলে গেছেন। কাল একবার এখানে ওঁর আপিসে গিয়ে খোঁজ করবি ভাই, তিনি এখন কোথায় আছেন ? তিনি খুবই ভদ্রলোক। আমার চিঠি তিনি কখনও পাননি—পেলে টাকাটা তিনি নিশ্চয়ই পাঠাতেন। তাঁর অন্তরটা খুব বড়, আমি জানি।

গণেশ আমার হাতটা ধরে বললে : এখন আর এসব নিয়ে বেশী ভাবিসনি মধু। কাল সকালে, প্রথমে তোদের আপিসে গিয়ে মিঃ শেঠী এখন কোথায় আছেন জেনে তাঁকে টেলিফোন করে দেব তোর নাম দিয়ে। তারপর জিনিসপত্তর প্যাকিং-এর ব্যবস্থা এবং গাড়ী বিক্রির চেষ্টা করব। নে, এখন শুয়ে পড় তো।

দু'-তিন দিনের মধ্যেই হরিরাম শেঠীর কাছ থেকে টাকা এল ; ঐ সঙ্গে তিনি আমাকে লিখেছেন যে, জয়গোপালের সঙ্গে তিনি নানান জায়গায় ঘুরছেন ওঁর ছবির 'লোকেশন' ঠিক করতে। আপাতত আগ্রায় আছেন, তিন-চার দিনের মধ্যেই লাহোরে আসছেন। ইতিমধ্যে যদি আরও টাকার দরকার হয়, ওঁর অফিস-ম্যানেজারের কাছে জানালেই সে ব্যবস্থা করবে।

এরই মধ্যে খদ্দের ঠিক করে গণেশ গাড়ীখানাকে বিক্রী করে দিল। যেদিন গাড়ীটা নিয়ে গেল, আমার চোখে জল এল। কত সুখস্মৃতি ওই পুরোনো

ওভারল্যাণ্ড গাড়ীটার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। কোনো নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটলে মনের যে ব্যথাতুর অবস্থা হয়, আমার বহুদিনের সুখদুঃখের বন্ধু ওভারল্যাণ্ডটি চলে যেতে আমার সেই অবস্থাই ঘটেছিল।

বিরাট সংসার তুলে আনতে দু'-চার দিন সময় গেল। গণেশ একলাই সব ব্যবস্থা করল—আমি ত' তখন বিছানাতে শুয়ে শুয়েই দিন কাটাচ্ছিলাম।

ইতিমধ্যে হরিরাম শেঠীও লাহোরে এলেন। এই সময় তাঁর আর্থিক সাহায্য না পেলে আমার কলকাতা ফিরে আসাই মুস্কিল হতো। কারণ, গাড়ী বিক্রী করে এমন কিছু টাকা পাইনি। একটা সংসার তুলে আনতে, সকলের পাওনা টাকা চুকোতে এবং অন্যান্য খরচ বাবদ বেশ কিছু মোটা টাকারই দরকার ছিল। এর জন্যে আমি হরিরাম শেঠীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এর অনেক বছর পরে আমি কলকাতা থেকে হরিরাম শেঠীকে এই টাকা ফেরত দেবার কথা লিখে'ছিলাম, তার উত্তরে তিনি আমায় লিখেছিলেন যে, তিনি কোনদিন সে-টাকা আমাকে ঋণ বলে দেননি, দিয়েছিলেন ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবে ; যেভাবে অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি 'খাইবার ফ্যালকন'-এর সম্পাদনা শেষ করেছি তাতে তার পারিশ্রমিক হিসেবেই সে টাকা আমার ন্যায্য প্রাপ্য। চিঠির সঙ্গে একটা চেকও পাঠিয়েছিলেন—বেশ মোটা টাকার।

'খাইবার ফ্যালকন' ছবি নাকি খুব ভাল চলেছিল, বিশেষ করে পাঞ্জাবে এবং তিনি বেশ ভাল টাকা পেয়েছিলেন।

এরপর একদিন লাহোরের বাস উঠিয়ে কলকাতা রওনা হলাম। ছাড়বার আগে কলকাতায় শ্বশুরবাড়ীতে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলাম।

মাঝখানে গণেশ নেমে গেল কোন এক শৈলাবাসে যাবার জন্যে।

ভেবেছিলাম সাধনাকে নিয়ে বেশ কিছুদিন লাহোরে কাটাব। হরিরাম শেঠীর সঙ্গে আমার কণ্ট্রাক্টও ছিল যে, এই ছবির পর এঁর পরের ছবিখানা আমিই করব, কিন্তু এই অসুখের ফলে সেটা আর হয়ে উঠল না—কলকাতা চলে আসতে হলো। তবু শেঠী মশায় এমন ভদ্রলোক—আসবার সময় বলেছিলেন আমায় যে, আমি সুস্থ হলেই যেন খবর দিই তাঁকে। তাহলে তিনি যদি ভবিষ্যতে ছবি করেন, তাহলে তার অগ্রাধিকার আমারই থাকবে।

কিন্তু আর আমার লাহোরে যাওয়া ঘটে ওঠেনি।

চুপচাপ চোখ বুঁজে ট্রেনে শুয়ে শুয়ে হাজার রকম চিন্তার মধ্যে নিজেকে

হারিয়ে ফেললাম। আবার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ফিরে যাচ্ছি—বিশেষ করে মার কাছে। এছাড়া কতদিন দেখিনি সাধনাকে, তাকে কাছে পাবার জন্যেও মনটা ছট্‌ফট্‌ করছিল।

কিন্তু সে যখন আমার এই রোগক্লিষ্ট চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করবে, আমার কি হয়েছিল, আমার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন—তখন কি জবাব দেব? আচ্ছা, সে দেখা যাবে তখন, যা হোক কিছু একটা বলে তাকে বোঝানো যাবে। কিন্তু সে আবার যে রকম temperamental তাতে তাকে বোঝাতে বেশ একটু বেগ পেতে হবে।

আবার কোন সময় মনে হচ্ছিল যে, এত লোক থাকতে গণেশ কি করে ঠিক এই সময়টিতেই এসে হাজির হলো লাহোরে! গরমের সময়ে সে বেরিয়েছিল কোন শৈলাবাসে যাবে বলে। পথে দিল্লীতে নেমে হঠাৎ কি খেয়াল হলো তার, সে সেজদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেজদিও জানত না আমার অসুখের কথা। গণেশকে শুধু বলেছিল যে, আমি লাহোরে আছি, অমনি সে স্রেফ আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই লাহোরে চলে এল এত পয়সা খরচ করে।

জীবনের ওপর এত বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলাম যে, গণেশ যদি তখন না আসত, তাহলে হয়ত সেদিন নিজের সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে বসতাম।

এটা কি বলব, নিছক বন্ধুপ্রীতি? না, অন্য কেউ তাকে জোর করে পাঠাল?

সে কে? কে সেই অজানা বন্ধু?

ভগবানের মঙ্গল হস্ত কি এইভাবেই কাজ করে?

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থামতেই দেখি শ্বশুরমশায় আমার জন্য অপেক্ষা করছেন একা—আশা করেছিলাম সঙ্গে সাধনাও থাকবে। শ্বশুরমশায় আমার এই চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? এত রোগা হয়ে গেছ তুমি?

আমি তাঁকে আমার অসুখের বিষয় বিশেষ কিছু বললাম না। শুধু বললাম: লাহোরে এখন এমন সাংঘাতিক গরম যে শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছিল না—ও কিছু নয়। দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

গাড়ীতে আসতে আসতে দেখলাম, তিনি খুব চিন্তিত। আমিই শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনাকে খুব worried মনে হচ্ছে!

তিনি আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—হ্যাঁ, একটু worried আছি বটে—সাধনার বিষয়—

আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: কি হয়েছে সাধনার?

তিনি বলতে লাগলেন: আজ আট দশ দিন ধরে তার জ্বর হয়েছে। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম ইনফ্লুয়েঞ্জা। কারণ, কয়েকদিন আগে মাঠে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল, তাতে বৃষ্টিতে খুব ভিজে বাড়ী আসে। তাতেই জ্বর হয়, কিন্তু চার পাঁচ দিন পরেও জ্বর ছাড়ে না। তারপর বিধানকে ডেকেছিলাম (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে তিনি বিধান বলতেন), তাতে সে দেখে শুনে বললে: টাইফয়েড বলে মনে হচ্ছে। তাই মেয়েটার জন্যে একটু চিন্তিত আছি।

আমি জানতাম যে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাধনাই ছিল শ্বশুরমশায়ের সবচেয়ে প্রিয়। সুতরাং তার অসুখে তিনি স্বভাবতই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

ভেবেছিলাম কলকাতায় ফিরে, আত্মীয় বন্ধুদের মাঝখানে গিয়ে, আর কিছু না হোক, সাধনা তো থাকবে কাছে—মনের নিঃসঙ্গ ভাবটা কেটে যাবে, মনে খানিকটা শান্তি ফিরে পাব। এ ছাড়া ডাঃ রায়কে দেখিয়ে নিজের চিকিৎসা করাব, এবং তাঁর নির্দেশ পেলে সাধনাকে নিয়ে রাঁচী চলে যাব। লাহোরে এক বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন—এ রোগের সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হলো সেবাশুশ্রূষা, পুষ্টিকর খাদ্য ও দেশের জলহাওয়া। রাঁচী রুক্ষ দেশ—ওদেশের জলহাওয়া আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, তাছাড়া মা আছেন সেখানে—সেবাযত্ন, পুষ্টিকর খাবার কিছুরই অভাব হবে না। কিন্তু বিধাতা তাতেও বাদ সাধলেন। সাধনাও অসুস্থ!

শুনলাম সাধনার জ্বর ১০৩।১০৪ ডিগ্রির কমে নামছে না—এ অবস্থায় তাকে রাঁচী নিয়ে যাই কি করে? আর একা যেতেও মন চাইছে না। ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না—শুধু মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলাম। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে শ্বশুরবাড়ীতে এসে পৌছোলাম।

সাধনার সঙ্গে দেখা করতেই ও আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না! ছেলেবেলা থেকেই ও একটু বেশী মাত্রায় ভাবপ্রবণ। সামান্য ব্যাপারেই ভেঙে পড়ে, আবার একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আমাকে জড়িয়ে ধরেই বলতে লাগল: যাক, তুমি এসে গেছ—এবার আমি বেঁচে উঠব।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি: নিশ্চয় ভালো হয়ে উঠবে। দেখ না দু'দিনের মধ্যেই রোগ কোথায় পালিয়ে যাবে!

কিছুক্ষণ পর আবেগের ঝোঁকটা কেটে গেলে আমার দিকে সাধনার নজর পড়ল, সে বলল : এ কি চেহারা হয়েছে তোমার ? কি হয়েছিল বল তো ?

আমি ওর কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে ব্যাপারটা হাল্কা করে দিয়ে বললাম : ও কিছু নয়—লাহোরে যা সাংঘাতিক গরম পড়েছে তাতে সামান্য heat fever হয়েছিল। সেইজন্যেই একটু রোগা হয়ে গেছি।

সাধনাকে তো এই বলে সান্ত্বনা দিলাম, কিন্তু আমার মনের যা অবস্থা তা কারু পক্ষেই কল্পনা করা সহজ নয়। মনের মধ্যে আশা-নিরাশার যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছিল, তা প্রাণপণ শক্তিতে চেপে রেখে লোকজনের সঙ্গে সহজ হবার চেষ্টা করছিলাম। তখন সব সময় শুধু মার কথাই মনে হচ্ছিল। খালি মনে হচ্ছিল, মা যদি একবার শুধু সামনে এসে দাঁড়ান তাহলেই আমার সব অসুখ সেরে যাবে। সব বিপদের হবে অবসান। মানুষের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল হলো মা—ঐ একটি অক্ষরের মধ্যে লুকিয়ে আছে স্নেহ ও করুণার জীবন্ত প্রতীক।

আমি সেইদিনই মাকে চিঠি লিখে দিলাম সাধনার অসুখের কথা জানিয়ে। আমার অসুখের কথা অবশ্য কিছু লিখলাম না—শুধু লিখলাম যে আমার শরীরটাও বিশেষ ভাল যাচ্ছে না।

পরদিন সকালবেলাতেই গেলাম ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে। ডাঃ রায় আমাকে খুব যত্ন করে পরীক্ষা করলেন, সেই সঙ্গে লাহোরের বিশেষজ্ঞের রিপোর্টটাও দেখলেন। সব দেখে শুনে বললেন : তোমার লাহোরের বিশেষজ্ঞের ডায়াগনোসিস্ ঠিকই হয়েছে। তোমার এখন কলকাতায় না থাকাই উচিত। এখন বর্ষাকাল—যতই ইনজেকসন দিই কোন ফলই হবে না। পত্রপাঠ তুমি রাঁচী চলে যাও, সেখানকার আবহাওয়া তোমার পক্ষে ভাল হবে, আর সবচেয়ে বড় কথা সেখানে তোমার মা আছেন। তাঁর সেবাযত্নে শীগ্গিরই ভাল হয়ে যাবে।

এখানে ডাঃ রায় সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের যে কি অন্তরঙ্গতা ছিল, তা বলে বোঝান যাবে না। আমার দাদা, অশোক বসুর তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিলেতে তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন। সেই সময় থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তা অক্ষুন্ন ছিল। সেই বন্ধুত্বের জোরেই তিনি আমাদের এতটা নিবিড় সংস্পর্শে এসেছিলেন।

দাদা যখন ত্রিপুরা থেকে অসুস্থ হয়ে কলকাতায় চলে এলেন, সে সময়

তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার (তখন স্যার উপাধি পাননি) দাদাকে দেখছিলেন। ডাঃ নীলরতন সরকার বাবার বিশিষ্ট বন্ধুই শুধু ছিলেন না, তাঁকে অগাধ শ্রদ্ধা করতেন। সে সময় ডাঃ রায় দু'বেলা আসতেন দাদাকে দেখতে এবং ডাঃ সরকারের পরামর্শমত চিকিৎসা করতেন। ১৯১২ সাল. ডাঃ রায়ের তখন বেশ নামডাক হয়েছে।

দাদাকে ডাঃ রায় নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসতেন। আমার মাকে বলতেন মাসিমা। আমার মামা, অজয় দত্তের বাড়ীতে (৯।১ হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট-এ) এসে উঠেছিলেন দাদা। মামার কাছে শুনেছি যে, দাদার শেষ ক'দিন ডাঃ রায় সমস্ত রাত্রি জেগে দাদার দেখাশোনা এবং সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয় সত্বেও দাদাকে ধরে রাখা গেল না। এত বড় বড় চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও দাদার আসল রোগটাই ধরা পড়ল না। মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে জানা গেল যে, এটা Black water fever—এ রোগ তখন এদেশে সম্পূর্ণ নতুন। যখন রোগ ধরা পড়ল তখন রোগী চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে।

একদিকে ডাঃ রায়ের উপদেশ, যে আমাকে অবিলম্বে কলকাতা ত্যাগ করতে হবে ; অথচ অপরদিকে সাধনাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যেতেও মন চাইছে না। তখন ১৪ দিন হয়ে গেছে, তবু সাধনার জ্বর ছাড়েনি। অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। ও তো তখন ওর সমস্ত ভার আমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। একমুহূর্তের জন্যে আমাকে কাছ ছাড়া করতে চায় না। যদিও নার্স ছিল, তবুও ওষুধ খাওয়ানো, পথ্য খাওয়ানো—সবই আমাকে করতে হতো। সাধনা মনে করত আমি যেন তার একটা প্রকাণ্ড আশ্রয়স্থল। আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পেরে সে নিজেকে নিশ্চিন্ত বোধ করছিল।

ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র রোজই একবার করে আসতেন। তিনি সাধনাকেও দেখতেন এবং আমাকেও দেখতেন। ডাঃ রায়ও রোজ আসতেন।

একদিন ডাঃ রায় এসেছেন—ডাঃ মিত্রও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দুজনে আমাকে আমার শ্বশুরমশায়ের ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাঁরা আমার এখানে থাকার কথা নিয়ে তর্ক জুড়ে দিলেন। ডাঃ মিত্র এতবড় সার্জেন কিন্তু অত্যন্ত সেন্টিমেণ্টাল—রোগীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি বললেন : সাধনার এ অবস্থায়

মধুর এখন কিছুদিন রাঁচী না গিয়ে এখানেই থাকা উচিত, নইলে মেয়েটা যেভাবে নিজেকে মধুর ওপর ছেড়ে দিয়েছে—তাতে ও চলে গেলে ওর অবস্থাটা কি হবে, ভাবো দিকি একবার!

ডাঃ রায় বললেন: কিন্তু এভাবে এখানে থাকলে মধুর রোগটাও যে বাড়বে।

ডাঃ মিত্র বললেন: বেশ তো, সাধনার জ্বরটা ছাড়ুক; তারপর ওকে নিয়ে দু'জনেই রাঁচী চলে যাবে একসঙ্গে। এ ক'দিনে আর মধুর অবস্থা এমন কিছু খারাপ হবে না।

আমিও ডাঃ মিত্রের কথায় সায় দিয়ে বললাম: ডাঃ রায়, ডাঃ মিত্র যা বলছেন তাই হোক। সাধনার জ্বর না ছাড়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না। ওর জ্বর ছাড়লে দুজনেই একসঙ্গে রাঁচী চলে যাব।

ডাঃ রায় হেসে বললেন: বেশ তাই হবে। এখন মাসীমাকে বলে দেখ, তিনি কি বলেন।

মা ইতিমধ্যে কলকাতা এসেছিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে ডাঃ রায় মাকে একথা জানাতে মা আমার মতেই মত দিলেন। মাও বললেন: সাধনার জ্বর না ছাড়া পর্যন্ত মধু এখন এখানেই থাক, তারপর সবাই আমরা একসঙ্গে রাঁচী চলে যাব।

এ সময় আবার একটা নতুন বিপদ দেখা দিল।

আমার শাশুড়ীর হলো গল-ব্লাডার, তার অপারেশনের জন্যে তাঁকে যেতে হলো হাসপাতালে।

সাধনার জ্বর ছাড়বার শেষ ক'দিন যাকে বলে একেবারে যমে-মানুষে টানাটানি। যাই হোক, ডাঃ মিত্র এবং ডাঃ রায়ের চেষ্টায় এবং সকলের অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষায় সাধনার জ্বর ছাড়ল ৪৪ দিন পরে।

এর কয়েক দিন পরে সাধনাকে নিয়ে আমি, মা আর শ্বশুরমশায় চলে গেলাম রাঁচীতে। এই দীর্ঘ রোগভোগের পর সাধনা হয়ে পড়েছিল যাকে বলে অস্থিচর্মসার। ট্রেনে তোলবার সময় তাকে রীতিমত কোলে করে ট্রেনে ওঠাতে হয়েছিল।

এ হলো ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। বিয়ের পর এখনও একটা বছর কাটেনি। আমাদের বিবাহিত জীবন শুরু হলো এইভাবে।

প্রায় তিন মাস শরীর ও মনের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল, তার প্রতিক্রিয়া

আরম্ভ হল রাঁচী পৌঁছবার পর। এতদিন আমি শুধু মনের জোরের ওপর খাড়া হয়ে ছিলাম। এবার রাঁচী পৌঁছে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না। আমি শয্যা নিলাম।

রাঁচীতে আমার নিয়মিত চিকিৎসা আরম্ভ হয়ে গেল। ডাঃ রায়ের নির্দেশমত যে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে আমি ওখানে ছিলাম তাঁর নাম হলো ডাঃ নরেশচন্দ্র মিত্র।

রাঁচীতে মা এবং সুশীলামাসী আমাকে এবং সাধনাকে আপ্রাণ সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। 'পুরাতন ভৃত্য' পাহাড়, তখনও ছিল। আমাদের সারিয়ে তুলতে সেও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। সাধনা তখন যদিও দুর্বল, তবে বিছানা থেকে উঠে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে—ডাক্তার ভরসা দিয়েছেন যে, সে এখন সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত।

আমাকে নিয়ে মার উৎকণ্ঠার আর সীমা নেই। মা দুটি সন্তানকে হারিয়েছেন, তাদের বয়সও ঠিক আমারই মত ছিল। সেইজন্যে মা যেন তাঁর সমস্ত ভালবাসা আমার উপরই উজাড় করে ঢেলে দিলেন। আমি যা যা খেতে ভালবাসি, তিনি নিজের হাতে সেগুলি তৈরী করে দিতেন।

তাঁর স্নেহ যত্ন, রাঁচীর আবহাওয়া এবং ডাঃ রায়ের নির্দেশমত চিকিৎসার গুণে আমি ক্রমশ সেরে উঠতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে পূজা এসে পড়ল। কলকাতা থেকে বহুলোক এল রাঁচীতে পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে। ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রও এলেন। তিনি রোজই আসতেন আমাকে দেখতে। তিনি আমাকে পরীক্ষা করে বললেন: মধু, তোমার গ্ল্যাণ্ড এখন পেকেছে, ওটি এইবার অপারেশন করতে হবে। অপারেশানের কথা শুনে আমি স্বাভাবিক ভাবেই একটু নার্ভাস হয়ে পড়লাম। তা দেখে তিনি অভয় দিয়ে বললেন: তোমার পায়ের অপারেশনের কথা মনে আছে তো! দেখো, এও মাস খানেকের মধ্যে সেরে যাবে এবং তুমি সম্পূর্ণ ভাবে রোগমুক্ত হয়ে তোমার স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। তাঁর কথাই ঠিক হলো; অপারেশানের মাস দেড়েকের ভিতরেই আমি প্রায় সুস্থ হয়ে উঠলাম।

এদিকে সাধনাও তখন প্রায় পুরোপুরি সুস্থ। অপারেশনের পরবর্তী সময় আমার নার্সিং-এর ভার খানিকটা সাধনাও নিয়েছিল। তখন তার বয়স মাত্র সতেরো।

রোগে ভুগে ভুগে আমি অত্যন্ত বদমেজাজী হয়ে পড়েছিলাম। একেই আমি বরাবরই ছিলাম একটু রগচটা। সামান্য ছোটখাট ঘটনাতেই মেজাজ গরম হয়ে উঠত এবং তার প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়ত মা ও সাধনার ওপর। খাওয়া-দাওয়ার

ব্যাপারে কোন জিনিস ঠিক আমার পছন্দসই না হলেই রাগারাগি করতাম। মা দুঃখ পেতেন খুবই, কিন্তু মুখে কিছু বলতেন না—শুধু চুপ করে বসে থাকতেন একখানি বিষাদ প্রতিমার মত। তা দেখে পরে আমারই কষ্ট হতো। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতাম এবং আমার এই বদমেজাজের জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতাম। হাতের কাছে কোন দরকারী জিনিস না পেলেই সাধনার সঙ্গে অকারণ চেঁচামেচি করেছি, রাগারাগি করেছি এবং পরে অনুতাপও করেছি।

আমার অনেক অন্যায় আবদার ও অত্যাচার এদের দু'জনকেই বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে হয়েছে। এই জন্যেই সমবেদনায় ও সহানুভূতিতে মা তাঁর হৃদয়ের অজস্র স্নেহধারায় সাধনার মনকে ভরিয়ে দিলেন। অর্থাৎ মার স্নেহ ভালবাসা যেটা আমি এতদিন একা ভোগ করে এসেছি, তখন সেটা দুজনের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল। মা ও সাধনার মধ্যে একটা হৃদয়ের নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠল। সাধনা তার প্রাণের যত ব্যথা বেদনা সব মার কাছে ব্যক্ত করত। শেষ পর্যন্ত সাধনা মার এত প্রিয় হয়ে উঠল যে, মা প্রায়ই বলতেন : এ হলো আমার বাড়ীর লক্ষ্মী।

মা প্রায়ই সন্ধ্যার সময় দাদামশায়ের ইংরাজী রামায়ণ ও মহাভারত পড়ে শোনাতেন। সাধনাও মাঝে মাঝে ভাল ভাল ইংরাজী বই থেকে পড়ে শোনাত।

আমি ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে চলতে লাগলাম।

এইভাবে শীতটা কেটে গেল। গ্রীষ্ম এল—রাঁচীতে গ্রীষ্মকালটা বড় অস্বস্তিকর। এক এক সময় অসহ্য মনে হয়। মা ঠিক করলেন, কিছুদিনের জন্যে আমাকে ও সাধনাকে দার্জিলিং পাঠাবেন। যদিও তাঁর টানাটানির সংসার—তবুও সংসারের খরচের টাকা থেকেই তিনি বেশ কিছু টাকা আমাদের হাতে দিলেন। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মার কাছে কোন কষ্টই বড় নয়। এই জন্যেই তিনি কল্যাণী—এ কল্যাণী রূপ একমাত্র মায়ের মধ্যেই সম্ভব।

কুচবিহারের ইন্দিরা মহারাণীর সংগে সাধনাদের পরিবারের নিবিড় সম্বন্ধ—একথা আগেই বলেছি। সুতরাং দার্জিলিং-এ কুচবিহার স্টেটের একটি বাড়ী, "ইউনিক ভিলা" বিনা ভাড়াতেই পাওয়া গেল। বর্তমান মহারাজা তখন ছিল নাবালক। ইন্দিরা মহারাণী কুচবিহার স্টেটের 'রিজেন্ট' রূপে সেই সময় কার্য পরিচালনা করছিলেন।

রাঁচীতে বেশ খানিকটা সুস্থ হবার পরে আমি ও সাধনা দার্জিলিং এলাম। সঙ্গে গেলেন সাধনার মা এবং ছোট বোন নীলিনা। প্রায় দেড় মাস ছিলাম সেখানে। তারপর এল বর্ষা। এর মধ্যে শরীর আমার সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে। ফিরে এলাম রাঁচীতে।

বর্ষা কাটতেই পূজো এসে পড়ল। আবার রাঁচীতে বহু লোকের ভিড় শুরু হয়ে গেল। রাঁচী আবার বেশ জমজমাট হয়ে উঠল।

এই সময় রাঁচীর বি-এন-আর হোটেলে এসে উঠেছিলেন কুচবিহারের মহারাণী স্বনীতি দেবী—ইন্দিরা মহারাণীর শাশুড়ী। আমার মার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সেই বাল্যকাল থেকে, যখন ওঁরা দু'জনেই মিস্ পিগটের স্কুলে পড়তেন। একথা আগেই বলেছি। কুচবিহার ছোট স্টেট হলে হবে কি? ওর ছিল বিরাট প্রতিপত্তি। ভাইসরয়, গভর্ণর ছাড়া ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের যখনই কেউ ভারতবর্ষে এসেছেন, তিনিই কুচবিহার রাজপরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন ওখানে শিকার করতে গিয়ে। এর ওপর স্বনীতি দেবীই হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় রাণী যিনি বিলেতে গিয়ে রাজপুরুষদের সঙ্গে কায়দাদুরস্তভাবে চলাফেরা করেছেন এবং স্বচ্ছন্দে ইংরাজীতে কথাবার্তা বলেছেন। বিরাট প্রাচুর্য ও জাঁকজমকের মধ্যে তাঁর জীবনের বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এখন আর তাঁর সেই আগেকার স্বখের দিন ছিল না। স্বামী গেছে; চার ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে মাত্র এক ছেলে ও এক মেয়ে বেঁচে ছিল—তাও তারা দু'জনেই তখন বিলেতে। রাঁচীতে ছিলেন শুধু তাঁর এক ভাই—নির্মলচন্দ্র সেন এবং তাঁর পরিবার। তাঁরা অন্য হোটেলে থাকতেন। তাই সম্ভবত নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে তিনি গাড়ী পাঠাতেন মাকে নিয়ে যাবার জন্যে। মার সঙ্গে আমি ও সাধনা প্রায়ই যেতাম। আমাকে দেখে তাঁর নিজের বড় ছেলে রাজীবের (রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ) কথা মনে পড়ে যেত—এইকথা তিনি মাকে কয়েকবার বলেছিলেন; আর সেইজন্যেই হয়তো আমি কোনদিন না গেলেই আমার সম্বন্ধে খোঁজ করতেন। যদিও তিনি সাধনার আপন বড় পিসিমা, তবু মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিজের বোনের মত এবং আমার প্রতি ছিল তাঁর গভীর অপত্য স্নেহ। তাঁর আগেকার উৎসবমুখর দিনগুলির কথা স্মরণ করে আমার মনটি বেদনায় ভরে যেত, আর ভাবতাম জীবনে ওঠাপড়ার কি বিচিত্র গতি!

ডিসেম্বর নাগাদ আমি আর সাধনা চলে এলাম জামসেদপুরে। সেখানে তখন আমার সেজদা ডাঃ অমর বসু (রাজা বসু) দন্তচিকিৎসক হিসেবে বেশ পশার জমিয়েছেন। প্রথমে সেজদার ওখানেই গিয়ে উঠলাম। ওখানে তখন আমার ন'-বোন, পূর্ণিমা থাকত। তাঁর স্বামী শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বসু (এ. সি. বোস) তখন টাটায় বেশ বড় চাকরী করে। এদের বাড়ীতেও কিছুদিন থাকলাম। এদেরই ছেলে হলো বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় (এক সময় ভারতের ১নং খেলোয়াড় বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল) দিলীপ বসু। সে সময় অবশ্য দিলীপের বয়স খুবই কম—শিশু বললেই চলে।

১৯৩৩ সালের গোড়ায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সাধনাকে নিয়ে চলে এলাম কলকাতায়। জামসেদপুর ছাড়ার সময় খবর পেলাম মহারাণী সুনীতি দেবী রাঁচীর বি. এন. আর হোটেলে মারা গিয়েছেন। নিজের অজান্তেই একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

কলকাতায় এসে আমরা উঠলাম শ্বশুর বাড়ীতে। ডাঃ রায়ের কাছে গেলাম নিজেকে ভাল করে পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্যে। ডাঃ রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করে বললেন: না, এখন আর তোমার কোন রোগ নেই। সম্পূর্ণ সেরে গেছ। তবে বেশী খাটাখাটুনি আর অনিয়ম কোরো না—আর সপ্তাহে অন্ততঃ দু'দিন আমার কাছে এস। শীতকালে কলকাতার আবহাওয়া ভাল নয়, একটু সাবধানে তোমার থাকা দরকার।

ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের ওখানেও যেতাম মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময়। এদিকে মা যা টাকা দিয়েছিলেন তা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। তাঁর কাছে আর কত চাইব, আর তিনিই বা দেবেন কোথা থেকে? ম্যাডান কোম্পানীর অবস্থা তখন খুবই খারাপ। তাঁদের নিজেদের ফিল্ম প্রোডাকসন আর হচ্ছে না—প্রোডাকশন ডিপার্টমেণ্ট একরকম বন্ধ বললেই হয়। অন্য জায়গায় কাজের চেষ্টা করতে লাগলাম। যদিও শ্বশুর বাড়ীতেই তখন আছি এবং সেখানে আমাকে সবাই খুবই আদর-যত্ন করছিলেন, তবুও টাকার তো দরকার, খাওয়া-থাকা ছাড়া অন্য খরচ তো আছে; আর তা ছাড়া কতদিনই বা শ্বশুর বাড়ীতে থাকব!

কাজকর্ম না থাকাতে একটু মনমরা হয়ে গিয়েছিলাম। ডাঃ রায় বোধহয় সেটা লক্ষ্য করেছিলেন, তাই একদিন তিনি আমাকে বললেন: মধু, তোমার হাতে তো এখন কোন কাজকর্ম নেই। তুমি ভিক্টোরিয়া ইনস্টিট্যুশানের জন্যে একটা চ্যারিটি শো করে কিছু টাকা তুলে দাও না।

আমি তাতে বললাম: কিন্তু চ্যারিটি শো করে আমার কি লাভ হবে বলুন? আমার এখন টাকার দরকার। কতদিন আর শ্বশুর বাড়ীতে থাকব? তাছাড়া শো করতে হলে নিজেদের একটা আলাদা থাকবার জায়গা হওয়া দরকার। অন্যের বাড়ীতে থেকে······

ডাঃ রায় বাধা দিয়ে বললেন: হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি, তোমাকে বিনা পয়সায় কাজ করাব না। যাতে ভাল পারিশ্রমিক পাও তার ব্যবস্থা করব। এমন কি, কিছু আগাম টাকাও তোমাকে পাইয়ে দেব।

আবার স্টেজ-প্রোডাকশন করব—তার সঙ্গে কিছু টাকাও রোজগার হবে, আমি আগ্রহসহকারে রাজী হলাম। ডাঃ রায় বললেন: তুমি তো রবীন্দ্রনাথের "দালিয়া"

স্টেজ করেছিলে, শুনেছিলাম বেশ ভাল হয়েছিল। সেইটাই আর একবার কর না! রবীন্দ্রনাথ এখন কলকাতায় আছেন, তাঁকে দিয়ে উদ্বোধন করাবার চেষ্টা করব।

আমি বললাম: খুব ভাল কথা। আমি কালই গুরুদেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।

'দালিয়া'র অভিনয়ের কথা গুরুদেবের কাছে গিয়ে বললাম। তিনি আমায় উৎসাহ দিলেন, তবে আগের নাট্যরূপটি একবার দেখতে চাইলেন। প্রথমবার যখন অভিনয় হয়, তখন তার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় ৺অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কারণ গুরুদেব তখন বিদেশে ছিলেন। সেই নাট্যরূপটি গুরুদেবকে দেখালাম। তিনি তার অনেক কিছু সংশোধন করে দিলেন। এমন কি, কয়েকটি নতুন দৃশ্য নিজে লিখে দিলেন। শুধু তাই নয়, একখানি গানও নতুন করে লিখে দিলেন।

আমার পরম দুর্ভাগ্য, আমার জীবনের একটি গুরুতর ক্ষতি যে, সেই অমূল্য পাণ্ডুলিপি আজ আর আমার কাছে নেই। আমার "মাইকেল মধুসূদন" ছবির মুক্তির পরে ১৯৫১ সালের কোন সময়ে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে আমার ঘর থেকে এই পাণ্ডুলিপিটি খোয়া যায়। "মাইকেল"-এর সাফল্যের পরে আমি গুরুদেবের রচিত কোন কাহিনীর চিত্ররূপ দেবার কথা চিন্তা করছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমি নির্বাচন করেছিলাম "শেষের কবিতা"কে। এই নিয়ে যাঁদের সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই শুনেছিলেন গুরুদেব আমার প্রযোজিত "দালিয়া"র নাট্যরূপটির অনেক কিছু নিজে হাতে সংশোধন করে দিয়েছিলেন এবং কয়েকটি নতুন দৃশ্যও যোগ করেছিলেন। এই জন্যে অনেকেই আগ্রহসহকারে পাণ্ডুলিপিটি দেখতে চাইতেন এবং আমি সানন্দে তা দেখাতাম। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, পাণ্ডুলিপিটি যথাস্থানে নেই এবং সেটি চিরকালের মত অদৃশ্য হয়েছে।

১৯৩৩ থেকে ১৯৫০—এই দীর্ঘ সতেরো বছর আমি ভারতের বহু জায়গায় গিয়েছি, আমার জীবনেও বহু রকম ভাঙ্গা-গড়া হয়ে গেছে, মুখে হয়ত হেসেছি, কিন্তু সুখ-শান্তি আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে বহু দূরে। অদৃষ্ট আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে হেলাভরে। বহুদিনই কেটেছে হোটেলে হোটেলে; কিন্তু বিপর্যয়ের মধ্যেও গুরুদেবের ঐ "দালিয়া" পাণ্ডুলিপিখানি যক্ষের মত বুকে করে আগলে রেখেছিলুম এতদিন। কিন্তু আর রইল না—তাঁর হস্তাক্ষর-সংবলিত সেই দুর্মূল্য রত্নটি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। মাত্র তার একখানি নকলকে কাছে রেখে আমার মনকে আমি সান্ত্বনা দিই।

ডাঃ রায় তাঁর কথামত আমায় ভাল অগ্রিম টাকা দিলেন প্রোডাকশনের খরচ বাবদ এবং আমার নিজের খরচের জন্যে। চৌরঙ্গী প্লেসে বর্তমান রক্সী সিনেমার পাশেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম। নতুন করে আবার সংসার পাতলাম সেখানে ১৯৩৩ সালের গোড়ায়।

'দালিয়া'র প্রোডাকশনের তোড়জোড় আরম্ভ করলাম। "দালিয়ার" অনেকগুলি গান আমি এবং মিঃ ফ্রাঙ্গোপোলো harmonise করেছিলাম ১৯৩০ সালে প্রথম অভিনয়ের সময়, সে কথা আগেই বলেছি। Harmonise করার সাহস পেয়েছিলাম "আলিবাবা" অভিনয়ের সময়। 'আলিবাবা'র harmonise করা গানের স্বরলিপি ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলাম—আর সেটি গুরুদেবকেই আমরা উৎসর্গ করেছিলাম। এই harmonise করা বাংলা গানের স্বরলিপি দেখে তিনি খুশী হয়ে এই আশীর্বাণীটি লিখে দিয়েছিলেন :

"I hope this small beginning will grow into a great musical development." বইটি প্রকাশ করেছিলেন ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স।

নতুন ফ্ল্যাটে নতুন উদ্যমে আবার কর্মে—যে কর্ম আমি সবচেয়ে ভালবাসি সেই স্টেজ-প্রোডাকসনে—আমার মন-প্রাণ ঢেলে দিলাম। সাধনাও নতুন উদ্যমে লেগে পড়ল নাচ compose করতে। ১৯৩০ সালে শুধু চারটি মেয়ে ব্যালেতে ছিল, এবার আটটি মেয়ে পেলাম। আমার বড়দি (সুষমা সেন) তখন কলকাতায়, পার্ক স্ট্রীটে বড় ফ্ল্যাট নিয়ে আছেন। তাঁর ওখানে ব্যালের রিহার্সাল আরম্ভ হলো। বড়দির বড় মেয়ে কল্যাণীও ব্যালেতে যোগ দিল। সাধনা নাচ শেখাতে শুরু করল।

১৯৩০ সালের 'দালিয়া'র প্রথম অভিনয়ের সময় পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রা ছিল ফ্রাঙ্গোপোলোর তত্ত্বাবধানে এবং দেশীয় অর্কেস্ট্রার ভার ছিল মিহিরকিরণ ভট্টাচার্যের হাতে। এবারেও তাই রইল।

"দালিয়া"র দ্বিতীয় অভিনয় হলো এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমান রক্সী) ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ সালে। গুরুদেব উপস্থিত থেকে সি. এ. পি'কে সম্মানিত করেন।

অভিনয়টি হয় কলিকাতার ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিট্যুশনের সাহায্যকল্পে।

"দালিয়া"র সংগঠনকারী—প্রযোজনা ও পরিচালনা : মধু বসু, নৃত্য পরিচালনা : সাধনা বসু, আলোক-নিয়ন্ত্রণ : গীতা ঘোষ, মঞ্চ-ব্যবস্থাপনা : সুশোভন গুপ্ত, রূপ-সজ্জা : শ্যাম, প্রচার : বি. সি. বোনার্জি ও সুধীর সান্যাল, পুস্তিকা-প্রচ্ছদ : শীলা বোনার্জি, পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রা : টি. ফ্রাঙ্গোপোলো, ভারতীয় অর্কেস্ট্রা : মিহির-

কিরণ ভট্টাচার্য, ভারতীয় অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে পাশ্চাত্য অর্কেষ্ট্রার সংমিশ্রণ : মধু বসু ও টি. ফ্রাঙ্কোপোলো।

ভূমিকা : আমিনা (তিন্নি)—সাধনা বসু, দালিয়া—মধু বসু, রহমৎ শেখ—কল্যাণ মজুমদার, জুলেখা—মীরা হালদার, বৃদ্ধ ধীবর—প্রীতিকুমার মজুমদার।

ধীবরকন্যা ও আরাকানী ব্যালে : সুশীলা সেন, শীলা দত্ত, নীলিনা সেন, সাবিত্রী পোদ্দার, ইরা সেন, কল্যাণী সেন, সীতা চট্টোপাধ্যায়, মার্জরী সুরিটা।

একক নৃত্য : অমলা নন্দী।

ধীবরগণ : ধীরেন ঘোষ, গৌরী ওঝা, অনিল নাগ, বোকেন চট্টো, ধীরেন বসু, নৃপেন বসু।

অভিনয় শুরু হলো। গুরুদেব 'দালিয়া'র প্রথম অভিনয় দেখেননি, তাই মনে ভয় ছিল harmonised গানগুলি তাঁর কি রকম লাগবে ? আমি বেশ একটু নার্ভাস হয়ে পড়লাম।

প্রথম অঙ্কের 'ড্রপ' পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম গুরুদেবের বক্সে 'দালিয়া'র মেক-আপ নিয়েই। গুরুদেবের সঙ্গে বক্সে বসেছিলেন, প্রশান্ত মহলানবীশ, আমার বড়দি (সুষমা সেন), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং মণিকা মহলানবীশ—সাধনার ন' পিসিমা, প্রোফেসার এস. সি. মহলানবীশের স্ত্রী। গুরুদেবকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম : কি রকম লাগছে আপনার ?

স্মিত হেসে গুরুদেব বললেন : ভালই তো লাগছে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম : তিন্নি কি রকম করছে ?

গুরুদেব বললেন : ভাল, বেশ ভাল করছে।

এইবারে আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : কতকগুলি গান harmonise করেছি। ১৯৩০ সালে যখন প্রথম 'দালিয়া'র অভিনয় হয় তখন বিবিমাসীকে শুনিয়েছিলাম। তাঁর ভালই লেগেছিল। আপনার কেমন লাগছে ?

গুরুদেব বললেন : ভালই হয়েছে।

মণিকামাসী বললেন : 'আমি চঞ্চল হে সুদূরের পিয়াসী' গানটি তোমাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে, তোমার আর সাধনার গাওয়াও বেশ ভাল হয়েছে !

গুরুদেব বললেন : হ্যাঁ, এ গানটি harmonise করার উপযুক্ত গান। অন্য গানগুলোও তো ভালই লাগছে।

আমার বুকের ওপর থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল। ভয় ছিল যদি গুরুদেব বলেন যে, এতো আমার সুরের সঙ্গে মিলছে না, তাহলেই সর্বনাশ !

ভেবেছিলাম 'দালিয়া'র গানগুলিও স্বরলিপি করে ছাপাব, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।

বৃদ্ধ ধীবররূপে অভিনয় করেছিল প্রীতি মজুমদার (টুকলু)। তার অভিনয়ও তাঁর খুব ভাল লেগেছিল! তিনি তার কথা জিজ্ঞেস করায় আমি বললাম: তার পার্ট তো শেষ হয়ে গেছে।

তখন তিনি বললেন: না, না—তা কি করে হয়? বুড়ো জেলেকে যে দরকার শেষ দৃশ্যে। এই ড্রপের আগে তিন্নি আর বুড়ো জেলের দৃশ্যটা বেশ জমেছিল বলে প্রোগ্রামের একটা পাতাতেই কয়েকটা লাইন লিখে দিলেন, অর্থাৎ শেষ দৃশ্যে বুড়ো জেলেকে আবার আসতে হবে এবং দৃশ্যটি মিলনান্তক হবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম স্টেজে। টুকলু ততক্ষণে মেক-আপ তুলে ফেলেছে। আমি গিয়ে বললাম: তোর অভিনয় গুরুদেবের ভাল লেগেছে। শেষদৃশ্যে তোকে আবার নামতে হবে। এই নে তোর শেষ দৃশ্যের পার্ট।

গুরুদেব প্রশংসা করেছেন শুনে টুকলু তো লাফিয়ে উঠল। আবার নতুন উৎসাহে মেক-আপ করতে বসে গেল। গুরুদেবের প্রশংসা পাওয়া যে-কোন শিল্পীর পক্ষেই পরম গৌরবের বিষয়।

অভিনয় শেষ হলে সাধনাকে স্টেজ থেকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম গুরুদেবের কাছে। সাধনা এসে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি বললেন: এই যে আমার তিন্নি এস। তারপর আশীর্বাদ করে বললেন: আমার তিন্নিকে তুমি সার্থক রূপ দিয়েছ। বেশ হয়েছে তোমার অভিনয়।

আমি ও সাধনা গুরুদেবের সঙ্গে এক গাড়ীতে বরানগরের বাড়ীতে গেলাম। তিনি বরানগরে শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশের বাড়ীতে ছিলেন। সে রাত্রে সেখানেই আমাদের খাবার নিমন্ত্রণ ছিল। একই গাড়ীতে ছিলাম গুরুদেব, সাধনা, সাধনার বাবা শ্রীসরল সেন এবং আমি। সাধনা ছিল তার বাবার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। কাজেই তার প্রতি কিছুটা পক্ষপাতিত্ব করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। গাড়ীতে যেতে যেতে শ্রীযুক্ত সেন বললেন, আমাকে আর সাধনাকে দেখিয়ে: সত্যই এ হলো মধুর সাধনা।

গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন: না সরল, মধুর সাধনা নয়, মধুর মাধবী।

এর পরও গুরুদেব আর একদিন দালিয়া'র অভিনয় দেখতে এসেছিলেন।

খরচ-খরচা সব বাদ দিয়ে এই চ্যারিটি শো থেকে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিট্যুশন প্রায় ৬০০০ টাকা পেয়েছিল। ডাঃ রায় তাঁর কথামত আমায় বেশ ভাল টাকাই দিলেন পারিশ্রমিক বাবদ। সেই টাকা দিয়ে আবার নতুন করে আমাদের চৌরঙ্গী প্লেসের ফ্ল্যাট সাজালাম।

শৈশব থেকেই সাধনা ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দু' ধরনেরই গান-বাজনার খুব ভক্ত ছিল। বিখ্যাত ঠুংরী গায়ক গিরিজাবাবু সাধনা ও তার কনিষ্ঠা ভগ্নী নীলিনাকে গান শেখাতেন। এছাড়া বিবাহের আগে থেকেই সে মিঃ টি. ফ্রাঙ্গোপোলোর কাছে পিয়ানো শিখত। পাঞ্জাবে "খাইবার ফ্যালকন" শুটিং করতে যাবার আগেই আমি এই শেখবার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলাম।

এখন আবার সাধনা পিয়ানো শিখতে চাইল। এর জন্য একটি পিয়ানো ভাড়া করে আনা হলো এবং মনীষা ওকে পিয়ানো শেখাতে লাগল। মনীষা হচ্ছে স্থনন্দ সেনের অর্থাৎ ক্যাবলাদার বড় মেয়ে; তবে সাধনার জ্যাঠতুতো দাদার মেয়ে হলেও মনীষা ও সাধনা প্রায় সমবয়সীই ছিল। আমার প্রথম মঞ্চ-প্রযোজনা "আলিবাবা"তে ব্যালে-গার্লরূপে অবতীর্ণা হয়েছিল মনীষা ১৯২৮ সালে এবং তখন থেকেই ব্যালে-গার্লরূপে সে বরাবরই সি. এ. পি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। সাধনা ঐ সঙ্গে আবার নতুন করে গান শিখতেও লাগল। সে-সময়ে আমাদের ফ্ল্যাটে প্রায়ই গান-বাজনার আসর বসত; এই আসরে প্রায় নিয়মিতভাবে যারা আসত, তাদের মধ্যে মিহিরবাবু (তিমিরবরণের দাদা মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য), শচীন (দেববর্মণ) ও হিমুর (হিমাংশু সুরসাগর) নাম বেশী করে মনে পড়ছে। আমি শচীনকে সাধনার গান শেখবার আগ্রহের কথা বলতে সে অত্যন্ত খুশী মনে তাকে শেখাতে চাইল এবং বলা বাহুল্য এর জন্যে কোনরকম পারিশ্রমিক নিতে সে রাজী হলো না।

গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে সাধনা তার নাচের অনুশীলন করত। হৃদ্যতাপূর্ণ বন্ধুদের সাহচর্যে আমাদের দিনগুলি কাটতে লাগল—আমাদের চারদিকেই তখন শিল্পীসুলভ পরিবেশ। আমার জীবনধারা সত্যিই বৈচিত্র্যময়।

লাহোরে যখন রোগশয্যায় একলা পড়েছিলাম তখন খালি মনে হতো এরকম ভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ? তারপর রাঁচীতে প্রায় এক বছরের উপর কি কঠিন পরীক্ষার ভেতর দিয়েই না আমাদের দুজনকে যেতে হয়েছে! আর আজ আবার নতুন করে যেন আমরা বেঁচে উঠলাম। মনে বল পেলাম, সাহস পেলাম—আবার দেখলাম ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ।

আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা প্রায় প্রতিদিনই আমাদের ফ্ল্যাটে আসতেন

তাঁরা হলেন : ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের পুত্র মণীন্দ্রলাল মিত্র (জজি নামে সুপরিচিত) এবং তার বোন এলা। এরা সি. এ. পি'কে সব দিক দিয়ে সাহায্য করত। মনমোহন ঘোষের নাতি গীতা ঘোষের কথা তো আগেই বলেছি। সে আমাদের সি. এ. পি'র একজন সবচেয়ে করিৎকর্মা সভ্য ছিল। সাধনার বাবা শ্রীসরলচন্দ্র সেন আমাদের মঞ্চাভিনয়ে বরাবর প্রচুর উৎসাহ দিতেন। উনি ছিলেন ব্যারিস্টার এবং প্রায় প্রতিদিনই হাইকোর্ট থেকে বাড়ী ফেরার পথে আমাদের ওখানে আসতেন।

জগদ্বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর (তখন অবশ্য পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করেননি) সেই সময় তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী ম্যাডাম সিমকিকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁরা থাকতেন আমাদের ফ্ল্যাটের খুব কাছে—কন্টিনেন্টাল হোটেলে। সুতরাং প্রায়ই শঙ্কর ও সিমকি আমাদের ওখানে আসত। আমরাও সময় পেলেই ওদের ওখানে যেতাম। ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে আমাদের একটা নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

ইঙ্গবঙ্গ সমাজে জাতে উঠতে হলে ককটেল পার্টিতে যেতে হবে এবং ঐ সঙ্গে কয়েকটি ভাল ক্লাবের মেম্বার হতে হবে। সুতরাং আমরাও দুটি খুব অভিজাত ক্লাবের সভ্য হলাম—300 Club (এটি ছিল নাইট ক্লাব) এবং লেক ক্লাব। এই ক্লাবের মধ্যে দিয়ে আবার অনেক নতুন বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হলো। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো বর্ধমানের মহারাজকুমারী ললিতা রাণী ও তার স্বামী ভগবতীপ্রসাদ মেহেরা। ভগবতীর ডাক-নাম ছিল 'বাগী' আর সে ঐ নামেই সকলের কাছে পরিচিত ছিল। সে তখন জেসপ্ কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এদের দুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্রমশ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। শেষে এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌছুল যখন 'বাগী' আর ললিতা প্রতিদিনই আমাদের ফ্ল্যাটে একবার না এসে পারত না। বন্ধু-বান্ধব মহলে ও সমাজে সাধনা ও ললিতার নামই হয়ে গিয়েছিল—'The two inseparable'.

ললিতা প্রায় প্রতি রবিবারেই আমাকে ও সাধনাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করত তাদের 'বিজয় মঞ্জিল' প্রাসাদে। এইখানেই মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। অসম্ভব উৎসাহ ছিল তাঁর নাট্যাভিনয়ের দিকে, তিনি নিজেও অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন। বাংলা সাহিত্য ও নাটক নিয়ে কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

আমাকে আর সাধনাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। ক্রমশ তিনি সি. এ. পি'র

একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলেন। তিনি আমাদের বরাবরের জন্যে নিমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রতি রবিবার দুপুরে 'বিজয় মঞ্জিলে' গিয়ে লাঞ্চ খেতেই হবে। আর সে তো যে-সে লাঞ্চ নয় যে বিলাতী হোটেলের মত ৩।৪টি 'কোর্স' দিয়েই শেষ করে দেবে—পুরোপুরি বাঙ্গালী রান্না এবং সে-যে কত রকমের খাবার থাকত তা গুণে শেষ করা যায় না। ললিতার মা নিজের হাতে কয়েকটি পদ রাঁধতেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের খাওয়ার তদারক করতেন। সত্যিই বিজয় মঞ্জিলের লাঞ্চ এক এলাহি ব্যাপার।

আমাদের চৌরঙ্গী প্লেসের কথা বলতে গিয়ে আরও দুজনের কথা মনে পড়ে গেল। একজন হলো আমার ভাগ্নে শঙ্কর (আমার সেজদির বড় ছেলে), আর একজন হলো হেম চৌধুরী, ভূতপূর্ব ভারতীয় সেনাদলের সর্বাধিনায়ক জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর ছোট ভাই এবং পরলোকগত ব্যারিস্টার এ. এন. চৌধুরীর পুত্র। ওরা দুজনেই তখন বিলেত থেকে ফিরে Andrew Yule কোম্পানীতে ভাল চাকরি করছিল।

তারা দুজনেই সংগীতের খুব ভক্ত ছিল—শঙ্কর ছিল ভারতীয় সঙ্গীতের ভক্ত বিশেষ করে কীর্তনের, আর হেম ছিল পাশ্চাত্য সংগীতের ভক্ত। হেম প্রায়ই সঙ্গে করে নিয়ে আসত তার Ukelily বাদ্যযন্ত্রটি। এই যন্ত্রটি হলো অনেকটা স্প্যানিশ গীটারের ছোট সংস্করণ। সে Ukelily বাজিয়ে পাশ্চাত্য সংগীত গাইত। মনীষা—যে সাধনাকে পিয়ানো শেখাত সে পিয়ানো বাজাতো হেমের সঙ্গে। হেম আর মনীষা ক্রমে এত বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল যে, একদিন তাদের বিবাহ হয়ে গেল।

শঙ্কর সে-সময় একলাই তাদের আউটরাম স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকত। সেজদি এবং আমার ভগ্নীপতি স্যার বি. এল. মিত্র তখন দিল্লীতে। বড়লোকের ছেলে—সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছে; তার ওপর কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৃটিশ কোম্পানীতে বড় চাকরি করছে—তার পক্ষে সন্ধ্যার সময় ক্যালকাটা ক্লাব বা ঐ জাতীয় কোন অভিজাত ক্লাবে যাওয়া এবং সেখানে কলকাতার বড় বড় সরকারী চাকুরে এবং বৃটিশ কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা শ্রেষ্ঠ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সঙ্গে মেশাই স্বাভাবিক, কিন্তু সে ওদিকে বিশেষ না গিয়ে বেশির ভাগ সন্ধ্যায় আমাদের চৌরঙ্গী প্লেসের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হতো। সে যে শুধু গান-বাজনার ভক্ত ছিল, তাই নয়, সে গান গাইতেও পারত সুন্দর। গানের কণ্ঠটি তার সত্যিই ভাল ছিল।

যদিও তখন আমরা 'দালিয়া'-র রিহার্সাল নিয়ে খুব ব্যস্ত, তারই মধ্যে মাঝে

মাঝে গানের আসর বসত এবং শঙ্কর সে-সব আসরে গাইত। যখন সে 'মেজাজে' থাকত, তখন সে ভাবে তন্ময় হয়ে একটার পর একটা গান গেয়ে যেত। তার সংগীতের দিকে অদ্ভুত আকর্ষণ ছাড়াও এমন একটি শিল্পীসুলভ মন ছিল যে আমার আর সাধনার মন সে খুব সহজেই জয় করতে পেরেছিল। আর সে তো 'ছোটমামা' 'ছোটমামী' বলতে অজ্ঞান।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসের শেষদিকে যখন আমাদের 'দালিয়া'-র রিহার্সাল পুরোদমে চলছে, তখন শঙ্কর মাঝে মাঝে বলত, "ছোটমামা, আমি যদি তোমার মত গান-বাজনা নিয়ে থাকতে পারতাম, তাহলে অনেক সুখী হতাম। আমি জানি লোকে আমাকে হিংসে করে; কারণ আমি এত বড় একটা বৃটিশ ফার্মে এরকম একটা ভাল চাকরি করছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এরকম একটা সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারি না।"

আগেই বলেছি, শঙ্কর সব থেকে ভালবাসত কীর্তন। শুনতেও ভালবাসত, গাইতেও ভালবাসত। সে-সময় কেষ্টবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র দে) গায়ক হিসাবে যশের শীর্ষদেশে—কীর্তনেও তখন উনি খ্যাতিলাভ করেছেন প্রচুর। স্বভাবতই শঙ্কর কৃষ্ণবাবুর গান শুনবার জন্যেই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একদিন আমায় বলল, "ছোটমামা, একদিন কেষ্টবাবুর গান, বিশেষ করে পালা-কীর্তন শোনাবার ব্যবস্থা কর না।" আমি তখন 'দালিয়া'-র রিহার্সাল নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, কেষ্টবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের ফ্ল্যাটে গানের ব্যবস্থা করতে একটু দেরী হয়ে গেল।

কিন্তু যখন ব্যবস্থা করলাম, তখন শঙ্কর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। সেই অসুখই তার কাল হলো। সামান্য অসুখ শেষপর্যন্ত দাঁড়াল নিউমোনিয়ায়। শঙ্করের অসুখের খবর পেয়ে সেজদি যখন দিল্লী থেকে এসে পৌছুল, তার দুদিন পরেই শঙ্কর আমাদের সকলের মায়া কাটিয়ে ইহলোক ছেড়ে চলে গেল।

তাকে আমরা ক'দিনই বা অন্তরঙ্গভাবে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম, বড়জোর হপ্তা-তিনেক হবে, কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে সে আমাদের এতখানি আপনার করে নিয়েছিল তার সুন্দর স্বভাবের জন্যে, যে তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়লাম। এ-আঘাতটি মর্মান্তিক হয়ে বাজল আমার বুকে।

শঙ্করের স্মৃতিরক্ষার্থে সেজদি একটি 'কীর্তন গানের স্কুল' প্রতিষ্ঠা করলেন—গুরুদেব তার নামকরণ করে দিলেন 'শঙ্কর মিত্র কীর্তন শিক্ষালয়।'

১৯৩৩ সালের মার্চের শেষাশেষি একদিন ক্যামেরাম্যান যতীন দাসের সঙ্গে দেখা। যতীন আমার 'গিরিবালা'র ক্যামেরাম্যান ছিল।

সে দেখল যে, আমি বেশ মন-মরা গোছের হয়ে আছি। আমায় বলল : মিঃ বোস, চলুন একদিন আমাদের ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে—দেখবেন কেমন সুন্দর স্টুডিও করেছেন মিঃ বি. এল. খেমকা, টালিগঞ্জের রিজেণ্ট পার্কে। এভাবে মন-মরা হয়ে বসে না থেকে, একদিন বেড়িয়ে আসবেন চলুন।

আমি বললাম : ফিল্ম-এর কাজ করতে আমাকে ডাক্তাররা বারণ করেছেন। সুতরাং শুধু শুধু বেড়াতে গেলে তো মন আরও খারাপ হবে।

যতীন বললে : রেখে দিন ডাক্তারের কথা, চলুন।—এই বলে একদিন সত্যিই সে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল।

কিছুদিন আগেই সবাক যুগের প্রবর্তন হয়েছে এবং নির্বাক যুগের হয়েছে অবসান। তখনকার ফিল্মশিল্প এখনকার মত ছিল না। তখন প্রোডিউসার বলতে স্টুডিও মালিকদেরই বোঝাত। তখন স্টুডিও ভাড়া নিয়ে ছবি হতো খুব কম। সব স্টুডিওতেই তখন টেকনিসিয়ান এবং আর্টিস্টরা মাস-মাইনেতে কাজ করত। স্টুডিও বলতে ছিল সাতটি—নিউ থিয়েটার্স, ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং, প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রীজ (পরে নামকরণ হয় কালী ফিল্মস ; সেটা বদলে এখন হয়েছে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও), রাধা ফিল্মস, ম্যাডান স্টুডিও, শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স এবং অরোরা। এর মধ্যে রুস্তমজী মারা যাওয়ায় ম্যাডান স্টুডিও হাত বদলে এসেছে রায়বাহাদুর শেঠ সুখলাল কারণানীর ব্যবস্থাপনায়। তখনকার দিনে বড় বড় আর্টিস্টরাও ছবিতে চুক্তি অনুসারে কাজ করতেন না—তাঁরাও মাইনে-করা ছিলেন। প্রায় ৮০০/৯০০ টাকার বেশী তখন কেউ পেতেন না। নিউ থিয়েটার্সের নামডাক ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে।

এই পরিবেশে কাজ করার মধ্যে তখন একটা বিশেষ আনন্দ ছিল। প্রত্যেক শিল্পী এবং কলাকুশলীর ভাল কাজ করার দিকে একটা আগ্রহ ছিল, তাঁরা টাকা-পয়সা থেকে কাজকেই বেশী ভালবাসতেন।

বোম্বাইতেও এই অবস্থাই চালু ছিল। ওখানেও প্রোডিউসার বলতে স্টুডিও-মালিকদেরই বোঝাত। তখন বোম্বায়ে ইম্পিরিয়াল, রঞ্জিৎ, প্রকাশ, সাগর এবং পুণায় প্রভাত ফিল্মের খুব নাম-ডাক।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। যতীনের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে গিয়ে দেখি ওখানে তখন বেশ কয়েকজন ডিরেক্টার ছবি করছেন। এ. আর. কার্দার তখন 'চন্দ্রগুপ্ত'

ছবি নিয়ে ব্যস্ত। কার্দারকে দেখেছিলাম লাহোরে জয়গোপাল পিলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করত—আর কাজ শিখত। কার্দার ছাড়াও ছিলেন পেসী কারানি, কৃষ্ণগোপাল (যিনি কে. জি. নামে এখন প্রসিদ্ধ)—ইনি প্রথমে চিত্রজগতে আসেন ক্যামেরাম্যান হয়ে, পরে পরিচালক হন।

অনেকের সঙ্গেই আমার আগে থেকে পরিচয় ছিল। আবার পরিচয়টা নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া গেল। ওখানে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে এবং স্টুডিওর পরিবেশে আবার আমার মনে একটা অদম্য আগ্রহ দেখা দিল এই লাইনে ফিরে আসবার জন্যে। বিকেল বেলায় ওখানকার 'লনে' বসে চা খেতে খেতে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটল—যাতে আমার জীবনের আর এক অধ্যায় সূচিত হলো বলা যেতে পারে।

ওখানে একজন জ্যোতিষী উপস্থিত ছিলেন—দেখলাম তিনি স্টুডিওর কর্মীদের ভেতর বেশ জমিয়ে নিয়েছেন এবং সকলেই তাঁর কথা বেশ মানে। তখন তিনি একজন ডিরেক্টরের হস্তরেখা পরীক্ষা করছিলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার তখন কোনরকম ঔৎসুক্য ছিল না, বরং ও ব্যাপারে একটা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল বলা যেতে পারে। আমি তখনও পর্যন্ত বরাবরই কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী। তবে আমার তখন মানসিক অবস্থা ভালো নয় এবং সকলেই জানেন, 'ডুবন্ত মানুষ একখণ্ড ভাসন্ত তৃণ ধরেও বাঁচতে চায়'। তাই যতীন যখন জ্যোতিষী মশায়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে, তখন 'দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি' এই মনোভাব নিয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কি একবার দয়া করে আমার হস্তরেখা পরীক্ষা করবেন? তিনি বললেন: নিশ্চয়ই করব। তারপর একটি ম্যাগনিফায়ার দিয়ে আমার হস্তরেখা ভালভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন: আপনি কি জানতে চান?

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: আমি কি আবার কাজ করতে পারব?

তিনি আমার হস্তরেখা আবার পরীক্ষা করে বললেন: নিশ্চয় পারবেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: কি ধরনের কাজ? চাকরী?

তিনি তখনও পরীক্ষা করছেন—ঘাড় নেড়ে বললেন: না, চাকরী নয়, শিল্প ও অভিনয় সংক্রান্ত কাজ। যে-কাজে সৃজনীক্ষমতার প্রয়োজন, সেই কাজ।

—আচ্ছা, সেটা কবে নাগাদ হবে সে বিষয়ে কিছু বলতে পারেন?

—অত নিখুঁত গণনা তো হাত দেখে বলা যাবে না। আপনার কোষ্ঠী আছে? অন্ততঃ জন্ম সাল, তারিখ ও সময় যদি আপনার মনে থাকে, তাহলে আমাকে লিখে দেবেন, আমি গণনা করে দেখে আপনাকে বলব।

এসবগুলো আমার জানাই ছিল, আমি তখনই একটা কাগজে লিখে তাঁকে দিয়ে দিলাম। কথা হলো, কয়েকদিন পরে তাঁর বাসায় গেলে সম্পূর্ণ গণনাটা পাওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে যতীনের সঙ্গে তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা করতে তিনি বললেন: খুব শীগ্‌গিরই কাজ আরম্ভ করবেন আপনি। আমি আমার অসুখের কথা উল্লেখ করে বললাম: সম্প্রতি আমি একটা সাংঘাতিক অসুখ থেকে উঠেছি—ডাক্তারে বলেছে ফিল্ম-স্টুডিওতে কাজ করলে আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

এ-কথায় তিনি বললেন: আমার জ্ঞানগম্যি অনুসারে বলছি যে, আপনার এখন কোনো অসুখের লক্ষণ নেই, বরং শরীর দিন দিন ভালর দিকেই যাবে।

জ্যোতিষী মশায়ের কথায় মনে একটা দারুণ উৎসাহ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি মনস্থির করে ফেললাম—যদি কাজ করতে হয় তো ফিল্ম-লাইনেই আবার ফিরে এসে নতুন করে জীবন শুরু করব।

সেদিন বাড়ী ফিরে সাধনাকে জ্যোতিষীর কথা বলতেই সে খুব খুশী হলো এবং আমাকে উৎসাহিত করল।

এর কয়েকদিন পরে যতীন আমাকে নিয়ে এল ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওর মালিক শ্রী বি. এল. খেমকার কাছে। খেমকাজী আমার 'গিরিবালা' ছবি দেখেছিলেন এবং নামও শুনেছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর হয়ে একখানি ছবি করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। খেমকাজী এর আগে কয়েকখানি সবাক ছবি করেছেন এবং তখনও করছেন। তাঁর সঙ্গে 'সেলিমা' নামক একটি উর্দু ছবির কনট্রাক্ট হয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। এই হলো আমার প্রথম সবাক ছবি।

আমার জীবনের আশা সফল হতে চলেছে। মনের আনন্দে মাকে বিস্তারিতভাবে সব জানিয়ে এক চিঠি দিয়ে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমার এতখানি ঝোঁক দেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মা অনুমতি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কেও একখানি চিঠি দিলেন আমাকে আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করতে।

ডাঃ রায় পরীক্ষা করে বললেন: তোমার এখন আর কোন রোগ নেই বটে, তবে এ-লাইনে না গেলেই ভাল করতে। কিন্তু তোমার যখন এতখানি ইচ্ছে, তখন সাবধানে থেকো।

ডাঃ মিত্র কিন্তু শুনে আমায় খুব উৎসাহ দিলেন। তিনি বললেন: দেখ, মানুষ যে-কাজ করে আনন্দ পায়, শান্তি পায়, তার সেই কাজই করা উচিত। মনের শান্তিটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা। মনে শান্তি না থাকলে শুধু ডাক্তারের ওষুধে

যোগ সারে না। ঠিক আছে—এই তোমার লাইন। আর যখন তুমি একটা ভাল সুযোগ পেয়েছ, তখন লেগে পড়। তারপর আমরা তো আছি—ভাবনা কি ?

এতদিনে সত্যিই মনের আনন্দ ফিরে এল। আবার মনের মধ্যে নতুন করে আশার জাল বুনতে লাগলাম।

মার অনুমতি পেলাম, আশীর্বাদও পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে পেলাম ডাক্তারদের ভরসা। এইভাবে নতুন করে আবার আমার চিত্রজীবন শুরু করলাম। সেটা হলো মে, ১৯৩৩।

'সেলিমা'-র চিত্রনাট্য লেখা শুরু করলাম। প্রথমে সংলাপ বাংলায় লেখা হলো, তারপর উর্দু অনুবাদ হলো। এতে গান এবং নাচ অনেকগুলি ছিল, তার সুরসৃষ্টি করা, ভূমিকা নির্বাচন করা প্রভৃতিতে বেশ কিছুদিন সময় গেল। তারপর নায়িকার নির্বাচন নিয়ে বাধল মুস্কিল। কারণ চরিত্রটি ছিল অল্পবয়সী একটি গ্রাম্যবালিকার। সে-ধরনের অভিনেত্রী অথচ উর্দু বলতে পারে, এমন কোন মেয়ে তখন কলকাতায় পাওয়া গেল না। সুতরাং নায়িকার সন্ধান চলতে লাগল উত্তরপ্রদেশে এবং পাঞ্জাবে।

এদিকে বছর প্রায় শেষ হয়ে আসে।

এই বছরের শেষের দিকে (ডিসেম্বর, ১৯৩৩) ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের স্ত্রী শ্রীমতী হেমলতা মিত্র (৺মনোমোহন ঘোষের প্রথমা কন্যা) আমায় অনুরোধ করলেন—"Children's Fresh Air & Excursion Society"-র জন্যে একটা চ্যারিটি শো করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দেবার জন্য। ডাঃ মিত্রের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। সুতরাং তাঁদের অনুরোধ আমাকে রাখতেই হলো।

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালের 'জেরিনা' নামে একখানি নতুন নাটকের পাণ্ডুলিপি তৈরী ছিল। সেইখানিকেই নির্বাচন করলাম। আমি যখন 'জেরিনা'-র ভূমিকা নির্বাচন করছিলাম, ললিতারাণী তখন একটি ছোট ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য খুব ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমি একটু ইতস্তত করলাম। কারণ, আমার সন্দেহ ছিল যে, মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর ললিতাকে মঞ্চে অবতরণ করতে দেবেন কিনা। যদিও আমি জানতাম যে, মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ ছিলেন নাট্যরসিক এবং সি. এ. পি.-র একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক।

যখন আমি ললিতাকে এ-কথা বললাম, তখন সে আমায় জানাল যে এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে তার পিতৃদেবের কথা হয়েছে। মঞ্চে অভিনয়ের ব্যাপারে তাঁর কোনোরকম আপত্তি নেই, বিশেষ করে এটা যখন সি. এ. পি-র ব্যাপার।

যাই হোক, 'জেরিনা'র অভিনয় হলো এম্পায়ারে ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩ সালে। ভূমিকালিপি ছিল এইরকম—

জেরিনা—সাধনা বসু। রুস্তম জামান—প্রীতিকুমার মজুমদার। আলি—গৌরী ওঝা (পালোয়ান হালদার)। মনসুর—মধু বসু। শাহ মির্জা—তিলক নেমো (টুটু ঘোষ)। বেগম সোফিয়া—সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়। কুলসম—মহারাজকুমারী ললিতারাণী। ব্যালেতে ছিল: মনীষা সেন, শীলা দত্ত, সাবিত্রী পোদ্দার, আইলীন সেনগুপ্ত, লতা দত্ত, সুসু কমিসারিয়েট ও জেরু পাওয়ালা।

'জেরিনা'-র অভিনয় সুধী ও সমালোচকদের খুশি করতে পেরেছিল।

এদিকে "সেলিমা"র কন্‌ট্রাক্টের দরুণ যা কিছু অগ্রিম পেয়েছিলাম, তা সবই খরচ হয়ে গেছে। 'জেরিনা'র মঞ্চাভিনয়ের জন্য পারিশ্রমিক খুব সামান্যই নিয়েছিলাম।

সুতরাং তাড়াতাড়ি কিছু একটা করা দরকার, নইলে সংসার চলাই মুস্কিল। শেষে ঠিক করলাম—"আলিবাবা"ই আর একবার করা যাক। কারণ এটা একবার করা ছিল এবং লোকের ভাল লেগেছিল।

১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ম্যাডান থিয়েটার্স অ্যাণ্ড প্যালেস অফ ভ্যারাইটিজে (বর্তমান এলিট সিনেমা) "আলিবাবা" মঞ্চস্থ করলাম।

এইবার 'আলিবাবা'র সাফল্য হলো অভূতপূর্ব—যশ এবং অর্থ দুদিক থেকেই। ম্যাডান থিয়েটার এণ্ড প্যালেস্ অফ ভ্যারাইটিজে 'আলিবাবা'র অভিনয় হলো তিনদিন—এবং প্রত্যেক দিনই হাউসে 'ন স্থানং তিলধারণম্'। চারিদিক থেকে অনুরোধ আসতে লাগল, এই অভিনয়ের মেয়াদ আরও কয়েকদিন বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু ম্যাডান থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ইংরাজী চিত্র-পরিবেশকের সঙ্গে পূর্বচুক্তি থাকায় আমাদের আর ম্যাডান থিয়েটার অ্যাণ্ড প্যালেস্ অফ ভ্যারাইটিজ দিতে পারলেন না। এর কিছুদিন পরে, মার্চ মাসে এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমান রক্সী) আবার কয়েকদিন 'আলিবাবা'র অভিনয় হলো। বলা বাহুল্য এখানেও প্রত্যেকটি শো পূর্ণ ছিল। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় "আলিবাবা" সম্পর্কে যে সব সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে থেকে দুটি এখানে উদ্ধৃত করলাম। বাকিগুলি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

It is all too seldom that Calcutta enjoys the privilege of seeing that talented band of artists, the Calcutta Amateur Players, and it was only to be expected that their performance of 'Alibaba' last evening at the Madan Theatre would fill the house as it did···. As is characteristic of the Calcutta Amateur Players, the stage management, individual costuming and general dressing of the piece were



সাধনা বসু ঃ 'আলিবাবা'য় মর্জিনারূপে [১৯৩৪ সাল]

excellent, while for individual histrionic ability there is none in Calcutta to surpass them. Among a team so well and evenly balanced, and sharing equally a very high standard of acting ability. it would be invidious to particularize….

……THE STATESMAN 21.2.1934.

"We feel sure that all those readers who are lovers of Art as well as discriminating connoisseurs of real entertainment will join us in welcoming the C.A.P. in a special repeat performance of their latest, if not their greatest success. "Alibaba" at the Empire Theatre on Friday the 16th March. This ardent and talented band of young artistes have by their keen enthusiasm, their ardent love of the Art and general all-round efficiency created for themselves a really unique position in the stage-world of Bengal".

"AMRITA BAZAR PATRIKA"

"আলিবাবা"র এই অভূতপূর্ব সাফল্যে আমাদের আর্থিক সমস্যার খানিকটা সমাধান হয়ে গেল।

বেশ মনের আনন্দে মশগুল হয়ে আমরা এর পরে কি করা যায় এই সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম। তখন এপ্রিল মাসের শেষাশেষি। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই রাঁচী থেকে আমার ন'দির একখানি টেলিগ্রাম পেলাম—

Father seriously ill—Come immediately.

এইরকম একটা দুঃসংবাদের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না—মনের সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে উবে গেল। তাই সঙ্গে সঙ্গেই টেলিগ্রাম করে দিলাম :

Starting tomorrow.

পরদিন রাত্রে সাধনাকে নিয়ে রাঁচী রওনা হলাম।

বেলা প্রায় এগারটার সময় রাঁচী পৌছলাম। গাড়ী থেকে নেমেই শুনলাম যে, সেইদিন ভোরেই বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন ইহলোকের মায়া কাটিয়ে। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আর আমার শেষ দেখা হলো না—এ মর্মান্তিক দুঃখ সহজে ভোলবার নয়।

ন'দির কাছে শুনলাম যে, গত দুদিন ধরে বাবা বিশেষ কিছুই খাচ্ছিলেন না। তখনই নিশ্চয় রোগের সূত্রপাত হয়েছিল—তবে তিনি অসাধারণ মনের জোরে দাঁড়িয়েছিলেন, কাউকে কিছু বলেননি। তারপর জ্বর খুব বেড়ে উঠল দেখে মা ডাক্তারকে ডাকবার জন্য বললেন, তখনও তিনি রাজী হলেন না, বলেছিলেন : না, না, ও কিছু নয়। এমনিতেই সেরে যাবে, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।

সন্ধ্যার সময় যখন খুব বাড়াবাড়ি হলো, তখন মা জোর করে ওখানকার সিভিল সার্জনকে খবর দিলেন। ডাক্তার যখন এলেন, তখন তিনি জ্বরে বেহুঁস। সুতরাং

ধরতে গেলে কোন চিকিৎসাই হলো না। তার পরদিন ২৭শে এপ্রিল, ১৯৩৪, ভোরবেলায় বাবা পরলোকের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি বরাবর বলে এসেছিলেন যে, ডাক্তারের চিকিৎসায় আমি কোনদিন থাকব না—আর ওষুধও কোনদিন খাব না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেলেন।

তাঁর বয়স ৮০ বছর পূর্ণ হতে আর কয়েকদিন মাত্র বাকী ছিল—তাঁর জন্মদিন ছিল মে মাসের ১২ তারিখে। কিছুদিন আগে থেকে 'অমৃতবাজারে' তিনি তাঁর আত্মকাহিনী ধারাবাহিক ভাবে লিখছিলেন: 'Reminiscence of a Septuagenarian'.

তিনি মাঝে মাঝে বলতেন যে নামটাকে পালটে এবার লিখতে হবে Octogenarian—কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না।

তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে রাঁচীর যত বন্ধু-বান্ধব এবং আরও কত লোক বাঙ্গালী, বেহারী, ইংরেজ সকলেই এসে শেষবারের মতো 'Grand old man of Ranchi'-কে তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন। আমার সেজদা তখন বিলেতে—সুতরাং তাঁর শেষ কাজ আমাকেই করতে হলো—সুবর্ণরেখা নদীর ধারে।

মা এই আঘাতে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। বাবার শ্রাদ্ধাদি শেষ করে মাকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে চলে আসতে পারলাম না। যতটা সম্ভব তাঁর কাছাকাছি থেকে তাঁকে কিছুটা অন্যমনস্ক রাখতে চেষ্টা করছিলাম। বাবার অবর্তমানে তাঁর মনের শূন্যতাবোধ এতে কতখানি কমেছিল বা আদৌ কমেছিল কিনা তা অবশ্য আমি জানি না। তবে অন্তরে উপলব্ধি করছিলাম, আমি কাছে থাকলে মা যেন অনেকটা শান্তি পেতেন। বড়দি (সুষমা সেন) ও মেজদি (সুরমা রায়) দুজনেই তখন বিলেতে। সেজদি (প্রতিমা মিত্র), ন'দি (পূর্ণিমা বসু) এবং ছোড়দি (উমা দে) মার কাছে কিছুদিন ছিল।

বেশীদিন আমি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী থাকতে পেলাম না। 'সেলিমা'র শুটিং অবিলম্বে করবার তাগিদ আসায় আমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলকাতা চলে আসতে হলো।

কলকাতায় ফিরে 'সেলিমা'র শুটিং-এর সব বন্দোবস্ত করলাম। বিভিন্ন ভূমিকায় যাদের নির্বাচন করলাম, তখনকার দিনে তাদের মধ্যে দুজনের নামডাক যথেষ্ট ছিল। একজনের নাম হলো মজহর খাঁ—সে অনেক ছবিতে এর আগে নেমে রূপদক্ষ অভিনেতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল এবং পরে বোম্বাইয়ে প্রযোজক হিসেবেও

প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিল। অপরজনের নাম হলো গুল হামিদ। গুল হামিদ জাতিতে পাঠান। এমন সুদর্শন চেহারা আমি চিত্রজগতে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি—যেমন লম্বা তেমনি দেহের গঠন আর তেমনি মুখশ্রী। এরা ছাড়া আর যারা এই ছবিতে অংশ নিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল সুগায়িকা ইন্দুবালা, নীহারবালা, আথার আলি, রাধাবাঈ, নাজির প্রভৃতি।

নায়িকার জন্য কিছুদিন থেকেই সন্ধান করা হচ্ছিল, একথা আগেই বলেছি। অনেক সন্ধানের পর শেষে ফৈজাবাদ থেকে একটি মেয়েকে ঠিক করা হলো। তার চেহারাটি সুশ্রী, আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি তখনও। নায়িকার চরিত্রটি হচ্ছে একটি গ্রাম্য মেয়ের—সুতরাং চেহারাটি চরিত্রের সঙ্গে ভালই মিলে গেল। আমি তাকেই নায়িকার জন্যে নির্বাচন করলাম। তার নামকরণ করলাম মাধবী।

মাধবীর মা ছিল বাইজী। মা বাইজী হলেও মাধবী মানুষ হয়েছিল ভিন্ন আবহাওয়ায় তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে। মাধবীর মা চাইত না যে সে এই পেশা গ্রহণ করে, তাই তার চালচলন, হাবভাব কোনটিই বাইজী-জনোচিত ছিল না। অত্যন্ত সাদাসিধা মেয়ে ছিল মাধবী। একটা ঘটনার কথা বললেই বুঝতে পারবেন যে কতখানি সরল গ্রাম্য বালিকা ছিল সে। একদিন শুটিং-এর সময় নায়ক গুল হামিদ নায়িকা মাধবীকে প্রেম নিবেদন করছে খুব অন্তরঙ্গভাবে। মাধবী তো প্রথমটা খুব ঘাবড়ে গেল—'সেট' থেকে তখুনি উঠে এসে আমাকে বললে যে, সে এ ধরনের কাজ করবে না। একজন সম্পূর্ণ অনাত্মীয় পরপুরুষ তার সঙ্গে এরকম ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে প্রেম নিবেদন করবে, আর তা সে সহ্য করবে কেমন করে? তাতে আমি, আমার সহকারী এবং তার মা অনেক করে বোঝালাম যে, এটা তো আর সত্যি সত্যি গুলহামিদ তাকে প্রেম নিবেদন করছে না—এটা হলো নায়ক-নায়িকার অভিনয়। এইভাবে তাকে অনেক করে বোঝাতে তবে সে বুঝল। পরে অবশ্য এ নিয়ে আর কোন হাঙ্গামা হয়নি।

'সেলিমার' ক্যামেরাম্যান হিসাবে প্রথম সুযোগ দিলাম যতীনের ছোটভাই, খোকাকে অর্থাৎ প্রবোধ দাসকে। অন্যান্য কলা-কুশলীদের মধ্যে ছিল বটু সেন শিল্প নির্দেশক হিসেবে, সি. এস. নিগম শব্দযন্ত্রী রূপে এবং মেক-আপম্যান ছিলেন হরিপদ চন্দ্র বা হরিবাবু। এই হরিবাবু পরে চলে আসেন মাদ্রাজে—সেখানে তাঁর প্রচুর প্রতিপত্তি হয়েছিল। সেখানকার 'স্টার'রা যখন প্রোডিউসারের সঙ্গে চুক্তি করতেন, তখন তাদের চুক্তির মধ্যে লেখা থাকত যে তাদের মেক-আপ করবেন হরিবাবু। হরিবাবু তার বাড়ীতেই Make-up-room করেছিলেন এবং মাদ্রাজের 'স্টার'রা এবং

বড় বড় আর্টিস্টরা হরিবাবুর বাড়ী গিয়ে মেক-আপ করে আসতেন। যখন 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে কন্যাকুমারী গিয়েছিলাম—পথে দু'দিন মাদ্রাজে ছিলাম। হরিবাবু খবর পেয়ে আমাকে আগের মতই সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে Connemara Hotel থেকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলেন।

'সেলিমা'র একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছিল আজকের দিনের এক বিখ্যাত সঙ্গীত-পরিচালক। এই ভূমিকাটি ছিল এক ভিখারীর। এই সঙ্গীত-পরিচালক তখন গাইয়ে হিসাবে সবে নাম করছে—এবং সাধনাকে গান শেখাত। তাকে একদিন কথায় কথায় বললাম: একটি ছোট ভিখারীর ভূমিকা আছে—কাজ বিশেষ কিছুই নেই—শুধু বসে থেকে একটি গান করতে হবে, আর কিছু নয়।

শুনে প্রথমে সে চমকে উঠল, বলল: বলেন কি মিঃ বোস? আমি ফিল্মে নামব কি? জানেন তো আমার পরিবারকে। আমি যদি ফিল্মে নামি তাহলে তাঁরা নির্ঘাত আমায় একঘরে করবেন। আমি গান করি, রেকর্ড করি, তাইতেই কত লোক কত কথা বলে!

আমি বললাম: তোমায় এমন করে মেক-আপ করে দেব দাড়িগোঁপ লাগিয়ে, যে কেউ চিনতেই পারবে না। তারপর অনেক করে বোঝানোতে শেষটায় সে রাজী হলো। গানটি সে খুবই ভালো গেয়েছিল। এই ব্যক্তিটি হলো আজকের বিখ্যাত সঙ্গীত-পরিচালক কুমার শচীনদেব বর্মন।

তখন আজকের মত গানের প্লে-ব্যাক প্রথা চালু হয়নি। সেইজন্যে আবার মুস্কিল বাধলো মাধবীকে নিয়ে। সে তো ভাল গান জানে না—যা জানে তাও বেসুরো গায়। বাইজীর মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও গান-বাজনায় তাকে আদৌ তালিম দেওয়া হয়নি, কারণ সে তো মানুষই হয়েছিল ভিন্ন আবহাওয়ায়। যাইহোক, অনেক ভেবেচিন্তে একটা মতলব বার করা গেল।

কমলা (ঝরিয়া) আসলে গান গাইবে ক্যামেরা ফিল্ডের বাইরে থেকে আর মাধবী সেই গান শুনে ঠোঁট নাড়বে অর্থাৎ lip movement দেবে—যেমন আজকাল প্লে-ব্যাকে হয়। কমলার কাছে 'মাইক' ছিল, সুতরাং মাধবী আস্তে গাইলে তার আওয়াজ মাইক্রোফোনে পৌঁছুবে না। শুটিং-এর আগে মাধবীকে গানটি পুরো মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং কোন্ লাইন কতবার গাইবে—এ সমস্ত বিষয় রিহার্সাল দিয়ে ট্রায়াল শুটিং করলাম একদিন। দেখা গেল এক্সপেরিমেণ্ট সফল হয়েছে—পর্দার ছবিতে মনে হলো গানটি মাধবীই গেয়েছে।

যারা ছবির প্রোজেকসান দেখল তারা কেউই বুঝল না যে গানটি মাধবী ছাড়া অন্য কেউ গেয়েছে। 'সেলিমার' মুক্তিলাভের পরে শুনলাম মাধবীকে চুক্তিবদ্ধ করেছে নিউ থিয়েটার্স মাসিক ৫০০৲ টাকা মাহিনায়। হঠাৎ একদিন নিউ থিয়েটার্সের প্রধান ব্যবস্থাপক অমর মল্লিক আমার কাছে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। সে বলল: হাঁ হে মধু, তোমার ছবিতে মাধবী এমন সুন্দর গান করেছে অথচ আমাদের ছবিতে গান গাইতে গিয়ে তো ডুবিয়ে দিয়েছে। রাই (রাইচাঁদ বড়াল) বলছে যে একে দিয়ে গান গাওয়ানো চলবে না—একেবারে বেসুরো। কি ব্যাপার বল তো ?

আমি তখন আসল ব্যাপারটা ভেঙ্গে বললাম: কনট্রাক্ট করার আগে একবার আমাকে যদি জিজ্ঞেস করতে তাহলে আর এ গণ্ডগোলটি হতো না। অমর তখন মুখ কাঁচুমাচু করে বললে: তোমরা যে তলে তলে এত কাণ্ড করেছ তা কি করে জানব বল ?

এর ফলে হলো কি, এন-টি তাদের চুক্তি অনুযায়ী পুরো এক বছর বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিয়েছিলো তাকে কোন ছবিতে না নামিয়ে।

তখন বাংলাদেশের বিখ্যাত নৃত্য-পটিয়সী শ্রীমতী নীহারবালা 'সেলিমা'র নাচগুলি মেয়েদের শিখিয়েছিল এবং নিজেও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

এইভাবে 'সেলিমা'র শুটিং চলল।

১৯৩৪ সালের শেষের দিকে একদিন শুটিং-এর জন্যে গেছি বোটানিক্যাল গার্ডেনে। তখন আমার ভাগ্নী সুন্তু (সুনীতার) বিয়ে হয়েছে সুধীর সেনগুপ্তের সঙ্গে। সুধীর তখন শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের লেকচারার, পরে প্রফেসার হয়েছিল। তারা তখন থাকত বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভিতরে একটা বাংলোতে। সে আমাকে আগে থেকেই বলে রেখেছিল দুপুরবেলা ওদের ওখানে লাঞ্চ খেতে।

খাবার সময় স্টেজ ও ফিল্মের কথা উঠল। আমি সুন্তুকে বললাম: তোর এত talent, ছোট বয়স থেকেই তোর অভিনয়ের যে ক্ষমতা আমি দেখেছি 'প্রহ্লাদে'র ভূমিকায়—তারপরে 'মর্জিনা'র ভূমিকায়, তাতে আমার মনে হয় যে তুই যদি অভিনয়টাকে seriously নিস্, তাহলে তুই অনেক কিছু করতে পারবি। এই শিল্পকে অনেক কিছু দান করতে পারবি।

তখন সুন্তুর বয়স আর কতই বা! ১৯।২০ বছর হবে। তাতে সে যা উত্তর দিয়েছিল তা আমার এখনও মনে আছে—সে বলেছিল: না ছোটমামা, আমি আর স্টেজে বা ফিল্মে ইণ্টারেস্টেড নই। একবার যখন ছেড়ে দিয়েছি তখন আর এ বিষয়ে

ভেবে কোন লাভ নেই। এখন আমার একমাত্র চিন্তা হলো সংসারকে নিয়ে—স্বামীকে নিয়ে। আর তাছাড়া আমার কি মনে হয় জানো ছোটমামা—সংসার আর অভিনয় দুটো একসঙ্গে চালানো যায় না ঠিক ভাবে।

সুস্ত আর সুধীর ছিল অত্যন্ত সুখী দম্পতি। সংসার আর স্বামীকে আঁকড়ে ধরে সুস্ত যে প্রেমের স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিল তা দেখে বোধহয় বিধাতা অলক্ষ্য থেকে হেসেছিলেন। নইলে সুস্তর ভাগ্যে এ সুখ বেশীদিন স্থায়ী হলো না কেন? আমার সঙ্গে দেখা হবার কয়েকমাস পরেই সুস্ত মাত্র কয়েকদিন টাইফয়েডে ভুগে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেল।

আজ বুঝতে পারছি যে সেদিন ছোট্ট সুস্ত যা বলেছিল তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। অভিনয় আর সংসার—দুটো দিক একসঙ্গে সামলানো যায় না—তা যে যত জোর গলাতেই বলুক।

'সেলিমা'র কাজ ধীরে ধীরে সুষ্ঠুভাবে শেষ হলো এবং মুক্তিলাভ করল ১৯৩৫ সালে।

সবাক চিত্রজগতে আমার এই প্রথম পদার্পণ—এবং বলতে বাধা নেই 'সেলিমা' দিল্লী ও পাঞ্জাবে বিশেষ করে পাঞ্জাবের জনসাধারণ কর্তৃক বিপুল ভাবে অভিনন্দিত হয়। পাঞ্জাবে তো রীতিমত box-office hit ও অন্যান্য স্থানের জনগণ এবং সমালোচকদেরও খুশী করতে পেরেছিল।

এর পর ঠিক করলাম যে নিজেরা মিলে একটা ফিল্ম কোম্পানী খুললে কেমন হয়! দু-চারজন বন্ধুবান্ধবের কাছে এই প্রস্তাবটি পাড়লুম। তারা সকলেই খুব উৎসাহ দেখাল এবং আশ্চর্যের বিষয় টাকাকড়িও জোগাড় হয়ে গেল। কোম্পানীর নাম দিলাম বেঙ্গল টকীজ। বন্ধুরা যারা টাকা দিয়েছিল—সকলেই বললে: 'আলিবাবা'টাই করা যাক। স্টেজে যখন এমন সাফল্যলাভ করেছে, তখন সেই সব শিল্পীদের নিয়েই 'আলিবাবা' করলে sure hit হবে। আমি বললাম: ভাই, এই সব এমেচার শিল্পীদের নিয়ে নিজের কোম্পানীর প্রথম ছবির কাজে নামতে ভরসা হয় না। ফিল্ম স্টুডিওর পরিশ্রম এরা সহ্য করতে পারবে না। শেষে মাঝপথে গিয়ে মহামুস্কিল হবে।

কোম্পানীর যারা অংশীদার তারা সকলেই আমার ওপর সমস্ত কাজের ভার ছেড়ে দিয়েছিল। আমি তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ না করলেও তারা কেউ কিছু বলল না। সুতরাং ভাল গল্পের খোঁজ চলতে লাগল।

এদিকে আমি প্রায়ই ডাঃ বিধান রায়ের কাছে যাই। শরীরটা মাঝে মাঝে তাঁকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিই। আমার এই নতুন কোম্পানীর বিষয় শুনে ডাঃ রায় একদিন বললেন: মধু, তুমি তো ফিল্মের জন্য গল্প খুঁজছ—তুমি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের একটা গল্প নাও না! উনি আমাকে বলছিলেন ওঁর অনেক ভাল ভাল গল্পের খসড়া করা আছে—বেচারীর এখন বড় টাকা-পয়সার টানাটানি যাচ্ছে।

আমি বললাম: ওঁর যদি ভাল গল্প থাকে আর তা যদি ফিল্মের উপযোগী হয় তাহলে আমার নিতে কোন আপত্তি নেই।

ডাঃ রায় সোৎসাহে বললেন: হ্যাঁ-হ্যাঁ, গল্প ভাল হবে বৈকি! উর্দু লেখক হিসেবে মৌলানা আজাদের যথেষ্ট সুনাম আছে। তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দেব।

আমি রাজী হলাম।

তারপর একদিন ডাঃ রায়ের বাড়ীতেই আজাদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো।

তিনি বললেন: আমার তো ঠিক গল্প তৈরী করা নেই। তবে একটা গল্পের প্লট মোটামুটি তৈরী করা আছে, সেটা আমি ডেভেলাপ করে দিতে পারি।

আমি বললাম: বেশ তো, আমি একদিন আপনার বাড়ী গিয়ে শুনব।

আজাদ সাহেবের গল্পের বিষয় আমি আমার অংশীদারদের বললাম। তাঁরা ঘোরতর আপত্তি করলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজাদ সাহেবের কিছু কিছু লেখা পড়েছিলেন—তাঁরা বললেন: আজাদ সাহেব খুব পণ্ডিত লোক সন্দেহ নেই, বিশেষ করে পার্শী ভাষায়। কিন্তু তিনি কখনও ফিল্মের জন্যে গল্প লেখেন নি। যা লিখেছেন সে সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর উর্দু সাহিত্য। গল্প যাও বা লিখেছেন তাও এত কটমট উর্দুতে যা খুব কম লোকই বুঝতে পারবে। অতএব ওদিকে না যাওয়াই ভাল। তার চেয়ে তুমি 'আলিবাবা'ই কর। আর্টিস্টরা সব ঠিক পারবে।

আমি কিন্তু ডাঃ রায়কে একরকম কথা দিয়েছি। ডাঃ রায়ের কাছে আমি যে রকম কৃতজ্ঞ এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের যে সম্বন্ধ তাতে তিনি কোন অনুরোধ করলে তাতে না বলার ক্ষমতা আমার নেই। আমি তখন তাদের বোঝালাম: আচ্ছা, শুনেই আসি না—কি রকম গল্প। ডাঃ রায় যখন বলছেন—

আমি গেলাম বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে আজাদ সাহেবের বাড়ী। শুনলাম গল্প—মন্দ লাগল না। শুনে তাঁর সঙ্গে কথা পাকাপাকি করেই এলাম।

আমার অংশীদারদের বললাম: আজাদ সাহেবের গল্পটাই পছন্দ করলাম—ওঁকে কথা দিয়ে এসেছি।

তাতে তাঁরা একটু ক্ষুণ্ণ হলেও বললেন: কথা যখন দিয়েছ তখন আর কিছু বলার নেই। তুমি হলে ডিরেক্টার—ডিরেক্টারের গল্প পছন্দ হলে আর আমাদের বলার কি থাকতে পারে?

শেষ পর্যন্ত তাঁর গল্পই মনোনীত হলো। অবশ্য এজন্য দক্ষিণাও ভালই দিয়েছিলাম তাঁকে। ছবির নাম হলো One Fatal Night বা "বলা-কি-রাত"। ছবিখানা হয়েছিল উর্দুতে।

এই ছবির বিষয় যত কম বলি ততই ভাল। মনে হয় কি অশুভক্ষণেই এই ছবিটির কাজে হাত দিয়েছিলাম। আমার জীবনের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা এই ছবিটা—এর শোচনীয় ব্যর্থতার কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় যে আমার অন্যান্য অংশীদারদের পরামর্শ নিলেই ভাল হতো, এতগুলো টাকা এভাবে জলে যেত না।

"One Fatal Night"—'বলা কি রাত' চিত্রটি এরকম শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবার পর ফিল্মের ওপর আমার কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেল। আমি তখন আবার মঞ্চের দিকে নজর দিলাম।

একদিন মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবের সঙ্গে মঞ্চ নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন: তুমি আর সাধনা যে এত খেটে মরছ—এতগুলো যে নাটক মঞ্চস্থ করলে—এতে তোমাদের কি লাভ হলো? 'চ্যারিটির' জন্যে 'শো' করছ—এতো খুব মহৎ কাজ। খুব যোগ্য কারণের জন্য 'চ্যারিটি শো' করে প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেশ কিছু টাকা পাইয়ে দিচ্ছ—এর জন্যে তোমরা সকলের কাছ থেকেই অভিনন্দন পাবে। কিন্তু এভাবে শুধু পরোপকার করে বেশী দিন চালাতে পারবে কি? তোমাদের তো আর জমিদারী নেই।

আমি তাতে বললাম: না, তা নেই, তবে আমি তো মাঝে মাঝে ফিল্মও করি, তা থেকে যা পাই—তাই দিয়ে কোনরকম করে খরচা চালিয়ে নিই।

তাতে তিনি বলে উঠলেন: কোনরকম করে চলবে কেন? ফিল্ম থেকে যা রোজগার করছ—তার ওপর নাটক মঞ্চস্থ করে যদি আরও কিছু টাকা আসে—তা হলে বেশ ভালভাবেই চলে যাবে। না—না—এভাবে talent এবং energy নষ্ট কোরো না। আমি বলি কি, এবার থেকে পেশাদারীভাবে 'শো'গুলো কর। পেশাদারী মানে আমি বলছি না যে, আমাদের চলতি থিয়েটারগুলো থেকে

অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে, তারা যেভাবে থিয়েটার করে, সেভাবে থিয়েটার কর। তবে সব সময় 'চ্যারিটি শো' নয়। সি-এ-পির এখন যেমন নামডাক হয়েছে,— 'চ্যারিটি'-র জন্য 'শো' না করলেও Full house পাবে।

আমি বললাম: আমি যে একথা না ভেবেছি তা নয়। তবে আসল সমস্যা হবে মেয়েদের নিয়ে। মা-বাবারা 'চ্যারিটি শো' বলেই মেয়েদের অনুমতি দেন। কিন্তু পেশাদারীভাবে করলে মা-বাবারা কি তাঁদের মেয়েদের অনুমতি দেবেন? এই ধরুন না—ললিতার কথা। পেশাদারীভাবে করলে আপনি কি তাকে মঞ্চে নামতে অনুমতি দেবেন?

তাতে তিনি বলে উঠলেন: কেন দেব না? আমি দেখব, কাদের সঙ্গে করছে—তারা কি রকম লোক। যেখানে তুমি আছ—সাধনা আছে, সেখানে ললিতাকে স্টেজে নামতে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।

তাঁর মনটা যে কত উদার ছিল, তা এই থেকেই বোঝা যায়।

ঠিক করলাম এবার থেকে 'সি-এ-পি'র শো-গুলি পেশাদারীভাবেই করা হবে।

আমার মামা অজয় দত্ত ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্তের একমাত্র পুত্র। মামাকে যখন আমার এই নতুন পরিকল্পনার কথা বললাম, তিনিও আমায় সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন। তাঁর দুই মেয়ে প্রথম থেকে সি-এ-পি 'ব্যালে'-তে ছিল। তিনি বললেন: বর্ধমানের মহারাজা ঠিকই বলেছেন। চিরজীবন কি শুধু 'চ্যারিটি শো' করেই যাবে? তুমি যে এত খেটে মরছ, তার দরুণ কিছু তো পাওয়া চাই।

এখানে আমার মামা সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়।

তিনি বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসেছিলেন; কিন্তু আইনের জটিলতা তাঁকে আকর্ষণ করেনি, ফলে তিনি প্র্যাকটিসও সে রকম করেননি। দুর্ভাগ্যবশতঃ মামা যে যুগের মানুষ, তখন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রভাব পুরো মাত্রায়। এই সময় শিক্ষিত তরুণরা মাতৃভাষার ওপর জোর না দিয়ে, বেশীর ভাগই ঝুঁকেছিলেন ইংরাজী সাহিত্য, শিক্ষা ও সভ্যতার দিকে। মামার ইংরাজী সাহিত্যের ওপর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য—শেক্সপীয়ারের বহু নাটকই ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। তিনি দাদামশায়ের অনেকগুলি বই ইংরাজীতে অনুবাদও করেছিলেন। মামার যে রকম প্রতিভা ছিল, তাতে যদি তিনি বাংলা ভাষার দিকে নজর দিতেন, তাহলে হয়ত তিনি একজন বড় সাহিত্যিক হতে পারতেন। মাঝে মাঝে মামা আমার কাছে দুঃখ করে বলতেন: বাংলাটা যদি আমি ভাল করে শিখতাম, তাহলে

আমার এই 'এনার্জি' অনুবাদ করে নষ্ট করতে হতো না। সত্যিই, এত বড় প্রতিভার কি অপমৃত্যু!

আগেই বলেছি যে, তিনি আইন-ব্যবসাটিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি—তিনি হয়েছিলেন ল' কলেজের অধ্যাপক, পরে কলকাতার Coroner হয়েছিলেন।

মামার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বরাবরই প্রগতিশীল—তার ওপর মঞ্চকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। প্রায়ই আমার কাছে লণ্ডনের স্টেজের গল্প বলতেন। তিনি লণ্ডনে অনেকদিন ছিলেন। সেখানে Sir Henry Irving, Sir Herbert Beerbohm Tree, Dame Ellen Terry, Sir Johnston Forbes-Robertson এবং অন্যান্য মঞ্চরথীদের অভিনয় দেখেছিলেন। তাঁদের অভিনয়ের গল্প করতেন আমার কাছে। এত ভাল লাগত সে সব কাহিনী যে, আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম শুনতে শুনতে।

আমার মামা ছাড়া যাঁরা আমার এই নতুন প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় আমার ছোড়দি (উমা) ও তার স্বামী জ্ঞানাঙ্কুর দে'র। শুধু মুখেই উৎসাহ নয়, আমাদের পরবর্তী নাটক 'মন্দিরে' তাদের দুই মেয়ে মঞ্জু ও বিনীতাকে 'ব্যালে'তে যোগ দেবার অনুমতিও দিয়েছিল। এরা ছাড়া, আরও অনেকে আমার এ প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছিল—তাদের মধ্যে ছিল মিঃ ডি. সি. গুপ্ত ও তার স্ত্রী রমলা গুপ্ত। তারাও তাদের দুই মেয়ে বিনীতা ও অনিতাকে 'ব্যালে' হিসেবে নামবার অনুমতি দিয়েছিল। আর একজন যে আমাকে সমস্ত কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ দিত—সে হলো পরলোকগত সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যিক হিসাবে বসন্তর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল এবং সে সময় বাংলার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'দীপালী'র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীও সে ছিল।

এবার থেকে সি-এ-পি'র 'শো'গুলি পেশাদারীভাবেই করব ঠিক করেছিলাম,—একথা আগেই বলেছি। সুতরাং 'এমেচার' বদলে 'আর্ট' করলাম—অর্থাৎ 'ক্যালকাটা এমেচার প্লেয়ার্সের' জায়গায় হলো 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স'—সি-এ-পি ঠিকই থাকল। বন্ধুরা সবাই খুশীই হলো—বিশেষ করে সবচেয়ে বেশী আনন্দ প্রকাশ করলেন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর। তিনি বললেন: সত্যিই, তুমি একটা কাজের মত কাজ করলে, মধু। এবার চেষ্টা কর, যাতে ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের নিজস্ব একটি থিয়েটার হয়,—আমি সেইদিনটির আশায় রইলাম।

এরপর সুসাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'মন্দির' নাটক মঞ্চস্থ করব ঠিক করলাম।

'মন্দির'-এর রিহার্সাল শুরু হলো। এক ঘরে সাধনা তার নিজের এবং ব্যালের নৃত্য পরিকল্পনা করত এবং সেই সঙ্গে তিমিরবরণ সুরসৃষ্টি করত। এই প্রথম তিমির সি-এ-পি-তে যোগ দিল। এরপরে অবশ্য সি-এ-পির যতগুলি 'শো' হয়েছিল—তাতে তিমির শুধু সুরসৃষ্টি করত না, অর্কেষ্ট্রা পরিচালনাও করত। তখন সি-এ-পির নিজস্ব অর্কেষ্ট্রা ছিল। 'মন্দিরে' পঙ্কজ (পঙ্কজ মল্লিক) গানের সুর দিয়েছিল। গানের সুরগুলি শোনাতে সে মাঝে মাঝে আসত।

আর এক ঘরে আমি নাটকের রিহার্সাল দিতাম অন্যান্য আর্টিস্টদের নিয়ে। বেচারী ললিতা—অভিনয় করবার এবং শেখবার আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল খুব—কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, অভিনয়ের ক্ষমতা তেমন ছিল না—যার জন্যে আমাকে খাটতে হতো সাংঘাতিক।

একদিন 'বিজয় মঞ্জিলে' গেছি। কথায় কথায় মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদকে বললাম: এখন তো সি-এ-পি আর এমেচার নেই—সুতরাং যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহলে 'মন্দির' নাটকের ভূমিকালিপিতে ললিতার নামের আগে 'মহারাজকুমারী' কথাটা আর জুড়ে দেব না, শুধু ললিতারাণী লেখা থাকবে। মহারাজাধিরাজ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন: না-না, আমি আপত্তি করব কেন? এতো খুব ভাল প্রস্তাব। কোনো শিল্পীর নামের সঙ্গে রাজকুমারী লেখবার তো কোন প্রয়োজন নেই। শিল্পীর যদি অভিনয়ের ক্ষমতা থাকে, তাতেই তার নাম হবে, তার অন্য কোন পরিচয়ের দরকার নেই।

'মন্দিরে' একজন নতুন শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল সি-এ-পি আর্টিস্টদের মধ্যে। সে হলো ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়। হরেন 'মন্দিরে' একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছিল এবং সুনামও পেয়েছিল।

১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে 'মন্দির' মঞ্চস্থ হলো এম্পায়ার থিয়েটারে। ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের এই হলো প্রথম পদক্ষেপ।

কিছু কিছু পারিশ্রমিক অনেককেই দেওয়া হয়েছিল। তবে বেশীর ভাগ আর্টিস্ট এবং যারা ব্যালে-তে ছিল তারা কেউ টাকা-পয়সা নেয়নি। অভিনয়ের শেষে এদের ভাল ভাল উপহার এবং ফুলের 'বাসকেট' ও তোড়া দেওয়া হয়েছিল।

পর পর কয়েকটি নাটক প্রযোজনা করে সি. এ. পি. সম্প্রদায় মঞ্চরসিকদের কাছে এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও বেশ একটা আলোড়ন আনতে পেরেছিল। প্রশংসা ও অভিনন্দনের জয়মাল্য পেয়েছিলাম সর্বসম্প্রদায়ের কাছ থেকেই।

এবার সব বন্ধু-বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীরা উৎসাহ দিল—সি. এ. পি'র শিল্পীদের দিয়ে একটা ফিল্ম তৈরী কর—আর করতে যদি হয় তবে 'আলিবাবা'-ই করা উচিত।

এদের প্রস্তাবটা সব সময় আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। সত্যিই তো—'আলিবাবা' করলে কেমন হয়? সত্যিই কি সি. এ. পি'র শিল্পীরা করতে পারবে না? সব এমেচার হলেও—এরা কি একেবারে ননীর পুতুল—যে একটু কষ্ট সহ্য করতে পারবে না, আর ফিল্ম-এ যদি কখনও কাজ নাও করে থাকে—ভাল করে রিহার্সাল এবং ট্রেণিং দিলে কেন পারবে না? এক সময় যেটাকে আমি অসম্ভব বলে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলাম—এখন সেই চিন্তাটাই দিন-রাত মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

যাই হোক, এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমি 'আলিবাবা'র একটা চিত্রনাট্য খাড়া করলাম। তখন কলকাতার কয়েকজন নামকরা চিত্রনির্মাতার কাছে গেলাম 'আলিবাবা'র প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু সকলেই বলতে লাগলেন: সব এমেচার আর্টিস্ট—এরা কি ফিল্ম স্টুডিওর কষ্ট সহ্য করতে পারবে? স্টেজে সি. এ. পি'র 'আলিবাবা' অভিনয় দেখেছি—সকলেই খুব ভাল করেছিল—কিন্তু ক্যামেরার সামনে তো কখনও এরা দাঁড়ায়নি। মঞ্চ আর পর্দা তো দুটো আলাদা জিনিস—ইত্যাদি। এঁদের মতে এরা Camera conscious হবে। আমি কিন্তু এঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত একদিন বন্ধুবর বৈজনাথ লাডিয়ার সঙ্গে এই নিয়ে কথা হলো। বৈজুবাবু ছিলেন শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীবাবুলাল চোখানীর ভগ্নিপতি এবং শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর ম্যানেজার। আমি যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম স্টুডিওতে 'সেলিমা' ছবি করি, তখন শ্রীবি. এল. খেমকা তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। চমৎকার লোক ছিলেন এই বৈজুবাবু। ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর প্রাণস্বরূপ ছিলেন তিনি।

বৈজুবাবু আমার এই প্রস্তাব শুনে বলেছিলেন: আর্টিস্টরা সব এমেচার—কখনও ফিল্ম-এ কাজ করেনি, তো কি হয়েছে—আপনি তো আছেন। 'সেলিমা' ছবিতে মাধবীও তো নতুন ছিল—শুধু তাই নয়, একেবারে গ্রামের মেয়ে ছিল—

এমন কি, লিখতে পড়তেও জানত না। আমি তো দেখেছি—কি ভাবে তাকে dialogue পড়িয়ে রিহার্স্যাল দিয়ে—নায়িকার ভূমিকা তাকে দিয়েই তো করালেন এবং পর্দায় দেখা গেল সে বেশ ভালই অভিনয় করেছে। আর, 'সমঝো কি না' মিঃ বোস, আপনার সি. এ. পি'র আর্টিস্টরা তো সকলেই লেখাপড়া জানা ভাল ঘরের ছেলে-মেয়ে,—আপনি ঠিক ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারবেন। 'সমঝো কি না'—ডিরেকটারই তো ছবির জান। ডিরেকটার যদি আর্টিস্টকে ভাল করে training দেয়—আর্টিস্ট নিশ্চয়ই ভাল অভিনয় করবে। আমি তো বলি—'সমঝো কি না'—ভাল ডিরেকটারের হাতে আর্টিস্টরা সব পুতুলের মত। যেভাবে তাদের নাচাবে—সেইভাবেই নাচবে। 'সমঝো কি না', বাবুলালজীকে বলে আমি সব ঠিক করে দেব, মিঃ বোস।

'সমঝো কি না' বলাটা ছিল বৈজুবাবুর মুদ্রাদোষ। কারো সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাকে অন্ততঃ দশবার 'সমঝো কি না' বলতেন। যাই হোক—বৈজুবাবু বড় ভালো লোক ছিলেন—যেমন উদার মন, তেমনি 'দিলদরিয়া'।

তিনি বাবুলালজীকে আমার প্রস্তাবের কথা বললেন। বাবুলালজী রাজী হয়ে আমার সঙ্গে 'আলিবাবা' ছবির চুক্তিপত্রে সই করলেন ১৯৩৬ সালের জুন মাসে।

'আলিবাবা'-র শুটিং আরম্ভ হলো এবং বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলতে লাগল। আলিবাবা, সাকিনা ও দস্যুসর্দার ছাড়া, মঞ্চে যে সমস্ত শিল্পী প্রধান ভূমিকাগুলিতে ছিল, তারা সকলেই চিত্রে নামল। আগেই বলেছি যে, ক্যামেরার সামনে এদের মধ্যে কেউ কখনও দাঁড়ায়নি। সুতরাং প্রথম প্রথম আমাকে পরিশ্রম করতে হয়েছিল যথেষ্ট; বিশেষ করে যেদিন আমার নিজের অভিনয় থাকত, সেদিন আমার প্রাণান্তকর অবস্থা। আবদাল্লার ভূমিকাটি প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, তার ওপর 'নিগ্রো' মেক-আপ—তাই দিয়ে আবার পরিচালনা। গরমের দিনে খুবই কষ্ট হতো, 'মেক-আপ' গলে পড়ত এবং জামা-কাপড় সব কালোয় কালো হয়ে তো যেতই, তাছাড়া গলার মধ্যে দিয়ে কাল রং গলে সমস্ত গা-ময় চট্‌চট্‌ করত। সেইজন্যে কিছুদিন শুটিং-এর পর আমি আমার 'শট'গুলো আগে শেষ করে, 'মেক-আপ' তুলে তারপর এসে পরিচালনার কাজে লাগতাম। আমার নিজের 'শট'-এর সময় আমার সহকারী এবং ক্যামেরাম্যান বিভূতি দাস ও গীতা ঘোষকে সব বুঝিয়ে দিয়ে অভিনয় করতে যেতাম।

মঞ্চ ও পর্দার অভিনয়ে অনেক তফাৎ।

মঞ্চে দৃশ্যের পর দৃশ্য ধারাবাহিকভাবে অভিনয় করতে হয় বলে আর্টিস্টের

emotion build করবার সুযোগ থাকে। ফিল্মে সে-সুযোগ নেই। এক-একটি 'সেট-' এর সব দৃশ্য সুবিধা অনুযায়ী কেটেকেটে ছোট-বড় 'শট'-এ অভিনয় করতে হয়। এতে emotional continuity বজায় রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। আর মঞ্চের অভিনয় সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয়; ফিল্মে বেশীর ভাগ মুখ ও চোখের অভিব্যক্তিরই প্রয়োজন। কাজেই শিল্পী সহজেই Camera conscious হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রথম প্রথম 'আলিবাবা'র শুটিং-এ এক-একটা 'শট' তিন-চারবার করে নিতে হতো—পরে অবশ্য বেশীর ভাগ শিল্পীই আর Camera conscious হতো না—প্রায় পাকা শিল্পীর মতই কাজ করত এবং পরিশ্রমও যথেষ্ট করত। অনেকে বলেছিলেন যে, এইসব এ্যামেচার ভদ্রঘরের মেয়ে আরামে মানুষ হয়েছে এবং আরামে থাকে, তারা কি ফিল্ম-শুটিং-এর পরিশ্রম সহ্য করতে পারবে? আমি তখন জোর গলায় বলেছিলাম, নিশ্চয়ই পারবে—এ্যামেচার হলেও এরা শিল্পী, এদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা আছে এবং আমার ধারণা পেশাদারদের চেয়েও এরা ভাল কাজ করবে। আমার কথা অনেকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল, শুধু বাবুলালজী আর বৈজুবাবু ছাড়া। আগেই বলেছি, বৈজুবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয় যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম স্টুডিওতে 'সেলিমা'-র শুটিং করছি—সুতরাং তাঁকেই আমি প্রথমে বলি, সি. এ. পি-র আর্টিস্ট নিয়ে 'আলিবাবা' ফিল্ম করার কথা এবং তিনিই শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীবাবুলাল চোখানীকে আমার প্রস্তাবে রাজী করান। বৈজুবাবু শুধু বাবুলালজীর ভগ্নীপতি ছিলেন না, তিনি শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর ম্যানেজার ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি যা বলতেন, বাবুলালজী তাতে কখনও না করতেন না। তাই 'আলিবাবা' ছবির অভাবিত সাফল্যে বৈজুবাবু আমায় বলেছিলেন: আমি বলেছিলাম মধুবাবু যে, 'সমঝো কি না' ডিরেক্টার ঠিক থাকলে সব ঠিক হয়ে যায়। দেখুন আমার কথা ঠিক হলো কি না। সমঝো কি না—'আলিবাবা'র মত 'হিট' পিকচার অনেক দিন হয় নি। এ কথা আজ সকলেই বলছে—কাগজওয়ালারা পাবলিক—সকলেই।

আবার 'আলিবাবা'র শুটিং-এর কথায় ফিরে আসি। 'সেট-সেটিং'সে যা-যা প্রয়োজন তার জন্যে খরচ করতে শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর কর্তৃপক্ষ কোনরকম কার্পণ্য করেননি। দৃশ্য পরিকল্পনার জন্য আমি শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীকে নিয়ে গেলাম। সুধাংশুর তখন বেশ নাম-ডাক হয়েছে Mural painter হিসাবে। কিছুদিন আগে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসে 'মিউরল' পেন্টিং করে এসেছে, তারপর স্থানীয় মেট্রো সিনেমায় Mural paintingগুলিও তার। সিনেমায় আর্ট ডিরেকশান আগে

অবশ্য সে কখনও দেয়নি, তবে তাকে একটু বুঝিয়ে দিলে আর কিছু ভাবতে হতো না। ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর শব্দযন্ত্র ছিল Visatone, আর তাতে রেকর্ডিং করতেন এ, গফুর। ক্যামেরার কাজ করেছিল বিভূতি দাস ও গীতা ঘোষ। গীতা আগে বরাবর আমার সঙ্গে মঞ্চে আলোক নিয়ন্ত্রণ করত। অবশ্য ফিল্ম-এ এই তার প্রথম কাজ। তখন সবে 'প্লে-ব্যাক' প্রথা চালু হয়েছে। 'প্লে-ব্যাক' মানে—গানটি আগে রেকর্ডিং করা হয়, তারপর সেই গান চালিয়ে আর্টিস্ট শুটিং-এর সময় গানের লাইন অনুসারে ঠোঁট নাড়ে—অর্থাৎ লিপ-মুভমেণ্ট দেয়। 'প্লে-ব্যাকের' সুবিধা হলো এই যে, শুটিং-এর সময় আর্টিস্টরা অনেক স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে এবং শট-ডিভিশন-এরও অনেক সুবিধা হয়।

তখন অবশ্য 'প্লে-ব্যাক' আর্টিস্টের এত চলন হয়নি, বেশীর ভাগ আর্টিস্ট নিজেই গাইত। মর্জিনা ও আবদাল্লা-র গান সাধনা আর আমি নিজেরাই গেয়েছিলাম—শুধু সাকিনা-র (ইন্দিরা রায়) গানটি গেয়েছিল ইন্দুবালা ও 'আলিবাবা'র (বিভূতি গাঙ্গুলী) গানটি গেয়েছিলাম আমি।

যত শুটিং এগোতে লাগল, সি. এ. পি-র আর্টিস্টরা ততই পাকা শিল্পীর মত কাজ করতে শুরু করল, বেশী রিহার্সালের আর দরকার হতো না, আমারও পরিশ্রম অনেক কমে গেল। প্রত্যেক দিন বেশ সুশৃঙ্খল ভাবেই কাজ হতে লাগল।

শুধু শুটিং-এর সময় মাঝে মাঝে সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট গফুরের চিৎকার কানে আসত—লাউডার, লাউডার অর্থাৎ আরও জোরে বল। আবার মাঝে মাঝে কানে আসত clearer, clearer—স্পষ্ট বলুন, স্পষ্ট বলুন—তার মানে সংলাপ আরও আস্তে এবং স্পষ্ট বলতে। বলতে বাধা নেই—এই 'লাউডার' আর 'ক্লিয়ারার' মাঝে মাঝে সকলের মনের হাসিখুশী ভাবটা উড়িয়ে দিয়ে বিরক্তির সঞ্চার করত।

তিরিশ বছর পরে 'আলিবাবা' ছবিটা দেখে মনে হয় যে, সংলাপগুলি যদি আরও তাড়াতাড়ি বলা হতো, যাকে বলে fast delivery, তাহলে ছবিটার গতি আরও অনেক ভাল হতো।

'আলিবাবার' অনেকগুলি গান এবং নাচ মঞ্চের জন্যে হারমোনাইজ করেছিলাম টি. ফ্রাঙ্গোপোলোর সাহায্যে, একথা আগেই বলেছি। এখন সেইগুলিই রাখা হলো। যেগুলো হারমোনাইজড্ হয়নি, যেমন—'হমে ছোড়ি দেরে সাঁইয়া', 'ভালবাসি তাই বাসিতে আসে', 'আমার এই ছাতির অন্দরে' এবং আরও দু-একটা—সেগুলি কোরিনথিয়ান থিয়েটারের বিখ্যাত হারমোনিয়ম বাদক নাগরদাস এবং গ্রামোফোন কোং (এইচ. এম. ভির)-র বাদ্যযন্ত্রীরা বাজিয়েছিল।

'আলিবাবা'র সম্পাদনা করেছিল শ্যাম দাস। তখন শ্যাম সবে সম্পাদক হয়েছে, সুতরাং আমি তাকে সাহায্য করতাম। এর পর থেকে শ্যাম আমার সঙ্গে অনেক-গুলো ছবিতে কাজ করেছে। আমি যখন বোম্বাই-এ 'কুমকুম' (দ্বিভাষিক) ও 'রাজনর্তকী' (ত্রিভাষিক) ছবি করি, তখনও সে আমার সঙ্গে গিয়েছিল। কলকাতায় ফিরে এসে 'মাইকেল মধুসূদন' এবং ১৯৫৩ সালের 'শেষের কবিতা' পর্যন্ত আমার সব ছবিরই সম্পাদনা করেছে শ্যাম।

যাই হোক, 'আলিবাবা'র শুটিং একদিন শেষ হলো খুবই সুষ্ঠুভাবে এবং ১৯৩৭ সালে ১৩ই ফেব্রুয়ারী, রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করল।

কাহিনী—পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ। প্রযোজক—শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স। পরিচালক—মধু বসু। সংগঠনকারিগণ: ব্যবস্থাপক: বৈজনাথ লাডিয়া, প্রধান যন্ত্রশিল্পী: চার্লস ক্রীড, চিত্রশিল্পী: বিভূতি দাস ও গীতা ঘোষ, শব্দযন্ত্রী: এ. গফুর, সম্পাদক: শ্যাম দাস, নৃত্য-পরিকল্পনা ও পরিচালনা: সাধনা বসু, দৃশ্য-পরিকল্পনা: সুধাংশু চৌধুরী, কারুশিল্পী: মতিলাল।

রূপায়ণে: মর্জিনা—সাধনা বসু। আবদাল্লা—মধু বসু। আলিবাবা—বিভূতি গাঙ্গুলী। ফতিমা—সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়। কাসিম—কমল বিশ্বাস। সাকিনা—ইন্দিরা রায়। হুসেন—বি. পি. মেহেরা। দস্যু-সর্দার—কালী ঘোষ। মুস্তাফা—প্রীতিকুমার মজুমদার।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'আলিবাবা' ছবি সম্পর্কে যে সব সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে থেকে কয়েকটি এখানে দেওয়া হলো—বাকিগুলি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য:

"বাঙলা দেশের যে-সমস্ত ছবি আমরা দেখিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে দেখিয়া তৃপ্তি হয়, এমন ছবির সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সুখের বিষয়, 'আলিবাবা' ছবিখানি সেই অল্পের মধ্যে একটি স্থান অধিকার করিয়া আছে। শ্রীযুক্ত মধু বসু এই ছবি পরিচালনা করিতে গিয়া যেরূপ সংযম ও সুষ্ঠুতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারি না।" ...আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০-২-৩৭

"......Entertainment-এর দিক থেকে বাঙলা চিত্রজগতে এখানি (আলিবাবা) কেবল অভিনব নয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠও বটে। 'আলিবাবা' সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, ছবিখানি প্রত্যেক দর্শককেই খুশি করবে।" ...বাতায়ন, ১৯-২-৩৭

...পরিচালনার গুণে এবং সিনেমা কলা-কৌশলের সুপ্রয়োগে 'আলিবাবা' প্রথম শ্রেণীর সিনেমা-ছবিতে উন্নীত হইয়াছে...এমন বিলোল নৃত্য-লাস্য সিনেমা-ছবিতে আর দেখা যায় নাই। অভিনেত্রীদের মধ্যে মর্জিনার ভূমিকায় সাধনা বোসের নৃত্য-গীত-বহুল অভিনয়ই সার্বিক সুখ্যাতি দাবী করে, ফতিমার ভূমিকায় সুপ্রভা মুখার্জির অভিনয়ও চমৎকার হইয়াছে...আবদাল্লার ভূমিকায় মধু বসুর অভিনয় অনিন্দ্যনীয়। এক কথায় বলিতে গেলে আবদাল্লার এর চাইতে নিখুঁত অভিনয় আমরা কল্পনা করিতে পারি না...।" ...অগ্রদূত, ১৯-২-৩৭

"আলিবাবা হইয়াছে সুন্দর। নাচে-গানে অভিনয়ে অনবদ্য...বাঙলা চিত্রজগতে নব-জাগরণের প্রথম অরুণোদয় 'আলিবাবা'।" দীপালী, ১৮-২-৩৭



'আলিবাবা' ছবিতে সাধনা বসু [মর্জিনা] ও মধু বসু [আবদাল্লা]

এই সুদীর্ঘ ৩০ বছরের মধ্যে 'আলিবাবা' এখনও পুরনো হয়নি। সেদিনও আলেয়া সিনেমায় 'আলিবাবা' দেখানো হলো—তিন সপ্তাহ চলেছিল এবং প্রত্যেক দিনই প্রায় 'হাউস ফুল'। আলেয়ার ম্যানেজার আমায় বললেন যে, 'আলিবাবা' অন্তত আরও এক সপ্তাহ ভালভাবেই চলত, কিন্তু ছবিখানির অন্যত্র বুকিং থাকায় আর চালাতে পারা গেল না। শেষদিন বহু দর্শক টিকিট না পেয়ে ফিরে গিয়েছিল।

আর একটা কথা তিনি আমায় যা বললেন, তা শুনে সত্যি আমার আনন্দ হলো। তিনি বললেন : প্রায় ৩০বছর আগে 'আলিবাবা' আমি প্রথম দেখেছিলাম এবং শুধু আমাকে নয়, সারা বাংলার দর্শকদের যেমন আনন্দ দিয়েছিল, আজও তারা ঠিক সেইরকম আনন্দই পাচ্ছে। বহু লোককে আমি জানি, যারা দু'-তিনবার করে দেখেছে। আপনার 'আলিবাবা' বরাবর চিরনূতনই রয়ে গেল।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, যে ছবি এই ত্রিশ বছর ধরে সমানভাবে দর্শকদের আকর্ষণ করে আনন্দদান করে আসছে, সেই ছবির নির্মাতাদের আয়ের অঙ্কটা কি রকম দাঁড়িয়েছে এখন। এই ধরনের ছবিকে একটা 'সোনার খনি' বললেই চলে।

কিন্তু এই 'আলিবাবা' ছবির জন্যে যে পারিশ্রমিক আমি এবং সি. এ. পি-র অন্যান্য আর্টিস্টরা পেয়েছিল, তা এতই নগণ্য যে, সে-কথা না বলাই ভাল। আজকের চিত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হবে। তবে আমি আগেই বলেছি যে, আর কোন চিত্রনির্মাতা বা প্রডিউসার সি. এ. পি-র এইসব এ্যামেচার শিল্পীদের নিয়ে 'আলিবাবা' ছবি করতে রাজী হননি—অর্থাৎ সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, সাহস পাননি। সকলেই প্রায় একই কথা বলেছিলেন : "সব এ্যামেচার আর্টিস্ট—এরা কি ফিল্ম স্টুডিওর কষ্ট সহ্য করতে পারবে ? তার ওপর ক্যামেরার সামনে তো কখনও এরা দাঁড়ায়নি, সুতরাং camera conscious হবেই" ইত্যাদি। একমাত্র শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীবাবুলাল চোখানী আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে সাহস করে কাজে নেমেছিলেন। সেটা অবশ্য বৈজুবাবুর জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং টাকার দিক থেকে যা পেয়েছিলাম তা যদিও খুবই নগণ্য, কিন্তু সি.এ.পি-র আর্টিস্টদের দিয়ে যে 'আলিবাবা'-কে পর্দায় উপস্থিত করতে পেয়েছিলাম এবং সেই ৩০ বছর আগেকার 'আলিবাবা' যে আজও দর্শকদের সমান আনন্দ দিচ্ছে, তার জন্যে আমি শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের শ্রীবাবুলাল চোখানী এবং বৈজুবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ।

তবে মনে মনে ভাবি যে, সেই 'আলিবাবা' করলাম ১৯৩৬ সালে—অথচ ১৯৩৫ সালে আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল-টকীজের অংশীদারদের কথা যদি শুনতাম

অর্থাৎ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের গল্প 'বলা কি রাত' নির্বাচন না করে যদি এই 'আলিবাবা' করতাম, তাহলে প্রতিষ্ঠানটিরও অকালমৃত্যু ঘটত না—আর অতগুলো টাকাও জলে যেত না। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, আমার এই বৃদ্ধ বয়সে একটা বাঁধা আয় থাকত, যা আমাকে অন্তত কিছুটা আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারত।

'আলিবাবা'র এই অভাবিত সাফল্য সি. এ. পি'কে এক নতুন মর্যাদায় ভূষিত করল। দর্শকসাধারণ ও সমালোচকদের কাছ থেকে অকুণ্ঠিত প্রশংসায় আমাদের আনন্দ আর দেখে কে? কিন্তু আমাদের এই বিরাট সাফল্যে সবচেয়ে যিনি বেশী খুশী হলেন তিনি হচ্ছেন আমার মা। আমাদের এই ছবি আরম্ভ করার সময় অনেকেই খুব সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন—যে সাধনার ঐ দুর্বল শরীরে ফিল্ম স্টুডিওর পরিশ্রম সহ্য হবে না—এতে শরীর আরও খারাপ হবে ইত্যাদি। কিন্তু মা আমাদের বরাবর উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন—না-না, ওসব কিছু নয়। যে কাজে মানুষ আনন্দ পায়, মনে শান্তি পায়, সে কাজে কখনও শরীর খারাপ হয় না। এবং সত্যিই তাই হলো। 'আলিবাবা' ফিল্মের কাজ শেষ হবার পর দেখা গেল সাধনার শরীর আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে মার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার বলে মনে করি। বাবার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে মা বাড়ী ছেড়ে রাঁচীতে একটি ছোট বাংলো ভাড়া নিলেন—সেখানে তিনি এবং আমার সুশীলামাসী থাকতেন। এতবড় বাড়ীটা খুব কম টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়েছিল শুনলাম, কারণ রাঁচীতে তখন অত বড় বাড়ী বরাবরের জন্যে ভাড়া নেবার লোক খুবই কম ছিল।

ছোটবেলা থেকেই দেখেছি যে গরমের সময় মার রাঁচীতে খুবই কষ্ট হতো—ছোটনাগপুরের 'ড্রাই হীট' মার সহ্য হতো না। সুতরাং বাবা বেঁচে থাকতে গ্রীষ্মকালে মা প্রায়ই রাঁচীতে থাকতেন না, কখনও বা দার্জিলিং যেতেন, কখনও বা কলকাতায় থাকতেন। বেশ মনে আছে, মা বলতেন: কলকাতায় গরমের সময় দুপুর বেলায় যতই গরম হোক না কেন, সন্ধ্যায় দক্ষিণের বাতাসটা থাকে—কিন্তু রাঁচী গরমের সময় দুপুরেও যা সন্ধ্যায়ও তাই, সব সময় যেন তেতে আগুন হয়ে আছে। যে বছর রাঁচীতে প্রচণ্ড গরম পড়ত, বাবা মাকে দার্জিলিং কিম্বা কলকাতায় যেতে বলতেন। বাবা অবশ্য রাঁচী ছেড়ে কখনও কোথাও যেতে চাইতেন না।

বাবার মৃত্যুর পর প্রায় প্রতি বছরই গরমের সময় মা রাঁচী থেকে চলে

আসতেন। ব্যারাকপুরে আমার ছোটমেসো জে. এন. গুপ্তর একটি বাংলো ছিল গঙ্গার ধারে। কখনও সেখানে এসে থাকতেন, কখনও বা কলকাতায় আউট্রাম স্ট্রীটে সেজদির বাড়ীতে থাকতেন।

সালটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না, ১৯৩৫ কিম্বা ১৯৩৬ সাল হবে। সেজদা তখন বিলেত থেকে ডেন্টিস্ট-এর ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছে এবং কলকাতায় প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছে। আগে বলতে ভুলে গেছি যে, বিলেতে দ্বিতীয়বার এল.ডি. এস ডিগ্রীর জন্যে যাবার আগে সেজদার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

বাবা নগদ টাকা বিশেষ কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, একথা আগেই বলেছি। যাও বা রেখে গিয়েছিলেন তার কিছুটা বড় অংশ মা সেজদাকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন তার খরচের জন্যে, এবং সেজদা যখন কলকাতায় প্র্যাকটিস আরম্ভ করল, তার জন্যেও যা কিছু খরচ হল—যেমন ডেন্টাল চেয়ার, অন্যান্য যন্ত্রপাতি কেনা ইত্যাদি, তার বেশীর ভাগই মা দিলেন। এর ওপর মার নিজের সংসারের খরচা ছিল, সুতরাং বাবা মারা যাবার বছর খানেক পরেই দেখা গেল যে, তিনি যা নগদ টাকা রেখে গিয়েছিলেন তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মার সঙ্গে টাকা-পয়সার বিষয় নিয়ে আমার কখনও কথা হয় নি, আর তিনি কিছু বলতেনও না। তিনি আমার অবস্থা জানতেন, যে আমি কোন রকমে তখন আমাদের মাসিক সংসারের খরচ চালাচ্ছি। আর তা ছাড়া জীবনে তিনি কখনও নিজের জন্যে কারও কাছে হাত পাতেন নি, বা পাতবার প্রয়োজনও হয় নি বরং বরাবর তিনিই যথাসাধ্য সকলকে দিয়ে গেছেন।

একবার মা রাঁচি থেকে কলকাতায় এসেছেন, দেখলাম তিনি কেমন মনমরা হয়ে আছেন। প্রথমে ভেঙ্গে কিছু বলতে চাইলেন না। পরে আমি দু-চারবার জিজ্ঞেস করাতে তিনি কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। শেষে আমি জিদ ধরে বললাম, বললাম: না মা, অন্তত আমাকে বলতেই হবে কি হয়েছে তোমার, আমার যদি কিছু করবার থাকে…

তিনি বাধা দিয়ে বললেন: না-না বাবা, তুমি আর কি করতে পার বল, তোমার কিছুই করবার নেই। এই বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আমি পীড়াপীড়ি করাতে তিনি সব কথাই ভেঙ্গে বললেন: তোমার বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই ভাবনা হয় মধু, আমার সংসার খরচ চালাবার জন্যে শেষে কিনা অন্যের কাছে হাত পাততে হবে!

আমি তাতে বললাম: না মা, অন্যের কাছে হাত পাতবে কেন? দেখা যাক না

কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাতে তিনি বললেন: কি আর ব্যবস্থা করবে বাবা, তোমার অবস্থা তো আমি জানি, কোনরকম করে নিজের সংসার খরচ চালাবার চেষ্টা করছ। তাই আমি অনেক ভেবে দেখলাম—রঁাচীর বাড়ীটা বিক্রী করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এই বাড়ীটার সঙ্গে আমাদের সকলের কত স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে। পূজোর সময় বাড়ী ভর্তি লোক—কত হৈ-হৈ, কত আনন্দে কেটেছে সে সব দিন—আর তোমার বাবার সাধের বাগান শেষে কিনা·· আর বলতে পারলেন না, একটা অব্যক্ত বেদনায় তাঁর গলা ধরে এল।

আমাদের পরিবারে অনেক বড়বড় বিপদ গেছে, কিন্তু মাকে এরকম ভেঙ্গে পড়তে কখনও দেখিনি। তিনিই বরাবর আমায় বহু বিপদ আপদে সাহায্য করেছেন স্থির এবং অবিচলিত চিত্তে। আমার অসুখের সময় সেবাশুশ্রূষা করেছেন মূর্তিময়ী করুণার মত। তিনি ছিলেন যেন আমার জীবনে ধ্রুবতারার মত। এ সময় তাঁকে এরকম ভেঙ্গে পড়তে দেখে বিশেষ করে যিনি আমার জন্যে এত করেছেন তাঁর এই দারুণ দুঃখের মুহূর্তে আমি কিছুই করতে পারছি না, একান্ত অসহায়ভাবে নির্বাক দর্শকের মত তাকিয়ে আছি, এই চিন্তাটাই আমার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে গুমরে গুমরে ফিরতে লাগল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলাম—তারপর আমি ধীরে ধীরে বললাম: বাড়ী বিক্রীর কথা এখন থাক মা, আগে বাড়ীর পিছনে যে অনেকখানি জমি আছে সেটা, তারপর বাগান, এগুলো প্লট করে বিক্রী করা যাক। আমি সেজদার সঙ্গে পরামর্শ করব এ বিষয়ে, তারপর তুমি যখন রঁাচী যাবে তোমার সঙ্গে আমিও যাব এবং সেখানে কিছুদিন থেকে তারপর বিক্রীর ব্যবস্থা করব। যখন দরকার হবে, সেজ-দাকে এবং জজিকে আসতে বলব রঁাচীতে। মাসখানেকের মধ্যে অন্ততঃ খানিকটা জমি বিক্রী করে যাতে কিছু টাকা আসে তার ব্যবস্থা করব। তুমি আর এই নিয়ে ভেবো না মা।

বলতে ভুলে গেছি যে, আমার মেজদার (অলোকনাথের) একমাত্র সন্তান খোকন (আশীষকুমার) তখন নাবালক। সুতরাং ওর মামা, জজির (মহীন্দ্রলাল মিত্র—ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের বড় ছেলে) ওপর 'পাওয়ার অফ অ্যাটনি' দেওয়া ছিল ওর বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনা করবার জন্যে। জজি বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে এখানে হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস করছিল। আগেও জজির কথা বলেছি। সে এবং তার বোন এলা আমাদের চৌরঙ্গী প্লেসের ফ্ল্যাটে প্রায় প্রতিদিনই আসত এবং ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে আমার ও সাধনার একটা নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

যতদূর মনে পড়ছে ১৯৩৭ সালের গোড়ার দিকে অথবা ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে হবে। রাঁচীর বাড়ীর সংলগ্ন বেশীর ভাগ জমি এবং বাগান প্রায় ১৫ বিঘার মত তখন বিক্রী হয়ে গেছে। শুধু বিরাট বাড়ীটা এবং তার সঙ্গে ছয়-সাত বিঘা জমি ছিল। বাড়ীটা বিক্রী করতে আমি প্রথমে রাজী হইনি। আমার মন বলছিল যে, আর বছর দুয়ের মধ্যে আমার আর্থিক অবস্থা ভাল হবে, তখন আর মার কোন অভাবই থাকবে না। তাই চেষ্টা করতে লাগলাম যদি জানাশুনা কোনো ধনী বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়দের মধ্যে কারো কাছে বাড়ীটা বন্ধক রেখে হাজার দশেক টাকা এখন জোগাড় করা যায়। তাতে আমাদের হাজার তিনেক টাকার ঋণ শোধ করে বাকী টাকাটা মায়ের হাতে তুলে দিতে পারি যাতে মার কয়েকটা বছর শান্তিতে কেটে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, কেউই রাজী হলো না বাড়ীটা বন্ধক রেখে কিছু টাকা দিতে। তাদের মধ্যে দু-একজনকে একথাও জোর গলায় বললাম যে, যদিও যুক্তভাবে আমরা যে কয়জন অংশীদার আছি, সকলেই এই ঋণের জন্যে দায়ী থাকব, কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি যে বছর দুইয়ের মধ্যে আমিই এ ঋণ শোধ করে দেব। কিন্তু তখন আমি কি রকম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, একথা অনেকেই জানত, সুতরাং আমার কথার উপর তারা কেউ ভরসা করতে পারল না। আবার দু-একজন একথাও বললেন যে, টাকা-পয়সার লেনদেনের ব্যাপারে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তাঁরা নিজেদের জড়াতে চান না। এই নিয়ে পরে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। যা হোক, শেষে বাড়ীটা বিক্রী করতেই হলো, যাকে বলে জলের দামে. রাঁচীরই একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। তাঁর কাছে হাজার দুই টাকার ঋণ আমরা করেছিলাম, এবং সুদে-আসলে আরও বেড়েছিল, সুতরাং তাঁকেই বাড়ীটা বিক্রী করতে বাধ্য হলাম।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমি যখন জোর গলায় বলেছিলাম যে কেউ যদি বাড়ীটা বন্ধক রাখে, সে ঋণ আমি বছর দুইয়ের মধ্যে শোধ করে দেব—আমার মন ঠিকই বলেছিল—আমার অনুমান সত্য হলো। ১৯৪০-৪১ সাল—তখন আমি বম্বেতে ছবি করছি। 'কুমকুম' শেষ করে 'রাজনর্তকী' ছবি আরম্ভ করেছি সুতরাং আমার আর্থিক অবস্থা তখন খুবই ভাল। আমার এক রাঁচীর বন্ধুকে লিখলাম খোঁজ নিয়ে দেখতে যদি সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোক বাড়ীটা বিক্রী করেন। অবশ্য যে দামে তিনি কিনেছিলেন তার চেয়ে বেশী টাকা দিতে রাজী আছি। বন্ধুর জবাব এল। সে লিখেছে যে, রাঁচীর

সঙ্গে নিশ্চয় অনেক দিন আমার কোন সম্পর্ক নেই, কেননা যুদ্ধ লাগবার কিছু-দিন পর থেকেই রাঁচীর জমির এবং বাড়ীর দাম হু হু করে চড়তে শুরু করল, সেই সুযোগে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ভদ্রলোক যে দামে আমাদের বাড়ীটা কিনে-ছিলেন তার প্রায় পাঁচগুণ বেশী দামে বিক্রী করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে যিনি কিনেছিলেন তিনিও আবার বাড়ীটা বিক্রী করেছেন আরও বেশী টাকায়, সুতরাং এখন সে বাড়ীর ভ্যালুয়েশন, আমরা যে দামে বিক্রী করেছিলাম তার প্রায় আট-দশগুণ। এই খবর পেয়ে বাড়ীটা উদ্ধারের চেষ্টা চিরদিনের মত ত্যাগ করলাম।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম—রাঁচীর বাড়ীটা বিক্রী করতে বাধ্য হলাম। বাড়ী বিক্রীটা মার মনে লেগেছিল—এটা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের রাঁচীর বাড়ীতে বার মাস কেউ-না-কেউ থাকত, আর পুজোর সময় তো কথাই নেই, এ বিরাট বাড়ীর ১৪খানা ঘর ভর্তি হয়ে যেত। ছেলে, মেয়ে, জামাই, নাতিনাতনীদের আনন্দ কলরবে বাড়ী সব সময় জমজমাট থাকত। আর আজ সেই রাঁচীতে প্রায় তিন বছর ধরে একটা ছোট্ট বাংলোতে মাকে একা থাকতে হচ্ছে, সঙ্গে শুধু সুশীলামাসীমা।

বুঝলাম রাঁচীতে আর মার মন টিঁকছিল না। যদিও তিনি কোনদিন আমায় এ বিষয়ে কিছু বলেন নি। যা হোক, আমি কলকাতায় মার জন্যে একটা ফ্ল্যাট খুঁজতে আরম্ভ করলাম। আমি জানতাম যে, আগের থেকে যদি বলি যে, আমি তাঁর জন্যে কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট নেবার চেষ্টা করছি, তিনি কিছুতেই তাতে মত দেবেন না, সুতরাং ঠিক করেছিলাম যে একেবারে একটা ভাল ফ্ল্যাটের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে তারপর মাকে জানাব। খোঁজ পেলাম লোয়ার সার্কুলার রোডে, গণেশ ম্যানশনে (কারনানী এস্টেট—এখন আমি যেখানে আছি তার খুবই কাছে) একটা তিন ঘরের ফ্ল্যাট খালি হয়েছে। গণেশ ম্যানশনের মালিক শ্রী এস. এল. দে'কে আমি চিনতাম, সুতরাং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে মাসিক ৯০ টাকায় ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিলাম। দুটি শোবার ঘর, সঙ্গে স্নানঘর আর একটি বড় ঘর, বসবার ও খাবার জন্যে। তাছাড়া বড় রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি এবং ম্যানশনে লিফ্‌টও ছিল। আজকের দিনে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে এরকম একটি ফ্ল্যাটের ভাড়া শুধু ৯০ টাকা। অবশ্য শ্রী এস. এল. দে আমাকে পনেরো টাকা কনসেসন করেছিলেন।

মাকে যখন ফ্ল্যাটের কথা বললাম—প্রথমে তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন, বললেন : এত টাকা তুমি মাসে মাসে কোথায় পাবে ?

মা চিরকাল আমাকেই সাহায্য করে এসেছেন, আমার কাছে তো কখনও কিছু চান নি, সুতরাং তাঁর আপত্তি করাটা খুবই স্বাভাবিক।

আমি বললাম : আমি তো এখন মোটের ওপর ভালই রোজগার করছি, স্টেজ প্রোডাকশান থেকে এবং নতুন ছবির কণ্ট্রাক্ট থেকে, সুতরাং এটুকু আমায় করতে দাও মা। আর ভাড়া তো বেশী নয়। গণেশ ম্যানশনটা হলো আমার এক বন্ধুর—তিনি আমায় অন্যের থেকে কম ভাড়াতেই দিয়েছেন। তুমি আমার জন্যে যা করেছ মা, শুধু টাকা-পয়সা দিয়ে তো নয়, সব রকমভাবে—সে ঋণ আমি কি জীবনে কখনও—

মা আমাকে আর বলতে দিলেন না, বাধা দিয়ে বলে উঠলেন : ওসব কথা থাক বাবা। ভগবান তোমাকে আর সাধনাকে ভাল রাখুন, জীবনে তোমরা আরও উন্নতি কর, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

আশ্চর্য বিশ্বাস ছিল মার ভগবানের উপর। তিনি প্রায়ই বলতেন : ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখো মধু, তাহলে জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট তুমি হাসিমুখে সহ্য করতে পারবে।

যতদূর মনে আছে ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি মা এবং সুশীলামাসিমা গণেশ ম্যানশনে চলে এলেন।

'আলিবাবার' চুক্তিপত্রে ছিল যে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের পরবর্তী ছবি আমায় করতে হবে।

এবার ঠিক করলাম যে আর নাচ গানের বই নয়—এমন বই করতে হবে যাতে সত্যিকার অভিনয় করবার আছে—যাকে বলে জোরদার নাটক। নাচগান অবশ্য থাকবে কিছু, কিন্তু নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত এবং অভিনয়ই হবে প্রধান।

তখন নাট্যকার মন্মথ রায় আমাদের ওখানে প্রায়ই যাওয়া-আসা করত। তার একটা নাটক 'সাবিত্রী' মঞ্চস্থ করবার জন্যে আমরা স্থির করেছিলাম। মন্মথ পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসত—সেই নিয়ে আলোচনা হতো।

আমি ও সাধনা অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই সিনেমা যেতাম। একদিন একটি ইংরাজী ফিল্ম দেখতে গেছি। ছবিটার নাম মনে নেই—তবে নাটকীয়তার চূড়ান্ত ছিল তাতে—গল্পটা আমার ও সাধনার দু'জনেরই খুব ভাল লেগেছিল। একদিন মন্মথকে এই গল্পের কাঠামোটা বললাম। তাকে বললাম : এই কাঠামোর

ওপর ভিত্তি করে আমাদের পরবর্তী ছবির জন্তে একটা গল্প তৈরী করে ফেল। সে ছবির নামও দেওয়া হয়ে গেল—'অভিনয়'।

এদিকে 'সাবিত্রী'র রিহার্সাল চলছিল। কিন্তু যেদিন সম্পূর্ণ স্টেজ-রিহার্সাল দেওয়া হলো, সেদিন তো মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। দেখা গেল সমগ্র নাটকটি দেড় ঘণ্টার বেশী হচ্ছে না। দেড়ঘণ্টায় তো একটা প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ হতে পারে না। এদিকে অভিনয়ের দিন ধার্য হয়েছে ১লা মে—আর মাত্র চার পাঁচদিন বাকী। এই চার পাঁচদিনে তো আর নাটকটাকে বাড়ানো সম্ভব নয়—এখন কি করা যায়! এই নিয়ে সন্ধ্যার সময় আমাদের এক বৈঠক বসল।

আমাদের বসবার ঘরে টেবিলের নীচে একটি সেল্‌ফে অনেকগুলি বই ছিল—তখন হঠাৎ চোখ পড়ল একটি ছোট্ট বইয়ের ওপর। বইটা হলো ফিট্‌জেরাল্ডের 'ওমর খৈয়াম'।

বইটা নিয়ে তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে মনে হলো যে এর মধ্যে থেকে তো কতকগুলো দৃশ্যের নাট্যরূপ অনায়াসে করা যেতে পারে।

এই প্রস্তাব সকলের কাছে আমি করলাম। সেখানে ছিল সাধনা, তিমির, টুকলু (প্রীতিকুমার), সি, এ, পি'র আরও কয়েকজন শিল্পী এবং আমার সহকারী হেমন্ত গুপ্ত। হেমন্তের কথা আগে বলতে ভুলে গেছি। আমি যখন ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে 'আলিবাবা'র শুটিং করছি হেমন্ত সেখানে পাবলিসিটি এবং অন্যান্য কাজ করতো। ওর লেখার স্টাইল দেখে আমার মনে হলো যে একটু বুঝিয়ে দিলে ও হয়ত ভাল সংলাপ লিখতে পারবে এবং 'আলিবাবা'র শুটিং-এর সময়েই আমি তাকে আমার একজন সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করলাম। আমার ধারণা ভুল হলো না—পরে দেখা গেল হেমন্তর সত্যি লেখবার ক্ষমতা ছিল।

'আলিবাবা'র পর ১৯৪২ সাল পর্যন্ত যতগুলি ছবি আমি করেছিলাম এখানে এবং বোম্বাইয়ে, হেমন্ত আমার প্রথম সহকারী তো ছিলই, তাছাড়া ছবির বেশীর ভাগ সংলাপ হেমন্তই লিখত। পরে হেমন্তর কথা বলব, এখন আবার 'ওমর খৈয়াম'-এর কথায় ফিরে আসি।

সুখের বিষয় সবাই আমার প্রস্তাব সমর্থন করল। কিন্তু আর এক বিপদ হলো—বইটা তো ইংরাজীতে। আগে তো যে সব কবিতাগুলির নাট্যরূপ দেব সেগুলি তো অনুবাদ করতে হবে। হেমন্ত বলল যে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'ওমর খৈয়াম'-এর অনুবাদ আছে। তখনই হেমন্তকে পাঠালাম বই কিনে আনতে।

হেমন্ত বই কিনে আনল। সকলে আমাদের ওখানে লাঞ্চ খেল—তার পর

বইটা পড়া হলো—আমার কিন্তু পছন্দ হলো না। আমি তিমিরকে বললাম : তুমি একবার অজয়কে (অজয় ভট্টাচার্য) ডেকে নিয়ে এস। অজয় 'সাবিত্রী'র গানগুলি লিখেছিল এবং এত ভাল লিখেছিল যে আমার কেমন মনে হলো আমি যেভাবে ফিটজেরাল্ড এর 'ওমর খৈয়াম'-এর কতকগুলি কবিতা সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করতে চাই, অজয় সেই ছন্দে অনুবাদ করতে পারবে। তিমির গাড়ী নিয়ে গেল এবং অজয়কে নিয়ে এল। এর মধ্যে আমি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কবিতা নির্বাচন করে রাখলাম এবং অজয়কে সেইসব অংশগুলি দেখালাম—অজয়েরও সে অংশগুলি খুব পছন্দ হলো। আমি অজয়কে বললাম : আমি চাই 'ওমর খৈয়াম'-এর রুবায়েৎগুলির আবৃত্তির সঙ্গে সুর ও ছন্দের সমাবেশ থাকবে। সেদিন রাত্রে সকলেই আমাদের এখানে খেল। 'ডিনারের' পর অজয় কাব্যগুলি অনুবাদ করতে লাগল—আর এদিকে তিমিরও সেগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে সুরে ও ছন্দে ফেলতে বসে গেল স্বরোদ নিয়ে।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি—১৯৩৭ সালে আমাদের ফ্ল্যাটের সামনে আরও দুখানি ঘর খালি হলো, সুতরাং সে দু'খানা ঘরও নিলাম। একটিতে আপিস্ হলো আর একটি রিহার্সালের জন্যে রইল। চারখানা ঘরের জন্যে চৌরঙ্গি প্লেসের মত জায়গায় কতই বা ভাড়া দিতাম—মাত্র ১৫০ টাকা। আজকের দিনে সেই ফ্ল্যাটের ভাড়া অন্ততঃ ১০০০ টাকা, তার ওপর 'সেলামি' দিতে হবে অন্ততঃ তিরিশ হাজার। কিছুদিন আগে শুনলাম—করপোরেশন আপিসের কাছাকাছি একটি পুরোন ম্যানশনে একটি তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাট খালি হয়েছিল এবং যিনি ভাড়া নিলেন—তিনি অবশ্য অবাঙালী—তিনি ১০০০ টাকা ভাড়া দিতে রাজী হলেন এবং বিশ হাজার টাকা 'সেলামী'।

যাক্ সে কথা—আবার 'ওমর খৈয়াম'-এর কথায় ফিরে আসি। সেদিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত এবং পরের দিন প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত অজয়ের অনুবাদ ও তিমিরের সুর রচনা করতে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় সাধনা আর তিমির মিলে নাচগুলো তৈরী করে ফেলল। সাধনার নিজের (সাকীর) এবং ব্যালের নাচ সবই তৈরী হয়ে গেল। ব্যালের মেয়েরা এল—সাধনা তাদের রিহার্সাল দিতে শুরু করল। টুকলু (প্রীতি মজুমদার)-কে আমি নির্বাচন করলাম ওমরের ভূমিকায়। তাকে আমি অজয়ের অনুবাদ করা ওমরের কবিতাগুলি তিমিরের সুরের ছন্দে রিহার্সাল করালাম।

তার পরদিন, 'শো'র ঠিক আগের দিন, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রিহার্সাল

চলল। যেদিন 'শো' সেদিন সকালে পুরো স্টেজ-রিহার্সাল হলো—প্রথমে 'ওমরের স্বপ্নকথা' তারপর 'সাবিত্রী'।

১লা মে ১৯৩৭—"ওমরের স্বপ্নকথা" ও 'সাবিত্রী' এম্পায়ার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলো—হাউস ফুল ছিল। আমি একটু নার্ভাস হয়েছিলাম, কি জানি যেভাবে ওমর খৈয়াম-এর কতকগুলি কাব্য সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করা হয়েছে দর্শকদের তা ভাল লাগবে কিনা। কিন্তু দেখা গেল যে, 'সাবিত্রী'র চেয়ে 'ওমরের স্বপ্নকথা'ই দর্শকদের ভাল লেগেছে বেশী।

আজও আমার মনে হয় 'ওমরের স্বপ্নকথা'য় তিমির যে সুরসৃষ্টি করেছিল সেইটাই তার সঙ্গীত-পরিচালনা ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

"ওমরের স্বপ্নকথা" ও "সাবিত্রী"র মঞ্চসাফল্যের পরে আমি আবার ঝুঁকলাম ছবি তৈরী করার দিকে—কায়া ছেড়ে ছায়ার প্রতি।

মন্মথও এই সময়ে 'অভিনয়'-এর গল্প লেখা শেষ করল। আমাদের সকলেরই গল্পটা ভাল লাগল—বাবুলালজীকে শোনান হলো এবং তিনিও গল্পটি পছন্দ করলেন। ১৯৩৭ সালের মে মাসের শেষের দিকে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের সঙ্গে "অভিনয়"-এর কণ্ট্রাক্ট সই হয়ে গেল।

চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হবার পর আমি আর মন্মথ চলে গেলাম দার্জিলিং। সেখানকার শান্ত পরিবেশে কিছুদিন থেকে চিত্রনাট্য রচনা সম্পূর্ণ করলাম। দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফিরে এসে সংলাপ এবং গান লেখা হলো। গানগুলি লিখল আমার সহকারী হেমন্ত গুপ্ত। গানের সুরের জন্য আমি নির্বাচন করলাম হিমু-কে (হিমাংশু দত্ত, সুরসাগর) আর নাচের সুর রচনার জন্য রইল তিমিরবরণ। এবারও সুধাংশু চৌধুরীকে নির্বাচন করলাম শিল্প নির্দেশনার জন্য। এইখানে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, 'অভিনয়'-এর 'সেট সেটিংস'-এ যে অভিনবত্ব এবং শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল সুধাংশু, তা আজও অম্লান হয়ে আছে। আমার ছবি বলে বলছি না —'অভিনয়' যাঁরাই দেখেছেন তাঁরাই বলবেন যে, 'অভিনয়'-এর সেট-সেটিংসের মত এমন উচ্চশ্রেণীর কলাসম্মত শিল্পনির্দেশনা খুব কম ভারতীয় ছবিতেই দেখা গেছে। আর একথাও আমি বলতে বাধ্য যে, বাবুলালজী খরচের জন্য কোন কার্পণ্য করেন নি—সকল বিষয়ে তাঁর এবং বৈজুবাবুর সহযোগিতা পেয়েছিলাম বলেই ছবিটি এত ভাল হতে পেরেছিল।

'অভিনয়'-এর নায়িকা অবশ্য সাধনাই নির্বাচিত হল, নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্য। মনীষার বৃদ্ধ অধ্যাপক পিতার ভূমিকায় নির্বাচন করলাম শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে।

অহীনবাবুর সঙ্গে এই আমার প্রথম যোগাযোগ। পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ এবং প্রীতিময় হয়ে উঠল যে তাঁকে নিয়ে আমি বহু ছবি করেছি এবং মঞ্চেও অনেক নাটকে তিনি সি. এ. পি'র হয়ে অভিনয় করেছেন।

দ্বিতীয় নায়িকা 'রাজকুমারী রত্না'র ভূমিকার জন্য একটি মেয়ে খুঁজছিলাম। অনেকগুলি মেয়ে দেখা হলো, কিন্তু ঠিক আমার মনোমত হচ্ছিল না। একদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে দেখি সাধনার কাছে একটি সুদর্শনা মেয়ে বসে আছে। সাধনা আমার সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিলে। ইনি জনৈক ডাঃ মুখার্জির স্ত্রী, নাম প্রতিমা মুখার্জি। সাধনাকে সে অনেক করে ধরেছে যে, তাকে একটা চান্স দিতেই হবে এ ছবিতে। আমি তো মহামুস্কিলে পড়লাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম: তুমি কি কখনও অভিনয় করেছ—মানে যেমন আজকাল কয়েকটি মেয়ে করছে স্কুল কিংবা কলেজের কোন ফাংশনে? সে মাথা নেড়ে জানাল যে, অভিনয় এর আগে সে কখনও করে নি। আমি তখন 'অভিনয়'-এর পাণ্ডুলিপি থেকে 'রত্না'র ভূমিকার কয়েকটি লাইন টুকে তাকে দিয়ে বললাম: এ লাইনগুলি শুধু মুখস্ত করবে —তারপর টেলিফোন করে কাল কিম্বা পরশু সন্ধ্যায় এস।

তারপর দিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে দেখি প্রতিমা বসে আছে সাধনার কাছে। তার চোখে তখনও জল—মনে হলে কোন দুঃখের কাহিনী সে সাধনাকে বলছিল আমি আসবার আগে। যা হোক, ওকে নিয়ে কিছুক্ষণ রিহার্সাল দিলাম। দেখলাম, যে কয়েকটি লাইন লিখে দিয়েছিলাম সেগুলি বেচারী কণ্ঠস্থ করেছে ঠিকই—কিন্তু যেভাবে সংলাপের ডেলিভারী হওয়া উচিত, অনেকবার দেখাবার পরেও দেখলাম ঠিক সেইভাবে সে কিছুতেই বলতে পারছে না। বুঝলাম, মেয়েটির অভিনয় করবার ক্ষমতা বিশেষ নেই। তাকে মুখে অবশ্য বললাম: আমি একটু ভেবে দেখি, তোমায় দু'-চার দিন পরেই জানাব। এই বলে আমি আপিস ঘরে গেলাম। 'ডিনার' খাবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় সাধনা খবর পাঠাল যে, আমাদের গাড়ী যেন প্রতিমাকে পৌছে দিয়ে আসে।

ডিনার খেতে খেতে সাধনা আমায় সব ভেঙে বলল। স্বামীর সঙ্গে মেয়েটির একেবারেই বনিবনা হচ্ছে না এবং সে সাধনাকে বলেছে যে, নিজে কিছু যদি সে রোজগার করতে না পারে, তাহলে তাকে পথে দাঁড়াতে হবে। যাহোক সে এক বড় দুঃখের কাহিনী। মেয়েটির জন্যে আমার কষ্ট হলো—সাধনার তো হয়েই ছিল, সুতরাং প্রতিমাকেই শেষপর্যন্ত 'রাজকুমারী রত্না'-র ভূমিকায় নির্বাচন করলাম। আমি তখন ভাবলাম যে, প্রতিমার চেহারাটি তো ভাল এবং 'রাজকুমারী রত্না'-র

ভূমিকায় মানাবেও ভাল। অবশ্য ওকে অনেক রিহার্সাল করাতে হবে, তবে খেটেখুটে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে চলে যাবে।

'অভিনয়' ছবির সংলাপ লেখা, গানের ও নাচের সুর রচনা করা এবং নাচের পরিকল্পনা এবং তার সঙ্গে মেয়েদের রিহার্সাল করানো—এই সমস্ত করতে বেশ খানিকটা সময় গেল। এদিকে পূজোর আর বেশী দেরী নেই। ঠিক করলাম পূজোর সময় আর একটা নাটক মঞ্চস্থ করব। মন্মথ রায়েরই একটা ছোটগল্প 'বিদ্যুৎপর্ণা' পড়লাম। আমার খুব ভাল লাগল। মন্মথকে বললাম, 'বিদ্যুৎপর্ণা'র নাট্যরূপ দিতে। গল্পটাতে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত যথেষ্ট ছিল, সুতরাং একটি প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে অহীন্দ্র চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম; তিনিও সানন্দে রাজী হলেন। এই প্রথম অহীনবাবু ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়াসের্র হয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন।

এদিকে 'অভিনয়'-এর বাকি ভূমিকাগুলির নির্বাচন এবং তাদের রিহার্সাল আর 'বিদ্যুৎপর্ণা'র রিহার্সালও চলতে লাগল। 'বিদ্যুৎপর্ণা' নাটকও খুব বড় নয়, তাই ঠিক করলাম 'বিদ্যুৎপর্ণা'-র সঙ্গে আবার 'ওমরের স্বপ্নকথা'ও মঞ্চস্থ করব।

পূজোর ঠিক আগে ৯ই অক্টোবর ১৯৩৭ সাল—ফার্স্ট এম্পায়ার-এ সাতদিন ধরে খুব সাফল্যের সঙ্গে 'বিদ্যুৎপর্ণা' ও 'ওমরের স্বপ্নকথা' মঞ্চস্থ হল।

'ওমরের স্বপ্নকথা' (অনুবাদ : অজয় ভট্টাচার্য) ভূমিকা—সাকী—সাধনা বসু, ওমর—প্রীতিকুমার মজুমদার।

'বিদ্যুৎপর্ণা' : বিদ্যুৎপর্ণা—সাধনা বসু, মোহন্ত—অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দ্রজিত —মধু বসু, মঞ্জরী—মঞ্জু দে, ভদ্রভুট—বিভূতি গাঙ্গুলী, গোকর্ণ—সুশান্ত মজুমদার, বিষ্ণুদাস—প্রীতিকুমার মজুমদার, রাজা—কালী ঘোষ, সেনাপতি—কল্যাণ মজুমদার, কৃতান্তক—সন্তোষ দাস, চরণদাস—অমিয় দাস।

সি-এ-পি ব্যালে : শীলা দত্ত, বিনীতা দে, নির্মলা দত্ত।

'বিদ্যুৎপর্ণা' ও 'ওমরের স্বপ্নকথা' এমন বিরাট সাফল্য লাভ করল সবদিক দিয়ে যে, আমরা ১৪ই নভেম্বর থেকে ৪ দিনের জন্য আবার ফার্স্ট এম্পায়ার-এ তা মঞ্চস্থ করলাম।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'ওমরের স্বপ্নকথা' ও 'বিদ্যুৎপর্ণা' সম্পর্কে যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে থেকে কয়েকটি এখানে দেওয়া হলো।

১৯২৮ সাল হইতে সি-এ-পি সম্প্রদায় 'আলিবাবা' 'দালিয়া' 'জেরিনা', 'মন্দিরা', 'সাবিত্রী', 'ওমরের স্বপ্নকথা'র মধ্য দিয়া রসপিপাসু দর্শকসমাজকে তৃপ্ত করিয়া আসিয়াছেন। 'বিদ্যুৎপর্ণা' তাঁহাদের অপূর্ব কলাশক্তির আর একটি বিকাশ মাত্র।'

—আনন্দবাজার পত্রিকা (১১-১০-৩৭)

'অহীন্দ্র-সাধনা সম্মিলন যে কিরূপে আকর্ষণীয় হয়েছিল তার প্রমাণ ওই হাউসে উপর্যুপরি কয়েকদিন অভিনয় হওয়াতেই পাওয়া গেছে। প্রযোজনায় মধু বসু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—সুন্দর এক দৃশ্যে তিনি নাটকখানাকে সুন্দরভাবে বইয়ে নিয়ে গেছেন।' —স্বদেশ (২১-১০-৩৭)

...মন্মথ রায় রচিত 'বিদ্যুৎপর্ণা' দেখিলাম। সুপ্রসিদ্ধ প্রযোজক মধু বসু কর্তৃক ইহা প্রযোজিত ও সি-এ-পি কর্তৃক অভিনীত। শ্রীমতী সাধনা বসু ও অহীন্দ্র চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয়নৈপুণ্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি...। —দীপালী (২৮ ১০-৩৭)

"The Calcutta Art Players have made a name for themselves by some of their excellent stage productions...In "Vidyutparna" they have scored a fresh triumph ......Sj. Ahindra Chowdhury, the celebrated actor, who has left the professional stage has considerably strengthened the C. A. P. by joining this organisation of brilliant players......the author, Sj. Manmatha Ray, has shown remarkable literary ingenuity......Timir Baran's dreamy and haunting music is simply unforgettable...... Amrita Bazar Patrika (10-10-1937)

"Once again the C. A. P. has delighted the public with a glamorous presentation of unique excellence. We heartily congratulate the C. A. P.......Omar-Khayyam is a beautiful piece of dream-song effectively and thoughtfully presented. "Vidyutparna" has been the star-success of the C. A. P. from the point of view of dramatic excellence." Advanced (11-10-1937)

আমার জীবনের সবচেয়ে কর্মবহুল সময় হলো ১৯৩৭-৩৮ সাল। 'আলিবাবা' ছবি শেষ হয়ে মুক্তিলাভ করার কিছু পরেই আমি মঞ্চস্থ করলাম 'ওমরের স্বপ্নকথা' ও 'সাবিত্রী'। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল 'অভিনয়' ছবির প্রস্তুতিপর্ব; বিভিন্ন শিল্পীকে তাদের ভূমিকায় মহলা দেওয়ানোতে বিশেষ করে প্রতিমাকে 'রাজকুমারী রত্না'র ভূমিকা শেখাতে আমার যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করতে হচ্ছিল। এরই মাঝে আবার 'ওমরের স্বপ্নকথা' ও নতুন বই 'বিদ্যুৎপর্ণা' মঞ্চস্থ করেছিলাম। শুধু তাই নয়; এই সঙ্গে এইচ. এম. ভি. গ্রামোফোন কোম্পানীতে 'আলিবাবা', 'ওমরের স্বপ্নকথা' ও 'বিদ্যুৎপর্ণা'র ডিস্ক রেকর্ড করা হয়েছিল। এই ডিস্ক-রেকর্ডিং প্রসঙ্গে আমি এমন একজনের কথা বলতে চাই যে পরে আমার জীবনব্যাপী বন্ধু এবং যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিল। সে হচ্ছে হেম সোম।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় হেম সোম ছিল গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং সেক্সানের কর্তা। তবে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, শ্রীসোমই ছিল এইচ. এম. ভির মূলাধার ও প্রাণস্বরূপ। সেই আমাদের ভদ্র ঘরের বেশীর ভাগ মেয়েদের গ্রামোফোন রেকর্ডে গান গাইতে রাজী করায়; এর জন্যে তাকে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

ভদ্রঘরের মেয়েরা যাতে নিঃসঙ্কোচে গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল-কক্ষে আসতে পারেন, তার জন্যে তারই পরামর্শে ও চেষ্টায় এই রিহার্সাল-কক্ষকে চিৎপুর অঞ্চল থেকে নলিন সরকার স্ট্রীটের বর্তমান ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়।

'আলিবাবা', 'ওমরের স্বপ্নকথা' ও 'বিদ্যুৎপর্ণা'র রেকর্ডিং উপলক্ষে শ্রীসোমের সঙ্গে আমার যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, আজও তা অটুট রয়েছে। ভারতের বহু জায়গায় ভ্রমণ করে বহুজনের সংস্পর্শে আমি এসেছি। কিন্তু এমন একজন যথার্থ সহমর্মী অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে আমি আর একজনকেও পাইনি। 'God's good man' আখ্যা যদি কাউকে দেওয়া যায়, তাহলে একমাত্র হেম সোমকেই সেই আখ্যা দিতে পারি।

শ্রীসোমেরই মধ্যস্থতায় আমি দৈবাৎ এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই, যিনি আমার পরিণত বয়সে আমার শ্রেষ্ঠতম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রূপে বিরাজ করছেন।

আমি আজ যদি কিছুমাত্র ধর্মের আলোক দেখতে পেয়ে থাকি তা মাত্র তাঁরই কৃপায় সম্ভব হয়েছে; তিনি আমার আধ্যাত্মিক জীবনের গুরু। তাঁর সম্বন্ধে পরে আমাকে অনেক কথাই বলতে হবে। এখানে আমি মাত্র এইটুকুই বলতে চাই যে, আমার মতে তিনি একজন মহামানব।

এইবার আমরা আবার 'অভিনয়' চিত্রের কথায় ফিরে আসি।

অভিনয়ের ভূমিকা নির্বাচিত হলো এইরূপ :—

মনীষা (নায়িকা)—সাধনা বসু, পীতাম্বর চৌধুরী—অহীন্দ্র চৌধুরী, হীরক রায় (নায়ক)—ধীরাজ ভট্টাচার্য, রতনগড়ের রাজা—বিভূতি গাঙ্গুলী, রাজকুমারী রত্না—প্রতিমা মুখার্জি, অজয় মল্লিক—প্রীতিকুমার মজুমদার, থিয়েটার ম্যানেজার—তুলসী লাহিড়ী, বুকিং ক্লার্ক—সত্য মুখার্জি, কুঞ্জবাবু—ললিত মিত্র, ফিল্ম ডিরেক্টর—ভানু রায়, ইনসিওরেন্স এজেন্ট—নবদ্বীপ হালদার, ভজা—বিজয় মজুমদার, অভিনেতা—রবি রায়, হীরকের ম্যানেজার—প্রভাত সিংহ, অভিনেত্রী—লাবণ্যনলিনী, সুলেখা চ্যাটার্জী।

'আলিবাবা' যখন মুক্তিলাভ করলো তখন সর্বশ্রেণীর দর্শকদের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলাম ঠিকই, কিন্তু একটা বিষয়ে আমার মনটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। সে কথাটা অবশ্য আমি অন্য কারু কাছেই প্রকাশ করলাম না—শুধু নিজের মনের মধ্যেই রেখে দিলাম।

ব্যাপারটা হলো : আগেই বলেছি যে শব্দযন্ত্রী গফুর প্রায়ই 'সাউণ্ড ভ্যান' থেকে চিৎকার করে বলত : Louder please, clearer please, সেজন্যে সমস্ত শিল্পীদের সংলাপ বলতে হতো বেশ জোরে এবং ধীরে ধীরে। ফলে ছবির গতিবেগ খুব মন্থর হয়ে গেলো। সেদিনও যখন দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে 'আলিবাবা' আর একবার দেখলাম তখনও এই কথাই মনে হলো। এর কারণ ভারতলক্ষ্মীর তখন ছিল Visatone শব্দযন্ত্র—এই শব্দযন্ত্রটিতে বেশ জোরে জোরে এবং ধীরে কথা না বললে স্পষ্টভাবে রেকর্ড করা সম্ভব হতো না। যেহেতু "আলিবাবা" ছিল নাচগানের ছবি—এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। তবে এই ত্রুটিটা আমার মনে সব সময় পীড়া দিত।

তাই "অভিনয়"-এর শুটিং-এর আগে বাবুলালজীকে বললাম যে 'আলিবাবা' যা হয়েছে তা হয়েছে, কিন্তু 'অভিনয়' হলো সংলাপ-প্রধান বই—এর সংলাপ ধীরে ধীরে এবং জোরে বললে সমস্ত নাটকটা মাটি হয়ে যাবে, অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় মনে হবে অস্বাভাবিক এবং ছবির গতি মন্থর হয়ে গেলে মার খাবে। স্টুডিওর প্রধান কলাকুশলী চার্লস ক্রীডও আমার কথা সমর্থন করলেন। তখন বাবুলালজী RCA (Portable Sound)-এর অর্ডার দিলেন। ইতিমধ্যে তখন কলকাতায় অন্যান্য স্টুডিওতেও 'RCA' studio channel মেশিন এসে গেছে।

"অভিনয়" সংলাপপ্রধান বই—তার ওপরে কয়েকজন নতুন শিল্পী ছিলেন। যাদের জন্যে চৌরঙ্গী প্লেসের বাড়ীতে আমি নিয়মিত রিহার্সালের বন্দোবস্ত করলাম। প্রতিমা মুখোপাধ্যায় ছিল একেবারে নতুন—তার জন্যেই আমাকে বেশি খাটতে হতো। রোজই রিহার্সাল হতো—সকলেই আসত, ধীরাজ, টুকলু, তুলসী লাহিড়ী, সাধনা সকলেই যোগদান করত। 'সি-এ-পির ওপরে অহীনবাবুর টান এমনিই ছিল যে, নিজের প্রয়োজন ছাড়াও দলগত উন্নতির জন্য তিনি প্রায়ই আসতেন। তাঁর নিজের কোনো রিহার্সালের প্রয়োজন হতো না, কিন্তু অন্যান্য সহশিল্পীদের সুবিধার জন্য তিনি রিহার্সাল দিতেন—যাতে টীম-ওয়ার্কটা ভাল হয়।

সমস্ত উদ্যোগপর্ব শেষ হবার পরে "অভিনয়"এর নিয়মিত শুটিং শুরু হলো ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে।

'আলিবাবা' শুটিং-এর সময় থেকে ভারতলক্ষ্মীর কলাকুশলীদের সঙ্গে যে একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এই ছবিতে তা আরও বেড়ে গেল। আমরা যখন 'ফ্লোরে' কাজ করতাম তখন সবাইকে মনে হতো যেন একটি বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। এর ওপর বৈজুবাবু প্রত্যেকের সুখসুবিধার দিকে এমন নজর রাখতেন

যে কেউ কোনদিন কোন অসুবিধাই অনুভব করেনি। কর্তৃপক্ষের এই আন্তরিকতায় প্রত্যেকটি কলাকুশলী এবং শিল্পী ছবির উৎকর্ষের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

'অভিনয়'-এর শুটিং চলতে থাকে। এদিকে আমার বন্ধু বান্ধবরা বলতে লাগল: 'ফিল্ম তুলতে গিয়ে কি স্টেজ একেবারে ছেড়ে দিলে? সামনেই বড়দিন আসছে—একটা কিছু কর।

আমারও তো এমনিতেই মঞ্চের দিকে টান অতি মাত্রায়, সুতরাং আমিও ভাবলাম: সত্যিই তো, বড়দিনের সময় কিছু তো একটা করা দরকার! তবে পুরোনো নাটক না করে এবার নতুন কিছু করা যাক।

মন্মথ প্রায়ই আসত, বিশেষ করে যখন শুটিং চলতো, তখন তো একরকম রোজই বলা চলে। তাকে এ কথা বলতেই সে বলল যে তার একটা নাটক লেখা আছে। নাটকখানির নাম হলো 'রাজনটী'।

পড়া হলো নাটক—সকলেই পছন্দ করল। প্রধান ভূমিকায় সাধনা এবং অহীনবাবু—তাছাড়া অন্যান্য চরিত্রও নির্বাচিত হলো। শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে রিহার্সাল চলতে লাগল। এই রকম কর্মব্যস্ততার মধ্যে ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে 'রাজনটী' মঞ্চস্থ হলো ফার্স্ট-এম্পায়ারে।

মা আমাদের 'রাজনটী' দেখতে এসেছিলেন। এর আগে আমাদের যতগুলি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে—তার কোনটাই মার দেখা হয় নি, কেননা তিনি তখন রাঁচিতে থাকতেন। অবশ্য 'বিদ্যুৎপর্ণা' যখন মঞ্চস্থ হয়, তখন তিনি কলকাতায়, কিন্তু সে সময় তাঁর শরীর খুব ভাল যাচ্ছিল না, তাই দেখতে পারেন নি।

'আলিবাবা', 'ওমর খৈয়াম' ও 'বিদ্যুৎপর্ণা'র গ্রামোফোন রেকর্ডের 'সেট'গুলি আমি মাকে দিয়েছিলুম। সময় পেলেই আমি মাকে দেখতে যেতাম—সাধনাও মাঝে মাঝে যেত। যখনই তিনি একলা থাকতেন, দেখতাম সুশীলামাসী মার কাছে সেই রেকর্ডগুলি বাজাত, বিশেষ করে যে রেকর্ডগুলিতে আমার এবং সাধনার অভিনয় অথবা গান ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন যে তাঁর অনেকদিনের বাসনা মঞ্চের ওপর আমার ও সাধনার অভিনয় দেখা—শুধু গ্রামোফোন রেকর্ড শুনে তৃপ্তি হয় না।

"রাজনটী" মঞ্চস্থ হবার কিছুদিন আগে যখন আমি মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি গণেশ ম্যানসনে, তিনি বললেন যে তিনি 'রাজনটী' দেখবেনই। আমি বললাম, আমাদেরও অনেকদিনের বাসনা যে তুমি আমাদের একটা মঞ্চাভিনয় দেখো—আর বিশেষ করে 'রাজনটী' নাটকে সাধনার অনেকগুলি কীর্তন গান

আছে—তোমার ভালই লাগবে। কিন্তু ভাবছি যে প্রায় দু'ঘণ্টার ওপর বসে থাকলে তোমার কষ্ট হবে—পরে আবার হয়ত তোমার শরীর···তিনি বাধা দিয়ে বললেন: না-না কিছুই হবে না। তোমাদের অভিনয় দেখবো, গান শুনবো—ওতেই আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

দেখলাম মা 'রাজনটী' দেখবেনই, সুতরাং প্রথম দিনেই আমি মার জন্যে এম্পায়ার থিয়েটারের নিচেকার স্টেজ-বক্স ঠিক করলাম। 'শো' আরম্ভ হবার অনেক আগেই মা এলেন—সঙ্গে এল সুশীলামাসী, ছোড়দি ও জ্ঞানাঙ্কুর। আরও কে কে ছিল এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

অভিনয়ের শেষে আমি তাড়াতাড়ি মেক-আপ্ তুলছি যাতে স্টেজ-বক্সে গিয়ে মার সঙ্গে দেখা করব—সাধনাকেও বলে রেখেছি যে দু'জনে একসঙ্গে যাব—এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর এসে আমায় খবর দিল যে মা স্টেজের ভিতর এসেছেন এবং সাধনার মেক-আপ রুমে গেছেন। আমি তাড়াতাড়ি সে ঘরে গেলাম। দেখলাম সাধনাকে জড়িয়ে আদর করছেন আর বলছেন: এত মিষ্টি গলা তোমার, আর এত ভাব আর দরদ দিয়ে কীর্তনগুলি গেয়েছিলে মা—যা এখনও আমার কানে বাজছে—এখনও ভুলতে পারছি না। তারপর আমাদের তিনি আশীর্বাদ করে বললেন—"আজ এতদিন পরে আমার অনেকদিনের সাধ পূর্ণ হলো।"

একাদিক্রমে সাতদিনের জন্য আমরা স্টেজ ভাড়া নিয়েছিলাম। প্রথম পাঁচদিন হলো "রাজনটী" এবং পরের দুদিন হলো "বিদ্যুৎপর্ণা"। এই দুটি নাটকের সঙ্গেই অবশ্য "ওমরের স্বপ্নকথা" নৃত্য-নাট্যটি যুক্ত ছিল। "বিদ্যুৎপর্ণা" এবং সি. এ. পি'র অন্যান্য নাটকের মত "রাজনটীও" বিরাট সাফল্য লাভ করল। নাট্যরসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসার জয়মালা পেল ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স। 'রাজনটী'র কয়েকটি সমালোচনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

"রাজনটী মঞ্চস্থ হবার কিছুদিন পরে আমার ছোট ভগ্নিপতি শ্রীজ্ঞানাঙ্কুর দে একদিন আমায় অনুরোধ করল ডাফরিন হাসপাতালের গৃহনির্মাণ ফাণ্ডের জন্যে যদি একটা চ্যারিটি শো করে কিছু টাকা তুলে দিই তবে বড় ভাল হয়। জ্ঞানাঙ্কুরের অনুরোধ এড়াতে পারলুম না—এদিকে তখন "অভিনয়"-এর শুটিং চলেছে পুরোদমে—তাই কোন নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব হলো না। সেইজন্য আমি স্থির করলাম যে "বিদ্যুৎপর্ণা" ও "ওমরের স্বপ্নকথা"কেই আর একবার মঞ্চস্থ করা হোক। তাছাড়া

এদুটি নাটকই নাট্যরসিকদের চিত্ত জয় করেছে—সুতরাং যে কারণের জন্যে চ্যারিটি শো'র আয়োজন তা সফল হবে নিশ্চয়ই।

তদানীন্তন বাংলার রাজ্যপাল মাননীয় লর্ড ব্র্যাবোর্ণ এবং লেডী ব্র্যাবোর্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় ফার্স্ট এম্পায়ারে আমরা ১১ই মার্চ ১৯৩৮ সালে আবার "বিদ্যুৎপর্ণা" ও "ওমরের স্বপ্নকথা" মঞ্চস্থ করলাম। এই অভিনয়ে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন লর্ড ব্র্যাবোর্ণ ও লেডী ব্র্যাবোর্ণ। প্রথম অঙ্কের পর বিরতির সময় রাজ্যপালের মিলিটারী সেক্রেটারী মঞ্চের ভিতরে এসে খবর দিলেন যে, অভিনয়ের শেষে লর্ড এবং লেডী ব্র্যাবোর্ণ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান—বিশেষ করে আমার, সাধনার ও অহীনবাবুর সঙ্গে। আমি সানন্দে স্বীকৃতি দিলাম।

অভিনয় শেষ হয়ে গেল—যবনিকা পড়ে গেল। আমরা মেক-আপ রুমে বসে মেক-আপ তুলছি তাড়াতাড়ি করে। অহীনবাবু ও আমি একই ঘরে মেক-আপ করতাম। এমন সময় খবর পেলাম লর্ড ও লেডী ব্র্যাবোর্ণ ইতিমধ্যে মঞ্চের ভিতরে এসে পড়েছেন। আমি, অহীনবাবু ও সাধনা তাড়াতাড়ি করে গেলাম। তাঁরা আমাদের অভিনন্দন জানালেন, অভিনয় তাঁদের খুব ভাল লেগেছে বললেন। লেডী ব্র্যাবোর্ণ একটি বড় ফুলের 'বাসকেট' ও দুটি ফুলের তোড়া উপহার দিলেন—ফুলের 'বাসকেট'টি সাধনাকে ও তোড়া দুটি আমাকে ও অহীনবাবুকে। তাঁরা একথাও বললেন যে অভিনয় তাঁদের এত ভাল লেগেছে যে সি. এ. পি যদি ভবিষ্যতে আর কোন নাটক মঞ্চস্থ করে তবে তাঁরা তা দেখতে পেলে খুব খুশী হবেন। আমি অবশ্য বললাম : নাটকের ভাষা তো বাংলায়, হয়ত আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা বললেন যে নাটকের কাহিনী তো "সুভেনির প্রোগ্রামে" ইংরাজীতে দেওয়া ছিল—তা পড়ে এবং সাধনার ও অহীনবাবুর অভিনয় এত সুন্দর এবং প্রাণস্পর্শী হয়েছিল যে আসল নাটকের বক্তব্য বুঝতে তাঁদের কোন অসুবিধাই হয়নি।

এর কয়েকদিন পরে লর্ড ব্র্যাবোর্ণের কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পেয়েছিলাম যেটা নীচে উদ্ধৃত করছি :—

GOVERNMENT HOUSE
DARJEELING 17. 6. 1938.

"I was much impressed by the artistic performances of "Omar Khayyam" and 'Vidyutparna' staged by the CALCUTTA ART PLAYERS at the First Empire Theatre. The Plays, which were admirably interpreted, reflected great credit on the Producer and actors, and set up a high standard.... I wish the C. A. P. all the success...."

Sd/-Brabourne

'অভিনয়'-এর যা কাজ বাকি ছিল তা শেষ হয়ে গেল জুন মাস নাগাদ।

আমার বন্ধু শ্রীএস. আর. হেমাদ তখন কলকাতার বিখ্যাত পরিবেশক এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্সের প্রধান কর্মসচিব। এঁরাই ছিলেন 'আলিবাবা' ও 'অভিনয়'-এর পরিবেশক। শ্রীহেমাদ সি-এ-পির প্রত্যেকটি 'শো'ই খুব উৎসাহের সঙ্গে দেখতেন এবং আমাদের একজন বিশেষ গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন। সি-এ-পির নৃত্যনাট্যগুলির বিরাট সাফল্য দেখে তিনি একদিন আমার কাছে প্রস্তাব করলেন, সাধনা বসু ও তাঁর ব্যালে নিয়ে বোম্বাই, বিহার এবং উত্তর ভারতের কতকগুলি বড় বড় জায়গায় সফর করলে কি রকম হয়। সি-এ-পির প্রযোজনায় 'শো'গুলি হবে এবং 'ওমরের স্বপ্নকথা'কেও তিনি প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করতে বললেন।

প্রস্তাবটি আমার ও সাধনার খুব ভাল লাগল এবং আমরা রাজী হয়ে গেলাম। শ্রীহেমাদ তারপর আমাদের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট সই করলেন এবং বোম্বে এবং আর কোন কোন জায়গায় ক'দিন করে 'শো' হতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ঠিক হলো সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকে সফর আরম্ভ হবে।

এরপর সাধনা কতকগুলি নৃত্য রচনায় লেগে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে তিমিরও এই নাচগুলির সুর রচনা করতে লাগল।

ইতিমধ্যে আমি এবং শ্যাম দাস 'অভিনয়'-এর সম্পাদনা কাজ শেষ করে ফেললাম।

সমস্ত ছবিটির প্রোজেকশান দেখলাম। এই প্রোজেকশানে সকলেই উপস্থিত ছিল—সাধনা, মন্মথ, বাবুলালজী, ধীরাজ, হেমন্ত, শ্যাম এবং প্রধান কলাকুশলীরা। ছবি দেখে কারু মনে বিশেষ কোন রেখাপাত করল না। সত্যি কথা বলতে কি, ছবি দেখে আমি তো হতাশই হয়ে পড়লাম। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল—এত খেটেখুটে শেষে এই হলো! খুব মনমরা হয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

আমি, মন্মথ, বাবুলালজী, শ্যাম ও হেমন্ত—সকলে মিলে আলোচনা করতে লাগলাম যে ছবিখানা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন সুন্দরভাবে এসে, শেষ কতকগুলি দৃশ্যে এমন কোন জিনিসের অভাব হলো যাতে নাটকের চূড়ান্ত পরিণতি মনে কোন দাগ কাটতে পারছে না। দীর্ঘ আলোচনার পর দেখা গেল যে শেষ তিন চারটি দৃশ্যই যত গণ্ডগোল করছে—অর্থাৎ গল্পটা মিলনান্তকভাবে শেষ হতে পারে না। মন্মথ ও আমি আগে যা ভেবেছিলাম তাই ঠিক—গল্পের ধারা যে ভাবে গেছে তাতে ট্রাজেডীতেই শেষ হওয়া উচিত। পরদিন আমি ও মন্মথ আবার আলোচনা করলাম—একটা কাঠামো ঠিক হলো এবং মন্মথ সেইভাবে দৃশ্যগুলি লিখল।

এ কয়েকটা দৃশ্য আবার শুটিং করা হলো। তারপর সম্পাদনা করে আবার সকলে ছবিটা দেখলাম। দেখলাম ছবির রূপই বদলে গেছে। সকলেই এক বাক্যে বলতে লাগল—এইবার ছবিটা জমেছে—অপূর্ব হয়েছে ইত্যাদি। আশ্চর্য—সামান্ত অদল-বদলে একটা ছবির 'টোটাল এফেক্টে'র তারতম্য কতখানি হয়!

এখন বলছি শেষ অংশটুকুর বিভিন্ন রূপায়ণ। প্রথমে আমরা যেটি তুলেছিলাম সেটা হলো :

মনীষা বিরাট ধনী তরুণ হীরক চৌধুরীর স্ত্রী। ভুল বোঝাবুঝির ফলে মনীষা হীরকের কাছ থেকে চলে এসে মঞ্চে অভিনয় করে। হীরক চৌধুরী নিজের ভুল বুঝতে পেরে মনীষার কাছে ফিরে আসে। দুজনের মধ্যে ঠিক হয় যে মনীষার আজই অভিনেত্রী-জীবনের শেষরাত্রি।—আজ অভিনয়ের শেষে দুজনে আবার নিজের বাড়ীতে ফিরে যাবে—এবং মনীষার পিতা পীতাম্বর চৌধুরীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করবে। তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করবেন।

এটা হলো মিলনান্তকভাবে শেষ। কিন্তু এটা আমাদের মনে কোন দাগ কাটতে পারেনি।

পরের পরিবর্তিত রূপ হলো এইরূপ। অবশ্য সংলাপগুলি সঠিক আমার মনে নেই, তবে মোটামুটি এইরকম :—

হীরক আর মনীষার মধ্যে স্থির হয়েছে আজই অভিনয় শেষে ওরা ফিরে যাবে। অভিনয় শেষ হয়ে গেল—মনীষা মনের আনন্দে মেক-আপ রুমে এসে মেক-আপ তুলছে। তার জীবনে লেগেছে আবার নববসন্তের দোলা। এদিকে হীরক বাইরে অপেক্ষা করছে মনীষার জন্যে। দুটি দীর্ঘ বিরহী হিয়া এতদিন পরে উভয়ে উভয়কে আবার নিবিড় করে কাছে পাবে—এরই ব্যাকুলতা ঝরে পড়ছে তাদের কথায় বার্তায় ব্যবহারে।

কিন্তু একটা কালো মেঘ এসে উভয়েরই জীবনের সমস্ত আলোটুকু ঢেকে দিল।

মেক-আপ রুমে এসে ঢুকলো রাজকুমারী রত্না। এসে দাঁড়াল মনীষার কাছে। মনীষা জানতে চাইল সে কে এবং কি চায়?

রাজকুমারী রত্না বলল : আমি চাই হীরককে।

মনীষা বলল, তার মানে? আমি তাকে ভালবাসি—তাকে আমি ছাড়তে যাব কেন?

রাজকুমারী বলে : আপনি অভিনেত্রী—আপনার জীবনে এ রকমের প্রেম বহু এসেছে এবং আসবেও—শুধু হীরককে আমায় ভিক্ষা দিন। আমি তার বাগ্‌দত্তা।

মনীষা বলে : আপনার বাজে কথা শুনবার সময় আমার নেই। পথ ছেড়ে দিন, আমার তাড়া আছে।

বলে দরজা দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করে।

রাজকুমারী রত্না বাধা দিয়ে বললে : দাঁড়ান, আমার শেষ কথা শুনে যান। আমি শুধু হীরকের বাগ্‌দত্তা নই—আমি তার ভাবী সন্তানের মা হতে চলেছি।

মনীষার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এতদিন কল্পনায় যে আকাশ-কুসুম সে রচনা করেছিল তা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

রাগে, দুঃখে, উত্তেজনায় মনীষা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

বাইরে করিডোরে হীরক মনীষার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মনীষাকে দেখে হীরক বলল : এত দেরী কেন ? চল—

মনীষা বলে : কোথায় যাব ?

হীরক বলে : সে কি ! সব ভুলে গেলে ? অভিনয়ের শেষে আমরা দুজনে গিয়ে তোমার বাবাকে প্রণাম করব।

মনীষা বলে : তুমি কি আমার কথা সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলে ?

হীরক : তার মানে ? কি বলছ তুমি ?

মনীষা হেসে বলে : আমি তো তোমার সঙ্গে অভিনয় করছিলাম—অভিনয়—কি নিখুঁত অভিনয় !

এই বলতে বলতে ওখান থেকে দ্রুত চলে যায়। তার মুখে হাসি এবং চোখে জল। যেন বর্ষণসিক্ত মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ঝল্‌কানি। সাধনার অভিনয়ে সে অভিব্যক্তি অপূর্ব প্রকাশ পেয়েছিল।

হীরক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এদিকে মনীষা ছুটে যায় গাড়ীর দিকে যেখানে পীতাম্বর চৌধুরী বসেছিলেন। মনীষা গিয়ে তাঁর কোলে মুখ লুকায়। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে।

পীতাম্বর চৌধুরী সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন : আমি জানতাম মা তুই আসবি। আমি জানতাম।

হীরক এসে দেখে পীতাম্বর চৌধুরীর গাড়ী আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।

এর আগে বলেছি যে সাধনা নৃত্য-নাট্য রচনার কাজে হাত দিয়েছিল। এখন সেগুলির রিহার্সাল সুরু করল। এই সময় কোচিনের নৃত্যশিল্পী মাধব মেনন আমাদের সি. এ. পি-তে যোগদান করল। তিমিরও এই নৃত্য-নাট্যগুলির সুর রচনা

করতে সুরু করে দিল। কয়েকটি নৃত্য-নাট্য ও নৃত্য দিয়ে একটি প্রোগ্রাম তৈরী হলো। ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে এই প্রোগ্রাম উপস্থাপিত হলো ফার্স্ট এম্পায়ারে :

৪-৬ আগস্ট 'হিন্দুনৃত্য-নাট্য', ৭-৯ আগস্ট 'রাজনটী' এবং শেষদিন, অর্থাৎ ১০ই আগস্ট আবার 'হিন্দু নৃত্য-নাট্য'। সাধনার এই নৃত্য-নাট্যগুলি, পরিকল্পনার দিক থেকে, সুরারোপের দিক থেকে এবং উপস্থাপনার দিক থেকে অপূর্ব হয়েছিল।

শ্রীহেমাদ এসে আমাদের সফরের সূচী জানালেন। সফর-সূচী নির্ধারিত হয়েছিল এইরূপ : (১) **পাটনা**—(এলফিনস্টোন সিনেমা) ৬-৮ সেপ্টেম্বর ; (২) বেনারস—(নিশাত সিনেমা) ১০-১১ই সেপ্টেম্বর ; (৩) **এলাহাবাদ**—(রিজেন্ট সিনেমা) ১১-১৩ সেপ্টেম্বর ; তারপর **বোম্বাই**—(ক্যাপিটল সিনেমা ১৭-২৪ সেপ্টেম্বর—৭ দিন)।

তখনকার দিনে অভিনেতৃদলের সফরের জন্যে রেলওয়ে কনসেশান পাওয়া যেতো। আমি একজন উপরওয়ালাকে ধরে ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স-এর নামে একটি 'বোগী' (bogey) রিজার্ভ করে ফেললাম সমগ্র সফরটার জন্যে। এতে ছিল একটি প্রথম শ্রেণীর 'কুপে' কামরা, দুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা ও একটি মধ্যম শ্রেণীর কামরা। 'কুপে'তে সাধনা আর আমি, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীতে মেয়েরা এবং অন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিমির, মাধব মেনন, হেমন্ত, যমুনাপ্রসাদ টুকলু এবং আরও কয়জন, এবং মধ্যম শ্রেণীতে বাদ্যযন্ত্রীরা, দুজন মঞ্চকর্মী, মেক-আপম্যান ইত্যাদি। এছাড়া একটি ট্রাক ছিল, তাতে আমাদের সাজ-সজ্জার বাক্সগুলি ও স্টেজের জিনিসপত্র ছিল।

রেলওয়ের কর্তৃপক্ষকে আগে থেকে 'চার্ট' তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল—কোন জায়গায় কবে যাব, কতদিন থাকব, কবে সে স্থান ত্যাগ করব ইত্যাদি। এতে সুবিধা হয়েছিল এই যে আমাদের ট্রেণ ধরবার জন্যে তাড়াহুড়া করতে হতো না। কোনো জায়গা ছাড়বার আগের দিন রাত্রে, 'শো' শেষ হবার পর, সকলে খাওয়া-দাওয়া করে এসে আমরা ট্রেণেই শুয়ে থাকতাম। অনেক সময় সেই রাত্রেই অথবা পরদিন ভোরবেলায়, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঠিক 'চার্ট' অনুযায়ী এই 'বোগী'টি নিয়ে গিয়ে আমাদের গন্তব্য স্থানের ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দিত—এবং গন্তব্য স্থানে গিয়ে একটা সাইডিং-এ কেটে রেখে দিত।

আগস্ট মাসের শেষদিকে আমরা কলকাতা ছাড়লাম। সব মিলে দলের সভ্য সংখ্যা হলো ২৪ জন। ঠিক কলকাতা ছাড়বার সময় হেমাদ আমাদের খবর দিল—'অভিনয়'-এর মুক্তিদিবস ঠিক হয়েছে রূপবাণীতে সেপ্টেম্বরের গোড়ায়।

প্রথমেই আমরা চলে গেলাম পাটনায়। সেখানে এলফিনস্টোন সিনেমায় ৩দিন (৬ই-৮ই সেপ্টেম্বর) আমাদের 'শো' হলো।

পাটনায় একটা মজার ঘটনা ঘটল। শেষদিন ইনটারভ্যালের সময় একদল দর্শক ধরে বসল যে আজকের শো-এর শেষে 'আলিবাবা' থেকে অন্ততঃ দুই একটা দৃশ্য অভিনয় করতে হবে। আমি তাদের যত বোঝাই যে 'আলিবাবা'র সাজ-পোষাক দৃশ্য পট কিছুই সঙ্গে নেই—সে সব না হলে 'আলিবাবা'র থেকে কোন দৃশ্য হতে পারে না, কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। তারা হাউস থেকে যাবে না।

এলফিনস্টোনের ম্যানেজার তখন অনুরোধ করলেন: যেমন করে হোক অন্ততঃ একটা দৃশ্য 'আলিবাবা' থেকে করুন মিঃ বোস। নইলে এরা তো শুনবে না কিছুতেই। আমি তখন দর্শকদের বললাম: 'শো'-এর শেষে 'আলিবাবা' থেকে একটি দৃশ্য করা হবে—কিন্তু মনে রাখবেন—শুধু একটি দৃশ্যই হবে। বলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের কি উল্লাস—হাউস ভেঙ্গে পড়ল তাদের করতালিতে সকলেই একসঙ্গে বলছে—হাঁা-হাঁা, একটা দৃশ্য—একটা দৃশ্য 'মর্জিনা' ও 'বাবা মুস্তাফার দৃশ্যটি—দেখতে পেলে আমরা খুশী হব। 'বাবা মুস্তাফা'র ভূমিকায় টুকলু ও 'মর্জিনা' সাধনা। 'ওমর খৈয়ামের' ভূমিকায় টুকলুর সাদা দাড়ি ত ছিল—শুধু ওর পোষাকটা বদলে দেওয়া হলো—আর সাকীর রূপসজ্জায় ছিল সাধনা। সেইটাই কিছু অদল-বদল করে 'হামে ছোড়ি দেরে সঁইয়া' নাচ ও গান সহযোগে অভিনীত হলো 'শো'-এর শেষে। দর্শকরা তখন খুব খুশী হয়ে বাড়ী গেল।

পাটনা থেকে চলে গেলাম বারাণসী। বারাণসীতে নিশাত সিনেমায় দুদিন (১০ই-১১ই সেপ্টেম্বর) শো হলো। বারাণসীতে তখন ললিতার মা, বর্ধমানের মহারাণী ছিলেন। সাধনা ও আমাকে একদিন দুপুরে খাওয়ালেন—সে এক এলাহি ব্যাপার। সেদিন আবার দুটি শো—৩টায় ও ৬টায়। এতদিন পাটনায় ও বেনারসে হোটেলে হোটেলে খেয়ে, হোটেলের খাওয়ায় বিতৃষ্ণা এসেছিল—বিশেষ করে আমার। বাংলা রান্না খাওয়ার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। সুতরাং আমরা দুজনেই খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। ৩টার শো শেষ হবার পর সাধনা বলল, সে এত খেয়েছিল যে নাচতে তার দস্তুরমত কষ্ট হচ্ছিল।

বেনারস থেকে এলাম এলাহাবাদে। এখানে ১২-১৩ সেপ্টেম্বর রিজেন্ট সিনেমায় আমাদের শো হলো। সব জায়গাতেই বিপুল সম্বর্ধনা পেলাম।

এলাহাবাদে আমাদের সম্বর্ধনাটা হলো আরও বিরাট। সেখানকার জনসাধারণ এবং রিজেন্ট সিনেমার ম্যানেজার আমাদের ধরে বসল যে আরও অন্ততঃ একদিন

আমাদের শো'টা বাড়িয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম এমনভাবে তৈরী ছিল যে অতিরিক্ত শো দেবার কোন উপায় ছিল না।

এর আগে বলেছি যে হুইলার কোম্পানীর মালিক মিঃ তিনকড়ি ব্যানার্জীর সঙ্গে আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একদিন আমাদের বিরাট ভোজ দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন। বহু বিশিষ্ট নাগরিক সে সম্বর্ধনা-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম ছিল বোম্বায়ের কাপিটল সিনেমায়। সেখানে ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে এক সপ্তাহের জন্য আমাদের হাউস বুক করা ছিল। শনিবার দিন আমাদের অনুষ্ঠান সুরু হলো। প্রত্যেকটি শো-তেই হাউসে তিলধারণের স্থান ছিল না। নাট্য রসিকদের এবং সমলোচকদের অকুণ্ঠিত প্রশংসার জয়মাল্য পেল সাধনার 'নৃত্য-নাট্য' ও ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স।

বোম্বের বিভিন্ন পত্রিকায় যেসব সমলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে থেকে দুটি এখানে দিলাম বাকিগুলি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য :—

"Enthusiastic and full houses greeted the Calcutta Art Players and Sadhona Bose for their opening show at the Capitol Theatre in Bombay last night . . . The many different dances proved Sadhona Bose to be an exponent of the first rank. The music of Timir Baran deserves special mention . . . certainly one of the best shows Bombay has seen for a long time. and if the same high standard is maintained, the Calcutta Art Players are assured of a good response."

—ILLUSTRATED WEEKLY OF INDIA,
Bombay, (18.9.1938)

"The Catcutta Art Players, which opened their show at the Capitol on last Saturday, have been drawing crowded houses. It speaks volumes for the art of Sadhona Bose and the talented troupe that they should have captured the Bombay public, which is as critical as it is appreciative. ...The appeal of the "Dream Songs of 'OMAR KHAYYAM' is compelling. The commendable directing abilities of Mr. Modhu Bose and histrionic talents of Sadhona Bose, have produced this crowning achievement of the Calcutta Art Players which is sure to please the most fastidious among the art lovers."

—BOMBAY CHRONICLE,
(23.9.1938)

বম্বের দর্শকসাধারণ ও সমালোচকদের কাছ থেকে 'ওমরের স্বপ্নকথা' এবং 'সাধনা বোস ও তার ব্যালে' অকুণ্ঠিত প্রশংসা পাচ্ছে—আমাদের আনন্দ আর দেখে কে? সি-এ-পির এই বিরাট সাফল্যে বোম্বে শহরে নাট্যমোদীদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেল।

এখানকার প্রোগ্রাম শেষ করে খুব খুশী মন নিয়ে বোম্বাই ত্যাগ করলাম সোমবার ২৬শে সেপ্টেম্বর।

আমাদের বিদায় অভিনন্দন দেবার জন্যে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। ভক্তের দল প্রচুর ফুল নিয়ে এসেছে শুধু আমাদের কামরাই নয়—বগীর প্রত্যেকটি কামরাই ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল।

বম্বে থেকে কলকাতা ফেরার পথে সম্ভবত বর্ধমান স্টেশনে গাড়ী থামতে টুকলু কয়েকখানি কলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা কিনে এনে আমাকে দিল। এই সাপ্তাহিকগুলিতে 'অভিনয়ে'র সমালোচনা বেরিয়েছিল—এবং সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে।

অবশ্য বোম্বেতে থাকতেই মিঃ হেমাদের কাছ থেকে টেলিফোনে 'অভিনয়ে'র অভাবনীয় সাফল্যের খবর পেয়েছিলাম—তাছাড়া আমার খুড়তুতো ভাই বাদলা, সমালোচনার সমস্ত কাটিং আমাকে পাঠিয়েছিল।

এখানে বাদলা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সে আমার ন'কাকা কুমুদচন্দ্র বসুর ছোট ছেলে—ভাল নাম সত্যেন্দ্রনাথ। ন'কাকা মারা যাবার কিছুদিন আগে একদিন আমাদের চৌরঙ্গী প্লেসের ফ্লাটে বাদলকে নিয়ে এলেন—সেটা ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে। আমাকে বললেন: মধু, আমার শরীর যে রকম ভেঙ্গে গেছে, তাতে মনে হয় আমার আর বেশী দিন নেই। বাদলকে নিয়েই পড়েছি মুস্কিলে—লেখাপড়াও ওর বিশেষ কিছু হলো না। ওকে আমি তোমার কাছে দিয়ে গেলাম—দেখ যদি কোনোরকমে মানুষ করতে পার।

তার কিছুদিন পরেই কুমুদকাকা মারা গেলেন—বাদলার বয়স তখন আর কতই বা হবে, উনিশ কিংবা কুড়ি।

এসময় সি. এ. পি. প্রায়ই একটার পর একটা নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে—আমি তখন ওকে প্রোডাকশান বিভাগে কাজ শেখাতে লাগলাম। বাদলার কাজ ছিল ব্লকমেকারের কাছে যাওয়া, প্রেসে যাওয়া, প্রুফ নিয়ে আসা, দৈনিক পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন এবং ব্লক দিয়ে আসা, সি-এ-পি সম্বন্ধে কোনো সংবাদ বা সমালোচনা বেরুলে সেগুলি কাগজ থেকে কেটে বেশ ভাল করে খাতায় সেঁটে রাখা ইত্যাদি। এই সব কাগজগুলি সে খুব যত্ন এবং নিষ্ঠার সঙ্গেই করত।

এই সময় আমার সঙ্গে আর একজনের বন্ধুত্ব হয়—তার নাম হলো শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত—ভারত ফটোটাইপ স্টুডিওর স্বত্বাধিকারী। আমাদের সি, এ, পি'র

যত কিছু ব্লক তৈরী হয়েছিল—এবং তার পরেও আমি যা কিছু ব্লক তৈরী করিয়েছি সবই করেছে এই ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও। কাজকর্মের সূত্র ধরে তার সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে, তা এখনও অটুট আছে। অজিত আমার একজন সত্যিকারের বন্ধু এবং গুণগ্রাহী। মুদ্রণ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে আমি তার মতকে যেমন শ্রদ্ধা করি, বন্ধু হিসেবেও তেমনি তাকে ভালবাসি।

যাই হোক, ২৮শে সেপ্টেম্বর আমরা কলকাতা এসে পৌছলাম। এদিকে ৩০ থেকে এম্পায়ার থিয়েটারে 'শো' ঘোষণা করা আছে। চারদিন 'সাধনা বসু ও তার ব্যালে'র নৃত্য-প্রদর্শনী বাকী—তিন দিন 'রাজনটী'। হেমন্তকে বোম্বাই থেকে আগেই কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—সে এসে অগ্রিম পাবলিসিটির কাজ সব করে রেখেছিল।

আমি এসেই পরদিন অর্থাৎ ২৯ তারিখে 'রাজনটী'র স্টেজ রিহার্সাল ঠিক করলাম।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ থেকে সপ্তাহব্যাপী সি. এ. পি. প্রোগ্রাম সুরু হলো এম্পায়ারে। "সাধনা বসু ও তার ব্যালের" নৃত্য-প্রদর্শনী দিয়েই প্রোগ্রাম আরম্ভ হলো। তখন পূজোর ছুটি সুরু হয়েছে, সুতরাং প্রতিটি 'শো'তেই ফুল হাউস। টাকা-পয়সা বেশ ভালই পাওয়া গেল।

একে বিহার-উত্তর প্রদেশ ও বোম্বাই সফরের সাফল্য, তারপর কলকাতায় স্টেজ শোর সাফল্য এবং সর্বোপরি "অভিনয়ে"র সাফল্যে আমাদের আনন্দ আর তখন দেখে কে ?

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় "অভিনয়" সম্বন্ধে যে সমস্ত সমালোচনা বেরিয়েছিল তার কিছু কিছু অংশ নীচে তুলে দিলাম :

'অভিনয়' ছবিখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না…চলচ্চিত্রের উপযোগী এমন সর্বাঙ্গসুন্দর কাহিনী আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি…ইহা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচায়ক…এই কাহিনীটিকে অতি নিষ্ঠায় সহিত পর্দার উপরে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন পরিচালক শ্রীযুক্ত মধু বসু। …শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরী ছবির শিল্প পরিচালনা করিয়াছেন। সেটের যে সমস্ত দৃশ্য তিনি দেখাইয়াছেন, আজ পর্যন্তও কোন ভারতীয় ছবিতে আমরা এই রকম দেখি নাই।' …আনন্দবাজার পত্রিকা (১০-৯-৩৮)

"ভারতীয় চিত্রের মধ্যে 'অভিনয়' এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল…, অভিমন্যু (দীপালী) ৮-৯-৩৮

"অভিনয়ের পরিচালককে ভারতের শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের সমপর্যায় অসঙ্কোচে স্থান দিতে পারি। সহজ সরল ভাবে ছবিখানা আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে গেল, কোথা দিয়ে যে পৌনে তিন ঘণ্টা কেটে গেল তা বুঝতেও পারলাম না।" …স্বদেশ (৯-৯-৩৮)

"…অনায়াসে যে কোন প্রথম শ্রেণীর বিলাতী ছবির সহিত 'অভিনয়'-এর তুলনা করা যেতে পারে……'
…আস্বাদ (৯-৯-৩৮)

"Abhinaya is supreme in technical and acting virtues and it will not be an exaggeration to say that it will come to occupy, a leading position in productions of this year. The cast is superb. Sadhona Bose aquits herself in a very perfect way and fully establishes her claim as first class artiste. Her dances are unique. Ahin Choudhury surpasses all his previous records in the screen. He is unique in his creation of Pitambar. Dhiraj Bhattacharjee wins another laurel in this picture. This is undoubtedly his best acting so far. Tulsi Lahiry as Theatre Manager is a unique creation...Photograph is superb ..Direction is faultless...Mr. Sudhansu Chowdhury shows his merit to perfection in designing the sets. Its excellence is so great that it out-shines not only all Indian pictures hitherto shown, but many foreign pictures too, lack in brilliance before it." ...J. N. M. (FILMLAND—

"Sree Bharat Luxmi Pictures have reasons to congratulate themselves for the very brilliant production 'Abhinaya'...The treatment accorded to the story very favourably compare with American movies." HINDUSTAN STANDARD

এবার কলকাতার বাইরে থেকে বহু আমন্ত্রণ আসতে লাগল 'শো' করার জন্য। কিন্তু এখন আমরা আর কোনো 'শো' না করে চাইছিলাম সম্পূর্ণ বিশ্রাম। দীর্ঘ মাসাধিককাল একটানা পরিশ্রমের পর আমরা সকলেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিছুদিন বিশ্রামের পর আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম ঠিক করলাম ঢাকায়—৪ঠা নভেম্বর ১৯৩৮ সালে। স্থির হলো 'ওমরের স্বপ্নকথা' ও 'বিদ্যুৎপর্ণা'র অভিনয় হবে সেখানে চারদিন।

এই ঢাকার আমন্ত্রণটি গ্রহণ করবার একটি বিশেষ কারণও ছিল। ওখানে তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিল শ্রীসুশীল দে, আই. সি. এস। সুশীল হলো বিখ্যাত বাগ্মী ও দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালের দৌহিত্র—অর্থাৎ বন্ধুবর নিরঞ্জন পালের ভাগ্নে। সুশীল বিবাহ করেছিল ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের ছোট মেয়ে ইন্দিরাকে। ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। আর সুশীলের পরিবারের সঙ্গে সাধনাদের পরিবারের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। কারণ সুশীলের বাবা মনোনীতধন দে, সাধনার বাবা শ্রীসরলচন্দ্র সেনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন।

সুশীল অবশ্য বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট ছিল, আমি তাকে ছোট ভাই-এর মতই দেখতাম। সে যখন জানতে পারল যে আমাদের ঢাকার 'শো' করবার কথা হচ্ছে, তখন সে অনেক করে লিখল যাবার জন্যে। আমরা গেলে আমাদের থাকার কোন অসুবিধে হবে না—সে নিজে সব বন্দোবস্ত করে দেবে।

আমাদের 'শো' আরম্ভ হবার ঠিক দুদিন আগে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম ঢাকায়।

এ দুদিন রোজই কোথাও না কোথাও আমাদের লাঞ্চ ও ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। সুশীল একদিন এক বিরাট ভোজ দিয়ে আমাদের সম্বর্ধনা করলে।

'শো'-এর আগেরদিন আমরা গেছি পিক্‌চার হাউসে স্টেজ রিহার্সাল করতে। পিকচার হাউসের কর্তৃপক্ষ আমাকে জানালেন যে পুরাতনপন্থী এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের একটি দল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তাঁরা চান না যে এই নাট্যাভিনয় হোক।

তাঁদের বক্তব্য হলো যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পৌত্রী সাধনা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে পেশাদারীভাবে অবতরণ করবে—এটা ঘোরতর অন্যায়। এটা অসামাজিক এবং এর প্রশ্রয় তাঁরা কোনমতেই দেবেন না। প্রথমটায় আমি বুঝতে পারিনি যে এ আন্দোলন এরকম তীব্র আকার ধারণ করবে।

আমার কলেজের বন্ধু ও বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় নগেন কালী একদিন তাদের বাড়ীতে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করল এবং সেই প্রথম আমাকে বলল যে এখানকার কয়েকজন ছেলে অভিনয়ের প্রথম দিন হয়ত কিছু গোলমাল করার চেষ্টা করতে পারে। এই দলটাকে নিযুক্ত করেছে স্থানীয় রক্ষণশীল সম্প্রদায়।

এই খবরে আমাকে কিছুটা নার্ভাস হতে দেখে নগেন বলল: আরে, কোন ভয় নেই—আমি ঢাকার ছেলে—এদের নাড়ী-নক্ষত্র সব আমার ভাল রকম জানা আছে। ঢাকা ওয়ারীর সব ছেলে আমার বিশেষ অনুগত। সুতরাং গণ্ডগোল যদি সত্যিই কিছু হয়, তা ঠাণ্ডা করবার ওষুধ আমার জানা আছে। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

প্রথমদিন 'শো'র কিছু আগে আমি পিকচার হাউসের গেটের মধ্যে ঢুকছি—এমন সময় দেখি বেশ একটা দল গেটের বাইরে জটলা করছে। কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না, এই মতলব। আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে এরা আটকাবে—তাই আমি গাড়ীর ড্রাইভারকে বললাম এখানে একেবারে না দাঁড়িয়ে জোরে গাড়ী চালিয়ে ভিতরে চলে যাও। ড্রাইভার তাই করল।

আমি ভেতরে চলে এলাম। তার পরের গাড়ীতে অহীনবাবু এলেন যখন, তখন তাঁর গাড়ী গেটে আটকালো। অহীনবাবুর সঙ্গে ছিলো সাধনা ও তিমির। অহীনবাবুকে আটকাতে তিনি খুব তৎপরতার সঙ্গে বললেন: আমাদের আপনারা আটকাচ্ছেন কেন? আমরা শিল্পী মাত্র—আমরা তো হাউস বুক করিনি। আপনাদের যা কিছু বলবার আছে তা প্রযোজক ও পরিচালক মধু বসু মশায়কে

বলুন। তিনি আমাদের কণ্টাক্ট করে নিয়ে এসেছেন এইমাত্র—আমরা এসেছি, এতে আমাদের কি দোষ বলুন।

এই বলে তো তাঁরা ভিতরে চলে এলেন।

এদিকে হাউস ভর্তি হয়ে গেছে—ন স্থানং তিলধারণম্। ঠিক পর্দা তোলবার পূর্ব মুহূর্তে নগেন কালি এসে আমায় যা বললো তাতে তো আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। সেই রক্ষণশীল পুরাতনপন্থী দলটি পাড়ার একদল বখাটে ছেলেকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছেন গোলমাল করার জন্যে। বয়স্ক ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা যে এই ধরনের নীচ কাজ করতে পারে এ আমি ভাবতেই পারি না। আমাকে নার্ভাস হতে দেখে নগেন বলল: কিছু ভেবো না মধু, আমি সব ব্যবস্থা করেছি। ওয়ারী থেকে বেশ কয়েকজন ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, বেশী কিছু করলে, তারা এই চ্যাংড়াগুলোকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দেবে।

তার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে পর্দা তোলা হলো। প্রথমেই "ওমরের স্বপ্নকথা" প্রথম দুটো দৃশ্য বেশ হয়ে গেল—তৃতীয় দৃশ্য সুরু হলে করগেটের ওপর ফটাফট্ ইষ্টকবৃষ্টি। তারপর সেটা থেমে গেল—আবার সুরু হলো 'ওমরের স্বপ্নকথা' অভিনয় শেষ হবার সময়।

আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। ইণ্টারভ্যালের সময় স্টেজের ওপর পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম: ঢাকায় এসে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছি—অতিথিদের যে আপনারা এই রকম সমাদর করেন এ জানলে আমি আমার দলকে নিয়ে এখানে কখনই আসতামই না। এ ব্যবহারে আমি মর্মাহত হয়েছি।

এ কথায় প্রত্যক্ষ ফল হলো। সারা প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল—সকলেই আমাকে সহানুভূতি জানালেন—কয়েকজন তরুণ যুবক এগিয়ে এসে বললেন: এরকম গুণ্ডামী তাঁরা কখনই সহ্য করবেন না—অতিথিদের প্রতি এ অসম্মান বরদাস্ত করা হবে না কিছুতেই। তাঁরা এখুনিই বাইরে গিয়ে এ গুণ্ডামী বন্ধ করবেন—তাতে যদি তাঁদের অভিনয় দেখা ভাগ্যে না থাকে তো না থাক্।

সুশীল এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের সঙ্গে নগেনের ছেলেরা এবং প্রেক্ষাগৃহের কয়েকজন তরুণ হাউসটিকে ঘেরাও করে বার-চৌদ্দ জন ছেলেকে ধরে ফেলল—এরাই হাউসের করগেটের ছাতে ইঁট পাটকেল ছুঁড়ছিল।

বাস, তারপর সব শান্ত হয়ে গেল। সুশৃঙ্খলার সঙ্গে 'বিদ্যুৎপর্ণার অভিনয় হয়ে গেল। অভিনয় শেষে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ হলো আমাদের। বহু গণ্যমান্য

নাগরিক, জেলার জজ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী উপস্থিত ছিলেন সে অভিনয়ে, তার মধ্যে ঢাকার নবাব ও তাঁর পরিবারের অনেকেই ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার ফুলের স্তবক ও মালা দিয়ে অভিনন্দন জানালেন।

এঁরাও এই পুরাতনপন্থী দলটির এই জঘন্য কাজের খুব নিন্দা করেন। এই ব্যাপারটি এত সবিস্তারে বলছি আমি এই জন্যে যে, আমরা যখন ১৯২৮ সালে প্রথম ফার্স্ট এম্পায়ারে 'আলিবাবা' অভিনয় করি তখন কলকাতায় একদল পুরোনপন্থী কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শন করে তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়ে আমাদের অর্থাৎ শিক্ষিত অভিজাতবংশীয় ছেলে-মেয়েদের মঞ্চাবতরণকে ব্যাহত করতে চেয়েছিলেন। তখন না হয় মানলুম যে এই ব্যাপারটা অনেকের কাছে অভিনব ছিল বলে তাঁরা আপত্তি করেছিলেন—কিন্তু তার দশ বছর পরে এই ১৯৩৮ সালে ঢাকার মত প্রগতিশীল শহরেও যে আমাদের এই অভিনয়কে একদল মুষ্টিমেয় রক্ষণশীল সম্প্রদায় বাধা দেবেন এটা ভাবতেই পারিনি। বিশেষ করে যখন দেখলাম যে ঢাকার মেয়েরা যথেষ্ট প্রগতিশীল এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁদের অবদান অপরিসীম—সুতরাং একটা ছোট্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সঙ্কীর্ণতা দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। নগেন এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি আমায় বললেন যে এতে অবাক হবার কিছু নেই—সব জায়গাতেই কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়াশীল দল থাকে, আর এতো সামান্য কয়েকজন লোক মাত্র। এদের দেখে আমি যেন ঢাকা শহরকে বিচার না করি।

যাই হোক, তারপর তিনদিন 'শো' হলো—তিনদিনই 'হাউস ফুল' ছিল এবং সুন্দরভাবে এখানকার প্রোগ্রাম শেষ হলো। আমরা ঢাকায় যে কদিন ছিলাম, বহু বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গে মিলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সর্বত্রই আমরা যে সম্বর্ধনা ও আদর-আপ্যায়ন পেয়েছিলাম তাতে আমার ধারণা সত্যিই বদলে গেল। প্রত্যেকটি পরিবারের ছেলে-মেয়েদের ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করেছিল। কি করে যেন লোক-জানাজানি হয়ে গেল যে আমি মাছ খেতে খুব ভালবাসি। এরপর যাঁরা আমাদের লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করলেন তাঁরা বহু রকমের মাছ রান্না করে আমাদের খাওয়ালেন। এত বিভিন্ন প্রণালীর মাছ আর তেমনি অপূর্ব স্বাদ—সেকথা মনে হলে এখনও রসনা আর্দ্র হয়ে ওঠে।

শেষের কদিন আমরা এত সম্বর্ধনা ও আদর আপ্যায়ন পেয়েছিলাম যে, ঢাকা থেকে বিদায় নেবার সময় সকলেরই মনে একটু কষ্ট হয়েছিল।

ঢাকা থেকে ফিরে আসবার পর খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম—একটা

নতুন কিছু করতে হবে। কিন্তু কি করা যায়?...এতদিন তো আমরা গুরুগম্ভীর নাটক করে এলাম—অবশ্য তার মধ্যে নৃত্যগীতের প্রাধান্য তো ছিলই। কিন্তু ক্রমাগত একই ধরনের জিনিস পরিবেশন করলে দর্শকদের কাছে সি. এ. পির নায়ের আকর্ষণটা কমে আসবে—সুতরাং নতুন কিছু দেবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

'ওমর খৈয়ামে' তিমিরের সুরসৃষ্টির অভাবনীয় সাফল্য দেখে মনে মনে ভাবতে লাগলাম নৃত্যগীতকে পুরোভাগে রেখে এবং তাকেই সম্পূর্ণ প্রাধান্য দিয়ে একটি গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করার কথা। মন্মথর সঙ্গে আলোচনা চলতে লাগল নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে। ঠিক করলাম যে, এবারে গতানুগতিকতার বাইরে যেতেই হবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হলো রূপকথা থেকে রাজপুত্র, রাজকন্যা, যক্ষ প্রভৃতিকে নিয়ে গল্প লেখা হোক। তাই হলো—নাম দেওয়া হলো "রূপকথা"। রূপকথার ওপরই ভিত্তি করে নাটকের আখ্যানবস্তু গড়ে উঠল।

আমাদের ধারণা হলো যে এই ধরনের নাটক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে খুব জনপ্রিয় হবে। কারণ রূপকথার কাহিনী পড়তে তারা যেমন অসম্ভব ভালবাসে—আর যদি তাদের সেই আজব দেশের প্রিয় রাজপুত্র, রাজকন্যা, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, যক্ষরাজ অর্থাৎ দৈত্য, রাক্ষস-খোক্কস প্রভৃতিদের চোখের সামনে দেখে বিচিত্র সাজ-পোশাকে—তাহলে তাদের আরও ভাল লাগবে।

অহীনবাবু তো এযাবৎ বড় বড় গুরুগম্ভীর নাটকেই অভিনয় করে এসেছেন, কিন্তু এই হাল্কা ধরনের চরিত্রে নামতে রাজী হবেন কি! আমি যখন তাঁকে প্রস্তাব করলাম এই 'যক্ষরাজ' চরিত্রটিতে নামবার জন্যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন। তিনি বললেন যে চরিত্রটির মধ্যে নূতনত্ব আছে—আর তিনিও অনেকদিন একই ধরনের গুরুগম্ভীর চরিত্রে অভিনয় করে আসছেন—এবার একটু বৈচিত্র্য পেলে খুশী হবেন।

নাটক রচনা শেষ হলো। সঙ্গীত ও নৃত্যকে পুরোপুরি প্রাধান্য দেওয়া হলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সুধাংশু চৌধুরী প্রচুর অর্থব্যয়ে দৃশ্য-সজ্জার পরিকল্পনা করে দিল। যদিও একটিই দৃশ্য এবং তারই মধ্যে যত কিছু নাটকের ঘটনা—কিন্তু সেই 'সেট'টি অপূর্ব হয়েছিল শিল্পসৃষ্টি ও আজবদেশের পরিকল্পনার দিক থেকে। প্রায় ১৫ দিন ক্রমাগত রিহার্সালের পর "রূপকথা"কে পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থিত করা হলো ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৮ ফার্স্ট এম্পায়ার মঞ্চে। পুরো এক সপ্তাহ ধরে "রূপকথা" দেখান হলো।

সমস্ত দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির নাট্য-সমালোচকরা 'রূপকথা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। দর্শকদের মধ্যে যাঁরা প্রগতিশীল এবং নূতনত্বের প্রয়াসী তাঁরাও বিদেশী ধারায় উপস্থাপিত এই রূপকথাকে অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা যা আশা করেছিলাম তা হলো না। সাধারণ দর্শক ঠিকমত গ্রহণ করল না 'রূপকথা'কে। আমার মনে হয় তার একমাত্র কারণ হলো যে আমাদের দর্শকসমাজ গুরুগম্ভীর নাটকই বেশী পছন্দ করে—এ ধরনের হাল্কা fairy tale-এর তারা পক্ষপাতী নয়। "রূপকথা"য় তো নাটকীয় সংঘাতময় সিচুয়েশান বা করুণ রসের মাত্রাধিক্যে চোখের জলের প্রস্রবণ—এ সব কিছুই ছিল না—এতে ছিল শুধু নাচ, গান, হাসি হল্লোড়।

যদিও ফার্স্ট এম্পায়ারে 'রূপকথা' এক সপ্তাহ চলেছিল তবুও অর্থাগমের দিক অর্থাৎ যাকে বলে বক্স-অফিস—সেদিকটা মোটেই সন্তোষজনক হলো না। সত্যি কথা বলতে কি, প্রোডাকশানের আসল খরচটাই ওঠান গেল না। অবশ্য, সি. এ. পির অন্যান্য নাট্য-অবদানগুলির তুলনায় "রূপকথা"র খরচ একটু বেশীই হয়েছিল, বিশেষ করে 'সেটিংস', পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পাব্লিসিটিতে বহু টাকা খরচ হয়েছিল।

যাই হোক, প্রযোজক ও পরিচালক হিসাবে আমার একটা বিশেষ সান্ত্বনা এবং আনন্দ ছিল,—যদিও আমাকে এই নাট্য-প্রচেষ্টায় আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল তবুও সি, এ. পিই প্রথম কলকাতায় দর্শকদের মঞ্চে রূপকথা—যাকে বলে Fairy tale উপহার দিয়েছিল, যে জন্যে সমস্ত নাট্য-সমালোচকরা এবং প্রগতিশীল দর্শকরা এই অভিনব প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সমস্ত প্রচেষ্টাকেই লাভ এবং ক্ষতির নিক্তিতে ওজন করলে চলে না—কিন্তু নূতন শিল্পসৃষ্টিতে স্রষ্টা যদি আনন্দ পায় এবং সেই সঙ্গে শিল্প-রসিকদের জয়মাল্য তার লাভ হয়—এর থেকে বড় আনন্দ আর কি হতে পারে?

ইতিমধ্যে রাজভবন থেকে একটি অনুরোধ এল—

King Emperor's Anti-Tuberculosis Fund for India (Bengal)-এর জন্য একটি চ্যারিটি শো করবার। তদানীন্তন বাংলার রাজ্যপালের মিলিটারী সেক্রেটারী এই সঙ্গে জানলেন যে, লর্ড এবং লেডী ব্র্যাবোর্নের "রূপকথা" দেখার—কারণ তাঁরা 'রূপকথা' সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছেন এবং কাগজেও পড়েছেন। তাঁদের অনুরোধ অনুসারে ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে নিউ এম্পায়ারে "রূপকথা" মঞ্চস্থ করলাম। এই অভিনয়ে টিকিটের মূল্য বিশেষ বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও হাউসে একটি সীটও খালি ছিল না।

এর পর মিঃ হেযোদ প্রস্তাব করলেন যে, লাহোরে এবং দিল্লীতে সাধনা বসু ও তার ব্যালের নৃত্য-প্রদর্শনী মঞ্চস্থ করবার জন্যে।

ক্রমাগত 'শো' আর ঘোরাঘুরিতে আমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মিঃ হেযোদকে আমি বললাম, জানুয়ারী মাসটা আমরা আর কোন 'শো করব না— সুতরাং ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ থেকে লাহোরে এবং তারপর দিল্লীতে শো'র বন্দোবস্ত করতে।

ছায়া সিনেমার কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে আগের থেকেই কন্‌ট্রাক্ট হয়েছিল যে, ২৯শে এবং ৩০শে ডিসেম্বর 'রাজনটী' এবং ১লা জানুয়ারী ১৯৩৯ 'আলিবাবা' মঞ্চস্থ করব।

ব্যবস্থা অনুযায়ী ছায়া সিনেমায় ২৯শে ডিসেম্বর থেকে 'শো' আরম্ভ হলো। সাফল্যের বিষয় আর নতুন করে কিছু বলবার নেই—বিশেষ করে ১লা জানুয়ারী যেদিন 'আলিবাবা' মঞ্চস্থ হলো অতিরিক্ত সীটের বন্দোবস্ত করেও অনেক লোক ফিরে গেল টিকিট না পেয়ে—সুতরাং আর একদিন 'শো' বাড়াতে হলো।

এম্পায়ার থিয়েটারে 'রূপকথা'র দরুণ যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল, সেটা পূরণ হয়েও ছায়ার 'শো' থেকে বেশ কিছু লাভ হয়েছিল।

এর পর কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম। ক্রমাগত 'শো' এবং ঘোরাঘুরিতে মার কাছেও বেশী যেতে পারি নি বলে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছিল। এখন আবার নিয়মিত যাওয়া শুরু করলাম।

ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স তখন গৌরবের শীর্ষদেশে—কিছুদিন ধরে একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ (ন্যাশনাল থিয়েটার) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করছিলাম।

যখন আমার এই পরিকল্পনার কথা সি. এ. পির সভ্যরা এবং আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা জানতে পারল—তখন সকলেই আমায় উৎসাহ দিয়ে বলল: এখন সি. এ. পির যেমন সুনাম হয়েছে এই সময় তুমি যদি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর মধু নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবে।

এখন কোন 'শো' করবার তাড়া ছিল না—সুতরাং ভেবে-চিন্তে আমি একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা তৈরী করলাম।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ ছাড়াও আমার পরিকল্পনায় ছিল প্রধান শিল্পীদের জন্য আলাদা সাজঘর অন্যান্য শিল্পী ও নর্তক-

নর্তকীদের জন্যও আলাদা ড্রেসিং রুম থাকবে। এ ছাড়া সাজ-সজ্জার জন্য, সেটিং-এর জন্য, স্টেজ-'প্রপারটি'র জন্য, রিহার্সালের জন্যে, এবং মঞ্চ-সংক্রান্ত আরও যতগুলি বিভাগের দরকার—সমস্তর জন্য আলাদা আলাদা ঘর।

ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গমঞ্চের তিনটি প্রধান বিভাগ থাকবে: (ক) নাটক: এর সর্বময়কর্তা হিসেবে থাকবেন অহীনবাবু, (খ) নৃত্য: এর ভার থাকবে সাধনার ওপর এবং (গ) সঙ্গীতের ভার থাকবে তিমিরবরণের ওপর। এই তিনটি বিভাগেই সি. এ. পির নাটকগুলি রিহার্সাল ছাড়াও নতুন শিল্পীদের এই তিন বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে তৈরী করা হবে।

জাতীয় রঙ্গমঞ্চে সি. এ. পি. একটার পর একটা 'শো' মঞ্চস্থ করবে—এছাড়া সি. এ. পির শিল্পীদের নিয়ে ফিল্মও করা হবে, যেমন 'আলিবাবা' হয়েছিল।

এই পরিকল্পনার ভেতর একটি শিল্প বিভাগ থাকবে। যার ভার নেবে সুধাংশু চৌধুরী—এখানে দৃশ্যপট নির্মাণ, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি তৈরী হবে। এর সঙ্গে থাকবে আলোক বিভাগ—এটির ভার নেবে গীতা ঘোষ।

এ ছাড়া থাকবে একটি আধুনিক ক্যান্টিন—একটি আধুনিক লাইব্রেরী যাতে মঞ্চ এবং ফিল্ম সম্বন্ধীয় দেশী এবং বিদেশী মূল্যবান পুস্তক এবং এই সম্বন্ধে যেগুলি 'ক্লাসিক'—সেই সব পুস্তকের বিরাট সংগ্রহ থাকবে। খেলাধূলা এবং অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থাও থাকবে।

জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিষয়টি আমি সংক্ষেপে বললাম—কিন্তু আসলে পরিকল্পনাটি হয়েছিল খুব বিস্তারিতভাবেই এবং পরে সেটা ছাপানোও হয়েছিল। সেই মুদ্রিত কপি আজও আমার কাছে আছে।

১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে যখন এই জাতীয় নাট্যশালার পরিকল্পনা নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছিলাম তখন এমন একটা ঘটনা ঘটলো যার জন্যে সমস্ত পরিকল্পনাটাই তখনকার মত আমায় পরিত্যাগ করতে হলো।

এই সময় একদিন এক ভদ্রলোক আমায় ফোন করলেন। এঁর সঙ্গে আগে আমার কোনো পরিচয় ছিল না বা এঁর নামও আগে কোনদিন শুনিনি। ভদ্রলোকের নাম হলো সুরেন্দ্র দেশাই—ইনি আসছেন বোম্বায়ের সাগর মুভিটোন থেকে—আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

তিনি এলেন আমাদের চৌরঙ্গী প্লেসের ফ্ল্যাটে। এসে প্রস্তাব করলেন যে আমি ও সাধনা তাঁদের হয়ে বোম্বায়ে একখানি দোভাষী ছবি (হিন্দী ও বাংলা) করতে

রাজী আছি কি না। এর আগে আমরা যখন সি, এ, পি, দল নিয়ে বোম্বায়ে স্টেজ-শো করছিলাম তখন রঞ্জিত মুভিটোনের স্বত্বাধিকারী শ্রীচণ্ডুলাল শাহ আমাকে প্রস্তাব করেছিলেন ওখানে একখানি হিন্দি ছবি করতে রাজী আছি কিনা। তখন হিন্দি ছবি করতে রাজী হইনি। এখন শ্রীদেশাই প্রস্তাব করলেন হিন্দি ও বাংলা দোভাষী ছবির জন্য—বাংলা ছবির কথা শুনেই আমরা রাজী হয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গেই। একটা মোটামুটি সাধারণ চুক্তিও হয়ে গেল—যেটা অবশ্য কার্যকরী হবে গল্প মনোনয়নের পর। এ খবরটা তখন আমরা কাউকে জানালাম না। সুরেন্দ্রকে বললাম যে আর ক'দিন পরেই আমরা উত্তর-ভারত সফরে বেরুচ্ছি—ফিরে এসেই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি নাগাৎ আমি গল্প ঠিক করে নিয়ে বোম্বায়ে যাব তাদের শোনাতে।

সুতরাং জাতীয় নাট্যশালার পরিকল্পনা তখনকার মত ধামা-চাপা পড়ে গেল। কায়া থেকে আবার ছায়াতেই ফিরে এলাম। রূপালী পর্দার মোহ ও আকর্ষণ মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোককে ছাপিয়ে উঠল সাময়িকভাবে। কিন্তু যখন এ পরিকল্পনা কার্যকরী হোতে পারত সে সুযোগ আমার হাতের মুঠোর মধ্যে আসা সত্ত্বেও আমি সেটা হেলায় হারিয়েছিলাম। সেই কথাটাই বলব এখন—

১৯৩৭ সাল—ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। তখন আমরা "রাজনটী"র রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত। আসন্ন বড়দিনের সময় মঞ্চস্থ হবে ফাস্ট এম্পায়ারে।

এমন সময় ললিতা একদিন আমায় বলল যে তার বাবা মহারাজাধিরাজ বিজয়-চাঁদ মহতাব একটা বিশেষ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমায় দেখা করতে বলেছেন।

আমি গেলাম "বিজয় মঞ্জীলে"। অনেকদিন কাজকর্মের চাপে যেতে পারিনি—সুতরাং আমাকে দেখে তিনি খুব খুশী হলেন। কলকাতার নাট্যরসিকদের কাছে, সি. এ. পি যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার জন্য মহারাজা খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে তদানীন্তন ভারতবর্ষের ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো তখন কলকাতায় এসেছেন এবং মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোকে সি. এ. পি'র শো'র বিষয় বিশেষভাবে বলেছেন। এতে ভাইসরয় বেলভেডিয়ার লাটভবনে আমাদের একটি নাটকের অভিনয় দেখতে চান।

মহারাজাধিরাজার মঞ্চপ্রীতি ছিল অসাধারণ একথা আগেই বলেছি এবং তিনি ছিলেন আমার ও সাধনার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল যে আমাদের নিজস্ব একটি স্টেজ হয়—সারা বছর ধরে যাতে আমরা অভিনয় করে যেতে পারি। ভাইসরয় যদি আমাদের শো দেখে খুশী হন, তাহলে আমাদের নিজস্ব

থিয়েটার করার জন্ত যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন—সে অর্থ সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধে হবে না। মহারাজা আরও বললেন যে তিনি খুব শীগ্‌গিরই ভাইসরয়কে একটা ডিনার পার্টি দিচ্ছেন—সে পার্টিতে তিনি আমাকে ও সাধনাকে নিমন্ত্রণ করবেন। সেইখানেই বড়লাট সাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। তখনকার দিনে ভাইসরয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাকে লোকে একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার বলে মনে করত—কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি ও সাধনা এইসব কেতাদুরস্ত পার্টিতে যাওয়া পছন্দ করতাম না—সেজন্য যেতামও না বিশেষ। কিন্তু যিনি আমাদের এত ভালবাসেন, আমাদের জন্যে এতখানি করতে চলেছেন, তাঁর মুখের ওপর 'না' বলতে পারলাম না। মন থেকে না হলেও মুখে অন্ততঃ তাঁর কথায় রাজী হতে হলো।

দুর্ভাগ্যক্রমে ডিনারের দু-এক দিন আগে সাধনা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে যেতে পারল না। বাধ্য হয়ে আমাকে একাই যেতে হলো। ডিনারের পর মহারাজাধিরাজ ভাইসরয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। চমৎকার মানুষ ছিলেন লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো। আমি বড়লাটসাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলায় এবং তাঁদের সব আদবকায়দার সঙ্গে সম্যক পরিচিত না হওয়ায় মাঝে মাঝে 'Your Excellency' না বলে 'you' বলে ফেলেছিলাম। তাতে অবশ্য লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো কিছু মনে করেন নি, কিন্তু তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারী এবং অন্যান্য সকলে খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে আমার মুখের দিকে অস্বস্তিসহকারে তাকাচ্ছিলেন।

যাই হোক, প্রায় ১৫ মিনিট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন—বহু বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আলাপের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারীকে বলে দিলেন অবিলম্বে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং বেলভেডিয়ারে 'শো'র ব্যাপারে সমস্ত বিষয়টা পাকাপাকি করে ফেলতে।

তারপর দিন সকালে ভাইসরয়ের মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল ম্যাক্সওয়েল আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে দেখা করতে এলেন। এসে তিনি বললেন যে আমি যদি একবার Viceregal Lodge-এ গিয়ে যেখানে অভিনয় হবে সেখানটা দেখে আসি তাহলে বড় ভাল হয়। আমাদের কি দরকার না দরকার তার একটা বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারলে ভাল হয়।

আমি গেলাম বেলভেডিয়ারে ভাইসরিগ্যাল লজে। গিয়ে দেখি এর মধ্যে সমস্ত পরিকল্পনা পাকা হয়ে গেছে। তিনি আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন কোথায় অভিনয় হবে। আমার নির্দেশ অনুসারে ঠিক হলো কোথায় বিশেষ অতিথিদের

বসানো হবে। সাধনার জন্যে আলাদা ড্রেসিং রুম এবং অন্যান্য শিল্পীরা কোথায় মেক-আপ করবে তার জায়গা। তিনি আমায় ডাইনিং হলেও নিয়ে গেলেন যেখানে বিশেষ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা শো'র আগে ডিনারে বসবেন। আমি এবং সাধনা কোথায় বসব তাও তিনি আমাকে প্ল্যানে দেখিয়ে দিলেন অর্থাৎ সমস্ত জিনিসটাই পুরোপুরি কেতাদুরস্তভাবে নিয়ন্ত্রিত।

সত্যি কথা বলতে কি, মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদের কাছ থেকে অনুরোধ এলেও ভাইসরিগ্যাল লজে আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়কে নিয়ে গিয়ে 'শো' করার ব্যাপারটায় আমার মন বিশেষ সায় দিচ্ছিল না। আমি বেশ ইতস্তত করছিলাম অথচ তাঁর মুখের ওপর 'না'ও বলতে পারছি না। বেশ দোটানার মধ্যে পড়ে গেলাম।

সমস্ত ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটতে লাগল যে আমি কি করব স্থির করতে পারছিলাম না। আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে যতই চিন্তা করতে লাগলাম, ততই আমার মাথায় এই ধারণাটা বদ্ধমূল হতে লাগল যে কারুর বাড়ীতে দলবল নিয়ে গিয়ে 'শো' করাটায় নিশ্চয়ই সি. এ. পি'র সুনাম বৃদ্ধি করবে না—তা তিনি বড়লাটসাহেবই হোন আর যিনিই হোন। এদিকে আমাকে অবিলম্বে জানাতে হবে। শো'র দিন পর্যন্ত স্থির করা হয়ে গেছে।

আমি তখন সি. এ. পি'র প্রধান সভ্যদের এবং আমাদের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের নিয়ে এক আলোচনা বৈঠক ডাকলাম। সেই বৈঠকে ছিল—সাধনা, অহীনবাবু, মন্মথ, সুধাংশু, গীতা ঘোষ, হেমন্ত, জ্ঞানাঙ্কুর, জজি, এলা, বসন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো বেলভেডিয়ারে বড়লাটের ভবনে গিয়ে সি. এ. পি'র এই 'শো' করা উচিত কি না! বেশীর ভাগ সভ্যদেরই মত হলো যে এই 'বিশেষ শো' দিতে আপত্তি নেই, তবে সেটা একটা সত্যিকারের থিয়েটারের স্টেজে হোক, বেলভেডিয়ার লাট-ভবনে কেন? দু' একজন একথাও বলে উঠল: এ যেন মনে হবে আমরা যেন একটি যাত্রার দল বা ভ্রাম্যমাণ থিয়েট্রিক্যাল পার্টি। যেমনি কোন বড়লোক তাদের বৈঠকখানায় বা নাটমন্দিরে অভিনয় করতে ডাকল, আর অমনি আমরা ছুটলাম।

এই গেল কয়েকজনের মত, আবার কয়েকজন একথা বললেন যে বেলভেডিয়ার বড়লাট-ভবন তো আর যেখান-সেখান নয়, আর বড়লোকের বৈঠকখানাও নয় সুতরাং এতে অন্যায়টা কি আছে? তা ছাড়া এত বড় একটা সম্মান অন্য কোন নাট্য সম্প্রদায়ের ভাগ্যে ঘটেনি, আর ঘটবে কি না সন্দেহ ইত্যাদি।

যা হোক—শেষে অনেক তুমুল তর্কবিতর্কের পর বেশীর ভাগ সভ্যদের মত হলো

যে এই শো'টাকে এখনকার মত যে কোন উপায়ে মুলতুবী রাখতে হবে। অবশ্য সরাসরি প্রত্যাখ্যান করাটা খুব খারাপ দেখাবে, সুতরাং এমন কোন উপায় বার করতে হবে যাতে সাপও মরে, অথচ লাঠিও না ভাঙে। কিন্তু এই শেষমুহূর্তে কিভাবে শো-টাকে এখন ধামা-চাপা দেওয়া যায়? খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম।

চিন্তা করতে করতে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা উপায়ও বেরিয়ে পড়ল। ফার্স্ট এম্পায়ারে 'রাজনটী' অভিনয়ের জন্য এক সপ্তাহ আমাদের হাউস বুক করা ছিল ১৯৩৭ ডিসেম্বরের শেষ থেকে ১৯৩৮ জানুয়ারীর প্রথম কয়েকদিন পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারী ক: ম্যাক্সওয়েল একটা দিন ধার্য করেছিল—এই হলো উপায়। জজিকে বললাম, কেটে বেরিয়ে আসবার এই হলো ফাঁকতাল। এই তারিখের সংঘর্ষকেই ভিত্তি করে আমাদের সানুনয় প্রত্যাখ্যান জানাতে হবে।

জজির আনন্দ আর তখন দেখে কে? সে সেইদিন রাত্রেই ভাইসরয়ের মিলিটারী সেক্রেটারীকে যে চিঠি লেখা হবে তার খসড়া করে ফেলল। চিঠিতে লেখা হলো যে ফার্স্ট এম্পায়ার থিয়েটারের সঙ্গে পূর্বের চুক্তি অনুসারে বর্তমানে বড়লাটভবনে গিয়ে শো করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না, যেহেতু পূর্ব নির্ধারিত তারিখ পরিবর্তন করা গেল না। ইতিমধ্যে সব 'শো'গুলির জন্য বহু অগ্রিম টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ বেলভেডিয়ার বড়লাটভবনে গিয়ে অভিনয় করতে পারলাম না বলে আন্তরিক দুঃখিত। এজন্য যেন আমাদের মার্জনা করা হয় ইত্যাদি।

এই সঙ্গে আমরা চিঠিতে আরও লিখেছিলাম যে আমরা তো ৭ দিন ফার্স্ট এম্পায়ারে 'শো' করছি এর মধ্যে যে-কোনো একদিন মহামান্য বড়লাট বাহাদুর আমাদের শো দেখতে এলে সি. এ. পি. নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করবে।

এই কথা লেখায় অনেকে আমায় বললে: তাদের নিমন্ত্রণ তুমি প্রত্যাখ্যান করলে —এখন উল্টে তাদেরই আবার নিমন্ত্রণ করছ তোমার 'শো' দেখবার জন্যে? দেখো, ব্যাপারটা হয়তো ওঁরা খুব সুনজরে দেখবেন না!

কিন্তু আমার চিঠি পাবার পর বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারী কর্নেল ম্যাক্সওয়েল আমায় টেলিফোন করে জানালেন: আপনার নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ কিন্তু বড়লাট বাহাদুর এখন প্রত্যেকদিনই সন্ধ্যার সময় খুব ব্যস্ত থাকবেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। তবে তাঁর ছেলেমেয়েরা একদিন দেখতে যাবেন। আপনাকে যথা সময়ে জানাব কোন দিন এবং ক'জন যাবেন।

সত্যিই কর্নেল ম্যাক্সওয়েল লোকটি খুব ভদ্র এবং বিবেচক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পূর্ব চুক্তির জন্যেই আমরা বড়লাটভবনে শো করতে পারিনি।

যাই হোক, একদিন 'রাজনটী' দেখতে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো'র ছেলেমেয়েরা, কর্নেল ম্যাক্সওয়েল, ভাইসরয়ের এ. ডি. সি. এবং আরও অনেকেই, প্রায় ৮।১০ জন হবেন—সকলে এসেছিলেন—

এর কয়েকদিন পরে ললিতা আমাদের ওখানে এসে বলল যে মহারাজাধিরাজ আমাকে একবার ডেকেছেন কি বিশেষ কথা আছে। আমি তখনই বুঝতে পারলাম যে তিনি কেন ডেকেছেন। তিনি যে কতটা মর্মাহত হয়েছেন তাও বুঝতে পারলাম। যাই হোক, তিনি যখন ডেকেছেন তখন আমার যাওয়া উচিত মনে করে আমি গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই বুঝতে পারলাম যে তিনি বেশ বিরক্ত হয়েছেন। তিনি অনেক কথাই বললেন আমাকে যার মর্মার্থ হলো: তোমার এবং সাধনার যাতে ভাল হয় তাই আমি করতে গিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম যে এই শো-তে অনেক বড় বড় ধনী ব্যবসায়ী উপস্থিত থাকবেন আর ভাইসরয়ের অভিনয় ভাল লাগলে, তাঁর মুখের একটা কথায় বহু লোক তোমাকে একটা স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণের জন্য যাবতীয় খরচ বহন করতে এগিয়ে আসবেন। এখন তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করলে।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। চুক্তি যদি সত্যি হয়ে থাকে তা সে যত আগে এবং যেরকম চুক্তিই হয়ে থাকুক না কেন আমরা যে ফার্স্ট এম্পায়ারের কর্তৃপক্ষকে বলে কয়ে একটা দিন আগে-পিছু বা রদবদল করতে পারতাম না—এটা তিনি বিশ্বাসই করলেন না।

তাঁর শেষ কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজছে: তোমাদের এই সব বাজে ধারণা, অর্থহীন আত্মসম্মানজ্ঞানই তোমাদের কাল হবে। নিজেদের স্বার্থ তোমরা নিজেরা বুঝলে না—এতে আমি আর কি করতে পারি বল। আজ যদি সি. এ. পি'র একটা নিজস্ব থিয়েটার হতো তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটি চিরকাল বেঁচে থাকত আর বাংলার মঞ্চজগতকে তোমরা অনেক কিছু দিতে পারতে। কিন্তু তা তো তোমরা করবে না। খালি স্টেজ ভাড়া করে বছরে দুটো, তিনটে শো করবে। এতে কি কখনও কোনো প্রতিষ্ঠান দাঁড়ায়? খুব ভুল করলে মধু, খুব ভুল করলে। একদিন বুঝবে।

আজও আমার মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই কি আমি ভুল করেছিলাম? অবশ্য

বর্ধমানের মহারাজা ঠিকই বলেছিলেন—হয়ত সি. এ. পি'র নিজস্ব একটা থিয়েটার হতে পারত। কিন্তু নিজের স্বার্থের উপরে আমি সি. এ. পি'র সম্মানকে স্থান দিয়েছিলাম—তাকে কি মিথ্যা আত্মসম্মানের দম্ভ বলা যায় ?

আগেই বলেছি যে, বম্বের সাগর মুভিটোনের সঙ্গে একটা মোটামুটি চুক্তি হয়েছিল একখানি দোভাষী ছবি (হিন্দী ও বাংলা) করবার জন্যে। চুক্তিটি অবশ্য কার্যকরী হবে গল্প মনোনয়নের পর।

সুতরাং ঠিক করেছিলাম যে, জানুয়ারী মাসে আর কোন 'শো' নয়—মন্মথর সঙ্গে বসে গল্পটি ঠিক করব এবং পুরোপুরি বিশ্রাম নেব।

কিন্তু বিশ্রাম চাইলেই কি বিশ্রাম পাওয়া যায় ?

একদিন আমাদের এক পুরোন বন্ধু কিশ্ নৌরজী এল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তার ডাকনাম ছিল 'কিশ্' এবং সকলের কাছে সে 'কিশ্' নৌরজী নামেই পরিচিত। 'কিশ্' ছিল বিখ্যাত দেশনেতা দাদাভাই নৌরজীর পৌত্র এবং জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর একজন খুব উচ্চপদস্থ কর্মচারী। 'কিশ্'-এর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় কলকাতায় মাণেক ও তার স্ত্রী জেরু পাওয়ালার মাধ্যমে। মাণেক ও জেরু আমাদের সি, এ, পি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। জেরু ও তার বোন সুনু, সি. এ. পি'র ব্যালেতে অংশগ্রহণ করত। মাণেক পাওয়ালাও টাটা কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, 'কিশ্' নৌরজী এসে জামসেদপুরে আমাদের 'শো' করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করে বসল। 'কিশ' প্রায়ই কলকাতায় আসত এবং সি, এ, পি'র বেশীর ভাগ শো-ই সে দেখেছে। তার একান্ত ইচ্ছে যে, জামসেদপুরে আমরা "ওমরের স্বপ্নকথা" ও "বিদ্যুৎপর্ণা" মঞ্চস্থ করি। সে আমাদের এও জানাল যে, আমাদের কোন কিছু ভাবতে হবে না। হাউস বুক করা, আমাদের দলের থাকা, খাওয়া সমস্ত বন্দোবস্ত সে করে দেবে। এমনকি টিকিট বিক্রির বিষয়ও আমাদের ভাবতে হবে না—কারণ শোর সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাদেরই। আমরা শুধু যাব, অভিনয় করব এবং একটা মোটারকম থোক্ টাকা পাব।

প্রস্তাবটি লোভনীয় সন্দেহ নেই। তবু আমি 'কিশ'কে বললাম যে, গত দু' মাস ক্রমাগত 'শো' করে, ঘোরাঘুরি এবং পরিশ্রমে আমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, সেইজন্যে আমরা জানুয়ারী মাসটা পুরো বিশ্রাম চাই।

সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। তার যুক্তি হলো: কলকাতায় থেকে কি কখনও

বিশ্রাম করা যায়? কোন 'শো' বা অন্য কোন কাজকর্ম না করলেও ফারপো, লেক্‌ ক্লাব এবং যাত্রে ৩০০ ক্লাব—এসবের আকর্ষণ কাটিয়ে কি কখনও বিশ্রাম হয়? তারচেয়ে জামসেদপুরে চল, সেখানে বিশ্রামকে বিশ্রামও হবে আর তার থেকে বড় কথা তোমাদের একটা চেঞ্জও হবে—যেটা তোমাদের খুব দরকার। আর সেই সঙ্গে কিছু ভাল অর্থাগমও হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত 'কিশ'-এর অনুরোধ এড়ান গেল না। ঠিক হলো জানুয়ারীর মাঝামাঝি আমরা জামসেদপুরে যাব। ইতিমধ্যে মিঃ হেমাদ ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ থেকে লাহোর ও দিল্লীতে 'সাধনা ও তার ব্যালে'র 'শো'র বন্দোবস্ত পাকাপাকি করে ফেলেছে।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি সদলবলে জামসেদপুরে গেলাম, সেখানে, 'মিলনী হাউসে' আমরা শো করলাম, "ওমরের স্বপ্নকথা" ও "বিদ্যুৎপর্ণা"। স্যার আর্দেশীর দালাল এবং তাঁর পরিবার, টাটার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কীনান ও তাঁর পরিবার, মিঃ জাহাঙ্গীর গান্ধী, মিঃ কে, এম, ম্যাডান প্রভৃতি টাটা কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা আমাদের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন।

অভিনয় করার কথা ছিল দু-দিন কিন্তু দ্বিতীয় দিন টিকিট না পেয়ে এত লোক ফিরে গিয়েছিল যে, আর একদিন শো বাড়াতে হলো।

মিঃ জাহাঙ্গীর গান্ধী তাঁর বাড়ীতে আমাদের এক ভোজ দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন।

আসবার সময় 'কিশ'কে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম: তুমি ঠিকই বলেছিলে 'কিশ'—ভাল চেঞ্জও হলো আর সেই সঙ্গে কিছু রোজগারও হলো।

কলকাতায় ফিরে এসে উত্তরভারত সফরের ব্যবস্থা শুরু হলো। জানুয়ারীর শেষদিকেই হেমন্তকে পাঠিয়ে দিলাম লাহোর—পাবলিসিটির জিনিসপত্র নিয়ে।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা সদলবলে লাহোরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। প্রায় ২৬ জন লোক নিয়ে এই দল। আমি ও সাধনা ছাড়া দলে ছিল তিমিরবরণ ও তার যন্ত্রীরা, মাধব মেনন ও অন্যান্য ছেলে ও মেয়ে নৃত্যশিল্পীরা, প্রোডাকশন ম্যানেজার, সহকারী, মঞ্চ-ব্যবস্থাপক প্রভৃতি।

৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ থেকে লাহোরের প্লাজা (Plaza) সিনেমায় সি. এ. পির শো শুরু হলো "সাধনা বসু ও তার ব্যালে" নাম দিয়ে। অর্থাৎ প্রোগ্রামে শুধু নৃত্যই থাকবে—কোন নাটকাভিনয় থাকবে না। প্লাজা সিনেমায় চার দিন শো হলো। প্রত্যেকদিন অতিরিক্ত সীটের বন্দোবস্ত করেও অনেক লোক ফিরে গেল টিকিট না পেয়ে। আমাদের চার দিন শো-র পর প্লাজা সিনেমায় ফিল্ম দেখাবার ব্যবস্থা

আগের থেকেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল—সুতরাং লাহোরের রিগ্যাল সিনেমায় আরও তিন দিন এই প্রোগ্রাম চলল। এর পর সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে হলো দিল্লীতে। এখানে রিগ্যাল সিনেমায় আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হলো ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে চার দিনের জন্য।

লাহোর এবং দিল্লী দু জায়গাতেই হলো যথারীতি অভাবিত সাফল্য।

ক-একটি নামকরা পত্রিকা যা বলেছিলেন তার মধ্য থেকে ক-একটি এখানে দিলাম :—

"......The repeated applause which greeted the outstanding items in the programme testified to Lahore's appcreciation of the art of Sadhona Bose and the Calcutta Art Players . ... It is really a work of art...... ."

"The Tribune"
Lahore. 9.2.39.

"......numbers in Sadhona Bose's Ballet are provided momemnts of escape from reality into the world of poetry...... .."

"Civil and Military Gazette".
Lahore. 10.2.39.

"......Sadhona Bose's ballet now at the Regal Theatre, is the most lovely that has been seen in Delhi since Pavlova visited us. In colour, composition and movement, it is the equal of Russian ballet at its best ....Sadhona's dancing is a dream of beauty.... ....."

"Statesman"
Delhi. 10.2.1939.

"......Of the dancers who had come to Delhi in recent years, Sadhona Bose is perhaps the greatest and the most beautiful exponent of the art .....The visiting company, Calcutta Art Players, under the leadership of Mr. Modhu Bose, the well-known stage and film director and sponsor of the C.A.P., have earned a distinctive name for themselves as the most advanced and unique stage organisation in India today."

"Hindusthan Times".
Delhi. 15.2.1939.

ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। আমাদের এই সাফল্যে মা খুবই খুশি হলেন এবং আশ্চর্যের বিষয়, মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব যে-কথা বলেছিলেন, তিনিও সেই কথাই বললেন অর্থাৎ যদি আমাদের নিজস্ব একটা স্টেজ থাকত!

এখনও পর্যন্ত বোম্বাই যাবার খবরটা মার কাছে ভাঙতে পারিনি। যখনই বলব-বলব মনে করেছি, তখনই মার মুখের দিকে চেয়ে আর বলতে পারিনি।

ভেবেছি যে, পরে বলব। এইভাবে ক্রমশঃ দিন চলে যেতে লাগল এবং বম্বে যাবার সময়ও ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল। এদিকে মন্মথও একটি গল্পের কাঠামো তৈরি করে ফেলল।

সুতরাং আর তো না বললে চলে না—একদিন বোম্বাই-এর নতুন কণ্ট্রাক্টের বিষয় মাকে বলতেই হলো। আর এও তাঁকে বললাম যে, বোম্বাই যাবার আমাদের প্রধান আকর্ষণ সেখানে একখানি দোভাষী ছবি (বাংলা ও হিন্দী) করবার প্রস্তাব পেয়েছি। বাংলাদেশে 'আলিবাবা' ও 'অভিনয়' করে আমরা যথেষ্ট সুনাম পেয়েছি, এখন যদি একটা হিন্দী ছবি আমাদের 'হিট' হয়, তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষে সুনাম ত' পাবই এবং টাকার দিক থেকেও অনেক বেশি রোজগার করতে পারব।

আমাকে ও সাধনাকে তিনি আশীর্বাদ করে বললেন: ভগবান করুন তোমাদের আরও নাম হোক, জীবনে আরও উন্নতি হোক তোমাদের। কিন্তু মুখে তিনি আনন্দ প্রকাশ এবং আশীর্বাদ করলেও আমি বেশ আন্দাজ করতে পারলাম, মার মনের অবস্থা। আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় তাঁর মনটি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিকে আমি মন্মথকে সঙ্গে করে নিয়ে বোম্বাই রওনা হলাম গল্পটিকে মনোনয়ন করবার জন্যে।

বোম্বেতে আমি আর মন্মথ গিয়ে উঠলাম ম্যাজেষ্টিক হোটেলে। হোটেলে উঠেই আমি সুরেন্দ্র দেশাই-এর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম। সুরেন্দ্র বোম্বাই-এ বুলবুল নামে পরিচিত। টেলিফোনে আমার খবর পেয়েই বুলবুল তার বাড়িতে আমাকে ও মন্মথকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করল।

যথাসময়ে বুলবুলের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেই সেখানে তার বাবা শ্রীচিমনলাল দেশাই-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। চিমনভাই তখন সাগর মুভিটোনের মালিক। শ্রীচিমনভাই-এর ছোট ভাই শ্রীঈশ্বরভাই দেশাই-এর সঙ্গেও আলাপ হলো। শ্রীচিমনভাই আমাদের বোম্বের শো দেখেছিলেন এবং তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। সেই সম্বন্ধে অনেক কথা হলো। খুব চমৎকার মানুষ এই চিমনভাই—অতবড় সাগর মুভিটোন কোম্পানীর মালিক কিন্তু অত্যন্ত নিরহঙ্কারী। তাঁর এই সহজ সরল ব্যবহার আমার খুব ভাল লাগল।

যাক, খাওয়া-দাওয়া হলো—একেবারে পুরোপুরি নিরামিষ গুজরাটি স্টাইলে। চিমনভাই ঠাট্টা করে বললেন: তোমরা বাঙালী, মাছ না হলে তো তোমাদের খাওয়াই হয় না। আমার তো মনে হয় তোমাদের পেটই ভরলো না।

আমি কিন্তু এই প্রথম গুজরাটি খানা খাচ্ছি—আর বলতে বাধা নেই—খেতে

ভালই লাগল এবং বেশ তৃপ্তি করে খেলাম। খাওয়ার পর সেদিন চলে গেলাম, পরদিন একটা সময় ঠিক করে—যখন গল্পটির কাঠামো পড়ে শোনানো হবে। গল্পটির নাম হলো 'ঝুমঝুম দি ড্যান্সার'।

পরদিন গল্পের কাঠামো শোনানো হলো—সঙ্গে সঙ্গেই ওঁদের খুব পছন্দ হয়ে গেল। চিমনভাই তাঁর সলিসিটরদের নির্দেশ দিলেন চুক্তিপত্র তৈরি করতে। সবই বেশ সুন্দরভাবে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ রৌদ্র-ঝলমল আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ দেখা দিল।

যেদিন চুক্তিপত্রে সই হবে তার ঠিক একদিন আগে বুলবুল আমাকে টেলিফোন করে বলল—বাবা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, বিশেষ দরকার আছে।

আমি যেতেই চিমনভাই বললেন: শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স থেকে আমরা একটা চিঠি পেয়েছি যে, আপনি ও মিসেস বোস নাকি পরের ছবির জন্যে তাঁদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ! এক্ষেত্রে আপনারা যদি অন্য কোন কণ্ট্রাক্ট সই করেন, তবে সেটা বে-আইনী হবে।

শুনে আমি তো বেশ বিব্রত বোধ করলাম। যদিও কলকাতা থেকে যখন রওনা হই, তখন এইরকম যে একটা কিছু ঘটতে পারে—এই ধরনের একটা সন্দেহ মনে হয়েছিল। তাই 'অভিনয়ে'র সময়ে ভারতলক্ষ্মীর সঙ্গে যে কণ্ট্রাক্ট হয়েছিল, সেটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

যাই হোক, বেশ একটু বিপদেই পড়লাম। বোম্বেতে তো কাউকেই চিনি না যার কাছে গিয়ে কোন পরামর্শ করা যেতে পারে। আর এ-সব ক্ষেত্রে একজন আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াটাই বিধেয়। কি করা যায় এখন—! এ-বিষয়ে ভেবে যখন কোন কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না, তখন হঠাৎ মনে পড়ল সিসিলির কথা। সিসিলি হলো বোম্বায়ে রয়টারের প্রতিনিধি ৺এ. সি. চ্যাটার্জির মেয়ে। আসল নাম তার সুশীলা—কিন্তু পাশ্চাত্য ও প্রগতির জৌলুস মেখে দাঁড়িয়েছে সিসিলি। অনেক বছর আগে সিসিলির সঙ্গে কলকাতায় আমার আলাপ হয়েছিল। সিসিলির স্বামী হচ্ছেন বর্তমান এটর্নী জেনারেল মিঃ সি. কে. দাফতারী, তখন ব্যারিস্টার হিসেবে বোম্বেতে বেশ নাম করেছেন। সিসিলিকেই তখন অকূলের কূল বলে মনে হলো—ফোন করলাম তাকে। সিসিলি আমাকে সেইদিন ডিনারে নিমন্ত্রণ করলো।

গেলাম ডিনারে। সিসিলি তার স্বামী মিঃ দাফতারীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। চমৎকার লোক এই মিঃ দাফতারী, অদ্ভুত ভালো ব্যবহার। সত্যিই আমার

খুব ভালো লাগল ভদ্রলোককে। ডিনারের পর আমি তাঁকে বললাম আমার এই বিপদের কথা।

তিনি বললেন: আপনি কাল সকালে আমার চেম্বারে আসুন ভারতলক্ষ্মীর কণ্ট্রাক্টটা নিয়ে। আমি কণ্ট্রাক্টটা পড়ে দেখি—তারপর এ-বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

পরদিন চেম্বারে যেতে মিঃ দাফতারী কণ্ট্রাক্টটি পড়ে বললেন: আমার মতে এই কণ্ট্রাক্ট অনুযায়ী আপনার বা মিসেস বোসের সঙ্গে ভারতলক্ষ্মীর কোন আইনগত বাধ্য বাধকতা নেই। যাতে সাগর মুভিটোনের সঙ্গে আপনাদের কণ্ট্রাক্ট সই না হয় সেই জন্যে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে এই চিঠি দিয়েছে। তবুও আমি একবার এই কণ্ট্রাক্টটি স্যার চিমনলাল শীতলবাদকে দেখিয়ে তাঁর মতামত আপনাকে জানাব।

স্যার চিমনলাল শীতলবাদ তখন বোম্বায়ের অ্যাডভোকেট-জেনারেল। তাঁর মতামত পাওয়া তো খুব সৌভাগ্যের কথা। তাঁর পরামর্শ ও মতামতের থেকে নির্ভরযোগ্য আর কি হতে পারে? আমি মিঃ দাফতারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

মিঃ দাফতারীর সঙ্গে যা আলোচনা হয়েছিল, সব এসে বললাম চিমনভাই দেশাইকে। তিনিও সব শুনে বললেন: মিঃ দাফতারী এখন বোম্বের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম। মিঃ দাফতারীর সঙ্গে আমিও একমত। আমারও ঠিক ঐ কথাই মনে হচ্ছে, যাতে এই কণ্ট্রাক্টটা সই না হয়, সেই জন্যেই ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স এই রকম একটা অ্যাটর্নীর চিঠি দিয়েছে। আচ্ছা, স্যার শীতলবাদ কি বলেন শোনা যাক।

মিঃ দাফতারী বলেছিলেন দুদিন পরে ফোন করে খবর নিতে। দুদিন পরে তাঁকে ফোন করতেই তিনি বললেন: আজ চিমনলাল শীতলবাদের চেম্বারে সন্ধ্যার সময় আসুন। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে রেখেছি। আমি আপনাকে যা বলেছি, তিনিও আমার সঙ্গে একমত। আপনি আপনার প্রোডিউসার মিঃ দেশাইকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। স্যার শীতলবাদের মতামতটা তিনি নিজের কানে শুনে আশ্বস্ত হতে পারবেন।

সেইমত আমি চিমনভাইকে সঙ্গে করে স্যার চিমনলাল শীতলবাদের চেম্বারে গেলাম সন্ধ্যার সময়। স্যার শীতলবাদ স্পষ্টই বললেন যে ভারতলক্ষ্মীর যা কণ্ট্রাক্ট আছে, তাতে অন্য প্রোডিউসারের সঙ্গে কোন ছবির কণ্ট্রাক্ট করলে ভারতলক্ষ্মী

কিছুই করতে পারবে না। তাদের সঙ্গে আমার ও সাধনার যে পরবর্তী ছবি করতেই হবে এমন কোন আইনগত বাধ্য-বাধকতা নেই।

এইবার চিমনভাই আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে আমার ও মন্মথের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা হয়ে গেল। আমরা কলকাতা চলে এলাম—কথা হয়ে গেল যে, আমরা সকলে মার্চের মাঝামাঝি সময়ে বোম্বাই চলে আসব।

কলকাতা ফিরে এসেই বোম্বে যাবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। কি জানি কেন ঠিক করে বসলাম যে, আমাদের যতকিছু আসবাব আছে, সবই বোম্বে নিয়ে যাব। এতে জ্ঞানাঙ্কুর, জজি এরা সবাই বলতে লাগল: সব জিনিসপত্র নিয়ে যেও না। অন্তত চৌরঙ্গী প্লেসের ফ্ল্যাটটা ছেড়ো না। বোম্বেতে তো আর চিরদিনের জন্য যাচ্ছ না। আবার যখন ফিরে আসবে তখন আর ও-রকম ফ্ল্যাট পাওয়া মুস্কিল হবে। ফাস্ট এম্পায়ারের পাশে, কলকাতার মধ্যিখানে সবচেয়ে সেরা জায়গায় চারখানা ঘরের ফ্ল্যাট পাওয়া সোজা কথা নয়। তখন তার ভাড়া ছিল মাত্র মাসিক ১৫০ টাকা যেটা এখনকার দিনে রূপকথা বলেই মনে হবে। আর তার চেয়েও বড় কথা ছিল যে, সে-ফ্ল্যাটটি আমাদের খুব পয়মন্ত ছিল। পরপর এতগুলো সাফল্যজনক সি. এ. পি.-র মঞ্চ প্রচেষ্টা, তার ওপর দুটো 'হিট' ছবি—'আলিবাবা' ও 'অভিনয়' সবই এই ফ্ল্যাটে থাকতেই হয়েছে।

অহীনবাবু তাঁর বিরাট অভিজ্ঞতার আলোয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, এইসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে। তাই তিনি আমাদের বোম্বে যাত্রার ঠিক আগে দেখা করতে এসে যা বলেছিলেন, তা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে।

তিনি তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন: বোম্বেতে Double-version ছবি করতে যাচ্ছেন, এটা খুবই আনন্দের কথা। এতে নামও হবে, পয়সাও হবে কিন্তু—

আমি বললাম: কিন্তু কি অহীনবাবু?

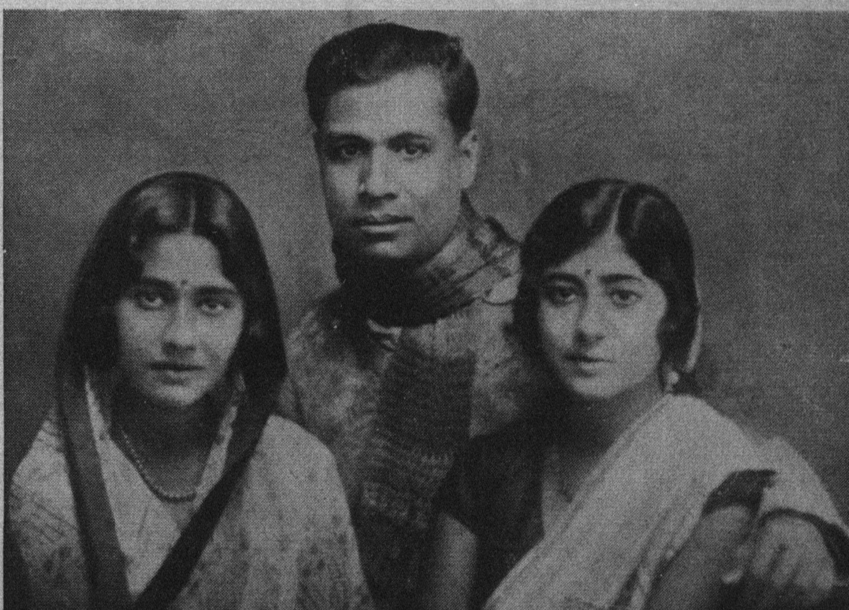
তিনি ম্লান হেসে বললেন: নিজের হাতে গড়া এতদিনের একটা প্রতিষ্ঠান সি, এ, পি এইভাবে ভেঙ্গে দিলেন!

তাতে আমি বলেছিলাম: সি, এ, পি ভেঙ্গে যাবে কেন? যাচ্ছি তো শুধু ৭।৮ মাসের জন্য, ফিরে এসে আবার সি, এ, পি-কে জাগিয়ে তুলব। আপনি হয়ত জানেন না অহনীবাবু, স্টেজই হলো আমার প্রাণ—এ আমি কখনও ছাড়িতে পারি?

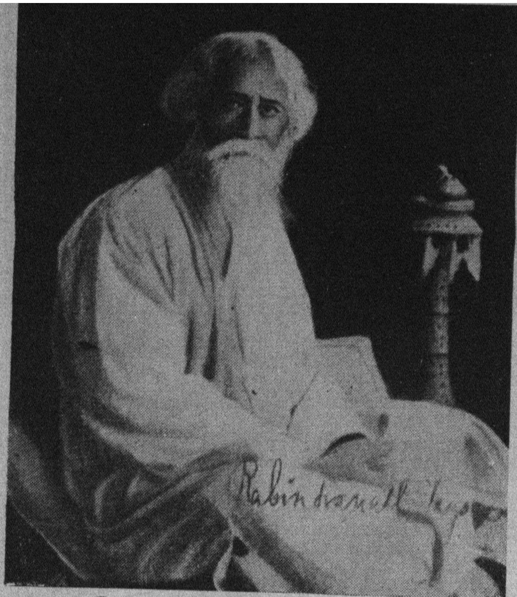
অহীনবাবু মুখে কিছু বললেন না—শুধু একটু হাসলেন। অহীনবাবু সত্যিই সি, এ, পি-কে ভালবেসেছিলেন, তা না হলে সি, এ, পি-র কাছ থেকে তিনি আর



ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়



সাধনা, লেখক ও সাধনার কনিষ্ঠা ভগিনী নীলিনা—দার্জিলিং-এ ১৯৩২ সাল।



কল্যাণীয় মুকুলকে আশীর্বাদ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



গুরুদেব 'দালিয়া'র পাণ্ডুলিপি সংশোধন ক'রে দিচ্ছেন।



'দালিয়া' নাটকে [১৯৩৩] 'তিন্নির' ভূমিকায় সাধনা বসু এবং জুলেখার ভূমিকায় মীরা হালদার।



'জেরিনা' নাটকের একটি দৃশ্যে সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় [বেগম সোফিয়া] ও মহারাজ কুমারী ললিতা রাণী [কুলসম]



'আলিবাবা'য় নীলিনা সেন [সাকিনা] ও সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় [ফতিমা]



"আলিবাবা"র সি. এ. পি. ব্যালে



'সেলিমা' ছবির (১৯৩৫) একটি দৃশ্যে নায়ক গুল হামিদ ও নায়িকা মাধবী



'সেলিমা'র একটি দৃশ্যে রাধাবাঈ, মাধবী, মজহর খাঁ ও অপর একজন শিল্পী।



'আলিবাবা'য় সাধনা বসু [মর্জিনা] ও প্রীতিকুমার মজুমদার [বাবা মুস্তাফা]



'আলিবাবা' ছবির একটি দৃশ্য !



'আলিবাবা'য় বিভূতি গাঙ্গুলী [আলিবাবা] ও সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় [ফতিমা]



'আলিবাবা'য় কমল বিশ্বাস [কাসিম] ইন্দিরা রায় [সাকিনা] ও মধু বসু [আবদাল্লা]



সাধনা বসু ঃ 'মন্দির' নাটকে দেবদাসী মঞ্জুলা রূপে



'মন্দির' নাটকে সি.এ.পি. ব্যালে

বাঁ দিক থেকে—শান্তা দত্ত, সান্ত্বনা বসু, লতা দত্ত, মঞ্জু দে, অনিমা রায়, অমিতা গুপ্ত, বিনীতা গুপ্ত, অনীতা গুপ্ত, বিনীতা দে।



"বিদ্যুৎপর্ণা" নাটকের একটি দৃশ্যে সাধনা বসু [বিদ্যুৎপর্ণা] ও মধু বসু [ইন্দ্রজিৎ]



ঢাকা সফরে সি-এ-পি'র সম্প্রদায় (১৯২৮) মধ্যে বসে আছেন ঃ
(বাঁ দিক থেকে) বিভূতি গাঙ্গুলী, তিমির বরণ, মধু বসু, সাধনা বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী ও মণিমালা।

এমন কি টাকা পেতেন ? অন্য থিয়েটারের সঙ্গে তুলনা করলে এটা কিছুই নয়। তার ওপর তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা তখন একেবারে শীর্ষে। তখন তাঁর একার নামেই যে-কোন স্টেজে 'হাউস ফুল' হয়ে যেত—এইরকম জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর।

সি, এ, পি-র জন্য কেন তার এই সমবেদনা ও সহানুভূতি ? কারণ, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের বিরাট ভবিষ্যৎ আছে এবং হয়ত এমন দিন আসবে যখন সি, এ, পি-র নিজস্ব একটা থিয়েটার হবে। তাই অহীনবাবু, তিমির বরণ ও অন্যান্য শিল্পীরা সি, এ, পি-কে তাঁদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন।

আস্তে আস্তে যাবার দিন এসে গেল। আসবাবপত্র যা ছিল, সব একে একে রেলে মালগাড়ীতে বুক করে দিলাম। আমার 'হিলম্যান' গাড়ীখানিও বোম্বে নিয়ে গেলাম, সেটি 'গুডস'-এ বুক করে দিলাম। এই গাড়ীখানা কিনেছিলাম 'আলিবাবা' করার সময়।

যত যাবার দিন এগিয়ে আসতে লাগল ততই যেন মনে হতে লাগল যে, একটা সুখের সংসার ভেঙে চলে যাচ্ছি। তখন সি, এ, পি ছিল যেন সত্যি একটা সুখী পরিবার। সি, এ, পি-র সকল সদস্য এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আমাদের চলে যাওয়ার আঘাতটা খুব বেশী করে বেজেছিল জানতাম, কিন্তু যেটা আমি জানতে পারিনি বা বুঝতে পারিনি, আর না বোঝার জন্যে আমি আজও নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না যে, কত বড় আঘাত আমি মাকে দিয়েছিলাম।

আশ্চর্য, আজ আমি কারনানী এস্টেটের যে-ফ্ল্যাটটিতে থাকি, তার বারান্দা থেকে গণেশ ম্যানশনে মা যে-ঘরটিতে থাকতেন, সেটি স্পষ্ট দেখা যায়। ঘরের দিকে তাকালেই মনে পড়ে মার করুণ শান্ত মুখখানি।

যাবার আগের দিন আমি আর সাধনা গেলাম মা-র সঙ্গে দেখা করতে, সেদিন তিনি আমাদের দুপুরে খেতে বলেছিলেন। যে-সমস্ত জিনিসগুলি আমি খেতে ভালবাসি সেইগুলি, সুশীলামাসীর কাছে শুনলাম যে, নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও, মা তদারক করে রাঁধবার লোককে দিয়ে রান্না করিয়েছিলেন।

তারপর এল বিদায়ের পালা। সাধনা মায়ের পায়ের ধুলো নিল। সাধনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা তাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসিক্তকণ্ঠে বললেন : ভাল থেকো বাবা, সুখে থেকো—তোমার আর সাধনার উন্নতি হোক, প্রার্থনা করি !

বোম্বেতে আমাদের সঙ্গে গেল আমার সহকারী হেমন্ত গুপ্ত ও টুকলু। এরা

ছাড়া তিনজন চাকর ও ড্রাইভার। সাধনার বাবা ও মন্মথ কিছুদিন পরেই বোম্বে গেলেন।

যাবার দিন হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সি, এ, পি-র যত অনুরাগী, বন্ধু, আত্মীয় ও শুভাকাঙ্ক্ষীর দল এসে হাজির। সকলেই নিয়ে এল ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া। ফুলে ফুলে আমাদের কামরা বোঝাই হয়ে গেল।

সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর ট্রেন ছাড়বার সংকেত-ধ্বনি হলো। আস্তে আস্তে ট্রেন চলতে আরম্ভ করল, ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে যেতে লাগল, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলকে পিছনে ফেলে। সকলকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হতে লাগল।

চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। একে একে সব মিলিয়ে যেতে লাগল কিন্তু ভেসে উঠল মার সেই করুণ শান্ত মুখখানি।

মার্চ ১৯৩৯ সাল।

বোম্বাই পৌঁছে আমি আর সাধনা গিয়ে উঠলুম প্রথমে তাজমহল হোটেলে। টুকলু, হেমন্ত এবং অন্যান্যরা ফোর্ট এলাকায় অন্য একটি হোটেলে গিয়ে উঠল। তখনকার বোম্বায়ের সঙ্গে এখনকার বোম্বাই-এর আকাশ-পাতাল তফাৎ। তখন পশ্চিমদিগন্তে যুদ্ধের আগুন জ্বলেনি, আর সে সময় 'পাগড়ি' বা 'সেলামির' কথা কেউ চিন্তাও করেনি, সুতরাং গৃহ সমস্যা এত নিদারুণভাবে দেখা দেয়নি। অর্থাৎ ফ্ল্যাট যথেষ্টই পাওয়া যেত।

ঠিক সমুদ্রের ধারে মেরিন ড্রাইভ হলো সবথেকে অভিজাত পল্লী। তখন সবে নতুন নতুন বাড়ীগুলি উঠতে সুরু করেছে। মেরিন ড্রাইভের একটি বাড়িতে সুন্দর একটি ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া গেল। বাড়ীটির নাম ছিল 'স্যাটো মেরিন'—পাঁচখানা ঘর, তার মধ্যে দু'খানা শোবারঘর, একখানা আপিসঘর, একখানা খাবারঘর, এক-খানা ড্রয়িংরুম। এ ছাড়া রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর এবং ভৃত্যদের থাকবার ঘর। সামনেই দিগন্তবিস্তারী সমুদ্র—ভাড়া মাত্র মাসে ৩৬০৲ টাকা। এখন ঐ রকম একটা ফ্ল্যাট ত্রিশ হাজার টাকা সেলামি দিলেও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ!

দিন পনের 'তাজ'-এ থাকবার পর আমি আর সাধনা এই ফ্ল্যাটে উঠে এলাম। সাধনার বাবা এলেন এবং কিছুদিন পরে মন্মথ এসে আমাদের ওখানেই উঠল।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আমাদের আসবাবপত্রগুলি সব এসে পৌঁছে গেল —আর তার সঙ্গে এল আমার সেই প্রিয় 'হিলম্যান' গাড়ীখানি।

বোম্বায়ে তখন ঘরে ঘরে সব আধুনিক ফার্ণিচার—আর আমাদের যত পুরোনো সাবেকী ধরনের আসবাবপত্র নিয়ে কি ঘর সাজানো চলে? আমাদের মনের ভাবটা তখন এই যে এখানকার 'তারকা' পরিচালক ও অভিজাত সমাজের সঙ্গে যখন মিশতেই হবে তখন আসবাবপত্র সব আধুনিক না হলে লোকে বলবে কি? সেইজন্যে আধুনিক ফার্নিচার কিনে খাবার ঘর এবং ড্রয়িংরুম সাজালাম—এবং সেই সঙ্গে কিনলাম একটা এচ, এম, ভি রেডিওগ্রাম। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা বেশ গুছিয়ে সংসার পাতলাম।

চিত্রনাট্য রচনার কাজ সুরু হয়ে গেল। মন্মথ ও হেমন্তের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে আলোচনা করতে করতে চিত্রনাট্যের কাজ এগুতে লাগল।

১৯৩৮ সালে যখন আমরা 'স্টেজ শো' করি বোম্বাইতে তখন বহু নাম করা মঞ্চ ও চিত্র-সাংবাদিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, তার মধ্যে খাজা আহমেদ আব্বাস (কে, এ, আব্বাস) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তখন "বম্বে ক্রনিকল" পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনিই "কুমকুমে"র হিন্দি সংলাপ লেখবার জন্য ডবলু, জেড' আহমেদের নাম প্রস্তাব করেছিলেন এবং তাকেই আমি নির্বাচন করেছিলাম। আহমেদ ছিল অসাধারণ বুদ্ধিমান, তাকে কোন জিনিসই বেশী বার বলতে হতো না। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে বাংলা ভাষাও মোটামুটি শিখে ফেলল।

প্রথমে চিত্রনাট্যের সংলাপগুলি লেখা হতো বাংলায়, তারপর সেগুলি আহমেদ হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করত। এইভাবে মাসখানেকের মধ্যে চিত্রনাট্য রচনা সম্পূর্ণ হলো। বাংলার গানগুলি অবশ্য হেমন্তই লিখেছিল।

সাগর মুভীটোনের স্বত্বাধিকারী শ্রীচিমনলাল দেশাই আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন শিল্পী, কলাকুশলী ও সঙ্গীতপরিচালক নির্বাচনে। তার ফলে আমি আমার মনোমত ব্যক্তিদের নির্বাচন করলাম। সঙ্গীতপরিচালকরূপে নির্বাচন করলাম তিমিরবরণকে। ক্যামেরাম্যান নির্বাচিত হলো জয়গোপাল পিলাই। জয়গোপাল পাঞ্জাব ফিল্ম কোম্পানীর টেকনিক্যাল ডিরেক্টার ছিল—যাঁদের হয়ে আমি "খাইবার ফ্যাসকন" ছবি করেছিলাম লাহোরে ১৯৩০ সালে। উভয় সংস্করণেই নায়কের ভূমিকায় আমি নির্বাচন করলাম ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। তারপর বাংলা সংস্করণের জন্য আমি নির্বাচন করলাম রবি রায়, নবদ্বীপ হালদার, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিংহ, লাবণ্য দেবীকে বাংলা দেশ থেকে। তখন বোম্বাই-এ অনেক বাঙালী শিল্পী কাজ করতেন হিন্দি ছবিতে—তাঁদের মধ্যে থেকে ঠিক করলাম পদ্মা দেবী, মণি

চট্টোপাধ্যায়, ভুজঙ্গ রায় চৌধুরী (কামতাপ্রসাদ নামে খ্যাত) অবনী মিত্র প্রভৃতিকে। 'ব্যালে'র মেয়েরা বোম্বাই থেকে নির্বাচিত হলো। সাধনাই তাদের শেখাবার এবং নৃত্য পরিকল্পনার ভার নিল।

সাগর মুভিটোনে তখন সুবিখ্যাত পরিচালক মেহবুব খাঁ নিয়মিত ছবি করছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান ফার্দুন ইরাণী। অনিল বিশ্বাস ছিলেন সাগরের বাঁধা মাইনে-করা সঙ্গীতপরিচালক। কোম্পানীর নিজেস্ব অর্কেষ্ট্রাও ছিল। তিমির অবশ্য কলকাতা থেকে কয়েকটি বিশেষ যন্ত্রশিল্পীকে নিয়েছিল।

কলকাতা থেকে বোম্বায়ের চিত্রজীবন তখন খুবই জমকালো ছিল। সুতরাং আমার ঐ ছোট্ট 'হিলম্যান' গাড়ীতে করে স্টুডিও যাওয়াটা অনেকেই বিশেষ সুনজরে দেখত না। তারা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকত—ভাবটা এই যে—এ আবার একটা গাড়ী নাকি? আমাদেরও কি রকম একটা সঙ্কোচ লাগত—তখনকার অন্যান্য ডিরেক্টার এবং তারকাদের বড় বড় গাড়ীর বাহার দেখে। সুতরাং তাদের সঙ্গে সমান তালে চলতে গিয়ে আমাকেও বাধ্য হয়ে একটা বড় গাড়ী কিনতে হলো।

কিনলাম একখানা পনটিয়াক, শুধু তাই নয়, মেম্বার হলাম ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার এবং উইলিংডন ক্লাবের। ওখানকার চিত্রজগতে 'জাতে' উঠতে হলে এই সব জৌলুষ দরকার, নইলে কেউ পাত্তাই দিতে চায় না। 'ককটেল পার্টি' তো লেগেই থাকত—আমরাও যেমনি নিমন্ত্রিত হতাম—তেমনি আমাদেরও মাঝে মাঝে পার্টি দিতে হতো মাসে অন্তত একবার।

গ্রীষ্মকালে 'স্যাটো মেরিন'-এর ছাতের ওপর ব্যবস্থা করতাম। সমস্ত ছাতটা চাইনীজ লণ্ঠন দিয়ে সাজানো হতো। একদিকে লম্বা খাবারের টেবিল—তার পাশেই পানীয়ের টেবিল (একটা ছোট খাটো বার বললেও চলে) অন্যদিকে অতিথিদের বসবার জন্যে ছোট ছোট টেবিল।

সামনেই মেরিন ড্রাইভের শান্ত সমুদ্র—তার মৃদু-মন্দ বাতাস, জ্যোৎস্নালোকিত উন্মুক্ত আকাশের নীচে রেডিওগ্রাম থেকে ভেসে আসছে দেশী ও বিলাতী সঙ্গীত—সমস্ত পরিবেশটাকে মনে হতো স্বপ্নময়। তার ওপর অতি উপাদেয় খাদ্য ও পানীয়। অতিথিরা সকলেই বলত—এ যেন একটা Fairy land অর্থাৎ রূপকথার রাজ্য।

এক একটা পার্টিতে অতিথি অভ্যাগতদের সংখ্যা ৫০ | ৬০-এর কম হতো না। এঁদের মধ্যে যাঁরা খুব নামকরা তাঁদের ছাড়া বিশেষ আর কারো নাম আমার এখন মনে পড়ছিল না। কিন্তু আমি যখন এই অধ্যায়টি লিখছিলাম তখন সাধনা আমায়

পুরো নামের তালিকা দিল। তাদের সকলের নাম লিখতে গেলে অনেক খানি জায়গা চলে যাবে বলে বিশিষ্ট অতিথির নামগুলিই নীচে দিলাম:

লেডী রামা রাও এবং তাঁর দুই মেয়ে প্রেমা এবং শান্তা (শান্তা এখন সুলেখিকা হিসেবে খুব নাম করেছে) সাধনার বড় মামা বিচারপতি এস. এন. সেন এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সুজাতা সেন ও পরিবারের অন্যান্য সকলে, স্যার রিচার্ড ও লেডী টেম্পল, সিসিলি ও তাঁর স্বামী মিঃ সি. কে. দাফতারী, সিসিলির বোন পমিলি (ভাল নাম প্রমীলা) এবং তাঁর স্বামী শ্রীনলিন সেন (উচ্চপদস্থ রেলওয়ে কর্মচারী) মিঃ রসিদ (ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী) ও তারা বেগ, মিঃ ও মিসেস ডি, সি, গুপ্ত এবং তাঁদের পরিবার (কলকাতায় যখন ছিলেন এঁরা, তখন এঁদের মেয়েরা বিনীতা ও অনীতা সি, এ, পি ব্যালেতে বহুবার অংশগ্রহণ করেছিল), শ্রীমতী কৃষ্ণা ও রাজা হাতীসিং, মিঃ জেপ্‌সন ও তাঁর স্ত্রী মিসেস জেপ্‌সন, ডাঃ এবং মিসেস সালধানা প্রভৃতি।

এ ছাড়া তো সাধনার বাবা থাকতেনই ওখানে। তারপর তিমিরবরণ, জয়গোপাল পিল্লাই, টুকলু, বুলবুল দেশাই এবং কয়েকজন নামকরা শিল্পী ও সাংবাদিক থাকতেন।

খুব আনন্দকলরবের মধ্যে দিয়ে এই সব পার্টিগুলি হতো। কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে খরচের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। মাসের শেষে আর একটি পয়সাও উদবৃত্ত থাকে না—অর্থাৎ প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত!

আমাদের 'স্যাটো মেরিনে'র নীচের ফ্ল্যাটে থাকতেন বিখ্যাত গায়িকা বাঈ জদ্দন বাঈ। ইনি হলেন স্বনামধন্যা শিল্পী নারগিসের মাতা। নারগিস তখন খুব ছোট, চিত্রজগতে প্রবেশ করেনি তখনও। সে আমাদের ফ্ল্যাটে প্রায়ই আসত—সাধনা তাকে খুব ভালবাসত।

মাঝে মাঝে জদ্দন বাঈ-এর সঙ্গে দেখা হতো। সত্যিকারের মহীয়সী মহিলা ছিলেন জদ্দন বাঈ—তাঁর অন্তঃকরণটি ছিল যেমন কোমল তেমনি বিরাট। দেখা হলেই আমি বলতাম: বাঈ জদ্দন বাঈ, কবে আমাদের মোগলাই খানা খাওয়াচ্ছেন বলুন? আর কবে গান শোনাচ্ছেন আমাদের?

—যেদিন খুশী বেটা তোমার সেদিনই চলে এসো! সস্নেহে বলতেন জদ্দন বাঈ।

একদিন সত্যিই তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন—খাওয়ার এবং গান শোনবার।

খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর গান সুরু হলো—এবং একের পর এক অনেকগুলি গান তিনি গেয়ে চললেন। সমস্ত মনটা ভরে উঠেছিল তাঁর অপূর্ব কণ্ঠের গান শুনে।

বেশ মনে আছে—কি করে যে সময়টা কেটে গেল বুঝতেই পারিনি। শেষে অনেক রাত্রে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরেছিলাম।

এই 'স্যাটো মেরিনে'র দোতলায় থাকতেন চিত্রজগতের আর একজন মহারথী মিঃ এ, আর, কার্দার। কার্দারের সঙ্গে অবশ্য আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল—অর্থাৎ যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং 'সেলিমা' ছবি করি, তখন থেকেই। পরিচালক মেহবুব প্রায়ই আসতেন মিয়া কারদারের কাছে। মেহবুব ছিলেন কারদারের ভায়রাভাই। মেহবুবও মানুষ হিসাবে খুব ভাল ছিলেন—এবং একজন খাঁটি মুসলমান। প্রতিদিন নমাজ পড়া তাঁর চাই-ই।

গোলাপদা (হিমাংশু রায়) তখন বম্বে টকীজের কর্ণধার—তাঁর স্টুডিও হলো ম্যালাডে—বোম্বাই থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে। বম্বে টকীজের তখন দারুণ প্রসার প্রতিপত্তি—প্রায় প্রত্যেকখানি ছবিই 'হিট' বললেই চলে। সৌভাগ্যলক্ষ্মী অকৃপণ-হস্তে যশ এবং অর্থ দুইই ঢেলে দিচ্ছেন। মিঃ পাল (নিরঞ্জন পাল) তখন বম্বে টকীজে—আমি অবসর পেলেই চলে যেতাম ম্যালাডে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ পুরোন দিনের মতো গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, খাওয়া-দাওয়া করে চলে আসতাম।

এই সময় যে সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণা এবং রাজা হাতিসিং-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোম্বাই-এ এলেই উঠতেন গিয়ে তাঁর ছোট বোন কৃষ্ণার ওখানে।

আমার বেশ মনে আছে, যেদিন আমি প্রথম পণ্ডিতজীকে দেখি, এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়, সেও ছিল একটা নৈশভোজে'র পার্টি—দিয়েছিলেন মিঃ ভাবা তাঁর মালাবার হিলের বাড়ীতে। এই মিঃ ভাবাই ছিলেন আমাদের সন্থ পরলোকগত বৈজ্ঞানিক হোমী জামসেদজী ভাবার পিতা।

মিঃ ভাবা এবং সাধনার বড়মামা বিচারপতি এস. এন. সেন একসঙ্গে বিলেতে ছিলেন এবং তাঁরা দুজনে বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রেই আমাদের নিমন্ত্রণ হয়েছিল এই নৈশভোজে। এই ডিনার পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না, তাঁর মেয়ে ডিনা ও জামাই নেভাল ওয়াদিয়া, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, কৃষ্ণা ও তাঁর স্বামী রাজা হাতিসিং এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁদের নাম আমার ঠিক এখন মনে পড়ছে না।

মিঃ জিন্নার মত সুসজ্জিত মানুষ খুব কম দেখা যেত। দামী ইয়োরোপীয় পোশাক, চমৎকার ইংরাজী উচ্চারণ—সহজেই লোককে আকৃষ্ট করতে পারত। পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চিত্তজয়ী হাসি মনে একটা প্রভাব বিস্তার করে।

ডিনারের পর আমরা সকলে ছাদের ওপরে গেলাম। নানাজাতীয় ফুলের টব এবং ছোট ছোট টেবিল দিয়ে ছাদটি সাজানো রয়েছে—ইংরাজীতে যাকে বলে 'রুফ-গার্ডেন'। একদিকে বসল বড়দের দল—আর একদিকে বসল আমাদের বয়সী যারা ছিল তারা। আমাদের টেবিলে ছিল কৃষ্ণা ও রাজা হাতিসিং, ডিনা ও নেভাল ওয়াদিয়া, হোমি জামসেদজী ভাবা ও তার ছোটভাই, ও আরও দুই-একজন।

এই সময় একটা ব্যাপার ঘটেছিল—সে ব্যাপারটার কোন মূল্যই থাকত না, যদি না মিঃ ভাবার হঠাৎ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হোত। ব্যাপারটা তাহলে বলি—

জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর আমার এবং সাধনার ঝোঁক অনেকদিন থেকেই। সে সময় সাধনা 'কিরো' ও অন্যান্য জ্যোতিষীদের হস্ত-রেখার বইপত্র খুব পড়াশোনা করত আর অনেকেরই হাত দেখে ঠিক ঠিক বলে দিত। মিঃ হোমি ভাবার হাতও সে সেই টেবিলে বসে দেখেছিল।

মিঃ ভাবা জিজ্ঞেস করেছিল: কি দেখছেন মিসেস বোস?

সাধনা বলেছিল: আপনি আপনার ক্যারিয়ারএর খুব উঁচুতে উঠবেন। যশঃ রেখা আপনার খুব প্রবল—কিন্তু—

—কিন্তু কি—মিসেস বোস?

—না-না—ও কিছু নয়—প্রেমের ব্যাপার—এখন থেকে না জানাই ভাল—বলে হেসে সাধনা কথাটা উড়িয়ে দিল। কথাটা ওই খানেই চাপা পড়ে গেল।

বাড়ীতে এসে সাধনা আমায় বললে: জানো, হোমি ভাবার হাতে এমন একটা রেখা দেখেছি যার মানে হলো—ওর মৃত্যু হবে কোন দুর্ঘটনায়। 'কিরো' এবং অন্যান্য জ্যোতিষীরা ঐ একই কথা বলেন যে হাতে ঐ রেখাটা থাকলেই নাকি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়।

সাধনা বলল, আমিও শুনে গেলুম। তারপর এক সময় ভুলেও গেলুম এ ঘটনার কথা।

তাই যেদিন মিঃ হোমি ভাবার মৃত্যু সংবাদ দেখলাম কাগজে, যে কি দারুণ বিমান দুর্ঘটনায় ওঁর জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়েছে, সেইদিন সাধনার সেই ভবিষ্যদ বাণীটি মনে পড়ল।

ইতিমধ্যে 'কুমকুমে'র বাংলা ও হিন্দি উভয় সংস্করণেরই চিত্রনাট্য তৈরী হয়ে গেল এবং শুটিং সুরু হলো। সেটা হবে জুন মাস। শুটিং বেশ সুষ্ঠু ভাবে চলতে লাগল। নতুন নতুন বহু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হতে লাগল।

সবই সুন্দরভাবে এগুতে লাগল, কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অশান্তি

মাঝে মাঝে উঁকি দেয়—মাঝে মাঝে মনটা উতলা হয়ে পড়ে যখনই মার কথা মনে পড়ে। মনে হতো মা নিশ্চয় আমার কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ করছেন। আমাকে ছেড়ে তিনি খুব শান্তিতে নেই। প্রায়ই মনে পড়ত মার কোমল করুণ মুখখানি। আসবার দিনে তাঁর সেই অশ্রুসজল দৃষ্টি আমাকে যেন সবসময় আনমনা করে তুলতে লাগল।

এই সময় স্টুডিওতে এক মহা গণ্ডগোল দেখা দিল ক্যামেরাম্যান জয়গোপাল পিলেকে নিয়ে। জয়গোপাল যদিও কাজ খুব ভালই করত—যাকে বলে একেবারে প্রথম শ্রেণীর—কিন্তু সে ছিল একটু মন্থরগতি অর্থাৎ Slow। সাগরের মালিক মিঃ দেশাই আমাকে ডেকে বললেন যে এত মন্থরগতি ক্যামেরাম্যান নিয়ে কাজ করলে ছবি শেষ হতে অনেক দেরী হবে আর চিত্রের নির্মাণ ব্যয়ও অনেক বেড়ে যাবে। তাঁর স্টুডিওর নিজস্ব ক্যামেরাম্যান ফার্দুন ইরাণী ক্যামেরাম্যান হিসাবেও যেমন ভাল, কাজও তেমনি দ্রুত করেন। জয়গোপালের বদলে তাকে দিয়ে কাজ করতে। জয়গোপালও থাকবে যতদিন না শুটিং শেষ হয় এবং তার চুক্তির টাকাও অবশ্য তাঁরা পুরোপুরিই দিয়ে দেবেন। কিন্তু ফার্দুন ইরাণীই ক্যামেরার কাজ করবে।

আমি বললাম: তা কি করে হয়? ওকে আমি নিজে থেকে ডেকে এনেছি—আর মাঝপথে তাকে বাদ দিয়ে আর একজন ক্যামেরাম্যানকে দিয়ে কাজ করালে শুধু অভদ্রতাই করা হবে না, তার ভবিষ্যতটাও নষ্ট করে দেওয়া হবে। আমি কিছুতেই শ্রীদেশাই-এর প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না।

এই নিয়ে বেশ মন-কষাকষি চলতে লাগল। শেষে শ্রীদেশাই ছবির কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখলেন। অর্থাৎ যতদিন না এই ব্যাপারের একটা চূড়ান্ত ফয়সালা হয়, ততদিন শুটিং বন্ধ।

মন-মেজাজ দুই-ই খারাপ হয়ে গেল। শেষকালে কি ছবি শেষ হবে না? আমিও জিদ ধরে রইলাম যে, জয়গোপালকে বাদ দিয়ে আমি ছবি করব না। আর এখানে শুধু জিদের কথা নয় একটা আদর্শের কথা, একজন কলা-কুশলীর ভবিষ্যৎ আমার হাতে।

এইরকম যখন আমার মানসিক অবস্থা ঠিক সেই সময় একদিন হঠাৎ রাত্রিবেলায় একটা 'ট্রাঙ্ক কল্' পেলাম্ জ্ঞানাঙ্কুরের কাছ থেকে। সে জানাল যে মা'র হার্টের অবস্থা খুব খারাপ—স্যার নীলরতন সরকার মাকে দেখছেন এবং আমাকে খবর দিতে বলেছেন।

জ্ঞানাঙ্কুরকে টেলিফোনেই জানালুম যে আগামী কাল সন্ধ্যার ট্রেনে আমি রওনা হচ্ছি। বোম্বাই থেকে কলকাতা তখন পর্যন্ত প্লেন সার্ভিস চালু হয়নি।

পরদিন সকালে গিয়ে আমি চিমনলাল দেশাইকে জানালাম আমার মার অসুখের কথা। সঙ্গে সঙ্গে এও জানালাম যে আমাকে আজই যেতে হবে। শ্রীদেশাই আমার মানসিক অবস্থা বুঝলেন এবং অনুমতিও দিলেন। আমার অনুপস্থিতিতে ছবির কাজ বন্ধ থাকবে জেনেও অনুমতি দেওয়া ছাড়া এ অবস্থায় তাঁর অন্য কোনো উপায় ছিল না।

সাধনার বাবা তখন বোম্বাইতে আমার ওখানেই ছিলেন—তাঁর ওপরেই সাধনার দেখাশোনার ভার দিয়ে আমি সন্ধ্যার ট্রেনেই কলকাতা রওনা হলাম। সেটা হবে জুলাই মাসের গোড়ায়।

হাওড়া পৌঁছে একেবারে সোজা গণেশ ম্যানসনে মার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে দেখে মা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে ও উত্তেজনায় তাঁর চোখের জলে আমার জামা ভিজে গেল। দেখলাম যে এই চার মাসের মধ্যে মা খুব রোগা হয়ে গেছেন, আর খুব দুর্বল হয়ে গেছেন।

আমি সপ্তাহ খানেক রইলাম। এই ক'দিনে মা অনেকটা সামলে উঠলেন। প্রথমে মাকে দেখছিলেন ডাঃ দেবেন ব্যানার্জি। তারপর যখন হার্টের অসুখটা একটু বাড়াবাড়ি হলো তখন স্যার নীলরতন সরকারও রোজ আসতেন মাকে দেখতে। স্যার নীলরতনের সঙ্গে যে আমাদের পরিবারের একটা গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল সে কথা আগেই বলেছি। মাকে কিছুটা ভাল হয়ে উঠতে দেখে স্যার নীলরতন বললেন: এখন বিপদ কেটে গেছে, এখন তুমি বোম্বাই ফিরে যেতে পার মধু। ওখানে তোমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে—কতদিন আর বসে থাকবে? বর্তমানে ভয়ের কোনো কারণ নেই—তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে।

স্যার নীলরতনের কাছে এই আশ্বাস পেয়ে আমি আবার বোম্বাই যাবার জন্য তৈরি হলাম। মার কাছে বিদায় নেবার সময় মা বেশী কিছু বলতে পারলেন না। অঝোর ধারায় চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। শুধু বললেন: "নিজের শরীরের যত্ন করিস বাবা। ভগবানে বিশ্বাস রাখিস।" এই তাঁর শেষ কথা।

কি জানি কেন আমারও তখন মনে হয়েছিল—যে আর হয়ত মার সঙ্গে দেখা হবে না। এই দেখাই শেষ দেখা। চলে আসতে একেবারেই মন চাইছিল

না—কিন্তু যে বিরাট দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি, তাতে এখানে বেশীদিন থাকলে কর্তৃপক্ষের প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাবে এবং আমার ইউনিটের লোকেরাও টাকা পয়সা না পেয়ে বিপদে পড়বে। এইসব ভেবে আবার আমাকে বোম্বাই রওনা হতেই হলো।

আমার বড়দি এবং সেজদি তখন বিলেতে, আর মেজদি এবং ন'দিও তখন কলকাতার বাইরে—একমাত্র ছোটদি (অর্থাৎ উমাদি) তখন কলকাতায় ছিলো। ছোড়দি, জ্ঞানাঙ্কুর এবং আমার মামা (অজয় দত্ত)—প্রায় রোজই আসতেন এবং দেখাশোনা করতেন। মামা তো মার দেখাশোনা করবেনই, কারণ বড়দি অন্তপ্রাণ ছিলো তাঁর—আর ছোড়দি যে মার যথাসাধ্য সেবা যত্ন করবে, সে ত খুবই স্বাভাবিক কিন্তু জ্ঞানাঙ্কুর জামাই হয়ে যেরকম সেবা-যত্ন এবং দেখাশোনা করেছিল, আমি কলকাতায় থাকলেও, তার বেশী কিছু করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

বোম্বাই ফিরে গিয়ে দেখি শ্রীচিমনভাই দেশাই তখনও তাঁর মত পরিবর্তন করেননি। অর্থাৎ জয়গোপাল পিলেকে না সরালে 'কুমকুমে'র কাজও আর সুরু হবে না। এজন্যে এ ইউনিটের কর্মীদের মাস-কাবার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কোনো টাকা-পয়সা দেওয়া হয়নি। আমি বোম্বাই যেতেই কর্মীরা সব আমার কাছে তাদের দুরবস্থার কথা জানাল। আমি দেখলাম মহা মুস্কিল। দেখা করলাম চিমনভাই-এর ভাই ঈশ্বরভাই দেশাইর সঙ্গে। তিনি মধ্যস্থতা করায় ব্যাপারটার মোটামুটি একটা নিষ্পত্তি হলো। আমি অনেক করে বললাম—একটা লোকের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নষ্ট করাটা কোনোমতেই উচিত নয় মানবিকতার দিক থেকে। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম জয়গোপাল যাতে আরো দ্রুত কাজ করে তারজন্যে দায়ী রইলাম আমি। এই প্রতিশ্রুতিতে কাজ হলো—চিমনভাই নরম হলেন। অবশ্য আমার প্রতিশ্রুতির মর্যাদা জয়গোপাল রেখেছিল—সেও আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল fast হবার।

আবার শুটিং আরম্ভ হলো। ইউনিটের লোকজনেরা টাকা-পয়সা পেল, তাদের মুখে আবার হাসি ফুটল। আমার কিন্তু কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর থেকে মনটা বড় অস্থির হয়ে ছিল—কোন কাজে মনঃসংযোগ করতে পারছিলাম না। সবসময় মার কথা মনে পড়ত। আসবার সময় যদিও জ্ঞানাঙ্কুরকে বলে এসেছিলাম একদিন অন্তর যেন সে 'ট্রাঙ্ক-কলে' মার সমস্ত খবরাখবর দেয়—সেও একদিন অন্তর আমাকে টেলিফোন করত। শুনতাম মার শরীর কখনও ভাল আবার কখনও খারাপের দিকে।

এইভাবে কিছুদিন চলল। তখন জুলাই মাসের শেষাশেষি—শুটিং চলছে পুরোদমে। একদিন আমি সকালবেলা একাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছি স্টুডিওতে; সাধনার সেদিন শুটিং ছিল না—অন্য শিল্পীদের ছিল। দুপুরবেলায় লাঞ্চের সময় যখন আমি খেতে বসেছি, তখন দেখি আমার চামান শুকনো ম্লান মুখে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে বসে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: চামান, তোমার চেহারা এরকম শুকনো-শুকনো দেখছি কেন? তবিয়ৎ ঠিক আছে তো?

সে ছোট্ট করে জবাব দিল, হাঁা সাহেব, ঠিক আছে।

দেখলাম তার গলাটা যেন ধরা-ধরা। আমি তাকে ফের জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে কি হয়েছে কি?

সে কিছু না বলে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আমারও মনের মধ্যে একটা অজানা আশঙ্কা কাঁটার মত খচ-খচ করতে লাগল। শুটিং শেষ করার পর সোজা একেবারে বাড়ী চলে এলাম। বাড়ী ফিরতেই সাধনার বাবা প্রথম আমায় খবরটা দিলেন। আমি সকালে স্টুডিও চলে যাবার পরই জ্ঞানাঙ্কুরের কাছ থেকে একখানি টেলিগ্রাম এসেছে। তাতে লেখা আছে মাত্র ক'টি কথা:

Mother passed away last night.

মাত্র এই ক'টি কথা—কিন্তু এরই মধ্যে যেন দুনিয়ার সমস্ত বেদনা একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হয়ে আমার মনের ওপর আঘাত করতে লাগল। রাত্রে জ্ঞানাঙ্কুরকে ট্রাঙ্ককল' করলুম। জ্ঞানাঙ্কুর বললে: টেলিফোনে আমি তোমায় কি বলব? এ দুঃসংবাদ তোমায় আমি মুখে বলি কেমন করে? তাই টেলিগ্রাম করেছি।

এ শোকের পরিমাপ নেই, কাউকে বলে বোঝান যায় না—যে সন্তানের কাছে মার মূল্য কতখানি, বিশেষ করে আমার কাছে। ছোটবেলা থেকে মা-ই আমার একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র বন্ধু। কত অন্যায় আবদার করেছি—কত জিদ করেছি—তাঁর মনে ব্যথাও দিয়েছি। আবার বিপদের সময় ছুটে গেছি তাঁর কাছে। তিনি দুহাত বাড়িয়ে তুলে নিয়েছেন বুকে। তাঁর স্নেহের স্পর্শে আমার সব বিপদ কেটে গেছে।

আজ তিনি নেই। একথা ভাবতেই আমার মন চাইছিল না। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি আমার পথ দেখিয়েছেন। তার স্নেহের আলোতে আমার চলার পথ হতো উজ্জ্বল—আজ সেই আলোকশিখা চিরতরে নিভে গেল।

মার মৃত্যুতে মনের এই আঘাতকে সামলাবার জন্যে আমি বেশী করে কাজে মন দিলাম। সময়ে সবই সয়ে যায়—কথায় বলে—Time is the best healer —সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্ষতটাও ধীরে ধীরে শুকোতে লাগল। 'কুমকুমে'র শুটিংও (হিন্দি ও বাংলা) বেশ সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়ে এল নভেম্বর নাগাৎ এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ছবির উভয় সংস্করণেরই সম্পাদনা শেষ হয়ে release-এর জন্য তৈরী হয়ে গেল।

চিমনভাই দেশাই কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং চিত্রনির্মাতাকে ছবিখানি দেখবার জন্য একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমার আজও মনে আছে—সম্পূর্ণ ছবিখানি দেখবার পর বম্বের চিত্রজগতের এক বিশিষ্ট দিকপাল আমায় অভিনন্দন জানিয়ে বললেন: মিঃ বোস, 'কুমকুম' আমার খুব ভাল লেগেছে কিন্তু আমার মনে হয় এ ছবির নির্মাণকাল অন্ততঃ ১৫ বছর এগিয়ে এসেছে—অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন যে "The picture is 15 years ahead of its time." তাঁর এই কথা বলার কারণ হলো যে 'কুমকুমে'র কাহিনী হলো সোস্যালিস্ট প্যাটার্নে'র—অর্থাৎ কিভাবে ধনীরা দরিদ্রদের শোষণ করছে তারই একটি আলেখ্য।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ বাংলা সংস্করণটি কলিকাতায় 'রূপবাণী'-তে মুক্তিলাভ করল। বাংলা সংস্করণটির পরিবেশক ছিলেন অধুনালুপ্ত প্রাইমা ফিল্মস্। ছবির মুক্তিলাভের সময় আমি আর সাধনা কলকাতায় এলাম কয়েকদিনের জন্যে।

হিন্দি সংস্করণটি বোম্বাইয়ে মার্চ মাসে ইম্পীরিয়াল সিনেমায় মুক্তিলাভ করল।

কলকাতা ও বোম্বায়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যেসব সমালোচনা বেরিয়েছিল, তার মধ্য থেকে ক'একটি বিশিষ্ট সমালোচনা এখানে উদ্ধৃত করলাম:

"কুমকুম্'! 'কুমকুম্'! সারা শহরে, ঘরে ঘরে, পথে পথে, জনতার মুখে মুখে 'কুমকুম্'!...চিত্রাখ্যান, পরিচালনা, অভিনয়, দৃশ্যপট, শব্দগ্রহণ ও আলোকচিত্রের কাজ, সর্বদিক থেকেই 'কুমকুম্' যে বাংলা চিত্রজগতে নব অধ্যায়ের সূচনা করবে, একথা বললে অতিশয়োক্তির অপরাধ হবে না।"

...বাতায়ন (৯-২-১৯৪০)

"সাহিত্যের মত রঙ্গালয় ও ছায়াচিত্রও জাতির জীবনের মুকুর...ছায়াচিত্রেরও জনসেবার একটা দিক আছে। সাগর মুভিটোনের প্রথম বাংলা ছবি 'কুমকুম্' জনসেবার সেই মহৎ কর্তব্যে আত্মনিবেদন করিয়াছে। ...আধুনিক যুগে ক্যাপিটালিজম্ ও লেবারে যে সংঘাত বাধিয়াছে, ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত গণ-স্বার্থের যে বিরোধ শুরু হইয়াছে...শ্রমিক-ভারতের বর্তমান সমস্যা আজ সমগ্র জাতির সম্মুখে যে মর্মান্তিক প্রশ্ন তুলিয়াছে, 'কুমকুম্' যেন সেই প্রশ্নের প্রতীক।...মায়াময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী সাধনা বসু এই

বর্ণাঢ্য চরিত্রটিকে যে অপরূপ রূপ দিয়েছেন, তাহাতে বাঙ্গলার ছায়াচিত্রাভিনয়ের ইতিহাস তাঁহাকে চিরদিন স্মরণ করিবে।...

...দীপালি (অভিমন্যু) (৮-২-১৯৪০)

"...পরিচালনা ত্রুটিহীন হইয়াছে বলিয়াই ছবিখানি এত সুন্দর হইতে পারিয়াছে..."

...ভগ্নদূত (১৭-২-৪০)

"......In her very first Hindustani film Sadhona Bose takes a place in the first rank of our screen artistes......" K. Ahmad Abbas.
(BOMBAY CHRONICLE), 15-3-1940.

"......When one realises the first rate talent, latest technique, superb music and excellent direction that distinguished 'Kumkum', one is not so much surprised at its tremendous success... The direction of 'Kumkum' could not have been placed in more capable hands......'Kumkum' bears the unmistakable stamp and polish of Mr. Modhu Bose's genius as a director and places him high in the direction field of national production......"

THE ILLUSTRATED WEEKLY OF INDIA (17-3-1940)

"......DEFINITELY the best of Sagar and one of India's best. That is my rating of 'Kumkum' the Dancer......"

D. C. Shah (THE SUNDAY STANDARD), 10-3-1940.

......'Kumkum the Dancer is one of the best and certainly the most polish picture that has ever graced the Indian screen......Sadhona Bose presents the exquisite art of the Indian dance in a manner never known on the Indian screen before......the photography displays remarkable inspiration.

THE TIMES OF INDIA, BOMBAY (15-3-1940)

'কুমকুম' বাংলা ও হিন্দি উভয় সংস্করণই প্রচুর সাফল্যলাভ করল। প্রথমে ঠিক করেছিলাম যে 'কুমকুম' শেষ হলেই কলকাতা ফিরে আসব। 'কুমকুম্ রিলিজের সময় এলামও কলকাতায়—কিন্তু মা মারা যাওয়ার পর কলকাতায় একদম মন টিকলো না। মার স্মৃতি সবসময় মনে ভেসে উঠত—সেজন্য বাধ্য হয়ে আবার চলে গেলাম বোম্বাই—এখানে অন্ততঃ কিছু ভুলে থাকতে পারব।

ওখানে গিয়ে দোভাষী ছবির কোনো কণ্ট্র্যাক্টের চেষ্টা করতে লাগলাম। ভাবলাম 'কুমকুম' যখন সকলের ভাল লেগেছে তখন নতুন কণ্ট্র্যাক্ট হতেও দেরী হবে না।

এইসময় একদিন খেয়াল হলো—হাতে যখন প্রচুর সময় আছে তখন অজন্তা ও ইলোরা গুহাগুলি দেখে এলে কেমন হয়। সাধনাকে বলতে সেও খুব উৎসুক হয়ে উঠল যাবার জন্য।

লেগে গেলাম যাবার বন্দোবস্ত করতে। শ্রীচিমনলাল দেশাই-এর ছেলে বুলবুল দেশাই আমাদের জানাল যে জলগাঁওতে তার এক বিশিষ্ট বন্ধু আছে, তার নাম সতীশ হোসালি। সে ওখানকার একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার। সে জানিয়েছে তার ওখানে একটি সুন্দর বিরাট বাংলো আছে—সেখানে সে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত করে দেবে। শুধু তাই নয়, জলগাঁও থেকে মোটরে করে অজন্তা ও ইলোরাতে নিয়ে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে দেবে। তার ওখানে আতিথ্য গ্রহণ করলে সে কৃতার্থ হবে।

আমরা দেখলাম, ভালই হলো। সেই পরিকল্পনা অনুসারে একদিন আমি, সাধনা, সাধনার বাবা ও বুলবুল জলগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সঙ্গে রইল চামান ও তার ভাই আসগর। সত্যিই সতীশ হোসালি আমাদের যেরকম আদর-আপ্যায়ন এবং অভ্যর্থনা করেছিল তা চিরদিন মনে রাখবার মত। সমস্ত আয়োজন এত সুন্দর ও পরিপাটি করে করেছিল যে আমরা কোনরকম অসুবিধাই বোধ করিনি।

জলগাঁও থেকে দুখানি বিরাট মোটরে করে আমরা অজন্তা ও ইলোরা গুহার দিকে রওনা হলাম। সঙ্গে চামান ও আসগর প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যাদি সব নিয়ে চলল।

এতদিন শুধু আমরা অজন্তা ও ইলোরার ছবিই দেখে এসেছি—অতীতের ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শুধু ফটোগ্রাফের মাধ্যমে—কিন্তু আমরা যখন স্বচক্ষে সেগুলি দেখলাম—তার সৌন্দর্য, তার কারুকার্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত অন্তর দিয়ে তা অনুভব করতে হয়। দু দিন ধরে এই অজন্তা ও ইলোরার গুহা ও ভেতরের ফ্রেস্কোগুলি দেখলাম সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। রাত্রে আমরা আওরঙ্গাবাদের এক হোটেলে গিয়ে থাকতাম।

অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হলো। পরিপূর্ণ মন দিয়ে আমরা জলগাঁও-এ ফিরে এলাম—এবং সেখান থেকে বোম্বাই।

আমাদের অত্যধিক খরচের জন্য আমরা কোনদিনই কিছু জমাতে পারিনি। যত্র আয়, তত্র ব্যয়। ক্রমশ আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে ২।১ জন প্রোডিউসারের সঙ্গে কথাবার্তা হয়, কিন্তু কার্যকরী হয় না—এদিকে সময় চলে যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যখন একটি কণ্ট্রাক্ট সত্যই হলো—তার কথাবার্তা শুরু থেকে মায় চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা পর্যন্ত ছয় সাত দিনের বেশী সময় লাগেনি।

ওয়াদিয়া মুভিটোনের সর্বময় কর্তা মিঃ জে. বি. এচ ওয়াদিয়ার সঙ্গে কোথায় যেন একদিন বুলবুলের দেখা হয়। কথায় কথায় মিঃ ওয়াদিয়া আমার ও সাধনার বিষয় জিজ্ঞেস করেন। তিনি বুলবুলকে এও জানান যে 'কুমকুম' তিনি দেখেছেন। ছবি তাঁর খুবই ভাল লেগেছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের তিনি একজন অত্যন্ত প্রগতিশীল চিত্রনির্মাতা—সত্যি কথা বলতে কি, আমার এই সুদীর্ঘ চিত্রজীবনে তাঁর মত শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল চিত্রনির্মাতা আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি বুলবুলকে জানালেন যে, আমার সঙ্গে তিনি একবার দেখা করে একটি ভবিষ্যৎ ছবির বিষয় কথাবার্তা বলতে চান।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করলুম। আলাপ হলো—চমৎকার লোক। প্রথম আলাপের সময় কি জানি কিভাবে দুজনের দুজনকে খুব ভাল লেগে গেল। তাঁর কথায় বুঝলুম যে, তিনি এমন একখানি ছবি করতে চান যা ভারতের বাইরেও চলবে।

—অর্থাৎ ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেটের জন্য ছবি এবং তা হবে ইংরাজীতে। আমি 'রাজনর্তকী'র গল্পটি বললাম। রাজনর্তকীকে রাজনটী নাম দিয়ে ইতিমধ্যেই আমি মঞ্চস্থ করেছিলাম। রাজনর্তকীর গল্প শুনে তাঁর খুব ভাল লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গেই কথাবার্তা পাকা হয়ে কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেল। যেদিন কণ্ট্রাক্ট স্বাক্ষর করলাম সে তারিখটি আমার আজও মনে আছে—সেটি হলো ১৯৪০ সালের ১৩ই এপ্রিল। ১৩ নম্বরকে ইংরেজরা বলে 'Unlucky 13'—অনেকে আমাকে বলল যে, এদিনে কণ্ট্রাক্টটা সই না করতে, কারণ দিনটা অশুভ। অন্য কোন কারণে নয় যেহেতু ১৩ তারিখ বলে, কিন্তু আমি কারও কথা শুনলুম না। সই করলুম ১৩ তারিখে, এবং আজ আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, আমার চিত্রজীবনে যতগুলি কণ্ট্রাক্ট সই করেছি, তার মধ্যে 'রাজনর্তকী'র কণ্টাক্ট সব দিক থেকে সার্থক এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কণ্ট্রাক্ট।

চিত্রনাট্যের কাজ শুরু হলো।

মন্মথ, আমি, হেমন্ত ও ও ডবলু. জেড. আহমেদ একসঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করে পরের পর দৃশ্য সাজিয়ে যেতে লাগলাম: সঙ্গে সঙ্গে সংলাপও লেখা হতে থাকল। "কুমকুমে"র মত সংলাপ প্রথমে বাংলাতেই লেখা হতে লাগল, তারপর আহমেদ সেগুলি হিন্দিতে অনুবাদ করে যেত। আহমেদ এতদিনে বাংলা বেশ ভালই শিখে নিয়েছিল, এমনকি সে এখন বাংলাতেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতো।

একদিন চিত্রনাট্য ও সংলাপ লেখা শেষ হলো। বাংলা সংলাপ মন্মথই লিখল,

হেমন্ত তাকে সাহায্য করেছিল, হিন্দি সংলাপ লিখল আহমেদ এবং ডি. এফ. কারাকা, (এখন যিনি 'Current' সাপ্তাহিকের সম্পাদক) লিখলেন ইংরাজী সংলাপ।

এর পর এল ভূমিকা নির্বাচনের পালা। প্রযোজক মিঃ জে. বি. এচ. ওয়াদিয়া আমায় কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন আমার পছন্দমত শিল্পী নির্বাচন করে একেবারে কণ্ট্রাক্ট করে ফেলবার জন্য। টাকা-কড়ি কাকে কি রকম দেওয়া যেতে পারে এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন: মিঃ বোস, আপনি আমার হয়ে কণ্ট্রাক্ট সই করবেন। যাকে যা দেওয়া উচিত সেটা আপনিই ঠিক করবেন।

এতখানি বিশ্বাস ছিল তাঁর আমার ওপর। শুধু তাই নয়, কতখানি বিরাট অন্তঃকরণ ছিল তাঁর, যা খুব কম দেখা যায়।

ঠিক আসবার সময় খবর পেলাম গোলাপদা খুব অসুস্থ। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, কত দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব তাঁর সঙ্গে আমার। বন্ধুভাবে তাঁকে ভালবেসেছি এবং দাদার মত তাঁকে শ্রদ্ধা করেছি। সেই গোলাপদা অসুস্থ শুনেই ছুটলাম ম্যালাড-এ। কিন্তু তাঁর বাড়ীতে পৌঁছেও, এত কাছে গিয়েও, এ সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না। দেবিকা বললে: খুব দুঃখিত মধু—কি করব বল, ডাক্তারের নির্দেশ কারুর সঙ্গেই দেখা করা চলবে না।

মনে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলাম—এই শেষ সময়ে একবার চোখের দেখা পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। খুব ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম। সেটা হবে মে মাসের মাঝামাঝি।

তারপর আমি চলে এসেছি কলকাতায়। এখানে এসে সমস্ত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নির্বাচন করে কণ্ট্রাক্ট সই করছি। এমন সময় হঠাৎ বম্বে থেকে একটা ট্রাঙ্ককল এল যে, গোলাপদা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমার আফশোষের আর সীমা রইল না—একবার শেষ দেখাও হলো না তাঁর সঙ্গে।

এদিকে যেসমস্ত শিল্পীদের নির্বাচন করলাম তাঁরা হলেন: অহীন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতিপ্রকাশ, প্রভাত সিংহ, বিভূতি গাঙ্গুলী, মৃণাল ঘোষ, প্রতিমা দাশগুপ্ত, প্রীতিকুমার মজুমদার ও মাধব মেনন। জ্যোতিপ্রকাশ ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই বাংলা ও হিন্দি উভয় সংস্করণের জন্য চুক্তি হয়েছিল। সুধাংশু চৌধুরীকে ঠিক করলাম শিল্প-নির্দেশক হিসেবে, সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে ঠিক হলো তিমিরবরণ, তার সহকারী হলো প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। ওয়াদিয়া মুভিটোন আগে বেশীর ভাগই

Stunt ছবি করত, আর সেগুলি পরিচালনা করতেন মিঃ জে. বি. এচ. ওয়াদিয়ার ভাই হোমি ওয়াদিয়া। তাঁদের নিজস্ব অর্কেস্ট্রা বলতে কিছু ছিল না। সেইজন্য তিমির এইখান থেকেই বেশীরভাগ যন্ত্রীদের নিয়ে গিয়েছিল। ক্যামেরাম্যান নিলাম যতীন দাস ও তার ভাই প্রবোধ দাসকে এবং শ্যাম দাসকে নিলাম সম্পাদক হিসেবে।

কলকাতায় নির্বাচিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট সই করে জুন মাসের গোড়ায় বম্বে ফিরে গেলাম।

বম্বে ফিরে এসে আমি ইংরাজি সংস্করণের জন্য শিল্পী নির্বাচন করতে স্বরু করলাম। ইংরিজি সংস্করণের নাম দেওয়া হলো 'দি কোর্ট ডান্সার'। পৃথ্বিরাজ কাপুরকে আমি নির্বাচন করলাম হিন্দী ও ইংরাজি উভয় সংস্করণের নায়কের ভূমিকায়। বাংলা সংস্করণের নায়ক নির্বাচিত হয়েছিল জ্যোতিপ্রকাশ। 'রাজনর্তকী'র অপর একটি প্রধান ভূমিকায় (কাশীশ্বর গোস্বামী) হিন্দী ও বাংলার জন্য আমি নির্বাচন করেছিলাম অহীন্দ্র চৌধুরীকে, আর ইংরিজি সংস্করণের জন্য ঠিক করলাম জাল খাম্বাটাকে।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে বাংলা হিন্দী ও ইংরিজি তিনটি সংস্করণের চরিত্রই নির্বাচিত হয়ে গেল শুধু একটি ছাড়া। সেটি হলো 'জেনারেল টায়া' ইংরিজি সংস্করণে। বাংলা ও হিন্দীতে আমি এ চরিত্রটির জন্য নির্বাচন করেছিলাম মণি চ্যাটার্জিকে। এই চরিত্রটির ইংরিজি সংস্করণের জন্য আমি অনেকগুলি শিল্পীকে দেখলাম, কিন্তু কাউকেই আমার ঠিক মনঃপূত হচ্ছিল না। কারু হয়ত চেহারা ঠিক 'জেনারেল টায়া'র মত নয়, কারু হয়ত ইংরাজী উচ্চারণ ঠিকমত হয় না—এই রকম একটা-না-একটা খুঁত থেকেই যাচ্ছিল।

জুন মাস এসে গেল—মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নিয়মিত শুটিং আরম্ভ হবার জন্য সব তোড়জোড় চলছে। কিন্তু তখনও 'জেনারেল টায়া' ঠিক হলো না। খোঁজ-খবর যথেষ্ট চলছে।

একদিন জুনের মাঝামাঝি প্রায়—আমি আমার বাড়ীতেই অফিসঘরে বসে আছি। এমন সময় চাপরাশি একটি ভিজিটিং কার্ড নিয়ে এল। কার্ডে নাম লেখা আছে কাপ্টেন কে. এল. থাপ্পান। প্রথমটা আমি বুঝতে পারলাম না যে একজন সেনাবাহিনীর কাপ্টেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন? কি এমন কারণ থাকতে পারে? যাই হোক আমি চাপরাশিকে বললাম, তাকে ভেতরে নিয়ে আসতে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই একজন লম্বা সুগঠিত দেহী যুবক আমার ঘরে প্রবেশ করল। লম্বায় প্রায় ৬ ফুট হবে। তাকে আমার সামনের চেয়ারে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলাম তার এখানে আসার কারণ।

কোনরকম ইতস্তত বা ভণিতা না করে সে সোজাসুজি বলল যে, সে কাগজে দেখেছে এবং লোকের মুখেও শুনছে যে আমি এটি ত্রিভাষী ছবি করছি—তাতে সে একটা পার্ট চায়।

এই কথা শুনে আমি তাকে জিগ্যেস করলাম যে, সে এর আগে কোথাও অভিনয় করেছে কিনা—তা সে স্টেজেই হোক আর ফিল্মেই হোক।

সে কিন্তু কোনরকম ইতস্তত না করে বলল: না, অভিনয় আমি কখনও করিনি। তবে আমার নিজের ওপর বিশ্বাস আছে যে অভিনেতা হিসাবে আপনাকে নিরাশ করব না। যদিও আপনি আমার কার্ডে নাম দেখে বুঝতে পারছেন যে আমি একজন সেনাবাহিনীর লোক। অবশ্য আগে আমি সেনাবাহিনীতে ছিলাম। এখন আর নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: এখন আর নেই কেন?

—মানে, আমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। বললেন তিনি।

—তার মানে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মি' থাপ্পান মৃদু হেসে বললেন: সে অনেক কথা স্যার। এখন আমি একটা কাজ চাই—এবং সেটা আমার তাড়াতাড়ি চাই।

আমি বললাম: কিন্তু আপনি ত এর আগে কখনও অভিনয় করেননি। আপনি কি পারবেন?

মিঃ থাপ্পান বললেন: বেশ ত আপনি আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন—দেখুন আমি পারি কিনা।

তাকে এরকম সহজভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখে আমার কিরকম ভাল লেগে গেল মিঃ থাপ্পানকে। তার পার্সোন্যালিটি আমাকে আকৃষ্ট করল, আর বিশেষ করে আকৃষ্ট করল তার ইংরাজী উচ্চারণ। চমৎকার উচ্চারণ—কোথাও কোন জড়তা নেই—স্পষ্ট ও পরিষ্কার।

আমার মনের ভাব আর আমি চেপে রাখতে পারলাম না, বলেই ফেললাম: আপনি তো চমৎকার ইংরাজী বলেন! আপনি বুঝি অনেকদিন বিলেতে ছিলেন?

মিঃ থাপ্পান বললেন: খুব ছোটবেলা থেকেই আমি বিলেতের এক স্কুলে লেখাপড়া শিখেছি।

আমার মনে হল এতদিন 'জেনারেল টায়া' চরিত্রটির (ইংরাজী সংস্করণ) জন্ত যে আপ্রাণ সন্ধান চারিদিকে করছিলাম—ক্যাপ্টেন থাপ্পান যেন ঈশ্বর-প্রেরিত সেই ব্যক্তি। তার ইংরাজী বাচনও নির্ভুল এবং নিখুঁত। যদিও সে চিত্রজগতে একেবারে নবাগত, তবু আমি তাকেই ঐ চরিত্রটির জন্য ঠিক করে ফেললাম, এবং আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে আমার নির্বাচন ঠিকই হয়েছিল, থাপ্পান তার ভূমিকাটির উপর পূর্ণ সুবিচার করেছিল।

জুন মাস নাগাদ আমাদের শুটিং সুরু হলো। এমন সুষ্ঠু পরিবেশে এবং সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ আমি ইতিপূর্বে আর করিনি। প্রোডিউসার মিঃ ওয়াদিয়া কখনও শুটিং-এর সময় 'ফ্লোরে' আসেননি, কিন্তু সমস্ত বিভাগের কাজ-কর্ম তিনি এমন সুন্দরভাবে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন যে মনে হতো যেন মেসিনে কাজ হচ্ছে। এক-একটি 'সেটে'র শুটিং শেষ হলেই আমরা সকলে বসে rush-print দেখতাম। কোনো কিছু আমাদের ভাল না লাগলে সেই সব দৃশ্যগুলি আবার তোলার আয়োজন করতাম অবশ্য সে রকম re-take আমাদের খুব কমই হতো।

লোকে শুনলে অবাক হবে যে 'রাজনর্তকী'র মত ওরকম একটি বিরাট ছবি, যার মধ্যে অতগুলো বড় বড় সেট, অত নাচ, গান এবং তাও আবার তিনটি সংস্করণে (বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী)—তুলতে সময় লেগেছিল মাত্র ছ'মাস।

এই অত্যাশ্চর্য জিনিস সম্ভব হয়েছিল সেদিন যেটা আজ একেবারে অসম্ভব। তার কারণ হলো—প্রত্যেকটি শিল্পীই এখান ছাড়া আর কোথাও অভিনয় করতে পারবেন না ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তারপর নিজের স্টুডিও, নিজের টেকনিসিয়ান, টাকা-পয়সার অভাব নেই এবং সর্বোপরি প্রোডিউসার, পরিচালকের ওপর সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত। কোনো বিষয়েই অনাবশ্যক প্রশ্ন করে সবজান্তা সেজে, কাজে ব্যাঘাত ঘটাতেন না। প্রডিউসারের এই অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং তাঁর প্লানিং ও স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিনের ফলে সমস্ত কর্মীরা যেন প্রাণ দিয়ে কাজ করত—মনে হতো যেন একটি বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। সকলেরই লক্ষ্য এক—ছবিটিকে ভাল করা। যার যতটুকু ক্ষমতা সে তাই দিয়েই ছবিখানিকে সার্থকতার পথে টেনে নিয়ে যেত।

এই প্রসঙ্গে সেকাল ও একালের চিত্র-নির্মাণপদ্ধতির একটা তুলনামূলক সমালোচনা করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমি এই শিল্পের প্রথম যুগের মানুষ—আজকে যে শিল্পকে আমরা এত বিরাট দেখছি—প্রদর্শন, পরিবেশন, নির্মাণ—তৎসহ যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও আনুসঙ্গিক বহু

বিভাগ নিয়ে এক সুবিশাল মহীরুহ—একদিন তাকে আমি দেখেছি অঙ্কুর রূপে—সবে মাত্র জন্ম নিয়েছে। বহু লোকের পরিশ্রম, চিন্তা ও সৃষ্টির প্রেরণায় অভিসিঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তখনকার কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আজকের কর্ম-পদ্ধতির কত তফাৎ! সেই সম্বন্ধেই কিছু বলছি।

তখনকার দিনে যাঁরা চিত্রনির্মাণ করতেন, তাঁদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল একটা ভাল জিনিস তৈরী করা—একটা বড় জিনিস তৈরী করা, এবং এই সৃষ্টির প্রেরণাতেই তাঁরা অনেক কিছু ত্যাগস্বীকার করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে এ ধরনের কাজ যা অনেক লোকের বহু পরিশ্রমের ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়, তাতে প্রয়োজন সমস্ত কর্মীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা। সমস্ত কর্মীর মন বাঁধা থাকবে একটি সূত্রে—লক্ষ্য হবে যাতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বজায় থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠানের তৈরী ছবি দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারে। সেইজন্যে কলাকুশলীরা এবং শিল্পীরা একখানি ছবি হিসেবে চুক্তি করতেন না—তাঁরা পাকাপাকিভাবে মাসিক মাহিনায় কাজ করতেন। ফলে কর্তৃপক্ষ সবসময়ের জন্যেই শিল্পী এবং কলাকুশলীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেতেন এবং একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে, যাকে বলে প্ল্যানিং, কাজ করবার সুযোগ পেতেন।

এখন যেমন, শিল্পীরা তো বটেই, নামকরা কলাকুশলীরা পর্যন্ত একসঙ্গে বহু ছবিতে কাজ করেন এবং চিত্র-নির্মাতাদের নিজস্ব স্টুডিও পর্যন্ত নেই, সুতরাং প্রডিউসারদের খেয়াল খুশী এবং মর্জি অনুসারে ছবির কাজ এগিয়ে চলে। প্ল্যানিং এবং ডিসিপ্লিন-এর কোন বালাই নেই—এর ফলে একখানি ছবি শেষ হতেও যেমন দেরী হয়, অর্থব্যয়ও হয় পরিকল্পনার অতীত।

নির্বাক যুগে এবং পরে সবাক যুগেও—বিশ্বমহাযুদ্ধের আগে, এমনকি দু-এক বছর পরেও আমি যেসব চিত্রনির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করেছি ভাল প্ল্যানিং এবং ষ্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিনের ফলে ছবি শেষ করতে বেশী সময় লাগত না।

কিন্তু কেন সেই পরিবেশের অস্তিত্ব আজ অবলুপ্ত? এর কারণ খুঁজতে বেশী দূর যেতে হবে না। যুদ্ধপর্ব এবং যুদ্ধোত্তরকালের চিত্রশিল্পের সমালোচনা করলেই দেখা যাবে যে সর্বগ্রাসী যুদ্ধই আমাদের চিত্রশিল্পের সেই সুন্দর পরিবেশে বিরাট ফাটল ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

যুদ্ধের সময় হলো বিরাট মুদ্রাস্ফীতি। লোকের হাতে তখন প্রচুর টাকা। সদুপায়ে অর্জিত থেকে অসদুপায়ের অর্জনই বেশী। এলো ফিল্ম কোটা—তৎসংশ্লিষ্ট লাইসেন্স প্রথা। যারা লাইসেন্স পেল, তাদের মধ্যে অনেকেই বিরাট অঙ্কের টাকার

বিনিময়ে লাইসেন্স বিক্রি করে দিতে লাগল। মুদ্রাস্ফীতির ফলে ছবির নির্মাণসংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। শিল্পীদের চাহিদাও বেড়ে গেল—তখন আর তাঁরা বাঁধা মাহিনায় কাজ করতে চাইলেন না। তাঁরা শুরু করলেন ছবিতে কণ্ট্রাক্টের ভিত্তিতে কাজ করতে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা,—মানে 'স্টার'-রা—যাঁরা কেউ মাসে হাজার টাকার বেশী মাহিনা পেতেন না—তাঁরা তাঁদের পারিশ্রমিকের হার বাড়াতে বাড়াতে বম্বেতে এখন একজন 'স্টার' প্রতি ছবির জন্যে পারিশ্রমিক নেয় ছয় থেকে দশ লাখ টাকা আর বাংলাদেশের স্টার'রা নেয় ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা। অবশ্য দুই-একজন 'স্টার' এখানেও আছেন যাঁরা বাংলা ছবিতে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে থাকেন।

বড় বড় 'স্টার'রা যে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন এর জন্যে আমার বিন্দুমাত্র হিংসা বা গাত্রদাহ নেই, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হলো, একজন শিল্পীর সঙ্গে একজন শীর্ষস্থানীয় কলাকুশলীর অর্থাগমের দিক থেকে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ—সেইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো। পরিচালক 'স্টার' তৈরী করেন, কিন্তু একজন ভাল পরিচালকের প্রতি ছবির জন্য আয় হলো দশ থেকে পনেরো হাজার—অবশ্য বাংলাদেশে কয়েকজন মুষ্টিমেয় শীর্ষস্থানীয় পরিচালক আছেন যাঁরা ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ হাজার টাকাও পেয়ে থাকেন।

একজন শিল্পী একসঙ্গে দুই কি তিন, কি কোন কোন সময় চারখানা ছবিতে কাজ করে থাকেন, কিন্তু একজন পরিচালক, যাঁর ওপর সমস্ত ছবির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তিনি একসঙ্গে একাধিক ছবি করতে পারেন না। আর একখানি ছবি শেষ করতে প্রায় ৮ থেকে ১০ মাস সময় লাগে। তাহলে 'স্টার'দের তুলনায় তাঁর মাসিক আয় কত দাঁড়াল? অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কলাকুশলীদের (যেমন ক্যামেরাম্যান, শব্দযন্ত্রী, সম্পাদক) আয়ও মাসে ৬০০ টাকার বেশী হয় না। বেশীর ভাগ বড় বড় কলাকুশলীরা (শব্দযন্ত্রী ছাড়া) এবং তাদের সহকারীরা ছবি-পিছু চুক্তিতে কাজ করে থাকেন অর্থাৎ free-lancer (ফ্রি ল্যান্সার) সেইজন্য একটা ছবি হয়ে যাবার পর অনেক সময় বহুদিন বসে থাকতে হয় নতুন ছবির আশায় বা নতুন কোন কণ্ট্রাক্টের আশায়। এইখানেই হলো আসল ট্র্যাজেডী যে একজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পীর সঙ্গে টেকনিসিয়ানের কি বিরাট ব্যবধান—অথচ এই টেকনিসিয়ানরা না হলে বড় বড় শিল্পীদের আবির্ভাবই ঘটত না।

আজকাল অবশ্য খুব আনন্দের বিষয় যে, অন্ততঃ বাংলাদেশে কয়েকজন প্রগতিশীল তরুণ পরিচালক এই 'স্টার প্রথা'র উচ্ছেদসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন কিন্তু

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে বেশীরভাগ পরিবেশকরা যাঁরাই এখন বলতে গেলে ছবির আসল নির্মাতা, তাঁরা সেই পুরোন স্টার প্রথাটিকে এখনো আঁকড়ে ধরে আছেন। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে 'স্টারদের' পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা সত্ত্বেও তাদের ছবি দেখে দর্শকরা তৃপ্ত হয়নি। সে ছবিগুলি ব্যর্থ অর্থাৎ যাকে বলা হয় flop হয়েছে।

আগেকার দিনে প্রোডিউসার এবং ডিরেক্টরই ছিলেন সর্বেসর্বা। স্টার বা ডিস্ট্রিবিউটাররা এবং চিত্রগৃহের মালিকরা সবসময়ই তাঁদের সমীহ করে কথা বলতেন। আর এখন সব উল্টো। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরিচালক এবং প্রেডিউসারের কোনো ব্যক্তিত্বই নেই, নেই কিছু জোর করে বলার ক্ষমতা। এখন যা কিছু করবেন সব, নয় স্টার'রা, নয় ডিস্ট্রিবিউটার কিংবা এক্সিজিবিটার।

এতক্ষণ একজন শীর্ষস্থানীয় টেকনিসিয়ানের আয়ের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আইডিয়া দিলাম কিন্তু উপরোক্ত টেকনিসিয়ানরা ছাড়াও আরও অনেক ছোট বড় কর্মীরা আছে যারা একটি চিত্রনির্মাণে তাদের সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করে। এই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে তিল-তিল করে একটি ছবির সম্পূর্ণ রূপ। কিন্তু একজন সহকারী ক্যামেরাম্যান, ব্যবস্থাপক ওতার সহকারী সম্পাদক ও অন্যান্য বিভাগের কর্মীদের গড়পড়তা আয় কত? খুব যদি বেশী হয় তবে মাসে ১৫০৲ থেকে ৩০০ টাকা। আর এ তো সব ছবি-পিছু চুক্তির ব্যাপার—ছবিও শেষ হলো তারাও আবার বেকার হলো বেশ কিছুদিনের জন্যে।

আমি আগেই বলেছি যে আগেকার দিনে স্টুডিওর মালিকেরাই ছিলেন সত্যিকার প্রোডিউসার এবং সেখানে এই সব কলা-কুশলীরা স্থায়ীভাবে মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত থাকতেন। আজকাল স্টুডিওগুলির একমাত্র আয় হলো ভাড়া দেওয়া—সুতরাং শব্দযন্ত্রী ও তার সহকারী, ইলেক্‌ট্রিসিয়ান, সেটিংস কুলী এবং ছুতাররা ছাড়া স্থায়ী ভাবে কেউই নিযুক্ত নয়। আর এই সব স্থায়ী কর্মীদের আয় কত জানেন?

একজন শব্দযন্ত্রী যাঁর অভিজ্ঞতা মনে করুন ২৫।৩০বছরের, তিনি মাসে ৬০০।৭০০ টাকার বেশী পান না। অন্যান্য কর্মীরা যেমন ছুতার, ইলেক্‌ট্রিসিয়ান বা চিত্রকর—এঁরা যে কি পান তা আর না বলাই ভাল। এই সব কর্মীদের বলা হয় সুদক্ষ কর্মী। এঁরা পান মাসে ১৩০৲-১৫০৲ টাকা আর যারা সুদক্ষ কর্মী নয়, যেমন সেটিংস কুলী প্রভৃতি—তারা পায় মাসে ৭৫৲ টাকা করে। আমি আমার পাঠক-পাঠিকাদের জিজ্ঞাসা করছি—আপনারা বলুন এটা কি কোনোরকমে বেঁচে থাকার মত মাহিনা

আজকালকার দিনে ? সুতরাং শুনে অবাক হবার কিছু নেই, যে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কলাকুশলী ছাড়া বেশীর ভাগ স্টুডিও কর্মীরাই দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে পায় না—তাহলে তাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ দুরবস্থার কথাটা একবার ভেবে দেখুন তো !

আগেকার দিনে চিত্রশালাগুলি ছিল শিল্পমন্দির। আর আজ সেগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে ফিল্ম কারখানা। বেশীরভাগ কর্মী কলাকুশলী এবং শিল্পীদের জীবনে আজ আর কোন লক্ষ্য নেই—নেই কোনো আদর্শ। এঁদের গতি আছে, কিন্তু স্থিতি নেই। থাকবেই বা কি করে ?

অনিশ্চয়তার দুর্নিবার স্রোতে, ভাগ্য আজ এঁদের বানচাল হয়ে গেছে। আজকের চিত্রশিল্প দুলছে অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চয়তার দোলায়—আর সেই সঙ্গে দুলছে যাঁরা ছবি করেন তাদের ভাগ্য—অর্থাৎ কর্মী এবং কলাকুশলীরা।

এ অবস্থায় অনাহারে এবং অর্ধাহারে যে সব কর্মীদের দিন কাটে তারা কি করে সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে কাজ করবে ? শীর্ষস্থানীয় শিল্পী এবং কলাকুশলীরা যাদের কোনো অভাব নেই, অভিযোগ নেই—তাদের সঙ্গে কি করে একসঙ্গে হাত মিলিয়ে এই সব কর্মীরা সহযোগিতা করবে ?

কয়েকজন মুষ্টিমেয় শীর্ষস্থানীয় 'স্টার'দের প্রভাব প্রতিপত্তিই আমাদের চিত্রজগতে আজকাল সমধিক, বিশেষ করে বম্বেতে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে বম্বের মতো অতটা 'তারকা-প্রীতি' নেই—এখানে একটা বাংলা ছবি ছ'মাসের মধ্যে শেষ করা যায়। কিন্তু বম্বেতে প্রোডিউসারদের 'তারকা প্রীতি' এত বেশী যে এক-একজন 'স্টার'কে একসঙ্গে ৩।৪ খানি—কিংবা কোনো সময় তারও বেশী ছবিতে কাজ করতে হয়। কিন্তু গোলমাল বাধে যখন প্রোডিউসারকে শুটিং-এর দিন দিতে হয়। সেজন্য তারা প্রোডিউসারদের মাসে ৪।৫ দিন, কোন মাসে তারও কম দিন দিতে বাধ্য হয়। সেরকম ব্যস্ত শিল্পী হলে কোন কোন প্রডিউসার হয়ত ২।৩ মাস ধরেই কোনো দিন পেলেন না। ফলে একখানি হিন্দী ছবির শুটিং চলে মাসের পর মাস ধরে, কোন কোন ক্ষেত্রে বছরের পর বছর ধরে।

সেজন্য আজকের কোন প্রোডিউসার বা ডিষ্ট্রিবিউটার কল্পনাও করতে পারেন না যে কি করে 'রাজনর্তকী'র মত একখানি ত্রিভাষী ছবি (ইংরাজী সংস্করণসহ)—যার অত জাঁক-জমকপূর্ণ বিরাট সেটিংস, বড় বড় নৃত্য-সমাবেশ এবং গান নিয়ে—ছ'মাসের মধ্যে শেষ হয়! এইখানেই স্টুডিওর সর্ববিভাগের কর্মীদের সঙ্গে প্রডিউসার, ডিরেক্টার, শিল্পী ও কলাকুশলীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জলন্ত প্রমাণ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা আজ স্বপ্ন বলে মনে হবে!

এবার আবার 'রাজনর্তকী'র কথায় ফিরে আসি।

'রাজনর্তকী'র তিনটি সংস্করণেরই শুটিং শেষ হয়ে গেল ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ। আমার এখনও মনে আছে মিঃ জে. বি. এচ. ওয়াদিয়া একদিন বলেছিলেন: মিঃ বোস, আপনার মনে আছে কি, যে আমরা কন্ট্রাক্ট সই করেছিলাম এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখে। আমাদের বন্ধু-বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীদের অনেকেই বলেছিলেন যে ১৩ তারিখে কণ্ট্রাক্ট সই করছেন, দেখবেন ছবি শেষ করতে কত বেগ পেতে হয়। এত বড় ছবি—এত টাকা খরচ করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মধ্যে তো কোনরকমই গণ্ডগোল হয়নি, এমনকি re-take (যা প্রায় সব ছবিতেই কিছু না কিছু হয়ে থাকে)—তাও সামান্য একটু আধটু ছাড়া কিছুই হয়নি।'

আমি মিঃ ওয়াদিয়ার সঙ্গে একমত হয়ে বললাম যে, এরকম একটা বিরাট কাজ এমন সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়েছে শুধু তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্যে।

তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন: 'না-না মিঃ বোস, শুধু আমার একার সহযোগিতা নয়—এই ছবির সঙ্গে সংযুক্ত প্রত্যেকটি কর্মী, শিল্পী ও কলাকুশলী—সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, যে রকম প্রাণ দিয়ে সহযোগিতা করেছে—তার ফলেই সম্ভব হয়েছে এই অসাধ্যসাধন।'

যাই হোক, এই 'অশুভ ১৩' আমাদের জীবনে সবথেকে শুভদিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আজ লিখতে লিখতে unlucky 13 বা অশুভ ১৩ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। কথাটা তাহলে বলি—

আমার ও সাধনার বিয়ের তারিখ প্রথমে ঠিক হয়েছিল ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩০। কিন্তু যখন আমার বন্ধু বান্ধব সব বলতে লাগল: ১৩ তারিখে বিয়ে করছিস? দিনটা বদলে ফেল এখনো। এদিনে বিয়ে করলে জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পাবি। শুনে শুনে আমারও মনে কেমন একটা খটকা লাগল এবং শেষে আমারই পীড়াপীড়িতে ১৩ তারিখ বদলে ১৫ তারিখ করা হলো—এ কথা আগেই বলেছি!

জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত এবং বহুরকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা দুজনেই গেছি—তাই আজ আমাদের মনে হয় যে বিয়েটা হয়ত ১৩ তারিখে হলেই ভাল হতো। অবশ্য জানি যে এটা একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আর আজ আমার পরিণত বয়েসে এও জানি যে, 'ললাটের লিখন কভু না যায় খণ্ডন'—

'What is ordained must happen'. কিন্তু আমি তো সাধারণ মানুষ—সংস্কার এবং কুসংস্কার দুই-ই বর্তমান আমার মধ্যে—তাই পরবর্তী জীবনে যখনই কোন শুভ-কর্মের সূচনা হয়েছে ১৩ তারিখে, তখনই মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করেছে। কারণ জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় দিন হলো বিবাহের দিন—সেটা জিদের বসে ১৩ তারিখ বদলে ১৫ তারিখ করে কি সুফল হলো? এই নিয়ে সাধনার সঙ্গে কথাও হয় আমার মাঝে মাঝে।

আবার 'রাজনর্তকী'র কথায় ফিরে আসি···।

শ্যামের সঙ্গে আমি "রাজনর্তকী" সম্পাদনার কাজ সুরু করলাম। প্রথমেই আমরা ধরলাম নাচের দৃশ্যগুলিকে। ছবিখানির মধ্যে সব শুদ্ধ তিনটি নাচ ছিল—তার মধ্যে দুটি বড় এবং একটি সাধনার একক। বড় নাচগুলির মধ্যে একটি হলো 'রাসলীলা' (সাধনা, মাধব মেনন ও ব্যালে) এবং আর একটি হলো রাজদরবারে নৃত্য (সাধনা ও ব্যালে)। নাচগুলির প্রচুর Shot ছিল। বড় নাচগুলির চিত্রগ্রহণের সময় দুটি ক্যামেরা তো ব্যবহার করা হোতই কখনও কখনও তিনটি ক্যামেরাও ব্যবহৃত হতো। তিন সংস্করণের জন্য প্রত্যেকটি শট তিনবার করে নিতে হয়েছিল।

আমরা প্রথমে হিন্দী সংস্করণের কাজটি সুরু করলাম। কারণ মিঃ ওয়াদিয়া বলে ছিলেন যে এই সংস্করণটি আগে মুক্তিলাভ করবে—ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ এর গোড়ার দিকে। সম্পাদনা সম্বন্ধে আমি সবিস্তারে কিছু বলতে চাই না, কারণ সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম টেক্‌নিক্যাল ব্যাপার। প্রায় ৫।৬ পিক্‌চার নেগেটিভের যথাযথ সাউণ্ড নিগেটিভ সংমিশ্রণ করে কোন্‌টা রাখব, কোনটা বাতিল করব—এই ঠিক করতে অসম্ভব বিচারবুদ্ধি একাগ্রতা এবং সময়ের দরকার হতো। কোন কোন দিন আমি শ্যাম আর শ্যামের দুইজন সহকারী কাজ করতে করতে গভীর রাত্রি হয়ে যেত—এক এক দিন ভোর হয়ে যেত। আমরা কাজের মধ্যে এমন ডুবে যেতাম যে হাতের কাজ শেষ না করে উঠতেই পারতাম না। আর এসব কাজ এমনই গোলমেলে যে অর্ধসমাপ্ত করে ওঠাও যায় না। যাই হোক, একটি সংস্করণের তিনটি নাচের সম্পাদনা যেদিন শেষ হলো, আমি আর শ্যাম নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম অন্য সংস্করণের নাচগুলিও এই একইভাবে সম্পাদনা করা হলো।

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নাগাৎ হিন্দী সংস্করণের সম্পাদনা শেষ হলো। তারপর আবহসঙ্গীত এবং Title music নেওয়ার পর জানুয়ারীর শেষাশেষি release print তৈরি হয়ে গেল। বোম্বাইয়ের রয়েল অপেরা হাউসে ৮ই ফেব্রুয়ারী

১৯৪১ সালে রাজনর্তকীর হিন্দি সংস্করণ মুক্তিলাভ করল। ছবি দেখে দর্শক ও সমালোচকদের উচ্ছসিত প্রশংসায় আমাদের মন আনন্দে ও গর্বে ভরে উঠল।

এখানে বম্বের এবং মাদ্রাজের কয়েকটি বিশিষ্ট সমালোচকের সমালোচনা উদ্ধৃত করলাম।

" ..Raj-Nartaki" is a beautiful picture—" a thing of beauty' in truth that may well be "a joy for ever"......bouquets are to be handed to Director Modhu Bose for grand work......the picture is well dressed, well photographed and eminently well presented throughout.

TIMES OF INDIA BOMBAY (15.2.41)

"...Sadhona Bose in the title role is a dream of grace and beauty come to life, exquisite in the sinuous grace and bewitching rhythm of her dancing...she reveals a flawless histrionic genius...Prithviraj puts over an attractive performance..."

THE EVENING NEWS OF INDIA. BOMBAY (20.2.41.)

"...Director Modhu Bose has given us one of the most remarkable of Indian productions. Ahindra Choudhury in the role of the high Priest, gives a performance which will be remembered as about the best of its kind we have had for a long time.

THE HINDU. MADRAS. (28.2.41).

এই অভাবিত সাফল্য আমাদের মনে এনে দিয়েছিল উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস সুতরাং বাংলা সংস্করণে সম্পাদনা খুব দ্রুত এগিয়ে চলল।

এই সময় সাধনার হাতে কোন কাজ ছিল না। সে আমাকে বলল যে গুজরাটের কয়েকটি জায়গায়, যেমন আহমেদাবাদ, সুরাট, বরোদায় তার নূতন সম্প্রদায় নিয়ে একটি সফরে বেরুতে চায়। গুজরাট ছাড়া বম্বেতে ও দক্ষিণ ভারতেও কয়েকটি শো দিতে চায়। তিমিরবরণ ও অর্কেস্ট্রা তো হাতের কাছে ছিল, এছাড়া মাধব মেননও রয়েছে বম্বেতে; শুধু ব্যালের জন্য কয়েকটি মেয়ে ঠিক করতে হবে এবং তাদের রিহার্সাল দিতে হবে। আমি সাধনাকে বললাম যে আমার তো এখন সময় নেই—আমায় এখন বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ 'কোর্টডান্সার'-এর সম্পাদনা করতে হবে। আমি বরং আমার বন্ধু হরেন ঘোষকে ঠিক করে দিচ্ছি সে তোমার সঙ্গে যাবে আর সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে। হরেন তখন অনেক বড় বড় শিল্পী ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে ইম্প্রেসারিও হিসেবে।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি আমি কলকাতার মন্মথর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম যে নিউ থিয়েটার্সের শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার তার কাছে একটি প্রস্তাব করেছেন যে আমি ও সাধনা নিউ থিয়েটার্সের হয়ে একখানি দোভাষী ছবি করতে রাজী আছি কিনা। হ্যাঁ, আমি বলতে ভুলে গেছি যে গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৪০)

রাজনর্তকীর শুটিং শেষ হবার পর মিঃ জে. বি. এচ. ওয়াদিয়ার সঙ্গে আর একখানি দোভাষী ছবি করার কণ্ট্রাক্ট সই করেছিলাম।

বোম্বাইতে আমি আছি প্রায় দুবছর হলো কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এখানকার জীবনধারার সঙ্গে কেন জানি না এখনও খাপ খাইয়ে নিতে পারিনি। যদিও বম্বে কলকাতার চেয়ে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর আধুনিক ক্লাব রয়েছে—বোম্বায়ের কাছাকাছি কয়েক মাইলের মধ্যে চমৎকার চমৎকার বেড়াবার জায়গা রয়েছে যেগুলো পিক্‌নিকের পক্ষে অপূর্ব—বম্বে থেকে পুণা মোটরে যাবার সুন্দর রাস্তা—সবার উপরে মেরিন ড্রাইভে আমাদের ফ্ল্যাট···এত সব আকর্ষণ সত্ত্বেও কলকাতার দিকে আমার মন পড়ে থাকত। আমার সেই চৌরঙ্গী প্লেসের ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের মধ্যে যে পরিবেশ ও প্রাণের স্পর্শ পেতাম, এখানে তার অভাবটাই সব থেকে বেশী অনুভব করতাম। বম্বেকে আমার মনে হতো যেন দেহ আছে প্রাণ নেই। রূপের দীপ্তি আছে কিন্তু স্নিগ্ধতা নেই। ওখানেও আমার বহু বন্ধুবান্ধব ছিল—কয়েকজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু যেন সেই প্রাণের স্পর্শ টুকু ছিল না, যেখানে মানুষ পায় সান্ত্বনা এবং নির্ভরতা। কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যেমন প্রাণখুলে মিশতে কোনো সঙ্কোচ হতো না, এখানে বন্ধুত্ব যতই গাঢ় হোক না কেন, কোথায় যেন একটা ব্যবধান রয়েই যেত।

সেজন্যে কলকাতায় অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যেও নিজের লোকজনের মধ্যে, নিজের সেই অতি-পরিচিত পরিবেশের মধ্যে ফিরে আসবার জন্যে আমার মনটা ছটফট করছিল। তাই আমি নিউ থিয়েটার্সের এই প্রস্তাবের কথাটি মিঃ ওয়াদিয়াকে বললাম। আমি আগেই বলেছি যে, মিঃ ওয়াদিয়া যে আমার একজন বিশেষ বন্ধু এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাই নয়, তিনি লোকের মনের আসল খবরটি ঠিক বুঝতে পারতেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিলেন—কেন আমি কলকাতা ফিরে যেতে চাই—শুধু যে নিউ থিয়েটার্সের কনট্রাক্ট তা নয়—কারণ, তাঁর সঙ্গে তো আমার আগেই আর একখানি ছবির জন্যে কণ্ট্রাক্ট হয়েই ছিল। আমি চাই আমার সেই পুরোন পরিবেশে ফিরে যেতে। তিনি ঠিক আমার মনের গোপন কথাটিই বলে দিলেন: আমি বুঝেছি মিঃ বোস আপনি কেন যেতে চান। নিউ থিয়েটার্সের হয়ে একখানি ছবি করবেন—এটাই একমাত্র কারণ নয়, কারণ আমার সঙ্গে তো আপনার আর একখানি ছবির কণ্ট্রাক্ট আছে। এছাড়াও অন্য কারণ, যেটা আমি বুঝতে পারছি। আমি আপনার সঙ্গে মিশে যেটুকু বুঝতে পারছি তা হলো, আপনি এমন একটি ঘরোয়া পরিবেশ খুঁজছেন, যা বম্বে আপনাকে দিতে পারছে না। এখানে

চারিদিকে সম্পদের সমারোহ, চারিদিকে আধুনিক সভ্যতার উগ্র প্রকাশ কিন্তু কোনো প্রাণের স্পর্শ নেই, নেই কোনো আন্তরিক সহানুভূতি। আপনার সঙ্গে, মন্মথ ও সুধাংশু চৌধুরীর সঙ্গে, বাঙালীদের সেন্টিমেন্টাল স্বভাব ও ভাবধারা নিয়ে অনেক সময় হাস্য-পরিহাস করেছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—আপনার সঙ্গে আমার আলাপ ৬।৭ মাসের বেশী নয়—আপনাকে আমি যতখানি আপনার বলে মনে করতে পেরেছি, যারা আমার সঙ্গে বহু বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাদেরও আমি এতখানি আপনার বলে ভাবতে পারি না।

মিঃ ওয়াদিয়ার মনের এই অদ্ভুত কোমল দিকটি আমার অন্তর স্পর্শ করল, তাঁর আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হলাম। আমি বললাম: আমিও ঠিক এই কথাই ভাবি মিঃ ওয়াদিয়া। আপনার সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম দেখা হয়, সেইদিন থেকেই মনে হয়েছে আপনি যেন আমার কত কালের চেনা—সেইদিন থেকেই পেয়েছি আপনাকে একান্ত বন্ধুভাবে—আমাদের সম্পর্ক প্রযোজক ও পরিচালকের মধ্যে যা হয় তা নয়।—আমরা দু'জনেই দু'জনকে স্পষ্টভাবে চিনতে পেরেছি, সেইজন্যেই আমাদের কাজও হয়েছে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে—একদিনের জন্যেও আমাদের মধ্যে কোনরকম মনান্তর বা মতান্তর হয়নি।

সমুদ্রের ধারে Worli Sea Face-এ মিঃ ওয়াদিয়ার সুন্দর আধুনিক বাড়ীর বারান্দায় বসে আমাদের কথা হচ্ছিল। সঙ্গে অবশ্য পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। হুইস্কিসোডার সঙ্গে রেডিয়োগ্রাম থেকে ভেসে আসা হাল্কা সংগীতের সুর—সামনে সমুদ্রের মৃদু কল্লোল—এরই মধ্যে আমাদের দু'জনের প্রাণখোলা আলাপ-আলোচনায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। মিঃ ওয়াদিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার কালে করমর্দন করবার সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমাদের এ-বন্ধুত্ব চিরদিন অটুট থাকবে। আজও আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের সে-বন্ধুত্ব এখনও তেমনি অম্লান আছে। ক'এক বছর আগে তিনি যখন কলকাতা এসেছিলেন কোন একখানি ওয়াদিয়া মুভিটোনের ছবির রিলিজের ব্যাপারে তখন আমাকে ও সাধনাকে একটি 'ককটেল পার্টি'তে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু সাধনা যেতে পারেনি বলে তিনি বহু কাজের ভিড়ের মধ্যেও, বম্বেতে ফেরবার আগে আমাদের কারণানী এস্টেটের ফ্ল্যাটে তাঁর মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম—নিউ থিয়েটার্সের কন্ট্র্যাক্টের কথা। মিঃ ওয়াদিয়ার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেল যে, নিউ থিয়েটার্সে দোভাষী ছবিখানি শেষ করার পরই

আমি আর সাধনা বোম্বাই ফিরে এসে ওয়াদিয়া মুভিটোনের হয়ে একটি দোভাষী ছবি করব।

আমি মন্মথকে লিখে দিলাম—নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে আমার আর সাধনার কণ্ট্রাক্টের খসড়া পাঠিয়ে দিতে।

তখন ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি। সাধনা তার আসন্ন সফরের নাচের রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত আর আমি ব্যস্ত রয়েছি রাজনর্তকী'-র বাংলা সংস্করণের সম্পাদনা নিয়ে।

ফেব্রুয়ারীর শেষদিকেই আমি আমার সহকারী হেমন্তকে নিয়ে চলে এলাম কলকাতায় বাংলা সংস্করণ রিলিজ করতে। সঙ্গে নিয়ে এলাম পাবলিসিটির সমস্ত মালমশলা। আগেই বলেছি যে মিঃ ওয়াদিয়ার আমার ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল, তিনি বলে দিয়েছিলেন আমি যেরকম ভাল মনে করব সেইভাবেই যেন পাবলিসিটি হয়। আমি তাঁকে অনেক করে বলেছিলাম 'রাজনর্তকী' (বাংলা)-র রিলিজের সময় কলকাতায় উপস্থিত থাকতে কিন্তু তিনি বললেন যে বম্বেতে 'রাজনর্তকী' হিন্দি সংস্করণ 'হিট' করেছে, সুতরাং তিনি এখন পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের রিলিজের জন্য খুব ব্যস্ত। এই কারণে তাঁর পক্ষে এখন কলকাতায় যাওয়া সম্ভব হবে না।

যাই হোক, 'রাজনর্তকী' মুক্তিলাভ করল উত্তরা সিনেমায় ৮ই মার্চ ১৯৪১ সালে এবং আমি খুব আনন্দের সঙ্গেই বলছি যে, হিন্দীর মতই বাংলা সংস্করণটিও সর্বশ্রেণীর দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল।

এখানে কলকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট সমালোচনা উদ্ধৃত করলাম :

"রাজনর্তকী—একসঙ্গে এই ছবিখানির তিনটি সংস্করণ বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজী তোলা হইয়াছে। এতবড় প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে এই প্রথম। ভারতীয় ছায়াচিত্রের ইতিহাসে ওয়াদিয়া মুভিটোন ও শ্রীযুক্ত মধু বোসের এই বিরাট প্রচেষ্টা নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল।···রাজনটীরূপে সাধনা বোসের অপরূপ নাটনৈপুণ্য তাঁহার পূর্ব গৌরবকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। তিনি যে ভারতের শ্রেষ্ঠতম অভিনেত্রী তাহা প্রমাণিত হইল··· প্রভুপাদের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী···এই নাটকীয় চরিত্রটির শ্রীযুক্ত চৌধুরী যথাযোগ্য রূপ দিয়াছেন। নায়ক চন্দ্রকীর্তিরূপে তরুণ প্রিয়দর্শন নট জ্যোতিপ্রকাশের অভিনয় সুন্দর। পরিচালক শ্রীযুক্ত বোস যে-চিত্র রচনা করিয়াছেন, রূপে, রসে ও বর্ণচ্ছটায় তাহাকে অনন্যসাধারণ বলা চলে ···চিত্রনাট্য রচনা ও Short division-এ তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমরা অকুণ্ঠকণ্ঠে অভিনন্দন জানাই।···তিমিরবরণ রচিত তিনটি নৃত্যের আবহসঙ্গীত আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে। ক্যামেরার কাজ প্রশংসনীয়।"

আনন্দবাজার পত্রিকা (২২-৩-৪১)

"......"Raj-Nartaki" is definitely a remarkable production in the annals of the Indian movies".

HINDUSTHAN STANDARD.
Calcutta, (21.3.41).

"......Sadhona Bose, in the title role, rises to dizzy heights on account of her magnificient exposition of histrionic talents and dancing...Music direction by Timir Baran is another highlight of the picture......I take my hat off in sincere admiration to the Producer Mr. J. B. H. Wadia and Director Modhu Bose for their memorable contribution to the Indian film-world".

DIPALI (Avimanyu).
Calcutta, 14.3.41.

কলকাতায় থাকাকালীন আমি নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে একখানি দোভাষী ছবির জন্যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলাম। এটা হলো ১৯৪১ সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে। ছবির শুটিং আরম্ভ হবে জুন মাস নাগাৎ। আমি মন্মথকে বললাম, এমন গল্প ঠিক করতে যাতে অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, জ্যোতিপ্রকাশ, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক) এবং নিউ থিয়েটার্সের অন্যান্য নামকরা শিল্পীদের ভাল চরিত্র থাকে। অবশ্য নায়িকার ভূমিকায় সাধনা তো থাকবেই। 'কুমকুম' এবং 'রাজনর্তকী' ছিল নৃত্যগীতবহুল কাহিনী কিন্তু এবারে আমি ঠিক করলাম পুরোপুরি একটি নাটকীয় কাহিনী করব।

মার্চ এবং এপ্রিল মাসে আমি 'রাজনর্তকী'র ইংরাজী সংস্করণটি (The Court Dancer)-র সম্পাদনায় ব্যস্ত রইলাম। সাধনা এর মধ্যে সুরাট, বরোদা, আহমেদাবাদ এবং বম্বেতে 'শো' দিয়ে বন্ধুবর হরেন ঘোষের সঙ্গে সদলবলে দক্ষিণ ভারতে চলে গেল। নাগপুর, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদে হরেন 'শো-র বন্দোবস্ত করেছিল।

মার্চ মাসের শেষাশেষি সাধনার বড়মামা বিচারপতি এস. এন. সেন বম্বেতে মারা গেলেন। দুঃখের বিষয় সাধনা তখন বম্বেতে ছিল না। আমি আগেই বলেছি যে, জাস্টিস সেনের পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় সাধনার সঙ্গে বিবাহসূত্রেই নয়—জাস্টিস সেনের পিতা মিঃ পি. সি. সেনের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের অনেক আগে থেকেই অন্তরঙ্গতা ছিল। সেজন্য বম্বেতে তাঁর অসুখের সময় আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব আমি করলাম, কিন্তু সকলের চেষ্টায় কোন ফলই হলো না—একদিন তিনি সকলের মায়া কাটিয়ে অনন্তধামে চলে গেলেন।

এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ 'কোর্ট ড্যান্সার'-এর সম্পাদনা শেষ হলো।

বোম্বাই-এর পাট তুলে আবার কলকাতায় আসার তোড়জোড় শুরু হলো।

জিনিসপত্র বাঁধাছাদা শুরু হলো,' আসবাবপত্র সব ভালোভাবে প্যাকিং করে ট্রেনে 'বুক' করা হলো—সেই সঙ্গে আমার Pontiac গাড়ীটাও।

বম্বে থেকে, আমি আমার বন্ধু জর্জি মিত্রকে লিখেছিলাম যে, মধ্য কলিকাতায় আমাদের জন্যে একটা 'ফ্ল্যাট' ঠিক করতে—সেই অনুসারে সে বিশপ লেফ্রয় রোডে, ক্যালকাটা ম্যানসনে একটি বেশ বড় 'ফ্ল্যাট' ঠিক করেছিল। যদিও তখন যুদ্ধের সময়—ঘৃণ্য 'সেলামী' প্রথা তখন বিশেষ চালু হয়নি কলকাতায়, তাই চার-কামরার একটি 'ফ্ল্যাট' পেলাম মাত্র ২৫০·০০ টাকা মাসিক ভাড়ায়। ইতিমধ্যে আমার সমস্ত আসবাবপত্র এবং Pontiac গাড়ীখানি বোম্বাই থেকে এসে পৌঁছে গেল।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আমি এ ফ্ল্যাটও ছেড়ে দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটাও বদল করলাম ; ছিল পণ্টিয়াক,—শুধু বছর দুই আগে কিনেছি, নতুন গাড়ী—বদলে হলো মাস্টার বুইক্। বন্ধুরা বললেন—তুমি মধু বোস, তোমার এখন কত নাম, কত যশ, চতুর্দিকে তোমার জয়জয়কার, এই সাধারণ পণ্টিয়াক গাড়ী কি তোমায় সাজে, না এই বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাট ? আমারও তাদের কথা মনে ধরল। এমনিই হয়, যশ এবং সাফল্য খানিকটা সুরার মত, এর ওপর আছে স্তাবকদের স্তুতি—এ মানুষ যত পাবে ততই তাকে বিভ্রান্ত করে তুলবে। সব সময় মাথা ঠিক রেখে কাজ করা যায় না—আমারও খানিকটা সেই অবস্থা হয়েছিল। 'আলিবাবা', 'অভিনয়', 'কুম্‌কুম্', 'রাজনর্তকী'—পর পর চার চারখানি ছবির সাফল্য তখন আমায় 'মাতাল' করে তুলেছে ; তখন তো আমি যে-সে লোক নই, আমি সাফল্যের শিখরে দণ্ডায়মান 'সার্থক পুরুষ মধু বোস'। চারদিকে তখন আমায় ঘিরে রয়েছে কত 'শুভকামী' বন্ধুবান্ধব! আমার কাছে আসছে কত রকমের প্রার্থী ; আমার সঙ্গে একটু কথা কইতে পেলে কত লোক নিজেকে ধন্য মনে করে। অতএব বদলাও গাড়ী, বদলাও বাড়ী।

পণ্টিয়াকের জায়গায় যেমন এল মাস্টার বুইক্, তেমনি বিশপ লেফ্রয় রোডের ক্যালকাটা ম্যানসনের ফ্ল্যাট ছেড়ে এসে উঠলাম স্টিফেন কোর্টের বড় ও দামী ফ্ল্যাটে। মিডল্‌টন্ রো ও পার্ক স্ট্রীটের সংযোগস্থলে এই বাড়ীটি আভিজাত্য ও পরিবেশের দিক দিয়ে অপরূপ। এতে ছিল ছ'খানি ঘর এবং একটা বিরাট বারান্দা। আমার আপিসের জন্যে একটি বড় ঘর এবং স্টেজ প্রোডাকসান, নাচের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি রাখবার জন্যেও আর যে একটি বড় ঘরের প্রয়োজন ছিল, তার সমাধান হয়ে গেল এই স্টিফেন কোর্টে। অথচ আজ শুনলে নিশ্চয়ই

অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, এই স্টিফেন কোর্টের বিরাট ফ্ল্যাটের ভাড়া ছিল তখন মাত্র ৩৭৫'০০ টাকা।

ইতিমধ্যে খুব সাফল্যজনকভাবে দক্ষিণ ভারত সফর শেষ করে সাধনা ফিরে এল হরেনের সঙ্গে।

এদিকে মন্মথ একটি বেশ নাটকীয় কাহিনী তৈরী করে রেখেছিল। কাহিনীটির নাম দেওয়া হলো "মীনাক্ষী"। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রনাট্য রচনা এবং শিল্পী-নির্বাচনের কাজে লেগে গেলাম। অবশ্য সাধনা হিন্দি ও বাংলা দুই সংস্করণেই নায়িকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করবে। অন্য প্রধান ভূমিকাগুলির জন্য নির্বাচিত হলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, দেববালা, রাজলক্ষ্মী (বড়), ইন্দু মুখোপাধ্যায় এবং নিউ থিয়েটার্সের অন্যান্য নিয়মিত শিল্পীরা। আর একটি বিশেষ ভূমিকার জন্য আমি নির্বাচন করলাম দুই সংস্করণের জন্যই অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'কে। এই ভূমিকাটিতে অনেকগুলি গান ছিল। পঙ্কজ মল্লিক তখন নিউ থিয়েটার্সের স্থায়ী সঙ্গীত পরিচালক—আমি তাঁকেই ঠিক করলাম সঙ্গীত পরিচালকরূপে। চিত্রনাট্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে আমার সহকারী হেমন্ত গানগুলি লিখে ফেলল এবং পঙ্কজ সেগুলিতে সুর দিতে লাগল। বাংলা সংস্করণে নায়কের ভূমিকায় ঠিক করলাম জ্যোতিপ্রকাশকে—যে আমার সঙ্গে 'রাজনর্তকী'তে নায়কের ভূমিকায় নেমেছিল এবং ইতিমধ্যে আরও কয়েকখানি ছবিতে অভিনয় করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। হিন্দি সংস্করণের জন্য ঠিক করলাম তদানীন্তন নিউ থিয়েটার্সের নিয়মিত শিল্পী কে. এল. সায়গলকে।

১৯৪১ সালের জুন মাসের শেষ নাগাৎ চিত্রনাট্য রচনা শেষ হলো এবং গানগুলির সুর রচনা করা হয়ে গেল। দুর্ভাগ্যবশত শেষ মুহূর্তে হিন্দি সংস্করণের নায়ক সায়গলকে নিয়ে লাগল গোলমাল। ব্যাপারটা খুবই সামান্য, কিন্তু সেটা এমন একটা রূপ নিল যার জন্যে নায়কের ভূমিকা থেকে সায়গলকে বদলে নাজমুল হোসেনকে নিতে হলো তার জায়গায়। ব্যাপারটা হচ্ছে সংক্ষেপে এই।

সাধনার কণ্ট্রাক্টের খসড়া আমিই বরাবর করতাম এবং 'রাজনর্তকী' ছবি থেকে ওর কণ্ট্রাক্টে থাকত, যে ছবির টাইটেলে ওর নাম একটি আলাদা টাইটেল কার্ড-এ লেখা হবে—ওর সঙ্গে আর কারুর নাম থাকবে না। সুতরাং নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গেও সাধনার কণ্ট্রাক্ট সেইভাবেই হলো।

সায়গল আমাকে অনুরোধ করেছিল যে সাধনার সঙ্গে ওর নামটাও দেবার জন্যে—সাধনার থেকে ছোট অক্ষরে হোক তাতে তার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু

সাধনা তাতে রাজী হলো না। সে জিদ ধরে বসল কণ্ট্রাক্ট যেভাবে সই হয়েছে তার নড়চড় চলবে না। নিউ থিয়েটার্সের শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার সব শুনে বললেন যে মিসেস বোস যখন রাজী হচ্ছেন না, তখন আমার কিছুই করার নেই। কণ্ট্রাক্ট অনুসারেই কাজ হবে। সায়গল যদি এতে রাজী না হয় তাহলে তার বদলে অন্য কাউকে নিতে হবে। এইভাবেই নাজমুল হোসেন নির্বাচিত হলো শেষ মুহূর্তে।

গায়ক-অভিনেতা সায়গলের তখন ভারত-জোড়া নাম, সেইজন্যই হিন্দি সংস্করণে নায়কের চরিত্রটি সঙ্গীতবহুল করা হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু সায়গলের বদলে যেই নাজমূলকে নেওয়া হলো অমনি সমস্ত গানগুলিকেও বাদ দিতে হলো এবং শেষ মুহূর্তে চিত্রনাট্যটি আবার নতুন করে লিখে চরিত্রটিও যথেষ্ট বদলাতে হলো। এর ফল বিশেষ ভালো হয়েছিল বলে মনে হয় না।

"মীনাক্ষী"র শুটিং শুরু হলো জুলাই মাসে। এর ক্যামেরাম্যান ছিলেন বিমল রায় আর শব্দযন্ত্রী ছিলেন বাণী দত্ত। খুব সুষ্ঠুভাবে চলল শুটিং এবং প্রোডিউসার মিঃ সরকারের কাছ থেকে সব রকম সাহায্য এবং সহযোগিতা আমি পেয়েছিলাম। মিঃ জে. বি. এচ. ওয়াদিয়ার মত তিনি কোনদিন আমার কাজের সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেন নি।

আমি আর সাধনা এই প্রথম নিউ থিয়েটার্সের হয়ে ছবি করছি, সুতরাং আমাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় এবং আমরা যাতে সবরকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাই তার জন্য তাঁর বিশেষ নির্দেশ ছিল। যেদিন-যেদিন আমাদের শুটিং থাকত তিনি রোজ সকালবেলায় স্টুডিও আসতেন এবং সিগারেট খেতে খেতে তিনি চুপচাপ বেড়াতেন, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে প্রোডাকশান বিভাগ তার কাজ ঠিকমত করছে কিনা, কলাকুশলী এবং শিল্পীরা ঠিক সময়ে আসছে কিনা এবং অন্যান্য কাজ-গুলি আমার নির্দেশ অনুযায়ী ঠিকমত হয়েছে কিনা। সমস্ত কিছুই তিনি তদারক করতেন নীরবে।

তারপর শুটিং শুরু হলে তিনি চলে যেতেন। তিনি কোনদিন ফ্লোরের ভেতর আসেন নি শুটিং দেখবার জন্যে। একদিন আমার মনে আছে, সাধনার নাচের শুটিং-এর দুদিন আগে মিঃ সরকার আমায় জিজ্ঞেস করলেন : মিঃ বোস, আমার স্ত্রী এবং বাড়ীর ২।১ জন মিসেস বোসের নাচের শুটিং দেখতে চান। আমরা কি আপনার শুটিং দেখতে আসতে পারি ?

আমি সানন্দে বললাম : নিশ্চয় আসবেন। আপনার স্টুডিও, আপনি কোম্পানীর

মালিক আর আপনি এবং আপনার বাড়ীর মেয়েরা শুটিং দেখতে আসবেন এতে আমার অনুমতির প্রয়োজন আছে কি?

তাতে তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন, তা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। তিনি তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসির সঙ্গে বলেছিলেন: মিঃ বোস, আমি স্টুডিওর মালিক হতে পারি কিন্তু 'ফ্লোরে'র মধ্যে আপনিই সর্বেসর্বা। সুতরাং আপনার কাছে 'ফ্লোরে' যাবার অনুমতি নেওয়াটা আমার ধারণায় সৌজন্যের খাতিরেও কর্তব্য।

তাঁর এই উক্তিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল। ক'জন প্রযোজক তাঁর পরিচালককে এ সম্মান দিয়েছেন?

জুলাই মাসের শেষ—তখন "মীনাক্ষী"র শুটিং চলেছে পুরোদমে। আমি খবর পেলাম গুরুদেব খুবই অসুস্থ—শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আনা হয়েছে। একদিন গেলাম জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তাঁকে দেখতে। কিন্তু ডাক্তারের কড়া নির্দেশ ছিলো যে তাঁর শোবার ঘরে কোনো লোককে যেতে দেওয়া হবে না যতদিন না তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম।

সেইদিনটির কথা আমি ভুলতে পারব না—৭ই আগস্ট, ১৯৪১। আমি "মীনাক্ষী"র শুটিং করছি, হঠাৎ দুপুরবেলায় খবর পেলাম যে রবীন্দ্রনাথ আর ইহলোকে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে শুটিং বন্ধ করে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যখন আমি আর সাধনা পৌঁছলাম তখন শুনলাম যে শবযাত্রা ইতিমধ্যে নিমতলা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। আমরা কিছুদূর যাবার পর দেখলাম যে আর এগুনো অসম্ভব, সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে শুধু মানুষের মাথা। নীরবে চলেছে ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্যে। শেষবারের মত একবার দেখার জন্যে সে কি আকুলি-বিকুলি জনগণের—এই স্বতঃস্ফূর্ত শোকোচ্ছ্বাসের সে দৃশ্য জীবনে ভুলবার নয়। কাছে যাবার শক্তিতে কুলোল না, দূর থেকেই শেষবারের মতো প্রণাম জানালাম বিশ্বকবির চরণে।

ী"র শুটিং বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলছিল। আগস্টের শেষাশেষি কিংবা সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে তদানীন্তন কলম্বিয়া পিকচার্সের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীনীতীশচন্দ্র লাহিড়ী আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন যে "রাজনর্তকী"র ইংরাজী সংস্করণ 'দি কোর্ট ডান্সার'-এর পরিবেশন-স্বত্ব তাঁরা নিয়েছেন এবং তাঁরা একই সঙ্গে

২রা অক্টোবর, ১৯৪১ সালে কলিকাতা ও বোম্বাইতে ছবিখানি release করতে চান। "রাজনর্তকী"র বাংলা ও হিন্দী সংস্করণ তো লোকে ভালভাবেই গ্রহণ করেছে, এখন ইংরাজী সংস্করণটি কি রকম জনাদর লাভ করে এ বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। বিশেষ করে 'দি কোর্ট ডান্সার' হলো প্রথম ভারতে নির্মিত ইংরাজী ছবি যা সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত এবং ভারতীয় কলাকুশলী দ্বারা গৃহীত।

অবশেষে সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিনটি (২রা অক্টোবর ১৯৪১) এল। বোম্বাই এবং কলকাতায় একসঙ্গে 'কোর্ট ডান্সার' মুক্তিলাভ করল। মিঃ ওয়াদিয়া বোম্বাই থেকে আমাকে লিখলেন যে উদ্বোধন দিবসে বোম্বাইয়ের রাজ্যপাল স্যার রজার লামলে এবং লেডী লামলে উপস্থিত থাকবেন মেট্রো সিনেমাতে। তারপর তাজমহল হোটেলে অভ্যাগতদের একটি বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। এদিনে ছবির নায়িকা এবং পরিচালকের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। আমি মিঃ ওয়াদিয়াকে লিখে জানালাম যে আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারলাম না, কারণ আমাদের কলকাতার মেট্রোতে উদ্বোধনের দিন অর্থাৎ ২রা অক্টোবর, উপস্থিত থাকতেই হবে। প্রথম 'শো'র পরে স্টেজের ওপর সাধনা এবং আমাকে সম্বর্ধনা জানানো হবে।

মিঃ ওয়াদিয়া তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষায় আমাকে লিখে জানালেন : আপনি এবং মিসেস বোস দুজনে আপনাদের কাজটা ভাগ করে নিন। মিসেস বোস কলকাতা 'প্রিমিয়ারে' উপস্থিত থাকুন, আর আপনি চলে আসুন বম্বে। কলকাতায় আমার উপস্থিতিটার একান্ত প্রয়োজন ছিল, আমি সেই মতই মিঃ ওয়াদিয়াকে লিখে দিলাম। 'দি কোর্ট ডান্সার'ও যখন 'রাজনর্তকী'র মত সমান সাফল্যলাভ করল তখন আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সমালোচকরা তাদের সমালোচনায় আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, কারণ ভারতের প্রথম ইংরাজী ছবি ভারতীয়দের দ্বারা নির্মিত এবং অভিনীত বলে।

···এইরূপে ভারতে ইংরাজী চিত্র নির্মিত হইলে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্বের দরবারে প্রচারের বিশেষ সুযোগ ঘটিবে এবং এই বিষয়ে ওয়াদিয়া মুভিটোন ও পরিচালক মধু বোস যে পথ প্রদর্শন করিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন······পরিচালক মধু বোস সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন এই চিত্র পরিচালনায়। ···শ্রীমতী সাধনা বোস এই চিত্রে সুন্দর ইংরাজী বাচনভঙ্গী এবং অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা (৩-১০-৪১)

"October 2, 1941 ; Long long after the present generation has been forgotten, that date will remain in the history of the Indian Motion Picture as a permanent landmark of what great stride forward was taken by Producer Jamshed B.H.

Wadia and his Wadia Movietone on that auspicious day by placing at the feet of India's four hundred million people INDIA'S FIRST ALL-INDIAN ENGLISH TALKIE!"

THE MOTION PICTURE MAGAZINE, Bombay, October 1941

"The release at the Metro of "Court Dancer"···may well be described as a historic event···in its technical excellence, comprised in the mounting, direction, photography, authenticity of detail, "Court Dancer" attains levels comparable with the best anywhere...In its exquisite embroidery of music, song and dance it is unique······it should accordingly prove a fine ambassador to introduce India's motion picture art to the world abroad......" EVENING NEWS, Bombay, 3.10.1941.

"With the release of 'The Court Dancer', a most significant advance in the progress of the Indian film industry has occurred."

THE TIMES OF INDIA (Leader), Bombay. 8.10.1941.

"The Court Dancer" now showing at the Metro, Calcutta, is a pioneer effort··· Sadhona Bose, who, as the Court Dancer dominates with her personality, as well as her talent, dance and song...the excellence and magnitude of the ballet composed by her, lack nothing of the grandeur of foreign pictures...the spoken English of the film is extremely good···Modhu Bose, as director, has carried out an ambitious project admirably. The speed and tempo are excellent and do not flag during an hour and half performance". THE SUNDAY STATESMAN Calcutta, 5.10.1941.

"The Court Dancer" is undoubtedly an outstanding attraction...it should provide a lesson for our producers. AMRITA BAZAR PATRIKA. Calcutta, 5.10.1941.

'দি কোর্ট ড্যান্সারের' সাফল্য আমাদের মনে এনে দিল বিরাট সান্ত্বনা। এই ছবিখানিই হলো সম্পূর্ণ ভারতীয় কলাকুশলী এবং শিল্পীদের দ্বারা ভারতে নির্মিত প্রথম ভারতীয় ছবি। রিলিজের আগে আমি এত বেশী নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম— এবং সত্যি কথা বলতে কি আমি কোনো কাজেই মন বসাতে পারছিলাম না। এমন কি 'মীনাক্ষী'র শুটিং চলছিল, তাতেও ঠিক পুরোপুরি মনঃসংযোগ করতে পারছিলাম না। অবশ্য ছবি 'রিলিজে'র আগে সব চিত্রপরিচালকই অল্পবিস্তর নার্ভাস হয়। আমিও এর আগে হয়েছি, কিন্তু এতটা কখনও হইনি। এর কারণ পরে মনে মনে ভেবে দেখেছি যে এ ধরনের ছবি মানে ভারতীয় শিল্পীদের দিয়ে ইংরেজী অভিনয়, তার ওপর মেট্রোর মত সিনেমায় একসঙ্গে কলকাতা ও বোম্বায়ে রিলিজ! এছাড়াও আর একটি কারণ ছিল "The Court Dancer"-এর বিশ্বপরিবেশক কলম্বিয়া

পিকচার্স তাঁদের বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে লোকের আগ্রহ ও কৌতূহল এমন একটা জায়গায় এনে দিয়েছিলেন যে লোকে আশা করে আছে একটা বিরাট কিছু এবং অভিনব কিছু দেখবার। এখন ছবি দেখে লোকের আশা মিটবে কিনা—এই উৎকণ্ঠাতেই আমার মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু রিলিজের পরে আমার সে উৎকণ্ঠার অবসান হলো—দর্শক এবং সমালোচকদের প্রশংসাধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল। সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের জয়মাল্য পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

পূজার সময়টা বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে খুব আনন্দের মধ্যে দিয়েই কাটালাম। গত তু'বছর পূজার সময়টা কেটেছিল বম্বেতে—তখনকার দিনে বোম্বায়ের যা দুর্গাপূজা হতো তা নামমাত্র, ধুমধাম বা হৈ-চৈ বিশেষ কিছুই ছিল না।

এখন নাম, অর্থ, যশ সবই পেয়েছিলাম প্রচুর ভাবে, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সময়টাও কাটছিল খুব আনন্দের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু একজনের অভাব মাঝে মাঝে বোধ করতাম। সহস্র আনন্দ কলরবের মধ্যে যাঁর কথা মনে পড়লেই মনটা উদাস হয়ে যেতো—তিনি আর কেউ নন, আমার মা। তাঁর শান্ত করুণ মুখখানি আমাকে মাঝে মাঝে উন্মনা করে দিত।

শীতকালে কলকাতার আকর্ষণ খুব বেশী—বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্বের সময় কলকাতা শহরের যেন চেহারাটাই পাল্টে যেত। রূপে রঙে নানা ধরনের উৎসব সমারোহে যেন ঝলমল করে উঠত। এই সময় বড়লাট সাহেব (Viceroy) আসতেন কলকাতায় এবং সেই সঙ্গে আসতেন সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলির রাজা মহারাজারা। কোন জায়গায় কোন কিছু বিশেষ ধরনের উৎসব বা 'ফাংশান' হলেই 'রোলস্ রয়েস' 'ডেমলার' এবং অন্যান্য বিরাট দামী দামী গাড়ীর ভিড় লেগে যেত। এই সব দেশীয় মহারাজারা দেখাতেন কার কতগুলি বড় গাড়ী আছে—এ ছিল যেন একটা ঐশ্বর্য প্রদর্শনের বিরাট প্রতিযোগিতা। এখন ভাবি তখনকার দিনে সাধারণ মানুষের অর্থ-শোষণ করে কি বিরাট অপচয়ই না তাঁরা করতেন!

আর পার্টি তো লেগেই ছিল প্রচুর—লাঞ্চ ডিনার এবং কক্‌টেল-এর তো কামাই ছিল না একদিনও। অনেকদিন পরে পুরনো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে পড়ে আমরাও নিজেদের ভাসিয়ে দিলাম এই সব পার্টির মধ্যে। ফলে আমাদেরও প্রায়ই বহু বন্ধু-বান্ধবকে পার্টি দিতে হতো স্টিফেন কোর্টের ফ্ল্যাটে। খরচের দিকে তাকাবার ফুরসৎ ছিল না, সুতরাং যত্র আয় তত্র ব্যয়!

বম্বে থেকে আসবার সময় মনে মনে স্থির করেছিলাম এবার খরচের মাত্রাটা কমাতে হবে। খরচ কমিয়ে কিছু জমাতেই হবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে সব সাধু সঙ্কল্প কোথায় ভেসে গেল। কথায় বলে না 'স্বভাব যায় না মলে' · ···। আমারও ঠিক সেই অবস্থা—হাতে টাকা এলে আমার মাথা যায় ঘুরে। কি করে যে সেই টাকাটা খরচ করব তারই চিন্তা সব সময়। টাকা হাতে থাকলে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের দিকে মন যায় বেশী, বন্ধুবান্ধবদের ডেকে খাওয়ান, একসঙ্গে বসে হৈ-হুল্লা করার স্বভাব আমার চিরকালের। আগেও ছিল, এখনও আছে। এ স্বভাব আর আমার গেল না।

যাই হোক, খুব হৈ-চৈর মধ্যে দিয়ে বড়দিন কেটে গেল—এদিকে 'মীনাক্ষী'র শুটিংও বেশ সুষ্ঠুভাবে চলতে লাগল।

ঠিক এই সময় একটা দুঃসংবাদ পেলাম বোম্বায়ের মিঃ ওয়াদিয়ার কাছ থেকে যে তাঁর অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার ফলে একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং মিঃ ওয়াদিয়া একটু অর্থসঙ্কটের মধ্যে পড়েছেন। সম্ভবতঃ ওয়াদিয়া মুভিটোন স্টুডিও হাত-বদল হয়ে অন্যের ব্যবস্থাপনায় চলে যাবে। মিঃ ওয়াদিয়া অবশ্য খুব আশাবাদী, তিনি বহু ঝড়-ঝাপ্টার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস যে এটা একটা সাময়িক দুর্ঘটনা মাত্র। কিন্তু এখন যা ব্যাপার দাঁড়িয়েছে তাতে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন যে আমাদের যে পরবর্তী ছবির জন্য চুক্তি তাঁর সঙ্গে হয়েছিল সেটা ১৯৪২ সালের শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখতে।

তিনি যে শুধু একজন প্রোডিউসার ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন আমার একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি আজ আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন বলে 'কন্ট্রাক্ট' স্থগিত রাখা তো দূরের কথা চুক্তিপত্র বাতিল করে দিতে বললেও আমি কিছুই বলতাম না। এই মর্মে আমি মিঃ ওয়াদিয়াকে চিঠি লিখে দিলাম। সেই সঙ্গে আরও লিখলাম যে, আমাদের দুজনেরই জীবনে বহু উত্থান-পতন ঘটেছে, জীবনে বহু বিচিত্র পরিস্থিতির সঙ্গে আমরা সংগ্রাম করেছি। আমার স্থির বিশ্বাস যে শীগ্‌গিরই আপনার বিপদের মেঘ কেটে যাবে।

এটা হবে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। আমার কি জানি কেন মনে হয়েছিল যে এবছরটা আমাদের সকলের পক্ষেই অশুভ। যদিও মিঃ ওয়াদিয়ার জন্যে আমার মনটা খুবই খারাপ হয়েছিল, তবুও এতখানি নৈরাশ্যবাদী হওয়ার কোন কারণ ঘটেনি। তবে কেন এই অনাগত ভবিষ্যতের অশুভ ইঙ্গিত মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে

গেল ? এর পরে আমার জীবনাকাশেও যে কালো মেঘের সঞ্চার হচ্ছিল এ কি তারই ইঙ্গিত মাত্র ?

যাই হোক, আমার মনের এ ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না, এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার কাজে মন দিলাম। 'মীনাক্ষী'র শুটিং প্রায় শেষ হয়ে এল।

মার্চের শেষের দিকে।

কলকাতায় তখন গুজবে কান পাতা দায়। চারিদিকে গুজব রটে গেল যে জাপানীরা এবার কলকাতায় বোমা ফেলবে। ইতিমধ্যে তারা রেঙ্গুন অধিকার করে নিয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে তারা এসে কলকাতায় হানা দিতে পারে। এই গুজবে লোকের মনে অশান্তির আর শেষ নেই। সাধনা তো একেই নার্ভাস, তার ওপর বোমা পড়ার কথা শুনে আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল। সে আমাকে বলল যে 'মীনাক্ষী'র শুটিং শেষ হলেই সে আবার একটা নৃত্য-সফরে বেরুতে চায়—তার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিতে। আমি তাকে জানালাম যে তার সফরের বন্দোবস্ত সব করে দিতে পারি, কিন্তু আমার পক্ষে তার সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হবে না, কারণ আমাকে এখন 'মীনাক্ষী'র সম্পাদনা নিয়ে বসতে হবে।

এদিকে সাধনা পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে সফরে সে যাবেই। ছবির সম্পাদনায় বেশ কিছুদিন লাগবে—ততদিন সে কলকাতায় শুধু শুধু বসে থেকে কি করবে ?

বন্ধুবর হরেনকে খবর দেওয়া হলো। হরেন বলল যে সে অন্য কার একটা শো নিয়ে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খুব ব্যস্ত আছে। তারপর সে সাধনার দলের সঙ্গে যেতে পারে।

যাই হোক, সফরের সূচী তৈরী হলো। এই সফরের প্রথম শো হবে মেদিনীপুরে ২৫শে এপ্রিল ১৯৪২। ওখানে কয়েকটি শো'র পরে আসানসোল, পাটনা, বেনারস—তারপর লক্ষ্ণৌতে 'মেফেয়ার হলে' ৯ই মে থেকে শো হবে। ততদিন পর্যন্ত দলের সঙ্গে আমি থাকব, তারপর লক্ষ্ণৌতে হরেন গিয়ে সব ভার নেবে।

এদিকে 'মীনাক্ষী'র শুটিং শেষ হলো এপ্রিলের মাঝামাঝি। ঠিক করলাম—আমি এই ছবির সম্পাদক হরিদাস মহলানবীশকে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে যাব। সে সমস্ত ছবির নেগেটিভগুলো বেছে নিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে রাখবে—তারপর মে মাসের মাঝামাঝি ফিরে এসে সম্পাদনা আরম্ভ করব।

এই সফরের প্রথম শো মেদিনীপুরে আরম্ভ করার একটা কারণ ছিল। তখন মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন মিঃ এন. এম. খাঁ, আই. সি. এস। তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল বহুদিন থেকে—তিনি প্রায়ই বলতেন একবার সি. এ. পি-র সম্প্রদায়কে মেদিনীপুরে নিয়ে গিয়ে শো করা। এত তাড়াতাড়ি সি. এ. পি-র কোন নাটক নিয়ে ওখানে গিয়ে শো করা সম্ভব ছিল না। তাই "সাধনা ও তার ব্যালে" নিয়ে যখন আমাদের সফর সুরু হচ্ছে তখন পথে ওখানে নেমে কয়েকটা শো করলে মন্দ কি? তিনি আমাদের এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানালেন এবং বিশেষ করে অনুরোধ করলেন যে আমি আর সাধনা যেন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠি এবং তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করি। দলের অন্যান্য সকলের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন অন্য জায়গায়।

এপ্রিল ১৯৪২-এর মাঝামাঝি। জাপানীরা যে কোন সময় এসে বোমা ফেলতে পারে—এই গুজবে কলকাতা শহরে কান পাতা দায়। সকলের মুখেই ঐ এক কথা। এদিকে আমাদের স্টিফেন কোর্টের নীচে বিমান আক্রমণের সময় 'আশ্রয়' তৈরী হয়েছে। এই সময় 'মীনাক্ষীর' শুটিংও শেষ হয়ে গেল। আমি চিত্র-সম্পাদক হরিদাস মহলানবীশকে সব বুঝিয়ে দিয়ে মাসের চতুর্থ সপ্তাহে সাধনার নৃত্যসম্প্রদায় নিয়ে সদলবলে সফরে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার সময় হরেনকে বলে গেলাম যে মে মাসের মাঝামাঝি লক্ষ্মৌতে গিয়ে যেন আমাদের সঙ্গে দেখা করে।

মেদিনীপুরে ২৫শে এপ্রিল সাধনার নৃত্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হলো। তিন দিন হলো এই নাচ। মিঃ এন. এম. খাঁর অতিথি-সৎকারের কোন ত্রুটি ছিল না—তিনি আমাদের সমস্ত বন্দোবস্ত সুচারুরূপে করে দিয়েছিলেন। ওখান থেকে আমরা আসানসোল, পাটনা, বেনারস হয়ে চলে এলাম লক্ষ্মৌএ। সব জায়গাতেই যথারীতি সাধনা ও নৃত্য-সম্প্রদায় বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হলো। লক্ষ্মৌতে মে-ফেয়ার সিনেমায় ৯ই মে সাধনার নৃত্য-প্রদর্শনী সুরু হলো। পূর্ব বন্দোবস্তমত হরেন গিয়ে ঠিক সময়ে লক্ষ্মৌতে পৌছুল—হরেনের ওপর সমস্ত দলের ভার ছেড়ে দিয়ে আমি চলে এলাম কলকাতায়। তারপর হরেনের সঙ্গে এই দলটি চলে গেল দিল্লী।

কলকাতায় পৌছেই আমি 'মীনাক্ষী'র দুটি সংস্করণেরই সম্পাদনা নিয়ে মেতে গেলাম।

জুনের গোড়ার দিকে—আমি হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেলাম হরেনের কাছ থেকে। আম্বালা থেকে সে টেলিগ্রাম করে আমাকে জানিয়েছে যে, সে কলকাতা ফিরে আসছে একলা—কিন্তু সাধনা এখান থেকে যাচ্ছে লাহোর, তারপর পাঞ্জাবের

কয়েক জায়গায় 'শো' করে কাশ্মীর যাবে। এই দলের সমস্ত ভার নিয়ে ইমপ্রেসারিও হিসেবে যাচ্ছেন জনৈক মিঃ এন. খান্না।

হরেনের এই টেলিগ্রাম পেয়ে মনে একটা দারুণ খট্‌কা লাগল—কে এই খান্না? লোক কি রকম? টাকা-পয়সা নিয়ে গণ্ডগোল করবে না তো? সাধনা তো টাকা-পয়সার কোন হিসেবই রাখতে পারে না—সে জানে শুধু খরচ করতে—তাও বেহিসেবী ভাবে। হিসেব-পত্রের ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞা। সে তার নিজের নাচ-গান-অভিনয় নিয়েই সব সময় মশগুল—ওসব টাকা-পয়সার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আনাড়ী।

একবার ভাবলাম হরেনকে জরুরী টেলিগ্রাম করে দিই—যে এই সফরটা শেষ করেই যেন সে সদলবলে ফিরে আসে—কিন্তু টেলিগ্রামের ভাব ও ভাষা দেখে বুঝলাম যে সবাই এখন আম্বালা ছেড়েছে—এখন আর টেলিগ্রাম করে কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে বরং হরেনের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।

হরেন এল।

হরেন আসতে আমি তাকে বললাম যে আমি তাকে টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছিলাম যে সাধনার সমস্ত সফরটা শেষ করে যেন সে ফিরে আসে। তাতে হরেন বললে: আমারও সেই রকম ইচ্ছেই ছিল যে সাধনার সঙ্গে সফরটা শেষ করেই একসঙ্গে ফিরি—কিন্তু আমি আর একটি দলের সঙ্গে চুক্তি করে বসে আছি। তারা শীগ্‌গির কলকাতায় তাদের 'শো' সুরু করবে—যে জন্যে ইচ্ছে থাকলেও আমাকে বাধ্য হয়ে চলে আসতে হলো। যা হোক, মিঃ এন. খান্না পৃথ্বিরাজ কাপুরের কি রকম ভাই হন। খুব বড়লোক এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ওঁর নিজের সিনেমা হাউস আছে—তাছাড়া পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের বহু সিনেমা মালিকদের সঙ্গে ওঁর বিশেষ হৃদ্যতা আছে। সুতরাং ও সাধনার সফরের ব্যবস্থা বেশ ভালই করবে। তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই।

আমি শুনে বললাম: সব তো বুঝলাম—বন্দোবস্ত সব না হয় ভালই করবে, কিন্তু টাকা-পয়সার দিকটা কেমন? শেষকালে যা কিছু লাভ হবে সব যেন ও নিজেই না খেয়ে বসে।

হরেন বলল: দেখে এবং কথাবার্তা বলে তো তাকে ভাল এবং সৎ লোক বলেই মনে হয় তবে তার সততার গ্যারাণ্টি কি করে দেব বল। তবে আমার যতদূর মনে হয় ভদ্রলোক কোন খারাপ ব্যবহার করবে না। এখন আর ও সব ভেবে কোন লাভ নেই, মধু। We can only hope for the best.

তারিখটা ঠিক মনে নেই, তবে মনে হয় সেটা ১৯৪২ সালের জুন মাসের শেষা-শেষি কোনদিন। হঠাৎ দেরাদুন থেকে সাধনা ট্রাঙ্ক-কলে আমাকে বলল, বোম্বাইয়ের কোন এক চিত্রনির্মাতার কাছ থেকে সে একটা হিন্দি ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে প্রস্তাব পাচ্ছে ; পারিশ্রমিক তারা খুব ভালই দেবে—সে কি এই প্রস্তাবে রাজী হবে ?

আমি দেখলাম, আমার হাতে তখন কোন কণ্ট্রাক্ট নেই ; শুধু পরলোকগত শেঠ সুখলাল কারনানির সঙ্গে একটা ছবির বিষয়ে সামান্য কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছে মাত্র। সুতরাং এ অবস্থায় আমি সাধনাকে কি করে বলি, বোম্বাইয়ের কোন কণ্ট্রাক্টে তুমি এখন সই করো না। মনে হলো সে যদি অন্য কোন পরিচালকের অধীনে কাজ করতে চায়, তাতে আমি বাধা দিতে যাই কেন ? তাই তার ট্রাঙ্ক-কলের উত্তরে আমি জানালাম, তুমি যদি স্বাধীনভাবে অন্য কোন পরিচালকের অধীনে কাজ করতে চাও, তাতে আমি আপত্তি করব কেন ?

মুখে তাকে এই কথা বললাম বটে, কিন্তু মন ? মন কি এতে সায় দিতে পেরে-ছিল ? না, তা পারে নি, কোন মতেই পারে নি। মন বলেছিল, সাধনা এ যা করতে যাচ্ছে, এ ঠিক নয়। সাধনার প্রতিভা আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নাচে, গানে, অভিনয়ে তার মত দক্ষ শিল্পী মেলা ভার। কিন্তু সাধনার বয়স যখন মাত্র তেরো, সেই ১৯৩০ সাল থেকে মঞ্চ এবং পর্দায় অতগুলি বইয়ে সে যে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে, তার প্রতিটিতেই ছিল আমার পরিচালনা ও নির্দেশনা। এই দীর্ঘকাল ধরে তার সহজাত প্রতিভা আমারই নির্দেশিত পথ বেয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ লাভ করেছে বলেই সে যশের শিখরে আরোহণ করতে পেরেছিল। আমি বিশ্বাস করি, মানুষ যত বড় প্রতিভারই অধিকারী হোক না কেন, উপযুক্ত পরিবেশ, সাহচর্য ও নির্দেশনা না পেলে সে-প্রতিভা শতদল পদ্মের মত বিকশিত না হয়ে বিনষ্ট হয়—বিশেষ করে অভিনয়ের ক্ষেত্রে। তাই আমার মনে আশঙ্কা জেগেছিল এই যে, সে অপরের পরিচালনাধীনে কাজ করতে যাচ্ছে, এতে তার সুনাম হয়ত অটুট থাকবে না, হয়ত প্রতিভা সত্ত্বেও সে তার গুণপনা দেখাবার সম্যক সুযোগ পাবে না। বিশেষ যখন শুনলাম যে, যে প্রযোজক, সেই সাধনাকে নায়িকা করে নিজেই পরিচালক হতে চায়, তখন আমার মনের আশঙ্কা আরও বদ্ধমূল হলো। বিখ্যাত 'স্টার' থাকলেই যে ছবি সাফল্যমণ্ডিত হয় না, তার জন্যে আরও অনেককিছু যে থাকা দরকার, একথা পরিচালনা-ক্ষেত্রে যে প্রথম হাতেখড়ি দিতে চলেছে, তার না জানা থাকবারই কথা। কিন্তু যে 'স্টার', সেই সাধনার তো সেকথা হৃদয়ঙ্গম

করা উচিত। সুনামের চেয়ে কি টাকা বড়? কিম্বা পর পর সাফল্য লাভ করার ফলে সাধনা তখন হয়তো ভেবেছিল, সে যে ছবিতেই নামুক না কেন, মাত্র তারই জোরে ছবি সাফল্যমণ্ডিত হতে বাধ্য, পরিচালক যেই হোক।

আমার মনের গভীরে এ ছাড়াও আর একটা কারণ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে চাইছিল। অনুভব করছিলাম, সাধনার অপর পরিচালকের অধীনে কাজ করবার মধ্যে যেন একটি ভবিষ্যৎ অমঙ্গল লুকিয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল, এই পথ দিয়েই হয়ত আসবে আমাদের দুজনের মধ্যে এক অবাঞ্ছিত বিচ্ছেদ। আমাদের জীবনে যেমনি, আমাদের কর্মক্ষেত্রেও তেমনি গড়ে উঠেছিল এক অচ্ছেদ্য বন্ধন, যার ফলে মঞ্চ ও চিত্রজগতে আমাদের দুজনকে নিয়ে এক প্রবাদবাক্যই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—আমরা একাত্মা। গুরুদেবও বলেছিলেন, 'মধুর সাধনা নয়, মধুর মাধবী।' মনে হলো এই যে সাধনা আজ আমাকে বাদ দিয়ে অপরের পরিচালনাধীনে কাজ করবার কথা ভাবতেও পেরেছে, এরই মধ্যে এই এতদিনের বন্ধন ছিন্ন করবার গোপন ছুরিকাটি লুকিয়ে রয়েছে এবং এই কথা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন একটা বিরাট শূন্যতায় ভরে উঠল অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ছবি দেখে।

ইতিমধ্যে শেঠ সুখলাল কারনানির সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার একথাও ঠিক হয়েছিল যে, আমি শুধু তাঁর হয়ে একখানি ছবি পরিচালনাই করব না—এম. বি. প্রোডাকশান্স নাম দিয়ে একটি ইউনিট করে সমস্ত স্টুডিওর ভার নেব এবং বছরে অন্তত দুখানি করে ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনা করব। শেঠ সুখলাল এর মধ্যে ভূতপূর্ব ম্যাডান স্টুডিওটি নিজে নিয়ে তাঁর নাতি ইন্দ্রকুমারের নামে নতুন নামকরণ করেছিলেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিও।

পার্ক স্ট্রীটের কারনানী ম্যানসনটিও ছিল শেঠ সুখলাল কারনানীর সম্পত্তি। ওখানকার ম্যানেজার (তাঁর নামটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না) ছিলেন তখন এক মুসলমান ভদ্রলোক। তিনি প্রায় রোজই একবার করে এসে চুক্তিটা কিভাবে হবে, এই নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। মন্মথ প্রায় রোজই আসত—এসে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে মধু বোস প্রোডাকসন্সের প্রথম কি ছবি হবে তার গল্পের বিষয় আলোচনা করত।

এইভাবেই চলছিল। একদিন জুলাই মাসের শেষদিকে আমার সহকারী হেমন্তর কাছ থেকে একখানা টেলিগ্রাম পেলাম। দেওঘরে হেমন্ত গিয়েছিল কয়েক দিনের জন্যে বেড়াতে—সেখান থেকেই সে টেলিগ্রাম করছে। টেলিগ্রামে লেখা আছে : সদলবলে সাধনা এসেছে দেওঘরে। সেখানে তারা অর্থাভাবে একেবারে

আটকে পড়েছে। কিছু টাকা এক্ষুনি না পাঠালে তারা কলকাতা ফিরতে পারছে না। এই সফরের দরুণ শিল্পী এবং বাদ্যযন্ত্রীদের অনেক টাকা বাকী পড়েছে, অতএব অবিলম্বে কলকাতায় কয়েকটা শো'র বন্দোবস্ত করে তাদের পাওনা টাকা মিটিয়ে দিতে।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি কিছু টাকা হেমন্তকে পাঠিয়ে দিলাম, এবং লিখে দিলাম সকলকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে। আমি হরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, অবিলম্বে সে কোন শো'র বন্দোবস্ত করে দিতে পারে কিনা? হরেনকে বললাম: দেখ হরেন, আমি যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরে সাধনা বহু শো করেছে এবং সব জায়গা থেকেই আমায় টেলিগ্রামে জানিয়েছে যে প্রত্যেক জায়গাতেই শো খুব সাফল্যজনকভাবে হয়েছে। সব জায়গাতেই 'হাউস ফুল' হয়েছে—অথচ এ দুর্দশা কেন? টাকার অভাবে এরকমভাবে আটকে পড়ার মানে কি? তার একমাত্র মানে হলো যে ভদ্রলোক ইম্প্রেসারিও হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কোন দায়িত্বজ্ঞান নেই। দায়িত্বশীল লোক হলে দলের সঙ্গে তাঁর কলকাতা পর্যন্ত আসা উচিত ছিল। যা হোক, এরা যে ভালয়-ভালয় ফিরে এসেছে, এইটেই ভগবানের অসীম দয়া।

হরেন ছায়া সিনেমায় সাধনার শো'র বন্দোবস্ত করল ২৯শে এবং ৩০শে জুলাই। শুধু দুই দিন মাত্র সময়—এর মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করা, পাবলিসিটি করা, কাগজে সেগুলো পাঠান, আরও এই সংক্রান্ত অনেক কাজ করতে হলো। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমি আর হরেন এই নিয়েই পড়ে রইলাম। শেঠ কারনানীর ম্যানেজার রোজই আসে, কিন্তু আমার চুক্তির খসড়াটা দেখার পর সলিসিটরের কাছে যাব, তার আর সময় হয়ে ওঠে না। মন্মথ বেচারা রোজ এসে বসে বসে চলে যায়—গল্পটা নিয়ে কোন আলোচনাই করতে পারি না।

সাধনা তার দলবল নিয়ে কলকাতায় এসে পৌছুল ২৭শে জুলাই।

সাধনাকে জিজ্ঞেস করলাম: এত জায়গায় শো করলে—সব জায়গাতেই তো শুনছি হাউস ফুল—অথচ টাকার অভাবে দেওঘরে আটকে পড়লে কি রকম?

তাতে সাধনা বললে: টাকা আমরা যথেষ্ট পেয়েছি, তবে খরচাও করেছি প্রাণ খুলে। সব থেকে ভাল হোটেলে রাজকীয়ভাবে থাকতাম। কাশ্মীরে শিকারা নিয়ে ঘুরেছি—মোটরে করে ঘুরে ওখানকার যতকিছু দেখবার সব দেখেছি। এতেই অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে।

আমি বললাম: এ সম্বন্ধে কাগজে কিছু কিছু রিপোর্ট আমি পড়েছি।

তাছাড়া শ্রীনগরে তুমি কাশ্মীরের প্রথম সবাক চিত্রগৃহ অমরেশ টকীর উদ্বোধন করলে। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং ত্রিজলাল নেহরু ছিলেন প্রধান অতিথি। এত সব করেও শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা!!

সাধনা বললে: দেওঘরে আমাদের আটকে পড়ার আর একটা কারণ ছিল। আমরা ভেবেছিলাম যে, ফিরতি পথে আমরা কয়েকটা হাউস বুকিং পাব। কিন্তু যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা বলেই কোন চিত্রগৃহেই স্টেজ খালি পাওয়া গেল না, সেই জন্য ফেরবার মুখে যে টাকাটা আমরা পাব আশা করেছিলাম তা পাওয়া গেল না। ফলে এই দুরবস্থা।

আমি বললাম: সবই বুঝলাম, কিন্তু তোমার ইম্প্রেসারিও ভদ্রলোক যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন এটা মানতেই হবে। এতগুলো ছেলে-মেয়েকে তাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত যাতে পৌঁছুতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিলেই সব দিক দিয়ে শোভন হতো। যাক, যা হবার তা হয়েছে, এখন ছায়াতে যে শো হবে সেই বিষয়ে চিন্তা করা যাক।

যাই হোক, ২৮ তারিখে ছায়াতে স্টেজ রিহার্সাল হলো এবং ২৯শে প্রথম শো শুরু হলো।

মাত্র ২।৩ দিনের মধ্যে হরেন যতদূর সম্ভব ভাল পাবলিসিটি করেছিল। তখন সি. এ. পি. এতগুলো শো করেছে যে, সাধনার নাম আর সি. এ. পির শো'র নাম তখন লোকের মুখে মুখে—সুতরাং পাবলিসিটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ২৯ ও ৩০ দু দিনই হাউস ফুল পাওয়া গেল। যথারীতি সমালোচক ও দর্শকদের অভিনন্দন তো পেলামই, টাকা-কড়িও ভালই পাওয়া গেল।

এরপর ৩১ তারিখ থেকে হেমন্ত, আমি আর আমার হিসাব-রক্ষক বঙ্কিমবাবুকে নিয়ে সমস্ত শিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীদের হিসাব নিকাশ করে তাদের প্রাপ্য ঠিক করতে বসলাম। সফরে সব মিলিয়ে প্রায় ২৪।২৫ জন লোক ছিল।

যাই হোক, নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে দলের সমস্ত লোকের পাই-পয়সা প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে আগস্ট মাসের ২।৩ তারিখ হয়ে গেল। এর মধ্যে বম্বে থেকে জরুরী টেলিগ্রাম এল যে, সাধনাকে তার ছবির জন্যে অবিলম্বে বম্বে চলে যেতে হবে।

কিন্তু সাধনার সঙ্গে যাবে কে? আমি এ ক'দিন এই শো'র ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলাম যে শেঠ কারনানীর ম্যানেজারের সঙ্গে, এমন কি মন্মথর সঙ্গেই ভাল করে কথা বলবার ফুরসুৎ পাইনি। এইবার ঠিক করলাম যে কারনানীর সঙ্গে চুক্তিপত্রটা সই সাবুদ করে ফেলা যাক। মন্মথর সঙ্গে গল্পটা নিয়েও বসা যাবে এইবার। কিন্তু

মানুষ ভাবে এক—আর হয় অন্যরকম। সাধনা ধরে বসল যে তার সঙ্গে বম্বে যেতে হবে—কারণ সে একলা গিয়ে প্রথমটা খুব অসুবিধায় পড়বে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তার বাবা যাবেন বোম্বাই, তখন আমি চলে আসতে পারব।

কি আর করি—রাজী না হয়ে পারলাম না। মন্মথ অবশ্য অনেক করে বলেছিল: মধু, কারনানির কন্ট্রাক্টটা সই না করে যেও না। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"There is many a slip between the cup and the lip." ভবিষ্যতের কথা কিছু বলা যায়? আমার কথা শোন। কন্ট্রাক্টটা সই হতে ৫।৬ দিনের বেশী লাগবে না। এক সপ্তাহ পরে বম্বে গেলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

এদিকে বম্বে থেকে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম—তারপর ট্রাঙ্ক-কল আসতে লাগল। তারা সাধনাকে চলে আসবার জন্য জোর তাগাদা দিতে লাগল। আমি ভাবলাম—ঝঞ্ঝাটটা একেবারে খতম করে আসি। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে কারনানীর কন্ট্রাক্ট সই করা যাবে। সব তো ঠিকই আছে, শুধু আমাদের সলিসিটারের কাছে গিয়ে সই করার অপেক্ষা। তারপর মন্মথর সঙ্গে শান্তিতে বসে ছবির গল্পটা ঠিক করা যাবে।

এই রকম ভেবে আমি সাধনাকে নিয়ে বম্বে রওনা হলাম—তারিখটা বোধ হয় ৪ঠা আগস্ট হবে। যাবার আগের দিন পর্যন্ত মন্মথ আমায় বলেছিল: এখনও তোমায় বলছি মধু, যাওয়াটা ২।৪ দিন স্থগিত রেখে কারনানীর সঙ্গে কন্ট্রাক্টটা সই করে যাও।

আজ মনে হয়, তখন যদি মন্মথর কথা শুনতাম!

সাধনাকে নিয়ে বম্বে গিয়ে প্রথমে উঠলাম তাজমহল হোটেলে। একটা ফ্ল্যাট খুঁজতে সুরু করলাম—এবারে গিয়ে দেখি বম্বে আর সে বম্বে নেই! অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। মেরিন ড্রাইভে কিংবা মধ্য-বম্বেতে ফ্ল্যাট পাওয়া একরকম অসম্ভব। বম্বেতে তখন সেলামী বা "পাগড়ী" প্রথা বেশ দেখা দিয়েছে। দালালরা বলতে লাগল যে উপযুক্ত 'পাগড়ী' না দিলে আজকাল বম্বেতে ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না। প্রথমটা আমি 'পাগড়ী' কথার মানেটাই বুঝতে পারিনি, তাই যখন জিজ্ঞেস করলাম যে 'পাগড়ী' জিনিসটা কি—তখন তার উত্তরে জানতে পারলাম যে বাড়ীর মালিককে প্রথমে মোটা একটা টাকা নগদ দিতে হবে—যার কোনো রসিদ পাওয়া যাবে না। তারপর ফ্ল্যাটের যা ভাড়া হয় তা দিতে হবে। আমি বললাম: মোটা টাকা 'পাগড়ী' দেবার ক্ষমতা আমার নেই—আর থাকলেও আমি তা দেব না।

চেষ্টা করতে লাগলাম বিনা 'পাগড়ী'তে কোন ফ্ল্যাট পাওয়া যায় কিনা। এই সব বন্দোবস্ত করতে এসে গেল ৯ই আগস্ট ১৯৪২। জলে উঠল আগুন চারিদিকে। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক রক্তক্ষরা অধ্যায়। সকালে কাগজ খুলে দেখি গান্ধিজী, জওহরলাল, আবুলকালাম আজাদ, সর্দার প্যাটেল প্রমুখ দেশনেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চারিদিকে সুরু হয়েছে আইন-ভঙ্গের পালা। ট্রেনের লাইন উপড়ে ফেলা হচ্ছে। স্টেশন, ডাকঘর এবং অন্যান্য সরকারী দপ্তর পোড়ানো হচ্ছে—পুলিশের গুলীতে বহু লোক প্রাণ দিচ্ছে—সারা দেশে একটা থমথমে ভাব। দেশের সাধারণ জীবন-যাত্রা ব্যাহত। সমস্ত লোকের মনে এক আতঙ্ক, ভয় আর উত্তেজনা। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের দমন-নীতি হয়ে উঠল প্রবলতর।

এ অবস্থায় বেরুই কি করে? আমি বোম্বাইতে আটকে পড়লাম। মন্মথর কথা তখন বার বার মনে পড়তে লাগল! 'কনট্রাক্ট সই করে যাও মধু, ভবিষ্যতের জন্য কিছু ফেলে রেখো না।' মনে হলো, 'চায়ের কাপ ও ঠোঁটের মাঝে ফাঁকটা থেকেই গেল।'

আমি মন্মথকে লিখলাম: আমি তো বম্বেতে আটকে পড়েছি—চারিদিকে যে রকম অরাজকতা চলছে, ট্রাম-বাস সব জ্বলছে—রাতদিন গুলী-গোলা চলছে—স্বাভাবিক নাগরিক-জীবন বিপর্যস্ত—এ অবস্থায় সাধনার বাবা তো আসতে পারবেন না আর উনি যতদিন না আসেন, সাধনাকে এরকম পরিস্থিতিতে একলা ফেলে আমি যাই কি করে? পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে, ওর বাবা এখানে আসবেন এবং সাধনাকে একটি ফ্ল্যাট ঠিক করে দিয়ে—আমি কলকাতায় ফিরব।

মন্মথর জবাব এল যে, সে কারনানীর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছিল। এই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সবাই খুব উৎকণ্ঠা ও অশান্তির মধ্যে রয়েছে। সুতরাং এখন শেঠজীকে ফিল্মের কনট্রাক্টের বিষয় কে বলতে যাবে? পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

মন্মথর চিঠি পেয়ে মনে হলো—একবার যখন বাধা পড়েছে, তখন শেঠ কারনানির সঙ্গে কনট্রাক্ট হবার আর হয়ত কোনো আশা নেই।

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন যখন পুরো দমে চলেছে, তখন বোম্বাই শহরে দেখে শুনে মনোমত একটা ফ্ল্যাট যোগাড় করা একরকম অসম্ভব। সেপ্টেম্বর মাসে আন্দোলনে খানিকটা ভাঁটা পড়ল, সেই সময় আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। দেখলাম যে, সেলামী বা পাগড়ী ছাড়া ফ্ল্যাট পাওয়া একেবারে অসম্ভব। হতাশ হয়ে আমি শেষকালে সাধনাকে বললাম:

দেখ, তোমাকে 'তাজমহল' হোটেলের সঙ্গেই মাসিক বন্দোবস্ত করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থাকতে হবে। শীগ্‌গীরই তো তোমার বাবাও আসছেন—দুজনে এইখানেই থাক তোমরা—তাছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না।

আমি যখন বিনা সেলামী বা পাগড়ীতে ফ্ল্যাটের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম ঠিক সেই সময় ভাগ্যদেবী আমার ওপর সুপ্রসন্ন হলেন।

একদিন ক্রিকেট ক্লাবে সন্ধ্যার সময় বসে গল্পগুজব করছি এমন সময় দেখা হয়ে গেল আগেকার দিনের এক বিখ্যাত চিত্র-তারকা সুলতানার সঙ্গে। আমি যখন কয়েক বছর আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে 'সেলিমা' ছবি করি তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার আলাপ। সুলতানা ছিল সবাক-চিত্রের প্রথম যুগের বিখ্যাত চিত্রতারকা জুবেদার ভগ্নী। জুবেদা বিয়ে করেছিল ক্রোড়পতি ধনরাজ গিরিকে। গ্রীণস্ হোটেলের পার্শ্ববর্তী বিরাট 'ধনরাজ মহল' বাড়ীটি ছিল তাদেরই।

সুলতানার স্বামী মিঃ বাওলাও ছিল সঙ্গে। মিঃ বাওলা হলো ইন্দোরের অধিবাসী। এর বাবা ছিল বিরাট ব্যবসায়ী—আমি এর বাবার নাম শুনেছিলাম আগে।

ফিল্ম সম্বন্ধে অনেক কথা হলো—এরা 'রাজনর্তকী' ও 'Court Dancer' দেখেছে। ছবি তাদের খুব ভাল লেগেছে, বিশেষ করে সাধনার নাচ ও অভিনয়ের তারা উচ্ছসিত প্রশংসা করল। এখন বোম্বায়ে আছে শুনে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল।

কথায় কথায় আমি তাদের জানালাম, আমার ফ্ল্যাট-সমস্যার কথা। আমার সমস্যার কথা শুনে সুলতানা তার স্বামীকে বলল: Worli Sea Face-এর বাড়ীটা তো আমাদের খালিই পড়ে আছে—ওখানকার একটা ফ্ল্যাট দাও না মিঃ বোসকে। ভদ্রলোক বড় অসুবিধেয় পড়েছেন।

তার স্বামী একথা শুনে একটু ইতস্তত করে বলল: —মানে, আমরা তো ও বাড়ীটা কাউকে ভাড়া দিই নে—ওটা তো আমাদের নিজেদের জন্যে রেখেছি—

সুলতানা বলে উঠল—অন্য কাউকে দেওয়া আর মিঃ ও মিসেস বোসকে দেওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে তো! আর ওদের তো পুরো বাড়ীটা দরকার নেই—ওপরের ফ্ল্যাটটা হলেই চলবে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে: কি বলেন মিঃ বোস—ওপরে চারখানা বড় বড় ঘর আছে, তাতে আপনাদের হবে না? আর যদি দরকার হয় নীচেতলায়

একটা ঘরও পেতে পারেন। নীচের বাকী ঘরগুলোতে আমাদের বাড়তি আসবাব-পত্রগুলো থাকবে।

আমি বললাম যে আমাদের ওতেই চলবে—কালই আমরা দেখতে যাবো।

পরদিন আমি আর সাধনা দুজনে গেলাম 'সুলতান বাগ' বাড়ীটা দেখতে। ঘর-গুলি বেশ বড় এবং সুসজ্জিত। মনে হলো ঘরগুলি সাজাতে ও রং করতে বেশ খরচা করেছে। একটি শোবার ঘরের রং ছিল নীল—সঙ্গে বাথরুম, বাথ-টব ইত্যাদি সব নীল মোজেক পাথরের—অপর শোবার ঘরটি গোলাপী রং-এর এবং সংযুক্ত বাথরুম গোলাপী মোজেক পাথরের। তাছাড়া একটি বেশ প্রশস্ত ড্রইংরুম ও খাবারঘর। এছাড়া ছিল রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, চাকরদের ঘর ইত্যাদি।

ফ্ল্যাট দেখে তো আমরা হাতে চাঁদ পেলাম, আমাদের দুজনেরই খুব পছন্দ হলো। সুলতানা জিজ্ঞেস করলে : কত ভাড়া হলে আপনাদের সুবিধে হয়?

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল : মাসে ৩৫০ টাকা হলে মন্দ হয় না।

সুলতানা বলল : বেশ তাই দেবেন।

যাক, গৃহসমস্যা মিটল। ভগবানের কৃপা আমার ওপর অসীম—নইলে এরকম একটি সুন্দর সুসজ্জিত ফ্ল্যাট বিনা সেলামীতে পাওয়া যায় না—আর মোটা 'পাগড়ী' ছাড়াও, মাসে সাতশো টাকার কমে পাওয়া অসম্ভব।

যাই হোক, কয়েকদিনের মধ্যেই 'সুলতান বাগে' এসে উঠলাম আমরা। আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকত তখনকার দিনের দুজন বিখ্যাত চিত্রতারকা—লীলা দেশাই ও প্রতিমা দাশগুপ্তা। 'রাজনর্তকী'র পর প্রতিমার নাম-ডাক খুবই হয়েছিল এবং বোম্বায়ের 'তারকা' পর্যায়ে সে উন্নীত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সাধনার নতুন ছবি 'পয়গম'-এর শুটিং সুরু হয়ে গিয়েছিল। অমর পিকচার্স ছিল এই ছবির নির্মাতা। আমি তখন কলকাতা ফিরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিছুদিন আগে মন্মথর কাছ থেকে খবর পেলাম যে শেঠ সুখলাল কারনানী আগস্ট আন্দোলনের পরে তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন এবং জাপানীদের বিমান আক্রমণের গুজবের দরুণ এখন কোন নতুন ছবিতেই হাত দিতে চান না। সুতরাং ষ্টিফেন কোর্টের অত বড় ফ্ল্যাটটা রাখবার আর কোন মানে হয় না। ঠিক করলাম, কলকাতায় এসে আসবাবপত্র সব বম্বেতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে, বম্বেতেই আবার ফিরে আসব। কিন্তু কলকাতায় আসব বললেই ত আসা হয় না। আগে ঠিক ছিল যে, সাধনার বাবা বম্বেতে গেলে আমি কলকাতায় চলে আসব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুদিন আগে তাঁর সেজ বোন, অর্থাৎ সাধনার সেজপিসি, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী,

সুচারু দেবীর একমাত্র পুত্র ধ্রুবেন্দ্র, প্লেন অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যায় সুতরাং সাধনার বাবাকে তাঁর বোনের কাছে শিলং-এ যেতে হয়েছে—এখন আর বম্বেতে আসতে পারবেন না তিনি।

অবশ্য আমাদের 'সুলতান বাগ'-এর ফ্ল্যাটে তখন অনেকেই থাকে। বৃদ্ধ বঙ্কিমবাবু এসেছেন—বন্ধুবর মণ্টি ঘোষও তখন এসেছে—তাছাড়া ভোম্বল, তিমিরের ভাইপো, অর্থাৎ মিহিরবাবুর ছেলেও আমাদের ওখানে আছে। এরা সকলেই নীচের একটি বড় ঘরে থাকে—তাছাড়া পুরনো চাকরবাকর আয়া তো আছেই। কিন্তু সাধনার সঙ্গে রাত্রে কে থাকবে? আগেই বলেছি যে লীলা দেশাই ও প্রতিমা দাশগুপ্ত পাশের বাড়ীতেই থাকত। প্রতিমাই সমস্যার সমাধান করে দিল। সে বলল: আপনি নিশ্চিন্ত মনে কলকাতায় যান—আমি সাধনাদির কাছে রাত্রে থাকব, যতদিন না আপনি ফিরে আসেন।

কলকাতায় এসে আবার সেই packing-এর হাঙ্গামা। অতবড় ফ্ল্যাটের আসবাব পত্র সব মাল গাড়িতে করে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। এই নিয়ে দু'বার হলো। প্রথম—যখন চৌরঙ্গী প্লেসের ফ্ল্যাট ছেড়ে বম্বেতে যাই।

যাবার আগে জ্ঞানাঙ্কুর ও জজি অনেকবার বলেছিল যে, ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে যেও না—কাউকে সাব্-লেট্ করে দিয়ে যাও, ফিরে এসে ৩৭৫ টাকায় আর এরকম ফ্ল্যাট পাবে না। কিন্তু তখন কে করে কথা শোনে।

তারপর যখন ১৯৪৫ সালে বোম্বাই থেকে আবার কলকাতা ফিরে এলাম তখন স্টিফেন কোর্টের মালিক মিঃ এ্যারাটুনকে একটি ফ্ল্যাটের কথা বলায় তিনি আমাকে সোজা প্রশ্ন করলেন: এতদিন কোথায় ছিলেন মিঃ বোস—ভারতবর্ষে না ইউরোপে?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম: তার মানে? আমি তো বম্বেতে ছিলাম।

তাতে মিঃ এ্যারাটুন বললেন: তাহলে তো আপনার জানা উচিত মিঃ বোস। এখন ফ্ল্যাট নিতে গেলে 'সেলামী', যাকে বোম্বাইতে বলে 'পাগড়ী', তাই দিতে হয়। আর এ প্রথা তো বোম্বাইতে অনেকদিন আগেই চালু হয়েছে।

আমি বললাম: কলকাতাতেও এ প্রথা চালু হয়েছে নাকি? আমি যখন ১৯৪২ সালে কলকাতা ছাড়লাম, কই তখন তো এ ঝামেলা ছিল না। তখন তো বিনা সেলামীতেই কত ফ্ল্যাট পাওয়া যাচ্ছিল। এই আপনাদের স্টিফেন কোর্টেই কত ফ্ল্যাট খালি ছিল।

ঠিক কথা মিঃ বোস, বললেন মিঃ এ্যারাটুন—তখন যে জাপানীদের বোমার ভয়ে বহু লোক কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল—তারপর ১৯৪৪ সাল থেকে আবার যখন কলকাতায় লোক আসতে সুরু করল, বিশেষ করে পাঞ্জাব এবং সিন্ধু থেকে, তখনই হু-হু করে ভাড়া বাড়তে সুরু করল—আর তার সঙ্গেই এসে জুটল 'সেলামী' প্রথা। আচ্ছা, আপনি তো স্টিফেন কোর্টের 'টপ ফ্লোরে' দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ফ্ল্যাটটায় থাকতেন, না?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম: হ্যাঁ।

—ওইটিই এখানকার মধ্যে সব থেকে ভাল ফ্ল্যাট—যাকে বলে প্রাইজ-ফ্ল্যাট। জানেন তো এর আগে ওখানে ফ্রেঞ্চ কনসুলেট থাকতো।

আমি বললাম: আমি জানি সে কথা।

মিঃ এ্যারাটুন বলতে লাগলেন: এখন ওই ফ্ল্যাটটার জন্যে এক ভদ্রলোক ত্রিশ হাজার টাকা সেলামী দিয়ে মাসে হাজার টাকা ভাড়া দিচ্ছেন। অবশ্য আপনাকে বলে রাখা ভাল যে, সে সেলামীর টাকা আমার হাতে আসে নি।

আমার চোখ তখন কপালে উঠেছে। আমি বললাম: বলেন কি মিঃ এ্যারাটুন? ত্রিশ হাজার টাকা সেলামী ও মাসে মাসে হাজার টাকা ভাড়া? আর তখন আমি দিতাম মাসে ৩৭৫ টাকা?

—হ্যাঁ মিঃ বোস। অবাক হবারই কথা। রূপকথা বলে মনে হবে। কলকাতা আর সে কলকাতা নেই। সেইজন্যেই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এতদিন আপনি ছিলেন কোথায়—ভারতবর্ষে না ইউরোপে?

আবার আগের কথায় ফিরে আসি। আমি যখন কলকাতার ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে বম্বে যাই, তখন আমার মাস্টার বুইক গাড়ীখানাও বিক্রি করে দিয়েছিলাম। একে তখন কলকাতা থেকে লোক সব জাপানী বোমার ভয়ে পালাচ্ছে—তখন গাড়ী কেনবার খদ্দের কোথায়? কিনেছিলাম গাড়ীখানা ৯০০০ টাকায় শুধু দেড় বছর আগে, আর বিক্রি করতে হলো ৫০০০ টাকায়। জ্ঞানাঙ্কুর বললে: এটা কি করছিস মধু? এমন সুন্দর নতুন গাড়ী আর এই জলের দামে বিক্রি করছিস? তার থেকে গাড়ীটা আমার কাছে রেখে যা। এ অবস্থা বেশীদিন থাকবে না—আমি বেশ ভাল দরে বিক্রি করে দেব। জজিও সেখানে ছিল। সেও একই কথা বলল।

আমি বললাম: উপায় নেই ভাই, এত জিনিসপত্র বম্বে নিয়ে যাওয়ার খরচ

আছে বিস্তর। এদিকে আমার টাকার দরকার। আমি জানি কলকাতায় কিছুদিন পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে—আমার 'মাস্টার বুইক' এর থেকে বেশী দামে বিক্রি হবে। কিন্তু বম্বেতে একেবারে নিঃস্ব হয়ে তো থাকতে পারব না। যতদিন না কোন কাজ হয় ততদিন নিজের খরচটা তো চালাতে হবে।

এর পরে আর জজি ও জ্ঞানাঙ্কুরের কিছু বলার ছিল না—চুপ করে রইল। তারা আমার সত্যিকারের বন্ধু—আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে তাদের খুব প্রাণে লেগেছে কথাটা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল ১৯৪৫ সালে বম্বেতে আমার এক বন্ধু ১৯৪১ মডেলের 'মাস্টার বুইক' কিনল ৩৫,০০০ টাকায়।

আমি বম্বেতে ফিরে এলাম নভেম্বর মাসে। এসে শুনলাম যে সাধনা রঞ্জিত মুভিটোনের সঙ্গে দুখানি ছবির চুক্তি করেছে—'শঙ্কর পার্বতী' এবং 'বিষকন্যা'। সে ছবির কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত দেখলাম। অবশ্য যেদিন সাধনার শুটিং থাকে না, সেদিন আমাদের ওখানে গানের আসর বসে। সায়গলই প্রধান গায়ক। সেই আসর জমাত। রঞ্জিতে তখন সে 'তানসেন' ছবি করছে। এ ছবির নায়িকা ছিল খুরশীদ।

আমাদের এই গানের আসরে অবশ্য অনেকেই আসত—তার মধ্যে ছিল জ্ঞান দত্ত (রঞ্জিত মুভিটোনের নিয়মিত সঙ্গীত পরিচালক), পরিচালক চতুর্ভুজ দোশী, কেদার শর্মা, বুলবুল দেশাই এবং আরো অনেকে। সায়গল একটার পর একটা গান গেয়ে যেত। এক একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত গানের জলসা চলত—খাওয়া-দাওয়া চলত। আমি কিন্তু কেন জানি না এই সব গানের আসরে যোগদান করতে পারতাম না। মনের মধ্যে যে একটা নৈরাশ্যের পাথর চেপে বসেছিল সেটাকে কিছুতেই সরিয়ে ফেলতে পারছিলাম না। বেশীর ভাগ সন্ধ্যার সময় আমি আমার ঘরটিতে একলা বসে সর্বদুঃখহরা হুইস্কির গ্লাসে মনোনিবেশ করতাম। আর পড়াশোনা নিয়ে সময় কাটাতাম। মাঝে মাঝে মিঃ ওয়াদিয়ার বাড়ী যেতাম। তিনি আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই থাকতেন।

ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে একদিন নিরঞ্জন পালের সঙ্গে দেখা। গোলাপদা মারা যাবার পর মিঃ পালও বম্বে টকীজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে বহু ছবির চিত্রনাট্য লিখে দিতেন এবং ভারত সরকারের ইনফরমেশন অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং ডিপার্টমেণ্ট-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন—তাঁরা যে-সব দলিল-চিত্রগুলি করছিলেন তার অন্যতম উপদেষ্টা হিসাবে। অনেক দিন পরে মিঃ পালের সঙ্গে

দেখা হওয়ায়, গেলাম দুজনে ক্রিকেট ক্লাবে—এবং পানাহারের মধ্যে দিয়ে দুই বন্ধুতে বহু সুখ-দুঃখের কথা হলো। মিঃ পাল জানতেন যে, সাধনা রঞ্জিত মুভিটোনের হয়ে স্বাধীনভাবে দুখানি ছবি করছে—এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি একটা মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমি যে বম্বেতে কোন প্রোডিউ-সারের সঙ্গে দেখা করতে চাই না—একথাও বুঝতে পারলেন। মিঃ পাল অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক—তিনি আমার মানসিক বিপর্যয়টি ঠিক ধরে ফেললেন।

তিনি বললেন: আমি শীগ্‌গির দিল্লী যাচ্ছি—তুমিও চল না আমার সঙ্গে। সেখানে আমি ইনফরমেশন অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং-এর সেক্রেটারী মিঃ পি. এন. থাপার-এর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। চমৎকার লোক মিঃ থাপার। তিনি অত্যন্ত শিল্পানুরাগী। নৃত্য-গীতের দিকে তাঁর অসীম আগ্রহ।

আমি বললাম: সবই তো বুঝলাম। কিন্তু শেষকালে চাকরী করব—তার ওপর গভর্ণমেণ্টের? এতদিন স্বাধীনভাবে কাজ করার পর?

মিঃ পাল বাধা দিয়ে বললেন: সেদিন আর নেই মধু। সেদিনের প্রোডিউসার আর আজকের যুদ্ধের সময়ের প্রোডিউসারের মধ্যে অনেক তফাৎ। এদের না আছে শিল্পজ্ঞান, না আছে শিক্ষা-সংস্কৃতি! এরা বোঝে শুধু একটি জিনিষ—টাকা—আর কি করে তাড়াতাড়ি প্রচুর টাকা করা যায়। এরা ভাল ডিরেক্টারের মূল্য বোঝে না। এরা ভাবে কতকগুলি বড় 'স্টার' ছবিতে থাকলেই—ছবি পয়সা দেবে—ডিরেক্টার যেই হোক না কেন। তোমার মনের ধারা আমি জানি মধু—তুমি এখানে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারবে না। তার চেয়ে তোমাকে আমি বলছি তুমি ইনফরমেশন ফিল্ম অফ্ ইণ্ডিয়াতে যোগ দাও। মিঃ থাপারকে বলে কয়ে তোমাকে যাতে বিশেষ বিশেষ ধরনের ছবি দেওয়া হয় তার চেষ্টা করব।

সব শুনে মিঃ পালকে বললাম: ঠিক আছে—আপনি দিল্লী গিয়ে মিঃ থাপারের সঙ্গে কথা বলুন। কোন সংস্কৃতিমূলক ছবি—যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য—এই ধরনের ছবি হলে আমি করতে রাজী আছি। কোন প্রচারমূলক ছবি অর্থাৎ প্রোপাগাণ্ডা ছবি আমার দ্বারা হবে না।

মিঃ পাল বললেন—না না—সে রকম ছবি তুমি করতে যাবে কেন? আমি মিঃ থাপারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তোমায় টেলিগ্রাম করব। টেলিগ্রাম পাবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসো। পরে যেন আবার মত বদলে ফেলো না—তাহলে কিন্তু আমি বড্ড অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যাবো।

আমি হাসতে হাসতে বললাম: না না, আমি মত বদলাব না। আপনার টেলিগ্রাম পাবার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লী গিয়ে হাজির হবো।

মিস্টার পালের কাছ থেকে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ নাগাদ আমি টেলিগ্রাম পেলাম—তাতে তিনি লিখেছেন অবিলম্বে দিল্লী রওনা হবার জন্মে। তিনি আমার জন্মে মিঃ থাপারকে বলে কয়ে বন্দোবস্ত করে রেখেছেন।

আমিও আর কালবিলম্ব না করে দিল্লী রওনা হয়ে গেলাম। দিল্লীতে গিয়ে উঠলাম রেস কোর্স রোডে সেজদির বাড়ীতে। ব্রজেন্দ্রদা (স্যর বি. এল. মিত্র) তখন ভারতের অ্যাডভোকেট জেনারেল। তখন দিল্লীতে ছিল ফেডারেল কোর্ট—সুপ্রীম কোর্ট তখনও হয়নি।

ওখানে পৌঁছে মিঃ পালের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন যে, মিঃ পি. এন. থাপারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে তাঁর কথা-বার্তা হয়েছে এবং তিনি আমাকে বিশেষ ধরনের কাজ দিতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক ছবি তৈরী করার কাজ।

পরদিন সকালে মিঃ পাল আমাকে নিয়ে গেলেন মিঃ পি. এন. থাপারের কাছে। প্রথম আলাপেই আমাদের দুজনের দুজনকে বেশ ভাল লাগল। তিনি আগেই আমার 'রাজনর্তকী' (হিন্দী) ও The Court Dancer (ইংরাজী) দেখেছিলেন। দুটি ছবিরই তিনি ভূয়সী প্রশংসা করলেন—বিশেষ করে ইংরাজী সংস্করণের। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে অনেক কথা হলো। আমি বললাম, আমাদের দেশে যে সব ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য আছে—সেগুলির এক-একটি ধারাকে নিয়ে যদি ১ রীল করে এক-একটি ছবি করা যায়—যেমন 'কথাকলি', 'কথক', 'মণিপুরী' ও 'ভারত-নাট্যম' এবং ভারতীয় লোকনৃত্য—এগুলির বিশেষ আকর্ষণ আছে জনসাধারণের কাছে, আর তাছাড়া দলিলচিত্র (Documentary film) হিসাবেও এগুলি বহুদিন সংরক্ষিত হতে পারে। তার মূল্যও বড় কম নয়।

যতক্ষণ আমি ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে কথা বলছিলাম মিঃ থাপার খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। আমার কথা শেষ হলে কয়েক মুহূর্ত তিনি কি একটা চিন্তা করলেন, তারপর বললেন: আমি ভেবে দেখলাম মিঃ বোস, আপনার প্রস্তাব মতই বিভিন্ন ধারার নাচগুলি এক রীল করে তুললে ভাল হবে—অর্থাৎ পাঁচটি ধারার নাচের জন্য ৫ রীল।

একজন পাকা আই. সি. এস অফিসারের মত কথাগুলি তিনি বেশ গুরুত্ব দিয়েই বললেন। তারপর আরও বললেন: অবশ্য আপনার পারিশ্রমিক খুব বেশী হবে

না—মানে আপনার মত একজন বিখ্যাত ডিরেক্টারের সাধারণ ফিল্ম কোম্পানীতে যা পাওয়া উচিত, এখানে অর্থাৎ ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইণ্ডিয়ায় তত বেশী হবে না। তবে আমি চেষ্টা করব যতটা বেশী করা যায়। গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ডিরেক্টারের জন্যে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের যে হার নির্ধারণ করা আছে সেইটা যাতে আপনি পান তার চেষ্টা করব।

এরপর তিনি জানতে চাইলেন যে দিল্লীতে আমি কোথায় উঠেছি। আমি আমার ভগ্নিপতির ঠিকানা দিলাম। তিনি বললেন যে, তিন চার দিনের মধ্যে আমার নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেবেন। আর এই সঙ্গে ইনফরমেশন ফিল্মের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ এজরা মীরকে বোম্বাই-এ আমার বিষয় জানিয়ে দেবেন। এজরা মীর যখন ম্যাডানে ছিলেন তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। অত্যন্ত অমায়িক এবং চমৎকার লোক ছিলেন এই মিঃ মীর। তাঁর সঙ্গে কাজ আমার ভালই চলবে। মিঃ থাপার আমাকে এও জানালেন যে সংস্কৃতিমূলক ছবির সব দায়-দায়িত্বের ভার আমার ওপরই থাকবে—অর্থাৎ এ বিভাগে আমিই হবো সর্বেসর্বা।

মিঃ থাপারকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম। মিঃ পালও আমার সঙ্গে চলে এলেন। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন ইম্পিরীয়্যাল হোটেলে লাঞ্চ খাওয়াতে। খেতে খেতে পুরানো দিনের অনেক কথাই হলো—বিশেষ করে গোলাপদার (হিমাংশু রায়ের) কথা। তিনি বলতে লাগলেন, গোলাপদা কত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বম্বে টকীজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর সেই অঙ্কুর বিরাট মহীরুহে পরিণত হলো—ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রনির্মাতাদের একজন বলে স্বীকৃতি পেল—কিভাবে একটার পর একটা ছবি 'হিট্' করল। এ স্বীকৃতি হঠাৎ পাওয়া বা ভাগ্যের জোরে পাওয়া নয়। এ যশ, এ স্বীকৃতি অর্জন করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, অদম্য সাহস ও সাহসিকতার প্রয়োজন হয়েছে—সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হয়েছে গোলাপদার সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি।

গোলাপদার কথা বলতে বলতে মিঃ পালের গলা ধরে এল—চোখে জল চিক-চিক করতে লাগল। একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন : কিন্তু গোলাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বম্বে টকীজের ভাঙ্গন ধরল। মাঝ-দরিয়ায় নৌকার হাল ভেঙ্গে গেলে যে অবস্থা হয় বম্বে টকীজেরও এখন সেই অবস্থা। এত বড়, এমন সুন্দর একটা প্রতিষ্ঠানের আজ কি অবস্থা! ভেঙ্গেচুরে তছ্‌নছ্‌ হয়ে যেতে বসেছে।···

লাঞ্চ খাওয়া শেষ করে বিদায় নেবার সময় মিঃ পাল আমার এই পদপ্রাপ্তিতে

অভিনন্দন জানিয়ে বললেন: আমি জানি মধু, তুমি এই নতুন চাকরীতে খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছ না। তবে আমি বলছি যে, আই. এফ. আই-তে কাজ করে তুমি আনন্দ পাবে। আজকের বোম্বায়ের চিত্রশিল্পের সঙ্গে আগেকার চিত্রশিল্পের অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। এখন ওখানে যত ভুঁইফোঁড়দের রাজত্ব। এরা না বোঝে সংস্কৃতি, না বোঝে শিল্প। এসব কথা তোমাকে আগেও বলেছি—এদের সঙ্গে তোমার বনবে না। তার চেয়ে আই. এফ. আই-তে বেশ শান্তিতে কাজ করতে পারবে। এর জন্যে তুমি আমাকে একদিন ধন্যবাদ দেবে।

আমি বললাম: সে তো আমি এখনই দিচ্ছি।

মিঃ পাল হেসে বললেন: আর তাছাড়া তোমার তো দেশ-বিদেশ ঘোরার একটা ভীষণ নেশা আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নাচ তুলতে গেলে সব দেশেই তোমায় ঘুরতে হবে—অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের পয়সায় দেশ ভ্রমণ হবে—ছবিও হবে। দেখবে, জীবনে অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে।

আমিও ভেবে দেখলাম মিঃ পালের কথাই ঠিক। যাই হোক, মিঃ পালকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

সেজদির বাড়ীতে বেশ আদর-যত্নে এবং শান্তিতে ছিলাম। এই পরিবেশে থেকে মানসিক নৈরাশ্য অনেকখানি কাটিয়ে উঠলাম।

তিন চার দিনের মধ্যেই মিঃ থাপারের কাছ থেকে নিয়োগপত্র পেলাম। মাহিনা হলো ১০০০৲ টাকা। মাহিনা ছাড়া সরকারী চাকুরেরা যে সব স্থবিধে পেয়ে থাকে —বাড়ীভাড়া, গাড়ীভাড়া ইত্যাদি সেগুলি থেকেও বাদ গেলাম না।

দিল্লীতে এই ক'দিন থেকে শরীর ও মন দুই-ই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। বম্বেতে যখন ফিরে এলাম তখন যেন আমি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ।

ফিরে এসে বোম্বায়ের তারদেও-তে ইনফরমেশন ফিল্মের অফিসে আমি মিঃ মীরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আগেই বলেছি যে মিঃ মীরের সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তিনিও ইতিমধ্যে আমার নিয়োগ ব্যাপারে খবর পেয়েছেন বেতার এবং তথ্য বিভাগ থেকে। মিঃ মীর আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

এই সময় সাধনার মা এলেন আমাদের ফ্ল্যাটে—সঙ্গে এল সাধনার ছোট ভাই প্রদীপ।

আমি 'ডান্সেস অফ ইণ্ডিয়ার' চিত্রনাট্য রচনার কাজ স্বরু করলাম। বিভিন্ন ধারার নাচগুলি সম্বন্ধে ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করার জন্য প্রচুর বই কিনলাম

এবং রীতিমত পড়াশুনা সুরু করলাম। এর আগে কলকাঁতা এবং বম্বেতে কয়েকজন দেশবিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর ক্লাসিক্যাল নাচ দেখার সৌভাগ্য আঁমার হয়েছে। কলকাতায় বালা সরস্বতীকে দেখেছিলাম 'ভরত নাট্যম' নাচতে। মণিপুর থেকে নৃত্যশিল্পীর দল এসে মণিপুরী নৃত্য দেখিয়েছিল। বম্বেতে বিখ্যাত 'কথক' নৃত্যশিল্পী লচ্ছু মহারাজকে দেখেছিলাম। সুতরাং প্রায় সবরকম ক্লাসিক্যাল নাচই আমার দেখা ছিল। কিন্তু ভারতের ক্লাসিক্যাল নৃত্য বুঝতে হলে প্রত্যেকটি নাচের টেকনিক, মুদ্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। ভারতীয় নৃত্য গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। নাচের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নৃত্যশিল্পীকে কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। তার সমস্ত পদক্ষেপ, অঙ্গ সঞ্চালন, ভাব-ব্যঞ্জনা, মুদ্রা—প্রত্যেকটি জিনিষ শাস্ত্রসম্মত হওয়া চাই—এমন কি সঙ্গীত পর্যন্ত বিশেষ রাগ-রাগিণীকে অবলম্বন করে বাজাতে হবে। শিল্পীর স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা এখানে চলবে না। দর্শকদেরও নৃত্য ও মুদ্রা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। তাঁরা নৃত্য দেখতে দেখতে যদি মুদ্রা বা অঙ্গ-ভঙ্গীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারেন তাহলে তাঁরা কিছুতেই সম্পূর্ণ নৃত্যের রস গ্রহণ করতে পারবেন না।

এরকম একটি দুরূহ বিষয়ের চিত্রনাট্য রচনায় যেমন চাই সবরকম নাচ ও তার টেক্‌নিক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান—তেমনি চাই সম্পূর্ণ একাগ্রতা। যে সব দিনগুলিতে সাধনার শুটিং থাকত সেদিনগুলিতে বেশ নির্বিবাদে বসে আমি পড়তে ও লিখতে পারতাম। কিন্তু যেদিন তার শুটিং থাকত না সেদিন সন্ধ্যার সময় গান-বাজনা, হৈ-হল্লা হতো। সায়গল একবার গান আরম্ভ করলে সে গান চলতেই থাকত। ও ছাড়া ছিল জ্ঞান দত্ত এবং অন্যান্য কণ্ঠশিল্পীরা। গান-বাজনা যত না হতো হৈ-হল্লা হতো তার থেকেও বেশী।

আমার অফিস ঘরটি ছিল এই ড্রয়িংরুমের পাশেই—সুতরাং যেসব দিনগুলিতে গান-বাজনার আসর বসত সেসব দিন আর আমার লেখাপড়া বা চিত্রনাট্য লেখা হতো না। আমি একদিন সাধনাকে এই বিষয় বললাম, কিন্তু কোন ফল হলো না।

সাধনা তখন একসঙ্গে দুখানা ছবিতে অভিনয় করছে—টাকাও পাচ্ছে প্রচুর, সুতরাং এসব ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তাই হলো। সাধনার বহু স্তাবক এবং তথাকথিত বন্ধু জুটে গেল—এই সব স্তাবকদের অজস্র স্তুতিবাদে সাধনার মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা বা বেপরোয়া ভাব এসে গেল—যেটা আমি সাধনার ক্ষেত্রে আশা করিনি। এটাই আমার মস্ত ভুল হয়েছিল। এইসব স্তাবকদের অনেক কথাই আমার কানে আসতে লাগল। এদের ইচ্ছে হলো যে আমি সরে যাই সাধনার কাছ থেকে, যাতে এইসব

তথাকথিত বন্ধুর দল সাধনাকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসে তার এই প্রচুর রোজগারের সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহণ করে। আমি থাকাতে এদের খুব বেশী সুবিধা হচ্ছিল না—কারণ রাত্রি বেশী হলেই আমি গান-বাজনা হৈ-হল্লা জোর করে বন্ধ করে দিতাম। আমার মুখের ওপর কিছু বলতে পারতো না বটে কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম এবং মাঝে মাঝে শুনতেও পেতাম আমার অসাক্ষাতে তারা সাধনাকে উস্কানি দিচ্ছে আলাদা ফ্ল্যাটে উঠে যাবার জন্য। আমি থাকাতে তারা পুরোপুরি সাধনার ওপর আধিপত্য করতে পারছে না।

প্রায়ই এই নিয়ে খিটিমিটি চলে। একদিন কিন্তু ব্যাপারটা চরমে উঠল।

সকালে আমি আই. এফ. আই-এর অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি এমন সময় সাধনা হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললে: আজ আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

চমকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: আমরা মানে?

—আমি, মা আর প্রদীপ। গম্ভীরভাবে বলল সাধনা।

—হঠাৎ এমন কি কারণ ঘটল যার জন্যে তোমরা চলে যাচ্ছ—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আমি বললাম।

সাধনা বেশ উত্তেজিতভাবেই বলল: তোমার সঙ্গে আজকাল প্রায়ই খিটিমিটি হয়—তাতে তোমার মেজাজ ঠিক থাকে না—আমারও ভাল লাগে না, সুতরাং—

আমি বাধা দিয়ে বললাম: খিটিমিটির কারণ তো আর কিছুই নয়, রাত্রিবেলায় চেঁচামিচি হৈ-হুল্লোড় হয়—শুধু সেটাই বন্ধ করতে বলেছি। এতে শুধু আমার অসুবিধা হয় না, পাশের বাড়ীর লোকেরাও এ অসুবিধা ভোগ করে—প্রতিমা, (প্রতিমা দাশগুপ্ত) আমায় বলছিল এই বিষয়। এটা তো ক্লাবঘর নয়!

এই কথায় সাধনা যা জবাব দিল তাতে আমি শুধু আশ্চর্যই হলাম না—একটা দারুণ আঘাত পেলাম। কয়েক মুহূর্ত আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। কোন মতে বললাম: একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ সাধনা? তবে তুমি যদি একেবারে সব স্থির করে ফেলেই থাক, তাহলে আমার আর কিছুই বলার নেই। ...তা কোথায় যাচ্ছ—কোন হোটেলে?

সাধনা বললে: হোটেলে নয়, মেরিন ড্রাইভে একটা ফ্ল্যাট পেয়েছি, সেইখানেই যাচ্ছি।

—ওঃ, তাহলে অনেকদিন আগে থেকেই সব ঠিক করে ফেলেছ!

সাধনা আর কোন কথা না বলে চলে গেল ঘর থেকে।

অফিসে বেরুবার সময় সাধনার মার সঙ্গে দেখা হলো। তাঁকে বললাম:

সাধনা এই যে এখান থেকে চলে গিয়ে আলাদা থাকতে যাচ্ছে—এ কাজটা কি ভাল হচ্ছে? এমন কিছু একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেনি যার জন্যে তাকে এবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন না?

তাতে তিনি বললেন: সাধনা যখন একবার ঠিক করেছে চলে যাবার তখন আর তাকে বলে কোন লাভ হবে না মধু। তাছাড়া সব বন্দোবস্তই পাকা হয়ে গেছে। মেরিন ড্রাইভের ফ্ল্যাটটির জন্যে আগাম টাকা দেওয়া, এমন কি জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য লরীর বন্দোবস্তও হয়ে গেছে। আজ লাঞ্চের পরই আমরা remove করব। সুতরাং এখন আর—

হতাশভাবে আমি বললাম: ও, এতদূর যখন গড়িয়েছে তখন আর বলে কোনো ফল হবে না। কিন্তু আমি আপনাকে বলে রাখছি যে সাধনা আজ যে পথ বেছে নিল সেটা অত্যন্ত ভুল পথ। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার মানে এই নয় যে ঘর-সংসার স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় আলাদা হয়ে থাকা। যাই হোক, তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে—নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই ঠিক করুক।

এই বলে আমি আর না দাঁড়িয়ে অফিসে চলে গেলাম।

মনটা ভীষণ খারাপ লাগল। পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের ওপর দারুণ বিতৃষ্ণা এসে গেল। সেদিন আর লাঞ্চ খেতে বাড়ী এলাম না। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা মাঝে মাঝে উঁকি দিল—হয়ত সাধনা একটা টেলিফোন করবে—কিন্তু কোন ফোন এল না।

সমস্ত দিন কাজে মন দিতে পারলাম না—নানান রকম চিন্তা মনের মধ্যে ভিড় করতে লাগল। এক এক সময় মনে হতে লাগল হয়ত সাধনা এতক্ষণে মত বদলেছে—হয়ত বাড়ী ফিরে দেখব ওরা যায়নি। হয়ত ঝোঁকের মাথায় সাধনা আমায় বলে ফেলেছে, কিন্তু সত্যিই কি সে এতদিনের প্রেম, প্রীতি ভালবাসা সব দু'পায়ে মাড়িয়ে চলে যেতে পারবে?

কিন্তু আবার পরক্ষণেই মনে হলো—মেরিন ড্রাইভে ফ্ল্যাটের জন্য টাকা আগাম দিয়েছে যখন, তখন বেশ কিছুদিন থেকেই ওরা চলে যাবার তোড়জোড় করছে। তার ওপরে শুনলাম জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্যে লরীর বন্দোবস্ত পর্যন্ত হয়ে গেছে—নাঃ, তাকে আর ফেরানো যাবে না।

তবু? তবু কি অঘটন ঘটে না? অসম্ভব কি সম্ভব হয় না? যদি···

এইভাবে আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরলাম। মনের মধ্যে যে ক্ষীণ আশার দীপটি ঝিলিক দিচ্ছিল সেটি একেবারে নিঃশেষে নিভে গেল।

বাড়ীতে কেউ নেই। সাধনারা চলে গেছে। তার শোবার ঘর খালি। তার আসবাবপত্র সব নিয়ে গেছে। তাছাড়া ড্রয়িংরুমের বেশীর ভাগ ফার্ণিচার এবং রেডিওগ্রামটিও নেই।

চামান বললে লাঞ্চের পরে একটা লরী এসেছিল, তাতে সব মাল বোঝাই করে মেমসাহেব চলে গেছে। এই সামান্য ক'টি কথা বলতেই যেন তার গলাটা ধরে এল। আমাদের বিয়ের পর থেকেই চামান আমার কাছে কাজ করছিল।

সমস্ত দেহ মনে এক দারুণ অবসাদ নেমে এল। মনে হলো এই বিরাট বিশ্বে আমি একা—এতদিন এত বছর ধরে সুখে দুঃখে যে আমার সমস্ত মনটা জুড়ে বসেছিল, সে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তার পরিবর্তে বিরাজ করছে এক বিরাট শূন্যতা। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা কি শুধু কথার কথা? সামান্য একটা মুখের কথায় কি তা চিরদিনের মত জলের দাগের ন্যায় মুছে ফেলা যায়?

শেষে সর্বসন্তাপহারিণী সুরার আশ্রয় নিলাম। লোকে বলে শোক দুঃখ মনোবেদনার অবসান ঘটাতে এর আর জুড়ি নেই। কিন্তু আমার তো মনে হয় এতে মানুষের সুপ্ত প্রবৃত্তিগুলি আরও সজাগ, আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বহুদিনের বিস্মৃত ঘটনাগুলি আবার মনের পর্দায় নতুন করে ধরা দেয়। মানসিক যন্ত্রণা কমে যাওয়া দূরে থাক আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যার সময় এত বড় ফ্ল্যাটটার মধ্যে আমি একা। একটা লোকও নেই—যার সঙ্গে দুটো কথা বলি। বহুদিনের পুরাতন স্মৃতিগুলি মনের মধ্যে এসে ভীড় করতে লাগল। ভাবতে ভাবতে মন চলে গেল সেই সুদূর অতীতে। মনে পড়তে লাগল—নতুন বিয়ের পর মোটরে কলকাতা থেকে লাহোর যাওয়া, সেখানে প্রথম সংসার পাতা—ভবিষ্যতের কত রঙীন স্বপ্নের জাল বোনা। তারপরে গরম পড়তে সাধনাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার পর নিজে অসুস্থ হয়ে পড়া। অসুস্থ অবস্থাতেই কলকাতায় ফিরে গিয়ে সাধনাকে নিয়ে রাঁচী চলে যাবার কথা চিন্তা করা, কিন্তু কলকাতায় এসে দেখা গেল যে, সেও টাইফয়েডে শয্যাশায়িনী—আমাকে দেখে সেদিন জাড়য়ে ধরে তার সেই আকুল কান্না! আরও মনে পড়ল, সে আমাকে পেয়ে কি রকম নিশ্চিন্ত বোধ করল; আমি যেন তার একটা বিরাট আশ্রয় যার ওপর সে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল: 'যাক, তুমি এসে গেছ মধু, এবার আমি ভাল হয়ে উঠব।' তারপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সে আমাকে কাছ ছাড়া করতে চাইত না।

যদিও নার্স ছিল তার কাছে সব সময়ের জন্যে—তবুও ওষুধ খাওয়ানো, পথ্য

খাওয়ানো, সব আমাকে নিজের হাতে করতে হতো। চুয়াল্লিশ দিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানি করে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের চিকিৎসায় সাধনার জ্বর ছাড়ল। তারপর তাকে নিয়ে চলে গেলাম রাঁচী। দীর্ঘ রোগভোগের পর সে এতখানি অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছিল যে তাকে রীতিমত কোলে করে ট্রেনে চড়াতে হয়েছিল।

এই দীর্ঘ দিন শরীর ও মনের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া সুরু হলো রাঁচী পৌছবার পর। এতদিন শুধু স্রেফ মনের জোরে নিজেকে খাড়া রাখতে পেরেছিলাম। রাঁচী পৌছে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না। শয্যা নিলাম। কিছুদিন পর সাধনা ভাল হয়ে উঠল। কিন্তু আমাকে নিয়ে মার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। আমার সেবা-শুশ্রূষার ভার মার সাথে সাধনা খানিকটা ভাগ করে নিল।

রোগে ভুগে আমার মেজাজটা অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয়ে পড়েছিল। আমার অনেক অন্যায় আবদার ও অত্যাচার মাকে ও সাধনাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হতো। এই জন্যে সমবেদনায় ও সহানুভূতিতে মা তাঁর হৃদয়ের অজস্র স্নেহধারায় সাধনার মনকে ভরে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সাধনা মার এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে মা প্রায়ই বলতেন: সাধনা আমার বাড়ীর লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী—লক্ষ্মী! বারবার মার এই কথাটাই মনে আঘাত দিতে লাগল। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না, হঠাৎ মনে হলো কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। শুনলাম স্ত্রীকণ্ঠে কে যেন বলছে: আসতে পারি মিঃ বোস? এবং আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল প্রতিমা দাশগুপ্ত, সঙ্গে বেগম পারা।

প্রতিমা বললে: চলুন মিঃ বোস, একটা সিনেমা দেখে আসি, চুপচাপ একা একা বসে থেকে কি হবে?

আমি বললাম: এখন একটু একা থাকতে চাই। আর আমার সাথী তো আমার সঙ্গেই আছে। বলে হুইস্কির গ্লাসটা দেখালাম।

প্রতিমা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করত। 'রাজ-নর্তকীতে' (হিন্দী) আমি তাকে প্রথম হিন্দী ছবিতে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দিয়েছিলাম—সেজন্যে সে আমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ ছিল। প্রতিমা হেসে বলল: ও সাথীতে কোন কাজ হবে না—তার চেয়ে চলুন আমরা তিনজনে কোথাও ডিনার খেয়ে তারপর একটা ভাল ছবি দেখে আসব।

আমি বললাম: আমায় মাফ করো প্রতিমা, আজ বাইরে গিয়ে ডিনার খেয়ে ছবি দেখার মত মনের অবস্থা নয় আমার। আর একদিন হবে'খন।

প্রতিমা বুঝল যে পীড়াপীড়ি করে কোন লাভ হবে না। শুধু বলল : বেশ, কবে যাবেন আমায় টেলিফোন করে বলবেন। একটু চুপ করে থেকে বললে : আপনার বাবুর্চি আছে তো!

আমি বললাম : হ্যাঁ, সে আছে বৈকি। সে আর যাবে কোথায়?

সাধনার বিষয় কোনো কথাই ও জিজ্ঞাসা করল না—আমিও কিছু বললাম না।

প্রতিমা ও বেগম পারা চলে গেল। আমারও চিন্তাধারায় একটা ছেদ পড়ল। সামনের বড় টেবিলটার ওপরে মার ছবিটা ছিল। সেদিকে নজর পড়তেই মনে পড়ল—মা প্রায়ই বলতেন : সাধনা আমার লক্ষ্মী। মা যাকে লক্ষ্মী বলতেন তার এতখানি পরিবর্তন সম্ভব হলো কি করে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার ভাগ্নী সুন্তুর কথা। সুন্তু (সুনীতা) আমার 'আলিবাবা' স্টেজ প্রোডাকসানের প্রথম 'মর্জিনা'। তার যথেষ্ট সহজাত প্রতিভা ছিল নাচে, গানে, অভিনয়ে। ওর বিয়ের পরে আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম : তোর এত ক্ষমতা, সুন্তু, আমার সি-এ-পি স্টেজ প্রোডাকসান কিংবা আমার কোনো ফিল্মে অভিনয় কর না! এতখানি প্রতিভা মাঠে মারা যেতে দিচ্ছিস কেন? তার জবাবে ছোট্ট সুন্তু যে কথা বলেছিল আজ দশ বছর পরে এই প্রথম সেই কথার সত্যতা আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম। সে বলেছিল : অভিনয় আর সংসার একসঙ্গে করা চলে না ছোটমামা। ভালো গৃহকর্ত্রী হওয়া অথবা ভালো অভিনেত্রী হওয়া দুটোর জন্যেই দরকার সারাক্ষণের জন্যে অখণ্ড মনোযোগ। আমি প্রথমটা বেছে নিয়েছি ছোটমামা। আমার সমস্ত ক্ষমতাকে আমি সুগৃহিণী হবার জন্যে নিয়োগ করেছি—তাই দিয়ে আমি আমার স্বামী ও গৃহের পরিচর্যা করব।

সেদিন ওর কথাকে আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ এতদিন পরে আমার মনের ভ্রান্ত ধারণা—ধারণাই বা বলি কেন, একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস—ভেঙে গেল। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, দুটো জিনিসই একসঙ্গে হয়। দুদিক একসঙ্গে সামলানো যাবে না কেন? আমার ধারণা ছিল শিক্ষিত ও অভিজাতবংশীয় ছেলেমেয়েরা যত বেশী মঞ্চ ও চিত্রশিল্পে যোগ দেবে তত বেশী শিল্প দুটির উন্নতি হবে। এই ধারণা নিয়েই আমি আমার সি-এ-পি গড়েছিলাম। আমি সাধনাকে মঞ্চ ও চিত্রশিল্পীর জীবনকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিলাম। গুরুদেবের 'দালিয়া' নাটকে সে যখন প্রথম মঞ্চে অবতরণ করে, তখন তার বয়স মাত্র পনেরো বছর। এবং তখন থেকে এই দীর্ঘকাল ধরে তার সহজাত প্রতিভা আমারই

নির্দেশিত পথ বেয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছিল এবং ক্রমে যশের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। অবশ্য প্রথম যখন আমি সাধনাকে 'আলিবাবা' ফিল্মে মর্জিনার ভূমিকা দিয়েছিলাম, তখন আমার জনকয়েক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে সাবধান করবার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: মধু, ঘরের স্ত্রীকে ফিল্মে নামাচ্ছ, এটা কি ভাল কাজ হচ্ছে? তুমি একটু ভেবে দেখো, ভাই। আমি তখন তাঁদের কথায় কান দিই নি, প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কুসংস্কার বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। এর আরও একটা মস্ত কারণ ছিল এই যে, সাধনাই হচ্ছে শিক্ষিত এবং অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত প্রথম বিবাহিত মেয়ে, যে এই চলচ্চিত্রশিল্পকে প্রকৃত নিষ্ঠার সঙ্গে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ওর আগে যে দু'-একজন অভিজাত বংশীয় মেয়ে চলচ্চিত্রে অবতীর্ণা হয়েছিলেন, তাঁরা খুবই ছোটখাটো ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউই ফিল্মের অভিনয়টাকে career হিসাবে গ্রহণ করেন নি, তাঁদের কাছে ওটা ছিল স্রেফ শখ! সাধনাই এ বিষয়ে প্রথম পথ-প্রদর্শক। আমারও জীবনে ছিল এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে একসঙ্গে শিল্পসাধনায় মত্ত হয়ে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলেছি, এতে আনন্দে দিশাহারা হবারই কথা—এর ভিতর ভাল-মন্দ দেখবার অবসর কৈ? কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল এবং অভিজাত পরিবারের মেয়েদের যতই ফিল্ম লাইনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে দেখতে লাগলাম, ততই ধীরে ধীরে আমার আগেকার ধারণাকে ভ্রান্ত মনে হতে লাগল। ক্রমেই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে শুরু করল, ভদ্রপরিবারের যে-সব শিক্ষিত মেয়ে চলচ্চিত্রাভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ক'জন শেষপর্যন্ত নিজেকে সংযত রেখে সসম্মানে সব দিক বজায় রাখতে পেরেছেন?

এই যে সব দিক সুষ্ঠুভাবে বজায় রেখে চলতে না পারা, আমার বিবেচনায় এর কারণ হচ্ছে: আকাশ-ছোঁয়া অহমিকা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। যেই একটু সাফল্যের পথে কোন মহিলা-শিল্পী পা বাড়ান, অমনই তাঁর পাশে এসে জোটে অগণিত ভক্তের দল। সংবাদপত্রের প্রশংসার সঙ্গে স্তাবকদের অজস্র স্তুতিবাদ এবং আশাতীত অর্থসমাগম মিশে শিল্পীকে এমনই এক অহমিকার সপ্তম স্বর্গে তুলে ধরে, যেখানে পৌছে শিল্পী সবাইকেই নস্যাৎ করতে শুরু করেন। তিনি তখন মনে করেন, তাঁর প্রতিভাই তাঁকে সব দিক দিয়ে বড় করে তুলেছে, কারুর সাহায্য পেলেও তিনি বড় হতেন, না পেলেও বড় হতেন—সমস্ত কৃতিত্ব হচ্ছে তাঁর। এই সময়ে তিনি মা, বাপ, স্বামী, গুরু বা আর কারুরই অভিভাবকত্ব স্বীকার করতে চান না; তাঁর মনে হয়, কাউকে গ্রাহ্য করা বা কারুর সদুপদেশ শোনা মানেই ছোট হয়ে

যাওয়া। এবং এরই বিষময় ফলে যা হবার, তাই হয়ে থাকে। একদিন যে সংসারকে তাঁর সুখের বলে মনে হয়েছিল, তা আর তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। যতদূর সম্ভব যথেচ্ছাচারিতাকেই তিনি তখন জীবন বলে মনে করেন; একটা প্রচণ্ড উন্মত্ততা তখন তাঁকে পেয়ে বসে।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে, অভিনয়কে—বিশেষ করে চলচ্চিত্রের অভিনয়কে যাঁরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের দ্বারা সংসারধর্ম পালন করা সম্ভব নয়। এদেশে আজ পর্যন্ত কাউকে দেখলাম না, যিনি উভয় দিকই সমানভাবে এবং সম্মানের সঙ্গে মানিয়ে চলেছেন। সাগরপারেও যেমন, এদেশেও তেমনই।

সাফল্য একদিন আমাকেও ঐ মহিলাশিল্পীদের মতই আত্মম্ভরী করে তুলেছিল। তখন আমি পুরুষাকারেই সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলাম। আর কেনই বা থাকব না? পর পর অনেকগুলো ছবির সাফল্যের ফলে যশ ও অর্থ আমার মনের ওপর সুরার মত কাজ করেছিল; তার ওপর ছিল স্তাবকদের মধুস্রাবী স্তুতিবাদ। কাজেই তখন আমি সাফল্যের গৌরীশৃঙ্গে দণ্ডায়মান সার্থক পুরুষ মধু বসু।

কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, সেই সার্থক পুরুষ মধু বসুর ক্ষমতা কতটুকু! আর্থিক, মানসিক, শারীরিক,—জীবনে একটার পর একটা ঘা খেতে-খেতে যখন আমার মনে হয়েছে, এই আমার জীবনের শেষ, অতলে তলিয়ে যাওয়া থেকে কেউ আর আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, দেখেছি ঠিক সেই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে কোথা থেকে যেন একটি অদৃশ্য মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হয়ে আমাকে শেষপর্যন্ত রক্ষা করেছে। এই অদৃশ্য মঙ্গলহস্তকে আমি ভগবান বলব, কি আমার নিয়তি বলে অভিহিত করব, তা আমি জানি না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয়, যে 'সার্থক পুরুষ মধু বসু'র ক্ষমতায় এই উদ্ধারকার্য সম্ভব হতো না। আজ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি: What is ordained must happen. এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে মনীষী রোমা রোঁলা, স্টিফেন জোয়াইগ এবং রমন মহর্ষির কথাগুলি:

"A man must humilate before the unknown God. Human can do nothing without God's will. One second is enough for him to obliterate the works of years of toil and effort. And if so pleases Him—He can cause the Eternal to spring forth from the dust and mud……No man more than a creative Artiste feels at the mercy of God……"

—Romain Rolland

'The inexorable Fate—one's own Destiny. There is No escape and there is No answer to any why!

—Stefan Zweig

"Whatever is destined not to happen, will not happen, try as you may. Whatever is destined to happen will happen do what you may to prevent it. This is certain……"

—Ramana Maharshi.

অনেক রাত্রি পর্যন্ত নানারকম জটপাকানো চিন্তা করতে করতে কখন যে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনে নেই।

সকালে উঠে মনে হলো যে বোম্বাইতে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য—। ঠিক করলাম যে 'ডান্সেস অফ ইণ্ডিয়া' ছবির জন্যে তো আমাকে বাইরে বহু জায়গায় যেতেই হবে, সুতরাং মিঃ এজরা মীরকে বলে এখুনি বেরিয়ে পড়াই ভাল। ঠিক এই সময় মনে পড়ল শ্রীনিরঞ্জন পালের কথা। তিনি বলেছিলেন: 'একদিন এই আই-এফ-আই-এর কাজের জন্যে তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে মধু।'

সত্যিই আজ তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম মনে মনে। কারণ আজ যদি কোন বম্বে প্রোডিউসারের হয়ে ছবি করতাম তাহলে তো আর বম্বে ছেড়ে যেতে পারতাম না। আর তখন এই বিচ্ছেদ-বেদনায় মনটা এমন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত যে কোন কাজই করতে পারতাম না। নতুন নতুন দেশ ঘোরা ও নতুন লোকের সংস্পর্শে এলে মনটা অনেকটা ভুলে থাকবে—অনেকটা শান্তি ফিরে আসবে মনে। আমার তখন যেরকম মনের অবস্থা তাতে এই ধরণের একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল একান্তভাবে।

সেইদিনই আই-এফ-আই অফিসে গিয়ে মিঃ এজরা মীরকে 'ট্যুরে' যাবার কথা বলতে তিনি বললেন। বেশ তো—আপনার তো চিত্রনাট্য তৈরী, আপনি এবার বেরিয়ে পড়ুন। আমাকে আপনার 'ট্যুর প্রোগ্রাম' দিন—আমি এক সপ্তাহের মধ্যে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

—এক সপ্তাহ? আমি বললাম: বড্ড দেরী হয়ে যাবে মিঃ মীর। আমি দু'তিন দিনের মধ্যেই বম্বে ছাড়তে চাই। আর বন্দোবস্ত করার বিশেষ এমন কি আছে? আপনি আমাকে একজন ভাল ক্যামেরাম্যান দিন—আমি একজন সহকারী ঠিক করে নিচ্ছি।

মিঃ মীর আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি যে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং এই বিভাগের সর্বেসর্বা—এ-মনোভাব নিয়ে কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলেননি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন: ঠিক আছে, আপনি স্থির করুন—কবে আপনি রওনা হতে চান। আমি আপনাকে ভাল ক্যামেরাম্যান দিচ্ছি, আপনি আপনার সহকারী ঠিক করে নিন। আপনি শুধু আমাকে জানিয়ে দেবেন আপনার কত টাকার দরকার হবে, আর প্রথমে আপনি কোথায় যেতে চান।

আমি বললাম: প্রথমে আমি যেতে চাই দক্ষিণ ভারতে। সেখানে 'ভরত নাট্যম্' এবং 'কথাকলি' নাচ তুলে, যাব ইম্ফলে। ওখানে তুলব 'মণিপুরী' নাচ এবং নাগাদের লোকনৃত্য। তারপর যাব উড়িষ্যা এবং রাঁচী। সেখানে তুলব আদি-বাসীদের 'ছউ' এবং সাঁওতাল নৃত্য। তারপর বম্বেতে ফিরে এসে উত্তর ভারতের দিকে যাব।

মিঃ মীর হেসে বললেন: আপনি তো দেখছি 'অল ইণ্ডিয়া ট্যুরে'র ব্যবস্থা করেছেন।

আমি বললাম: তা তো করতেই হবে মিঃ মীর। ভারতের সব জায়গায় ক্লাসিকাল নাচ ও লোকনৃত্য তুলতে গেলে সেইসব জায়গায় না গেলে তো চলবে না। কাল আপনাকে বিস্তারিতভাবে ট্যুর-প্রোগ্রাম দিয়ে দেব, আর সেই সঙ্গে জানিয়ে দেব এখন আমার কত টাকার দরকার। তারপর যেমন যেমন দরকার হয় আপনাকে জানাব।

এই বলে আমি বাড়ী চলে এলাম।

টুকলু (প্রীতি মজুমদার) তখন বম্বেতে একটা হোটেলে থাকে। জানাশোনা পরিচালকদের অধীনে ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয় করে। টুকলুকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম: মিছিমিছি কেন হোটেলে থেকে পয়সা নষ্ট করছিস। আমি তো এত বড় ফ্ল্যাটে একলা আছি। হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে আয় তুই এখানে। এখানেই থাক, তারপর দু'-তিন দিনের মধ্যেই আমি দক্ষিণ ভারত 'ট্যুরে' বেরুচ্ছি। যদি চাস তো আমার সঙ্গে যেতে পারিস আমার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে। বিনা পয়সায় অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরবি। তার ওপর আমি দেখব যাতে তুই সহকারী হিসেবে ভাল টাকা পাস।

আমার কথা শুনে তো টুকলু লাফিয়ে উঠল। সে তখনই হোটেল থেকে ওর সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে চলে এল আমার ফ্ল্যাটে।

পরদিন সকাল বেলায় মিঃ মীরকে আমি সম্পূর্ণ 'ট্যুর' প্রোগ্রাম এবং যা যা

দরকার, তার তালিকা দিলাম। কত টাকা এখন লাগবে, কত রোল ফিল্ম লাগবে, তাও জানালাম।

এর দু'তিন দিন পরেই আমি, টুকলু এবং ক্যামেরাম্যান প্রভাকর ও তার সহকারী মাদ্রাজ যাত্রা করলাম। সঙ্গে চামান গেল। সেটা হবে ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি।

মাদ্রাজে এসে আমি দু'জন ভদ্রলোকের সংস্পর্শে এলাম, যাঁরা আমায় দাক্ষিণাত্যে থাকার সময় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের একজনের নাম হলো আম্বি নাটেশন—মাদ্রাজের বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক জি. এ. নাটেশান এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী জি. এ. নাটেশানের জ্যেষ্ঠ পুত্র; অপরজনের নাম হলো সাচী। নাচ-গানের দিকে তাঁদের আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট, সেই সূত্রে তাঁদের ওখানকার প্রায় সমস্ত শিল্পীদের সঙ্গেই বেশ পরিচয় ছিল। আমি যখন আমার মাদ্রাজ আসার উদ্দেশ্য তাঁদের বললাম তখন তাঁরা পরামর্শ দিলেন—বিখ্যাত 'ভরত নাট্যম্' নৃত্যবিশারদ মীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাই-এর সঙ্গে দেখা করতে। শ্রীপিল্লাই থাকেন কুম্ভোকোনাম থেকে কিছু দূরে, পাণ্ডাসুলুর নামক গ্রামে। মীনাক্ষীসুন্দরম ছিলেন রামগোপাল, শান্তা রাও, রুক্মিণী আরুণ্ডেল প্রভৃতি বিখ্যাত 'ভরত নাট্যম্' নৃত্যশিল্পীদের গুরু।

কিন্তু মুস্কিল হলো যে, আমি তো তামিল একেবারেই জানি না, আর শুনেছিলাম যে, মীনাক্ষীসুন্দরমও এক বর্ণ ইংরাজী বোঝেন না। এই বিপদের মুখে সাচী এগিয়ে এল আমায় সাহায্য করতে। সে দক্ষিণ ভারতীয়, তামিলই তার ভাষা। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতের বেশীর ভাগ সংগীত ও নৃত্যশিল্পী ও গুরুদের সঙ্গে ওর আলাপ। নিজে থেকেই আমাকে জানাল যে, আমার সঙ্গে যেতে সে রাজী আছে। টুকলুও গেল আমাদের সঙ্গে।

প্রথমে আমরা গেলাম কুম্ভোকোনাম, তারপর সেখান থেকে মোটরে করে পাণ্ডুসুলুর গেলাম। খুবই ছোট গ্রাম পাণ্ডুসুলুর। মীনাক্ষীসুন্দরমের বাড়ী বলতে খান-তিনেক মাটির ঘর, সঙ্গে একটা লম্বা বারান্দা, তার সংলগ্ন আরও দু'তিনখানা ঘর, যেখানে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা থাকে। আমার নির্দেশমত সাচী শ্রীপিল্লাইকে বলল যে, আমরা এসেছি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। 'ভরত নাট্যম্' নৃত্যের ওপরে আমরা একটা প্রামাণ্য ছবি করতে চাই। এজন্যে কোন্ শিল্পীকে নিলে ভাল হয়, সেই বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাই।

এই কথা শুনে মীনাক্ষীসুন্দরম্ জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি কখনও 'ভরত

নাট্যম্' নৃত্য দেখেছি কি না। তার উত্তরে আমি বললাম যে, বালা সরস্বতী যখন কলকাতায় গিয়েছিল, তখন তার নাচ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

এরপর 'ভরত নাট্যম্'-এর টেকনিক সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু বললেন। তিনি বললেন: এ-নাচের জন্যে শিল্পীকে খুব অল্প বয়স থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে—ছয়-সাত বছরের বেশী বয়স না হলেই ভাল, কারণ তখন শরীর থাকে খুব নমনীয়, তারপর ■■ বছর রীতিমত একাগ্রচিত্তে নিষ্ঠাসহকারে ট্রেনিং নিতে হবে। তারপর যদি শিল্পীর তালজ্ঞান এবং সুরজ্ঞান থাকে, যেটা অবশ্য সহজাত, তাহলেই সে 'ভরত নাট্যম্' পুরোপুরি শিখতে পারবে এবং তার জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে।

এমন সময় বার-তের বছরের একটি মেয়ে সেখানে এসে হাজির হলো—সঙ্গে একজন মৃদঙ্গবাদক। স্বভাবতই সে এসেছিল শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে। মীনাক্ষী-সুন্দরম তাদের জানালেন যে, মাদ্রাজ থেকে কয়েকজন বিশেষ অতিথি এসেছেন, সুতরাং আজ আর নৃত্যশিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না। মেয়েটি এবং মৃদঙ্গবাদক এই কথা শুনে চলেই যাচ্ছিল। এঁদের কথাবার্তা যদিও তামিল ভাষাতেই হচ্ছিল, তবুও আমি অনুমানে বুঝলাম, এঁদের কথাবার্তার বিষয়বস্তুটা কি। আমি তখন সাচীকে দিয়ে বলালাম যে, 'ভরত নাট্যমে'র শ্রেষ্ঠ গুরু তাঁর ছাত্রীকে কি ভাবে নৃত্যশিক্ষা দেন সেটা যদি আমাদের দেখার সৌভাগ্য ঘটে, এর থেকে বড় আনন্দের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। এই সঙ্গে 'ভরত নাট্যমে'র আসল রূপটিও আমরা বুঝতে পারব। বালা সরস্বতীর নাচ দেখেছি আজ প্রায় আট-দশ বছর আগে, তখন নাচ সম্বন্ধে ভাল বুঝতামও না—আর এতটা আগ্রহও ছিল না।

সাচীর কথা শুনে মীনাক্ষীসুন্দরম্ হেসে বললেন: এঁরা হলেন সব কলকাতা শহরের লোক, বড় বড় থিয়েটারে নাচ দেখতে অভ্যস্ত, এখানে এই কুঁড়েঘরের উঠোনে বসে এতক্ষণ ধরে নাচ দেখার ধৈর্য থাকবে কি?

আমি বললাম: খুব থাকবে। 'ভরত নাট্যম্' নাচ সম্বন্ধে জ্ঞান আমার খুব কম—বইতে যেটুকু পড়েছি, তার বেশী নয়। বেশীর ভাগ মুদ্রার মানেই হয়ত আমি বুঝতে পারব না, কিন্তু মনের মণিকোঠায় এই স্মৃতিটুকু চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে যে, 'ভরত নাট্যমে'র শ্রেষ্ঠ গুরুর নৃত্যশিক্ষাদান-পদ্ধতি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

কথাবার্তা যা-কিছু সব তিনি বলছিলেন তামিল ভাষাতেই, আর আমি ইংরাজীতে—মাঝখানে সাচী দোভাষীর কাজ করছিল।

নাচ শুরু হলো—শিল্পীর নাম জয়শ্রী। এর সঙ্গে বাজনা বলতে শুধু মৃদঙ্গ—তার

বাজনার সঙ্গে দুটি ছড়ির সাহায্যে মীনাক্ষীসুন্দরম তাল দিয়ে যেতে লাগলেন। শিল্পী যখন মুদ্রা ও যথাযথ ভাব-ব্যঞ্জনাসহকারে 'অভিনয়ম্' অংশটুকু করছিল, তখন মৃদঙ্গবাদক গানও গাইছিলেন।

নাচ যখন শেষ হলো আমরা বুঝতেই পারলাম না যে কি করে এত দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। সাচী অবশ্য সব বড় বড় নৃত্যশিল্পীদের নাচই দেখেছিল, এটা তার কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু আমার আর টুকলুর কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই তের বছরের কিশোরী নৃত্যশিল্পীর নৃত্যশৈলী এমন একটা উঁচু মার্গের যে, তার প্রতিটি ভঙ্গী, প্রতিটি মুদ্রা যেন ভাবে ও ভাষায় মুখর হয়ে উঠছিল। গুরুজী বিশেষ বিশেষ স্থান ও মুদ্রাগুলি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন—সেগুলি সাচী আবার ইংরাজীতে অনুবাদ করে আমায় বলে দিচ্ছিল। এমন বিমুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে বসে দেখছিলাম যে, স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গিয়েছিলাম।

সত্যিই তো, আমরা শহরের শিক্ষিত দর্শক—বড় বড় থিয়েটারে কুশন-দেওয়া সীটে সবরকম আরামের মধ্যেও দু'ঘণ্টা বসে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠি—শেষকালে আর বসে থাকার ধৈর্য থাকে না—কিন্তু এখানে এই শক্ত উঠানের মধ্যে অনেক রকম অস্বস্তির মধ্যে বসেও এই ত্রয়োদশী কিশোরী বালিকার নাচ দেখতে দেখতে এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে, তিনঘণ্টা সময়কে মোটেই দীর্ঘ মনে হয়নি।

মীনাক্ষীসুন্দরমকে জিজ্ঞাসা করলাম: এই মেয়েটিকে কি আমার ছবিতে নাচতে অনুমতি দেবেন?

তাতে তিনি বললেন: এর শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে এখনও তিন বছর দেরী আছে, তার আগে তো এ সাধারণ্যে নাচতে পারবে না।

তাহলে আপনার মনোমত কোন ছাত্রীর নাম বলে দিন, যাকে আমাদের ছবিতে 'ভরত নাট্যম' নৃত্যের জন্য নিতে পারি।

তিনি তখন তাঁর দুই ছাত্রী—শান্তা রাও ও রাণীর নাম করলেন।

আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম।

রাণী কুম্ভোকোনামে থাকত, আমরা গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আমাদের ছবির জন্যে ঠিক করে ফেললাম। শান্তা রাও তখন বাঙ্গালোরে। কুম্ভোকোনাম থেকে মাদ্রাজ ফিরে আসার পর সাচী তার ঠিকানা যোগাড় করল এবং যোগাযোগ করে তার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেল।

এর পর আমাদের পরবর্তী কাজ হলো একদল 'কথাকলি' নৃত্যশিল্পী ঠিক করা। কেরালা হলো কথাকলির জন্মস্থান।

আমি, টুকলু এবং সাচী রওনা হলাম কোচিনের দিকে—সঙ্গে গেল চামান।

কোচিনে নৃত্যশিল্পী মাধব মেননের বাড়ী—সে এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ত্রিবান্দ্রমে গিয়ে 'কথাকলি' নৃত্য তোলার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, তাতে সে বলল যে, ওখানে কথাকলি নৃত্যশিল্পীদের দল পাওয়া খুব কষ্টকর হবে, তার চেয়ে ত্রিচুরের কাছে কেরালা কলামণ্ডলম-এ গিয়ে কবি ভাল্লাথোলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কবি হিসেবে ভাল্লাথোলের নাম ভারতবিশ্রুত। এঁর নাম আমি আগেও শুনেছিলাম। এঁর যে একটি নৃত্য-শিক্ষায়তন আছে, তাও আমি জানতাম। আসলে মাধব মেনন এই 'কেরালা কলামণ্ডলে'রই ছাত্র ছিল।

কোচিন থেকে আমরা গেলাম ত্রিচুর এবং সেখান থেকে মোটরে 'কেরালা কলা-মণ্ডলম্'। কবি ভাল্লাথোলের সঙ্গে আলাপ হলো। দক্ষিণ-ভারতের এমন একজন প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার—কিন্তু কি অমায়িক!

যখন সাচী তাঁকে বলল যে, আমরা ভারত সরকারের আই-এফ-আই বিভাগ থেকে এসেছি 'কথাকলি' নাচের দশ মিনিটের মত একটা ডকুমেণ্টারী ছবি তুলবার জন্যে; তখন তিনি তো গাছ থেকে পড়লেন।

বললেন: দশ মিনিটে কথাকলি নাচ? দশ মিনিটে তো এ-নাচের কিছুই দেখানো যাবে না। আপনারা কখনও পুরো একটা 'কথাকলি' নাচ দেখেছেন?

আমি বললাম: না, কথাকলি নাচ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

তাতে তিনি বললেন: বেশ, কাল রাত্রে আমি একটা নাচের প্রোগ্রাম বন্দোবস্ত করছি, কিন্তু সেটা শেষ হতে ৮।৯ ঘণ্টা সময় লাগবে। আপনার কি অতক্ষণ বসে থাকার ধৈর্য থাকবে?

আমি বললাম: আমার ধৈর্য ঠিকই থাকবে, কারণ আমার সম্পূর্ণ 'কথাকলি' নাচ দেখার খুব ইচ্ছে।

সেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা গেলাম কেরালা কলামণ্ডলম-এ 'কথাকলি' নাচ দেখার জন্যে।

এখানে আমি এই 'কথাকলি' সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলতে চাই। ভারতীয় নৃত্য হলো দু'রকমের—'লাস্য' এবং 'তাণ্ডব'। প্রথমটি হলো কোমল ও শান্ত রসাশ্রিত, এটি মেয়েদের জন্যে এবং লাস্য নৃত্য শুধু মেয়েরাই করে থাকে। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ তাণ্ডব হলো পুরোপুরি পুরুষালি—এতে প্রয়োজন শক্তি এবং ভয়ঙ্কর

রসের। কথাকলি হলো শেষোক্ত ধরনের—এতে স্ত্রী-চরিত্রগুলিও পুরুষদের দ্বারা অভিনীত হয়। অর্থাৎ এই কথাকলিতে মেয়েদের কোন স্থান নেই।

কথাকলি নাচের বিষয়-বস্তুগুলি সব গৃহীত হয় হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী থেকে। রামায়ণ বা মহাভারতের এক-একটি অধ্যায় নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। কথাকলি খুব কষ্টসাধ্য নৃত্য এবং ভরত নাট্যমের মত তিনটি ভাগে এটিও বিভক্ত। যথা: অভিনয়ম, নৃত্যম্ এবং গীতম্ (সঙ্গীত)। কিন্তু 'ভরত নাট্যমে' অভিনয় এবং নৃত্যে সমানভাবেই জোর দেওয়া হয়, কিন্তু কথাকলিতে অভিনয়মৃই প্রধান এবং তা রূপায়িত হয় বিবিধ মুদ্রা ও ভাবব্যঞ্জনার মাধ্যমে।

'কথাকলিতে' পারদর্শিতা লাভ করতে হলে একজন তরুণ শিক্ষার্থীর সময় লাগে ছয় থেকে আট বছর।

আমরা যখন কেরালা কলামণ্ডলমে পৌছলাম, তখন শুনলাম নাচ আরম্ভের বেশ কিছু দেরী আছে। শিল্পীরা সবে মেক-আপ শুরু করেছে। এর মেক-আপটা একটু বিশেষ ধরনের, সেইজন্যে এক-একজন শিল্পীর সময় লাগে অনেকক্ষণ করে। কবি ভাল্লাথোল আমাদের কফি খাওয়ালেন। এই কফি খেতে খেতে নাচের সম্বন্ধে অনেক কিছুই বললেন।

অবশেষে শিল্পীদের মেক-আপ শেষ হলো এবং খবর পেলাম যে, খুব শিগ্‌গীর নাচ আরম্ভ হবে।

কবি ভাল্লাথোল বললেন: সাধারণত একটা সম্পূর্ণ কথাকলি নাচে সময় লাগে ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা, অতক্ষণ ধরে বসে থাকতে আপনাদের বিরক্তি ধরে যাবে, আর তাছাড়া আপনারা তো দু'তিন ঘণ্টার শো দেখতে অভ্যস্ত, তাই আমি একে কেটে ছোট করে এনে দাঁড় করিয়েছি ৫ ঘণ্টায়। এই নাচের শেষে আপনারা ত্রিচুর ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমুতে পারবেন।

আমি হেসে বললাম: ধন্যবাদ।

নাচ সুরু হবার সঙ্কেত হলো। প্রেক্ষাগৃহের মেঝেতে মাদুর বিছানো—চেয়ার-বেঞ্চির কোনো ব্যাপার নেই, আর আলো বলতে দুটি বড় বড় পিলসুজের ওপর তেলের প্রদীপ। কোন দৃশ্যপটের বালাই নেই, সামনের পর্দাটি হলো একটি মোটা রঙীন কাপড়, শিল্পসম্মতভাবে তাতে নক্সা কাটা আর চারিধারে একটা বর্ডার। এটা টাঙানো হয় না, দুদিক থেকে দুজন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

পর্দা সরে গেল, নাচ সুরু হলো। প্রথমে ভেবেছিলাম পাঁচ ঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকব কি করে, কিন্তু সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল জানতেও পারলাম

না। যখন শেষ হলো তখন আমি টুকলুকে বললাম : এত শিগ্‌গীর ? টুকলুর চোখ তখন ঘুমে জড়িয়ে এসেছে—মাঝে খানিকটা ঘুমিয়েও নিয়েছিল, সে উঠে চোখ রগড়ে বললে : শিগ্‌গীর মানে ? ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে ?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনটে বেজে গেছে।

কবি ভাল্লাথোলকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিলাম। আসবার সময় বলে এলাম যে কাল আবার আসব।

মাত্র দশ মিনিটে 'কথাকলি'র কোন কোন অংশ নেওয়া যায় এসম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে দু'তিনদিন ধরে দীর্ঘ আলোচনা হলো। তিনি বহু দেশবিদেশ ঘুরেছেন এবং মানব-চরিত্র ও মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য। উনি রামায়ণ থেকে একটা অংশ নির্বাচন করলেন এবং সেটা ওঁর ছাত্রদের দিয়ে মহলা দেওয়ালেন এবং অপূর্ব দক্ষতায় মুদ্রা অভিনয় ও নৃত্যের মাধ্যমে একটি দশ মিনিটের উপযোগী নৃত্য-নাট্য রচনা করলেন।

কবি ভাল্লাথোলকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমি আর টুকলু নৃত্যশিল্পীদের দলকে নিয়ে রওনা হলাম। এই দলে ছিল প্রায় ২৫ জন লোক—নৃত্যশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীদের মিলিয়ে।

ত্রিচুর থেকে মাদ্রাজ যাবার পথে কইম্বাটুর। সাচীর বাড়ী কইম্বাটুরে এবং সেখানকার স্টুডিওর মালিক মিঃ নাইডু সাচীর বিশেষ বন্ধু ; সুতরাং ঠিক করলাম 'কথাকলি' নাচের শুটিং মিঃ নাইডুর স্টুডিওতেই করব।

সাচী সমস্ত বন্দোবস্ত করল এবং ভালভাবে শুটিং শেষ হলো। মিঃ নাইডু আমাদের সব বিষয়ে সাহায্য করলেন। নৃত্যশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীরা কেরালা কলা-মণ্ডলমে ফিরে গেল। আমরাও মাদ্রাজের জন্যে রওনা হলাম।

মাদ্রাজে পৌঁছে শান্তা রাও-এর কাছ থেকে খবর পেলাম যে সে আসছে দিন পনেরো পরে। সুতরাং আমাদের হাতে তখন অফুরন্ত সময়। আম্বি ও সাচী আমায় বলল যে আমি যখন নাচের ছবি করছি তখন আমার চিদাম্বরম মন্দিরটি একবার দেখা উচিত। দক্ষিণ ভারতের যতগুলি মন্দির আমি দেখেছি সেগুলির 'গোপুরম' (প্রবেশদ্বার) এবং মন্দির তৈরীর পদ্ধতি সবই প্রায় একরকম, তবে চিদাম্বরম মন্দিরের একটি বিশেষত্ব আছে ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে। সেই সম্বন্ধে ভাল রকম ওয়াকিবহাল হবার জন্যে আমি, টুকলু ও সাচী চিদাম্বরম মন্দির দেখবার জন্য রওনা হলাম।

ভরতমুনি নির্দেশিত 'করণ'গুলি আমি ভরতনাট্যম্ সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ

"তাণ্ডব-লক্ষণম্"-এ পড়েছিলাম এবং তাতে শুধু ছবিগুলিই দেখেছিলাম—কিন্তু চিদাম্বরম মন্দিরের গোপুরমের স্তম্ভের গায়ে দেখলাম সেই সমস্ত 'করণ'গুলি ভরতমুনি নির্দেশিত ১০৮টি নৃত্য-ভঙ্গী অপূর্বভাবে খোদাই করা আছে এবং প্রত্যেকটি 'করণে'র উপরে ভরতমুনির নাট্য-শাস্ত্র থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃত শ্লোকগুলিও লেখা রয়েছে।

আমরা নটরাজের মন্দিরও দেখলাম। প্রবাদ আছে যে এইখানে নটরাজ নাকি তাঁর 'তাণ্ডব' নৃত্য করেন। এই মন্দির দেখতে দেখতে আমার মনে হলো—নটরাজের মন্দির-সংলগ্ন উঠোনে শিবের 'তাণ্ডব'-নৃত্য তুললে কেমন হয়?

সাচীকে এই কথা বলতেই সাচী বললে: মন্দিরের ভেতরে কোন শুটিং করবারই অনুমতি দেবে না এরা, নাচ তোলা তো দূরের কথা—তবে চেষ্টা করে একবার দেখা যেতে পারে। আমি কাল সকালে মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয় কথা বলব।

সাচী খুব করিৎকর্মা ছেলে ছিল—সারা মাদ্রাজে এমন জায়গা ছিল না যেখানে তার কোন জানাশুনা লোক ছিল না। পরদিন সকালে সে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে আমাকে এসে বলল: সব বন্দোবস্ত করে এলাম মিঃ বোস। মন্দিরের সংলগ্ন উঠোনে আপনি 'তাণ্ডব নৃত্যে'র শুটিং করতে পারেন। আচ্ছা, ভালকথা, এই তাণ্ডব-নৃত্য করবে কে? আপনি কি কোন আর্টিস্টকে ভেবেছেন?

আমি বললাম: মাধব মেনন করতে পারবে এই নাচ। সে সাধনাব সঙ্গে বরাবর 'শিব-পার্বতী' নৃত্যে 'তাণ্ডব' নেচেছে। তার চেহারা ভাল আর শিল্পী হিসেবেও খুব ভাল।

সেইদিনই আমি কোচিনে মাধব মেননকে টেলিগ্রাম করে দিলাম অবিলম্বে মাদ্রাজ চলে আসবার জন্যে। তারপর আমরা মাদ্রাজ ফিরে এলাম।

কয়েকদিন পরে শান্তা রাও মাদ্রাজে এসে পৌঁছুল এবং রাণীও কুম্ভোকোনাম থেকে এল। মাত্র দশ-বারো মিনিটের মধ্যে 'ভরতনাট্যমে'র কতকগুলি বিশেষ মুদ্রাসহ সম্পূর্ণ নাচটা আমাকে তুলতে হবে। আগেই বলেছি যে একটা গোটা 'ভরতনাট্যম্' নাচে সময় লাগে খুব কম পক্ষে তিন ঘণ্টা—কিন্তু সেইটাকে দশ-বারো মিনিটে কমিয়ে আনতে হবে, এ এক সাংঘাতিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

অনেক রিহার্সালের পর শান্তা এবং রাণীর দুজনের নাচ মিনিট বারোর মধ্যে দাঁড় করানো গেল। মাদ্রাজে একটি স্টুডিও ভাড়া করে সেখানেই শুটিং করা হলো। তারপর যখন 'দি ডান্সেস অফ ইণ্ডিয়া' (মোট পাঁচ রীল) ছবিটি সম্পূর্ণ হলো তখন দেখা গেল যে এই ভরত-নাট্যম্ অংশটুকুই সব থেকে ভাল এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

ইতিমধ্যে কোচিন থেকে মাধব মেনন এসে পড়ল। তাণ্ডব-নৃত্যের সঙ্গীতাংশ আগে তোলা হলো, পোষাক তৈরী হয়ে গেল। তারপর আমরা সদলবলে অর্থাৎ ক্যামেরাম্যান সহকারীসহ, মাধব মেনন, টুকলু, রূপসজ্জাকর প্রভৃতি চিদাম্বরম যাত্রা করলাম। অবশ্য আমার বন্ধু এবং গাইড সাচীকে তো সঙ্গে নিলামই।

নটরাজের মন্দির-সংলগ্ন উঠোনেই আমরা 'তাণ্ডব' নৃত্যের শুটিং করলাম। সাচী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খুব সুকৌশল বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল যে শুটিং-এর সময় কোন বাইরের লোক যেন এই মন্দিরে প্রবেশ করতে না পারে। তারপর গোপুরমগুলির স্তম্ভের গাঁয়ে খোদিত নৃত্য-ভঙ্গীর ছবি তুললাম।

মন্দির কর্তৃপক্ষকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে আমরা মাদ্রাজে ফিরে এলাম।

আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম হলো মণিপুর যাওয়া। আমার খুব ইচ্ছে ছিল সাধনা ও তার ব্যালেকে দিয়ে মণিপুরী রাস-নৃত্য তোলা—কারণ এই নাচটি 'রাজ-নর্তকী'তে অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাধনা তখন তার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। সেইজন্য আমি স্থির করলাম যে আমাকে যখন ইম্ফাল (মণিপুর) যেতেই হবে নাগাদের লোক-নৃত্য তুলবার জন্যে, তখন সেইখানকারই আসল শিল্পী দিয়ে 'রাস-নৃত্য'র শুটিং করে নেব।

দক্ষিণ ভারতের প্রোগ্রাম শেষ হলো। ভরতনাট্যম, কথাকলি ও তাণ্ডব-নৃত্যের 'নেগেটিভ টেষ্ট' নেওয়া হলো ওখানকারই এক স্টুডিওর ল্যাবরেটরী থেকে—। 'টেষ্ট' ভালই লাগল—তারপর সমস্ত ফিল্মটিকে পাঠিয়ে দিলাম বোম্বাইতে পরিস্ফুটনের জন্যে।

এরপর আমরা মাদ্রাজে এক সপ্তাহের বিশ্রাম নিলাম। সেই সময়ে অবশ্য মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ-শিল্পীদের গান শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, যেমন এম, এস, শুভলক্ষ্মী, বসন্ত কোকিলাম প্রভৃতি। এছাড়া প্রসিদ্ধ বীণকারদের বীণ-বাদনও শুনলাম। অবশ্য এ সমস্তই সম্ভব হয়েছিল আম্বি নাটেশন ও সাচীর ব্যবস্থাপনার গুণে। বালা সরস্বতীর নাচ আর একবার দেখবার ইচ্ছে হলো। আম্বির সঙ্গে তার বিশেষ জানাশুনা ছিল—সে সমস্ত বন্দোবস্ত করল। কিন্তু যেদিন আমরা তাঁর বাড়ীতে গেলাম সেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর শরীরটা ভাল ছিল না—কিন্তু এত ভদ্র যে তাঁর এই অসুস্থতাসত্ত্বেও তিনি আমাদের একেবারে বঞ্চিত করলেন না। তিনি ঘরে বসে বসে 'অভিনয়মে'র কতকগুলি মুদ্রা এবং চোখের কাজ আমাদের দেখালেন—সঙ্গে তাঁর মা তানপুরা নিয়ে গান গাইতে লাগলেন। এই অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি যা দেখালেন, সত্যিই তা অপূর্ব লেগেছিল। 'ভরতনাট্যম' নৃত্য-পদ্ধতির তিনি

অন্ততম শ্রেষ্ঠা শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত—তাঁর 'অভিনয়ম্' (মুদ্রাভঙ্গী) এমন অপূর্ব এবং শিল্পশৈলীর এমন উচ্চতম শিখরে পৌছেছিল যে তা কথিত ভাষার মতই সহজ ও সরলভাবে লোকের কাছে ধরা পড়ত।

মাদ্রাজ ছাড়বার সময় হয়ে এল। আম্বি আমাদের একদিন নিমন্ত্রণ করল। পুরোপুরি দক্ষিণ ভারতীয় কায়দায় আমাদের প্রচুর খাওয়ালো।

সাচী ও আম্বির সঙ্গে আমাদের ক'দিনেরই বা আলাপ—বড় জোর মাস তিনেক হবে—কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই এরা এত আপনার লোক হয়ে গিয়েছিল যে তাদের ছেড়ে আসতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে আমাকে বিদায় দিতে তাদেরও বেশ কষ্ট হয়েছিল।

যাই হোক, নভেম্বরের শেষদিকে আমি, টুকলু এবং আমার ক্যামেরা-ইউনিট চলে এলাম কলকাতায়। ইতিমধ্যে আমি মিঃ এজরা মীরকে লিখে দিয়েছিলাম—একজন শব্দযন্ত্রী যেন একটি পোর্টেবল্ সাউণ্ড রেকর্ডার নিয়ে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। কারণ মণিপুরী এবং নাগা-নৃত্যের সঙ্গীত গ্রহণ করতে হবে।

কলকাতায় পৌছে আমি গেলাম সাধনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। যদিও সাধনা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ছিল, কিন্তু আমাকেও তিনি খুব ভালবাসতেন। স্থতরাং আমাদের এই বিচ্ছেদ হওয়ায় তিনি মনে খুব আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন : সাধনা কি যে ছেলেমানুষি করল! যা হোক, আমি ওকে লিখে দিয়েছি যে আমি শীগ্‌গির বম্বে যাচ্ছি। আমি যতদূর জানি তাতে আমার মনে হয় যে তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যাপার ঘটেনি—যাতে তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজন হবে। আমার মনে হয় কাছে গিয়ে ওকে একটু ভালভাবে বোঝালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে বম্বে থেকে সাউণ্ড-রেকর্ডিষ্ট প্যাটেল তার সহকারীকে নিয়ে এসে হাজির হলো কলকাতায়। তারপর আমি, টুকলু, সাউণ্ড ও ক্যামেরা-ইউনিট এবং চামান ১লা ডিসেম্বর ইম্ফালের দিকে রওনা হলাম। দীর্ঘ ট্রেন-ভ্রমণের পরে একদিন সন্ধ্যায় এসে পৌছলাম ডিমাপুরে। এইখানে ট্রেন থেকে নেমে যেতে হয় মোটরে বা বাসে। তখন যুদ্ধের সময়—মণিপুরে সৈন্য-চলাচল অবিশ্রান্তভাবে চলেছে। ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমগুলি ভীড়ে ভর্তি। বেশীর ভাগ সৈন্যদলই তখন অস্থায়ী কুঁড়ে-ঘরগুলিতে ছাউনী ফেলেছিল। এই ঘরগুলি মাটি আর বাঁশ দিয়ে তৈরী। সেইরকম একটি ঘরেই আমরা সে রাতটা কাটালাম। একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে

আলাপ হলো। চমৎকার ভদ্রলোকটি। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের ক্যানটিনে নৈশভোজের জন্য।

তখন ওখানে দারুণ শীত। বাঁশের দেওয়ালের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে হু-হু করে—আপাদমস্তক মোটা 'রাগ' মুড়ি দিয়ে শুয়েও শীত যায় না। কিন্তু কি আর করা যাবে—কোন উপায় নেই। কোনরকমে রাতটা কাটালাম—কখনও শুয়ে, কখনও বসে, কখনও সিগারেট ধরিয়ে জোরে জোরে টানতে টানতে। তারপর সকাল হতেই আমরা মোটরে করে রওনা দিলাম কোহিমা হয়ে ইম্ফালে।

আমরা ইম্ফাল পৌছলাম সন্ধ্যাবেলায়। এখানকার কমিশনার ছিলেন তখন মিঃ স্টুয়ার্ট, আই-সি-এস। আমি কলকাতা থেকে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে থাকবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। স্থানীয় এক বাঙ্গালী ডাক্তারের বাড়ীতে আমার দলের অন্যান্য সকলের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

চমৎকার লোক এই মিঃ স্টুয়ার্ট—ওখানে উনি একলাই থাকতেন—আই-সি-এস বলে তেমন দেমাক বা কোন চাল ছিল না। আমাকে দেখে হেসে বললেন: মিঃ বোস, জাপানীদের বোমার ভয়ে সকলে এখন ইম্ফাল ছেড়ে পালাচ্ছে—আর আপনারা এখন এখানে এলেন নাচের ছবি তুলতে?

আমিও হেসে উত্তর দিলাম: অত ভয় করলে কি পৃথিবীতে বাস করা চলে?

মিঃ স্টুয়ার্ট ইতিমধ্যে নাগাদের নৃত্য তোলবার বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং মণিপুরের মহারাজার প্রাসাদ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক করেছিলেন, মহারাজার নিজস্ব নৃত্যশিল্পীদের দিয়ে 'রাস-নৃত্য'টির চিত্রগ্রহণ করবার।

ইম্ফালে আমরা এক সপ্তাহ ছিলাম—মিঃ স্টুয়ার্টের সুবন্দোবস্তের ফলে আমাদের কোন অসুবিধাই হয়নি—বরং বেশ আরামেই ছিলাম। বেশ ভালোভাবেই আমাদের নাগা লোক-নৃত্য এবং মণিপুরী রাস-নৃত্যের চিত্রগ্রহণ শেষ হলো।

মিঃ স্টুয়ার্ট আমাদের নিকটবর্তী নাগাদের গ্রামের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাদের কুটিরশিল্প দেখালেন। যদিও বিমান আক্রমণের সংকেতধ্বনি অর্থাৎ 'সাইরেনে'র আওয়াজ প্রায়ই শোনা যেত এবং যে-কোন মুহূর্তে ইম্ফালে বোমা বর্ষণের আশঙ্কা ছিল, তবুও স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল খুব শান্ত এবং সংযত। সাধারণভাবেই তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যেত। কুটির-শিল্পের নিয়মিত কাজে কোনরকম বিশৃঙ্খলা দেখা যেত না।

অদ্ভুত তাদের হাতের কাজ। মণিপুরী নাচের পোষাক থেকে আরম্ভ করে কত

বিচিত্র ধরণের কাপড় চাদর প্রভৃতি তৈরী করছে। এক জায়গায় দেখলাম শ্রীখোল তৈরী হচ্ছে। মণিপুরী খোল আমাদের বাংলাদেশের খোলের থেকে কিছু ছোট। বাপ-ছেলে সবাই এ কাজে মেতে রয়েছে। ছেলেটা তো আমাদের দেখে গলায় খোল ঝুলিয়ে বাজাতে বাজাতে নাচতে স্থরু করে দিল। মাঝে মাঝে চরকির মত ঘুরছে আর বাজাচ্ছে। এরা যে খোল বাজানোতে এবং নাচে কত দক্ষ তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ইম্ফাল থেকে চলে আসবার সময় মিঃ স্টুয়ার্ট আমাকে একটি চমৎকার মণিপুরী 'বেড কভার' উপহার দিলেন। আমার বন্ধুভাগ্য সত্যিই ভালো—মাদ্রাজে পেলাম আম্বি আর সাচীর মত বন্ধু আর স্থদূর ইম্ফালে পেলাম মিঃ স্টুয়ার্টকে। এঁদের সাহায্য না পেলে ভরতনাট্যম্, কথাকলি ও মণিপুরী নাচ এমন স্থষ্ঠুভাবে তুলতে পারতাম কি না সন্দেহ।

মিঃ স্টুয়ার্টের সঙ্গে যখন মণিপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরছিলাম তখন বহু ছবি ও ফিল্ম তোলা হয়েছিল। ইম্ফাল থেকে ফেরবার সময় মিঃ স্টুয়ার্টকে কথা দিয়ে এলাম যে তাঁকে একটা করে সমস্ত ছবির প্রিন্ট বম্বে থেকে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু সব থেকে দুঃখের বিষয়, বম্বে পৌছেই আমি খবর পেলাম যে ইম্ফালে বোমা পতনের সময় মিঃ স্টুয়ার্টের মৃত্যু হয়েছে। শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ইম্ফালে থাকতেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে কলকাতা পৌছেই রাঁচী যাব—সাঁওতাল নৃত্য তোলার জন্য, তারপর রাঁচী থেকে আবার কলকাতা ফিরে এসে সাধনার বাবাকে নিয়ে বম্বে যাব। ইম্ফাল যাওয়ার সময়ই তিনি আমায় বলেছিলেন যে তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না—বম্বের জল-হাওয়াটা তাঁর বেশ সহ্য হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি সাধনাকে লিখে দিয়েছেন যে শীগ্‌গিরই তিনি সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন। তাছাড়া তাঁর কথাবার্তায় বুঝেছিলাম যেটা তাঁর মনকে সব সময় পীড়া দিচ্ছিল, সেটা আমার আর সাধনার এই বিচ্ছেদ।

আমারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি বম্বেতে গিয়ে সাধনাকে বুঝিয়ে বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সাধনা কখনও তার বাবার কথা ঠেলতে পারবে না।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক জিনিস, আর বিধাতার বিধানে ঘটে অন্য জিনিস।

যখন ইম্ফাল থেকে কলকাতা এসে পৌছলাম তখনই একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদে আমার সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সাধনার বাবা ঠিক দুদিন আগে অর্থাৎ ৮ই ডিসেম্বর ইহলোকের মায়া কাটিয়ে পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন।

ইংল্যান্ড যাওয়ার আগেও তাঁর সঙ্গে দু'তিন দিন দেখা করতে গেছি, তখন এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি যে তিনি এত শিগ্‌গীর আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। তাঁর শরীরও এমন কিছু খারাপ দেখিনি। সেইজন্যে তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু আমার কাছে ঠিক বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতন মনে হলো। আমি তাঁকে ঠিক আমার শ্বশুরমহাশয় বলে ভাবিনি কখনও, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল ঠিক যেন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। তিনিও আমাকে সেইভাবেই দেখতেন। বম্বের মেরিন ড্রাইভ এবং স্টিফেন কোর্টের ফ্ল্যাটে বহুদিন তিনি আমাদের কাছে একসঙ্গে ছিলেন। খুব সহজেই তিনি সকলকে আপনার করে নিতে পারতেন। তাছাড়া সাধনা ও মধু ছিল তাঁর প্রাণ। যদিও সাধনা ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান—কিন্তু আমাদের দুজনকে তিনি কখনও আলাদাভাবে দেখেননি।

আমার মনে তাই খুব আশা হয়েছিল যে বম্বেতে গিয়ে সাধনাকে বুঝিয়ে বললে সুফল নিশ্চয়ই হবে—কিন্তু সে আশার দীপশিখাটুকু একেবারে নিভে গেল। অর্থাৎ বিধাতার ইচ্ছে নয় যে আমার ও সাধনার তখন পুনরায় মিলন হয়।

কলকাতায় কয়েকদিন থাকার পর আমি আমার দলবল নিয়ে রাঁচী যাত্রা করলাম। আমার বন্ধু কমল বিশ্বাস রাঁচী থেকে আমায় লিখে জানাল যে সাঁওতাল নাচের সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

রাঁচীতে গিয়ে হোটেলে উঠলাম। বহু পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হতে লাগল। প্রায় রোজই কারুর না কারুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ লেগেই ছিল। কত পুরোন স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠল। স্কুলের কয়েকজন বন্ধু আমায় বলতে লাগল: তোদের ওরকম বাড়ী—অতবড় বাগান—সব একেবারে জলের দরে বিক্রি করে দিলি?

কিন্তু আমি আর আসল ব্যাপারটা কি করে প্রকাশ করে বলি: কেন বেচতে হলো?

আমাদের বাড়ীর দিকে কিন্তু আমার একবারও যেতে ইচ্ছা করল না—অর্থাৎ ইচ্ছে করেই আমি ওদিকে যাই নি—পাছে বহু পুরোন স্মৃতির দংশনে আমার মনটা ক্ষত-বিক্ষত হয়—বিশেষ করে মার স্মৃতি।

একদিন স্কুলের এক পুরোন বন্ধু জোর করে আমায় ধরে নিয়ে গেল। প্রায় আট বছর পরে রাঁচী গেছি—বহু পরিবর্তন হয়েছে—সে রাঁচী আর নেই। বহু বাড়ী ঘর উঠেছে, বহু উন্নতি হয়েছে শহরের। আমাদের বাড়ীর সামনেও বহু নতুন নতুন

বাড়ী হয়েছে। সেই বাগানটার মধ্যে অনেকগুলো বাড়ী উঠেছে, নাম হয়েছে পি. এন. বোস কম্পাউণ্ড—তবে আমাদের বাড়ীটা এখনও তেমনিই আছে—সেই একই রং—একই গেট।

বাড়ীর দিকে যত দেখি ততই মার কথাগুলো মনে পড়ে—শেষে আর সহ্য করতে পারলাম না, মুখ ফিরিয়ে নিলাম। চলে আসতে চাইলাম। আমার সেই বন্ধুটি বলল: চল্ না, তোর সেই নীচের পড়বার ঘরটা একবার দেখে আসি। কতদিন, কত আড্ডা দিয়েছি সেখানে। একটা অব্যক্ত বেদনায় আমার বুকের ভেতরটা তখন টন্‌টন্ করছে—কথা বলতে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল, কোনক্রমে বললাম: না ভাই, আমার একটা জরুরী কাজ আছে—আমায় এখুনি হোটেলে ফিরতে হবে। বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে আমি গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম।

বন্ধু কমল বিশ্বাসের ব্যবস্থাপনায় যে জায়গাটাকে আমরা বলতাম, 'কমলের জমিদারী'—রাঁচী শহর থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে—সেইখানে সাঁওতাল নাচ তোলা হলো। এই নাচের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হলো মাদল। এখানকার কাজ শেষ করে আমরা সকলে কলকাতায় ফিরে এলাম।

ডিসেম্বরের শেষ নাগাৎ বম্বে ফিরে গিয়ে সাধনার সঙ্গে দেখা করলাম—সাধনার মা তখনও ওখানেই ছিলেন। ওরা তখন ছিল গ্রীনস্ হোটেলে।

দেখলাম বাবার মৃত্যুতে সাধনা খুব ভেঙ্গে পড়েছে। সেও যেমনি শ্বশুরমশায়ের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সন্তান ছিল, সাধনাও তেমনি তার বাবাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম: জন্ম-মৃত্যু সবই বিধাতার খেলা। এভাবে ভেঙ্গে পড়লে কি চলে? অবশ্য আমি জানি তুমি তোমার বাবাকে কি রকম ভালবাসতে—তাই এ শোকের সান্ত্বনা নেই—যাই হোক মনকে শক্ত করো। ঈশ্বর তোমায় শান্তি দেবেন।

তারপর বললাম: মিছামিছি কেন হোটেলে এতবড় 'স্যুইট' নিয়ে পয়সা নষ্ট করছ, তার চেয়ে ফিরে চল আমাদের ফ্ল্যাটে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে সাধনা কোন জবাবই দিল না—একথা একেবারে চাপা দিয়ে, তার বাবার কথাই বলে যেতে লাগল।

যাবার আগে আমি আবার তাকে বললাম: আর একবার ভালো করে ভেবে দেখো সাধনা—যদি তুমি কোনদিন মনোভাব পরিবর্তন করে Worli-র ফ্ল্যাটে ফিরে আসতে চাও তাহলে আমাকে জানাবারও দরকার হবে না—সোজা চলে এস। এই বলে চলে এলাম।

ওরলির অত বড় ফ্ল্যাটে এত ভাড়া দিয়ে শুধু আমি আর টুকলুর থাকার কোনো মানেই হয় না। সুতরাং একটা ছোট ফ্ল্যাট খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু ছোটই হোক আর বড়ই হোক—যে-কোন ফ্ল্যাট পাওয়াই তখন একটা দারুণ সমস্যা, আর তার সঙ্গে তো বিরাট অঙ্কের 'পাগড়ী' অর্থাৎ সেলামীর প্রশ্ন তো ছিলই।

একদিন মিঃ মীরকে আমার এ-সমস্যার কথা জানালাম। মিঃ মীর শুনে বললেন: আরে, এ-কথা আমায় এতদিন বলেননি কেন মিঃ বোস! আপনি তো একটা গভর্ণমেন্টের ফ্ল্যাটই পেতে পারেন। আচ্ছা, আমি খোঁজ করে দেখছি যে, ভাল জায়গায় কোন ভাল ফ্ল্যাট খালি আছে কিনা।

এর কিছুদিন পরে মিঃ মীর বললেন: আপনার জন্যে একটা ভাল ফ্ল্যাট পাওয়া গেছে মালাবার হিলে, রিজ্ রোডে। আপনি তো জানেন বোম্বায়ের এই পল্লীটা কি রকম অভিজাত আর ভাড়াও বেশী নয়।

কয়েকদিন পরে আমি ওরলির ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে রিজ্ রোডে উঠে এলাম। টুকলুও আমার সঙ্গে এল।

ইতিমধ্যে আমি ম্যাডাম মেনকার নৃত্য-সম্প্রদায় থেকে কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে 'কথক' নৃত্যর শুটিং শেষ করলাম।

আমি উত্তর-ভারতে যাবার আয়োজন করছিলাম কুলু ও কাংড়া ভ্যালির লোক-নৃত্য, পাঞ্জাবের 'ভাঙরা' নৃত্য এবং পেশোয়ারের 'খটক' নৃত্য তুলবার জন্যে। এমন সময় একদিন মিঃ মীর আমায় বললেন: শীগ্গির বোম্বাইতে একটা বিরাট সঙ্গীত-জলসা হচ্ছে—ওখানে বহু বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েরা আসছেন। 'ভারতের নৃত্য' তো প্রায় শেষ করে আনলেন, এবার ভারতের সংগীত সম্বন্ধে একটা ৪।৫ রীলের ডকুমেণ্টারী তুলুন না।

প্রস্তাবটা আমার বেশ ভাল লাগল। আমি আমার সাউণ্ড এবং ক্যামেরা ইউনিটকে উত্তর-ভারতে লোক-নৃত্যগুলি তুলবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে জলসার জন্যে বোম্বায়ে যে-সব বড় বড় ওস্তাদ এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করলাম। আমি বিখ্যাত গায়কদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বুঝলাম যে, ভারতীয় সংগীতের মধ্যে যে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী আছে এবং তার ব্যাপ্তি এত বিরাট যে, ৩।৪ রীল বা ৩০।৪০ মিনিটের মত ছবি তুললে তার প্রতি সুবিচার করা হবে না। আমি স্থির করলাম যে, এর চেয়ে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে একটা ছবি করলে মন্দ হবে না। আমি ভারতের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তবে অল্প-ক্ষণের জন্যে বাজাতে তাঁদের রাজী করাতে আমায় বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।

যাই হোক, আমি কয়েকজন বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রীকে ঠিক করে ফেললাম, যেমন সেতারে বিলায়েত খাঁ, সানাই-এ বিসমিল্লা খাঁ, ফ্লুট-এ পান্নালাল ঘোষ, বীণায় ভেঙ্কাটা গিরিয়াপ্পা। সারেঙ্গী, বিচিত্র-বীণা, তবলা, পাখোয়াজ এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের কতকগুলি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র যাঁরা বাজিয়েছিলেন, তাঁদের নামগুলো আমার ঠিক মনে পড়ছে না। স্বরোদের জন্য মিঃ মীর আমায় বললেন হাফেজ আলিকে ঠিক করতে, কিন্তু আমার একটা দুর্বলতা ছিল বিখ্যাত আলাউদ্দীন খাঁ-সাহেবের ওপর। সেজন্য আমি বহুকষ্টে তাঁকে রাজী করালাম অল্পক্ষণ বাজাবার জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যেদিন তাঁর স্বরোদ বাজনার শুটিং-এর দিন ঠিক করেছিলাম, সেদিন ঘটল এক দুর্ঘটনা। আমার প্রোগ্রাম ছিল সন্ধ্যা ৬টায় আলাউদ্দীন খাঁর স্বরোদ এবং সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ ভেঙ্কাটা গিরিয়াপ্পার বীণা। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এসে পৌঁছুলেন না, এদিকে ভেঙ্কাটা গিরিয়াপ্পা ঠিক ৬-৩০ মিনিটের সময় এসে বীণার সুর বেঁধে ৭টার মধ্যে একেবারে তৈরী।

তখন গিরিয়াপ্পা বললেন: এখনও যখন খাঁ সাহেব এলেন না—এর পর এসে সুর বেঁধে তৈরী হতে হতে প্রায় ৮টা বেজে যাবে এবং যত তাড়াতাড়িই করুন ৯টার আগে আপনি ওঁর শুটিং শেষ করতে পারবেন না। ওদিকে আজ রাত্রে সংগীত-সম্মেলনে আমাকেই প্রথম বাজাতে হবে। অতএব যদি আমার 'বীণা'-র শুটিং করতে চান, তাহলে এখুনি নিয়ে নিন মিঃ বোস। এর থেকে দেরী হলে আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। আমিও দেখলাম, সত্যিই তো খাঁসাহেব কখন আসবেন তার ঠিক নেই—এর মধ্যে গিরিয়াপ্পার বীণার শুটিংটা সেরে ফেলা যাক।

লাইটিং, রিহার্সাল, সাউণ্ড-মণিটার—এইসব করতে করতে প্রায় আটটা বাজল। যখন 'final take' করব বলে তোড়জোড় করছি, এমন সময় আলাউদ্দীন খাঁসাহেব এসে হাজির। উনি এসেই দেখলেন যে, আমি গিরিয়াপ্পার বীণা 'টেক' করবার জন্য একেবারে তৈরী। এই দেখেই তিনি মনে মনে খুব ক্ষুণ্ণ হলেন—তাঁর অভিমানে ঘা পড়ল।

আমি খাঁসাহেবকে অনেক করে বুঝিয়ে বললাম—তাঁর জন্যে একঘণ্টারও বেশী সময় অপেক্ষা করেছি আমরা, ভেঙ্কাটা গিরিয়াপ্পাকে আজ জলসায় প্রথম বাজাতে হবে বলে তাঁর কাজটা শেষ করে দিচ্ছিলাম।

কিন্তু আমার অত অনুনয়-বিনয়, যুক্তি কিছুই খাঁসাহেব শুনলেন না, বুঝলেনও না। তিনি শুধু বললেন: তাঁর এখানে আসতে দেরী হওয়ার জন্যে দায়ী তিনি

নন, আমাদের প্রোডাকশান ম্যানেজার ঠিক সময়ে যান নি। এতে তাঁর সম্মানহানি হয়েছে, তিনি শুটিং করতে পারবেন না।

যা হোক, অভিমান করে তিনি চলে গেলেন।

এদিকে ওস্তাদ হাফেজ আলি শুনেছিলেন যে, স্বরোদ-বাদ্যের জন্য আমি ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁকে ঠিক করেছি, সুতরাং এর পর আবার তাঁর কাছে গিয়ে স্বরোদ বাজাতে অনুরোধ করতে পারলাম না। ফলে হলো কি, এই ডকুমেণ্টারীতে স্বরোদ বাজনাটাই বাদ পড়ে গেল।

এর বেশ কিছুদিন পর একদিন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। কোন অভিমান নেই—কথা-বার্তা ব্যবহার আন্তরিকতায় ভরা। শুধু তাই নয়, তিনি প্রায় তিনঘণ্টা ধরে আমাকে স্বরোদ বাজিয়ে শোনালেন। সে যে কি অপূর্ব সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়েছিল, তা বলে বোঝানো শক্ত—সে স্বরোদ-বাদ্য কোন দিন আমি ভুলবো না।

এরপর অনেক কথা হলো—বিশেষ করে তিমিরবরণের কথা। দেখলাম তিনি তিমিরকে কি গভীর স্নেহ করেন।

এরপর আমি 'ভারতের নৃত্য' এবং 'ভারতের বাদ্যযন্ত্র' ছবি দু'খানির সম্পাদনা শুরু করলাম। ইতিমধ্যে আমার সাউণ্ড ও ক্যামেরা ইউনিট উত্তর ভারতের লোক-নৃত্যগুলি তুলে ফিরে এল।

যদিও ২।৩ জন সম্পাদক ছিলেন চিত্রসম্পাদনার জন্যে, তবু মিঃ মীর স্বয়ং সম্পাদনার তত্ত্বাবধান করতেন। মিঃ মীর ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সম্পাদক। সম্পাদিত হলে যে ছবির রূপ বদলে যায়, সেটা মিঃ মীরের কাছে শিখলাম, বিশেষ করে ডকুমেণ্টারী ছবির ক্ষেত্রে। কথায় কথায় তিনি আমায় একদিন বলেছিলেন যে, তিনি যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সম্পাদনা জিনিসটা ভালভাবে শিক্ষা করা।

এই সময় আমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটল।

ইনফরমেশন ফিল্মসের কাজ একেবারে রুটিন-বাঁধা—১০টা থেকে ৫টা। আমাদের অন্যান্য স্টুডিওর মত নয় যে, সময়ের কোনো মা-বাপ নেই। অবশ্য মাঝে মাঝে 'এডিটিং'-এ বসলে দেরী হয়ে যেত বৈকি অল্প-সল্প—তা না হলে ৫টা-৬টার মধ্যে কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরে আসতাম।

সন্ধ্যার সময় একা-একা বাড়ীতে বসে থাকতে ভাল লাগে না, তাই মাঝে মাঝে

ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ায় যেতাম, সেখানে অনেক পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হতো—সময়টা বেশ কেটে যেত।

একদিন ক্লাবে তুজন পুরোন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—লীলা ও মায়া। কলকাতা থেকেই এদের আমি চিনতাম। তারা আমাকে তাদের বড় বোন কৃষ্ণার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। প্রথম আলাপেই আমার মনে হলো—আমাদের মধ্যে যেন কোথায় একটা মিল আছে। কথা বলতে বলতে বুঝলাম যে, ইংরাজী সাহিত্যের ওপর তার বিরাট দখল্ আছে। তাকে দেখলে মনে হয় যেন সব সময় সে একটা গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারতাম দর্শন ও মনস্তত্ত্বে তার বিশেষ আগ্রহ। কথাচ্ছলে আমি যখন তাকে বললাম যে, 'ড্যান্সেস অফ ইণ্ডিয়া' ছবি তোলার ব্যাপারে আমাকে অনেক দিন মাদ্রাজের অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছে, তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে, আমি অরুণাচলমে রমণ মহর্ষির আশ্রম দেখেছি কিনা। আমি স্বীকার করলাম যে, আমি দেখিনি।

তাতে সে বলল: দক্ষিণ ভারতে এত জায়গায় ঘুরলেন অথচ রমণ মহর্ষির আশ্রমেই গেলেন না? আপনাদের বাংলাদেশে যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, দক্ষিণ ভারতে তেমনি রমণ মহর্ষি। আমি যখনই সময় পাই, তখন অরুণাচলমে গিয়ে রমণ মহর্ষির সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে প্রচুর শান্তি পাই।

প্রথম পরিচয়ের দিনেই আমরা কথাবার্তার মধ্যে এমন ডুবে গিয়েছিলাম যে, লীলা মন্তব্য করলে: কি মধু, আমার বোনকে পেয়ে যে আমাদের একেবারে ভুলে গেলে?

যা হোক, এরপর থেকে প্রায়ই কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হতো—একসঙ্গে সিনেমা যেতাম। আমার এ নিঃসঙ্গ জীবনে দেবতার আশীর্বাদের মতই সে এসে দাঁড়াল। যদিও তার মা ছিলেন বাঙালী এবং বাবা ছিলেন মারাঠী, সে বাংলা বলতে পারত ভালই, তবে লিখতে বা পড়তে পারত না। আমি তাকে বাংলা বই, বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের এবং রামকৃষ্ণের কথামৃত বইগুলি পড়তে দিতাম—আর সে তার পরিবর্তে আমাকে দিত ইংরাজী বই।

আমার মত তার জীবনেও ছিল একটা বিরাট ট্র্যাজেডী। স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করে সে কোর্টে দরখাস্ত করেছিল বিবাহ-বিচ্ছেদের। সমাজ-কল্যাণের কাজ করার দিকে তার ছিল অসাধারণ আগ্রহ, তাই সে ভারতীয় রেডক্রশ-এ যোগদান করেছিল। তখন যুদ্ধের সময় সেবার কাজে অনেক দূর-দূর জায়গায় যেতে হতো তাকে, কিন্তু যখনই সে বোম্বায়ে ফিরে আসত, তখনই আমরা তুজনে

ঘনিষ্ঠ হয়ে নিরিবিলিতে পরস্পরের সান্নিধ্যের আনন্দ উপভোগ করতাম। ক্রমশঃ আমাদের এই বন্ধুত্ব নিবিড় অনুরাগে পরিণত হলো।

ইতিমধ্যে 'ড্যান্সেস অফ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদনা শেষ হলো এবং ভারতের সর্বত্র মুক্তিলাভ করল। এই ছবি সম্বন্ধে বিভিন্ন কাগজে যে সব সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে থেকে একটি নিচে দেওয়া হলো :

"The presentation on the screen by the Information Films of India of the 'Dances of India" has highly educative and cultural value. The dances are rendered by expert exponents who adhere to the classical traditions in their pure forms. The efforts of I.F.I. and Director Modhu Bose are to be highly commended for the meticulous care and artistic taste with which these dances have been produced with a genuinely documentary basis. ...TIMES OF INDIA Bombay. 17.7.44

আমার পরবর্তী ছবির কথা হয়েছিল ভারতের চিত্রশিল্প (Indian Film Industry) সম্বন্ধে একটি ডকুমেণ্টারী ফিল্ম করার। এই উপলক্ষে আমি প্রথমে গেলাম মাদ্রাজে। সেখানে চিত্রশিল্পীদের সঙ্গীত ও অভিনয়-এর শুটিং করলাম। এই প্রসঙ্গে Indian Express যা লিখেছিল সেটিও নিচে দিলাম :

"Modhu Bose's "Dances of India" and "Musical Instruments of India" have proved that under capable direction, shorts, dealing with the cultural heritage of India can be artistic hits. Mr. Bose is here in Madras again in connection with his latest documentary film the 'Indian Screen' which will deal with the various aspects of the Indian film Industry. It will trace the growth of films in India from the days of Phalke and Madan Theatres, upto the present films".

...Indian Express, Madras, 23.12.1944

১৯৪৪ সালের শেষের দিকে আমি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এলাম ইনফরমেশন ফিল্মস্ অফ ইণ্ডিয়ার 'দি ইণ্ডিয়ান স্ক্রীন'-এর ডকুমেণ্টারীর কিছু অংশ তুলবার জন্যে। টুকলুও আমার সঙ্গে এল। নিউ থিয়েটার্সের শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা দিয়েছিলেন তাঁর প্রধান প্রধান শিল্পীদের অভিনয় ও সঙ্গীত গ্রহণ চিত্রায়িত করবার। আমার এখনও মনে আছে সায়গলের গান রেকর্ডিং-এর 'শট'—সায়গল গান করছে এবং পঙ্কজ মল্লিক অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, অর্থাৎ চিত্রনির্মাণের গোড়ার দিকে কি ভাবে ছবি দেখানো হতো তার ইতিহাস কখনই সম্পূর্ণ হবে না, যদি না ম্যাডান থিয়েটার্সের প্রথম যুগের কার্য-পদ্ধতি কিছু দেখানো হয়। কিন্তু ম্যাডান থিয়েটার্সের তখন আর

কিছুই অবশিষ্ট নেই, কোন পুরোনো ছবি বা ফিল্ম নেগেটিভ কিছুই পাওয়া গেল না ; পাওয়া গেল শুধু কয়েকটি পুরোনো ক্যামেরা ও প্রজেক্টর।

বার্জোরজী এবং জাহাঙ্গীরজী ম্যাডানের কাছ থেকে জানলাম তখনকার দিনে কি করে কলকাতার ময়দানে তাঁবু ফেলে নির্বাক ছবি দেখানো হতো। তখন কোন চিরস্থায়ী চিত্রগৃহ নির্মিত হয়নি। তাঁবু খাটিয়ে পর্দা জলে ভিজিয়ে ছবি দেখানো হতো। অবশ্য তখনকার দিনের অনেক ইতিহাস এবং পুরোনো তথ্য শুনেছিলাম জে. এফ. ম্যাডানের জামাই এবং ম্যাডান থিয়েটার্সের আসল নির্মাতা রুস্তমজী দোতিওয়ালার কাছ থেকে যখন আমি ১৯২৮ সালে ম্যাডানের হয়ে গুরুদেবের 'গিরিবালা' (নির্বাক) ছবি করছিলাম।

কলকাতায় যতদিন ছিলাম বেশীর ভাগ সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় হেম সোমের সঙ্গে বিশেষ দেখা হতো না।

আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু হেম সোমের কথা আগেই বলেছি, তবে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সোম একবার বম্বে এসে আমার মালাবার হিলের ফ্ল্যাটে কিছুদিন ছিল। সেটা সম্ভবতঃ ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে হবে। গ্রামোফোন কোম্পানীর কি একটা কার্য উপলক্ষ্যে সে বম্বে এসেছিল।

মালাবার হিলের ফ্ল্যাটে রোজ গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বহু ধরনের আলোচনা হতো—ধর্ম, দর্শন মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি। আমি জানতাম যে সোম একজন সত্যিকারের ভাল লোক, কিন্তু তার যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে এত গভীর জ্ঞান আছে, তার পরিচয় এর আগে কখনও পাইনি। খুব সহজ সরলভাবে সে আমাকে 'গীতা' থেকে মূল্যবান শ্লোকগুলি বুঝিয়ে বলত। সে সময়টা আমিও একটা ভয়ানক মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে চলেছিলাম সুতরাং এই সব আলোচনা বেশ খানিকটা সান্ত্বনা যোগাত আমাকে।

একদিন কথায় কথায় সোম বলেছিল, কলকাতায় একজন গৃহী সন্ন্যাসী আছেন। তিনি নাকি মহাযোগীও। সোম তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছিল বটে, তবে সবটাই অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা। এমন কি তাঁর নামটাও আমার কাছে তখন প্রকাশ করেনি। আর আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। তারপর সোম কলকাতায় চলে এসেছিল, এদিকে আমিও সেই মহাযোগীর কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

কলকাতায় থাকাকালীন যেদিন আমি বোম্বাই রওনা হবো, তার আগের দিন সোম আমায় তাদের বাড়ীতে লাঞ্চ খাবার নিমন্ত্রণ করল। আমি তাতে বললাম : কাল চলে যাচ্ছি ভাই—এখনও অনেক কাজ বাকি সুতরাং এবারকার মত লাঞ্চটা

থাক, পরে আবার যখন আসব তখন হবে এখন। কিন্তু সোম নাছোড়বান্দা, ওর মনে কষ্ট দিতে পারলাম না। সুতরাং বাধ্য হয়ে রাজি হলাম। সোম বলল যে সে এসে নিয়ে যাবে।

তার পরদিন ট্যাক্সিতে যেতে যেতে সোম বলল: হ্যাঁ মধু, তোমাকে যাঁর কথা বলেছিলাম তিনি এখন আমাদের বাড়ীতেই থাকেন, তাঁর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেব তোমার।

আমি বললাম: বাঃ, তুমি তো বেশ লোক। কাল তো কিছু বললে না যে উনি তোমার ওখানে আছেন—ধর, যদি আমি কোনো কারণে না আসতে পারতাম তাহলে তো ওঁর সঙ্গে দেখা হতো না।

সোম বরাবরই আত্মভোলা দার্শনিক মানুষ, বেশীর ভাগ সময়ই কি রকম যেন অন্যমনস্ক—যা হোক, সোমের বাড়ী আসতেই সোম দোতলার ওপরে একটা ঘরে নিয়ে গেল। তাঁকে দেখলাম। শুনলাম যে সোমকে তিনি 'হেমদা' বলে সম্বোধন করছেন। প্রথম আলাপেই তিনি আমাকে এত আপনার করে নিলেন যে মনে হলো যেন কত-কালের পরিচয়। বম্বেতে সোম আমাকে বলেছিল যে তিনি গৃহী সন্ন্যাসী, তবুও আমি ভেবেছিলাম যে হয়ত দেখব তিনি গেরুয়া পরে বসে আছেন। কিন্তু সে ভুল আমার ভাঙল যখন দেখলাম যে তিনি শাদা ধুতি ও গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসে আছেন আর একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছেন। আমি আরও ভেবেছিলাম, তিনি শুধু ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ই আলোচনা করবেন কিন্তু আমাদের আলোচনা হলো বহু বিষয়ে—সিনেমা, সাহিত্য, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি। প্রত্যেক বিষয়েই তাঁর গভীর জ্ঞান। তাঁর ব্যাক্তিত্ব এবং কথাবার্তায় এমন একটা অন্তরঙ্গতার সুর ছিল যা আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করল। কথা বলতে বলতে সময়টা কোথা দিয়ে যে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।

তারপর খাওয়া-দাওয়া হলো। এতদিন হোটেলে খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েছিল। মাদ্রাজেও হোটেল, কলকাতা এসেও সেই হোটেল। আজ অনেক দিন পরে বাংলাদেশে বাড়ীর রান্না খেলাম। সোমের স্ত্রী নিজে রান্না করেছিলেন—বহুরকমের পদ ছিল। খেয়ে খুবই তৃপ্তি পেলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। এখন পর্যন্ত কিন্তু সোম আমাকে তাঁর নামটি বলেনি, আমিও জিজ্ঞাসা করিনি।

অতি পরিচিতের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় যেমন বলি, তাঁকেও তাই বললাম: আজ তাহলে আসি, আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।

তাতে তিনি হেসে বললেন : নিশ্চয়ই হবে—অনেকবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।

"অনেকবার দেখা হবে" কথাটার মধ্যে তখন তেমন কোন গুরুত্ব দিই নি।

কিন্তু এর বেশ কিছুদিন পরে আমার জীবনের এক অত্যন্ত সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি আমার শ্রেষ্ঠতম হিতৈষী বন্ধু হিসেবে আবার আবির্ভূত হলেন, তখন বুঝলাম সেই সেদিনের কথার অর্থ—"আপনার সঙ্গে অনেকবার দেখা হবে।"

কথাগুলি যে কতখানি অর্থবহ, তা আমি সেদিন বুঝিনি। বুঝিনি যে সেগুলি শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। তাঁর মুখের কথাই যে তাঁর বাণী তাও বুঝিনি। এও বুঝিনি যে তিনি শুধু অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎই নয়—তিনি ছিলেন ত্রিকালদর্শী। বুঝিনি যে অনেক সৌভাগ্য থাকলে কেউ অমন ত্রিকালদর্শীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে।

বম্বে ফিরে গিয়ে 'দি ইণ্ডিয়ান স্ক্রীনের' বাকী কাজ শেষ করার আয়োজন করতে লাগলাম।

এর মধ্যে ইনফরমেশন ফিল্মসের অফিসে অনেক কিছু অদল-বদল হয়েছে। আগে মিঃ মীর চিত্র নির্মাণ এবং কার্য পরিচালনা উভয় দিকই দেখতেন। এখন ইনফরমেশান এণ্ড ব্রডকাষ্টিং বিভাগ থেকে একজন অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে যিনি বিভাগটি পরিচালনার দিকটা দেখবেন আর মিঃ মীরের দায়িত্বে থাকবে শুধু প্রোডাকশান বিভাগ।

একদিন সেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারটি আমায় বললেন : মিঃ বোস, আপনার 'ইণ্ডিয়ান স্ক্রীণ'-এর সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্য দু-একটা ডকুমেণ্টারীর কাজ হাতে নেন তাহলে ভাল হয়। আমি চাই যে আপনি এগুলো করেন। বলে অন্য দুখানা ডকুমেণ্টারীর চিত্রনাট্য আমার হাতে দিলেন। চিত্রনাট্য দুখানি আমি পড়ে দেখলাম যে একটি হলো যুদ্ধের প্রোপাগাণ্ডা এবং অপরটি হলো কালোবাজারীদের বিষয়ে।

আমি অফিসার ভদ্রলোককে বললাম যে, আমি যখন আই-এফ-আইতে কাজ নিই তখন মিঃ থাপারের সঙ্গে স্পষ্টভাবে এই কথাই হয়েছিল যে সাংস্কৃতিক ছবি ছাড়া আমি আর অন্য কিছু করব না। কিন্তু এখন···

তিনি বাধা দিয়ে বললেন : আমি তা জানি মিঃ বোস। কিন্তু এখন

ডকুমেণ্টারীগুলির মান এত নেমে গেছে যে কর্তৃপক্ষের একান্ত ইচ্ছা যে একজন অভিজ্ঞ এবং গুণী পরিচালকের দ্বারা এগুলি তোলা হোক। আপনি তো সংস্কৃতিমূলক ছবিগুলি তুলবেনই, সেই সঙ্গে এগুলিও যদি কিছু কিছু করেন তবে ছবিগুলির মান অনেকটা উন্নত হয়।

আমি দেখলাম যে এই অফিসারটির সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ হবে না—মিঃ মীরের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে আসল সত্যি কথাটা বললেন। 'ভারতের নৃত্য' এবং 'ভারতের বাদ্যযন্ত্র' ডকুমেণ্টারী দুটির অভাবিত সাফল্যে ভারতবর্ষের সব কাগজেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও পাবলিসিটি বেরিয়েছে। সেই জন্যেই আই-এফ-আই-এর কয়েকজন পরিচালকের মধ্যে অত্যন্ত গাত্রদাহ হয়েছে। তারা অভিযোগ করেছে যে মধু বোস শুধু সংস্কৃতিমূলক ছবি করবে কেন? এসব ছবি তো এমনি জনগণের ভালোই লাগবে। তাঁকে নিয়ে অন্যান্য প্রোপাগাণ্ডা ছবিই বা করানো হবে না কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারা জানে যে তুমি আমার পুরনো বন্ধু—সেইজন্যে অবস্থাটা সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে—বুঝলে মিঃ বোস! তুমি বরং সেক্রেটারী মিঃ থাপারকে এ বিষয়ে লিখে দেখ।

আমি মিঃ নিরঞ্জন পালের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা বললাম। মিঃ পাল বললেন: তুমি যখন মিঃ থাপারকে লিখতে বলছো আমি অবশ্য লিখব—কিন্তু কোন ফল হবে না। আমি শুনেছি যে ইনফরমেশন ফিল্মসের আরও অনেক অদল-বদল হবে, মিঃ থাপারের সঙ্গে এই বিভাগের কর্তৃপক্ষের তেমন বনিবনা হচ্ছে না। মিঃ থাপারকে নাকি অন্য কোন বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তার চেয়ে, মধু—একটা পূর্ণদৈর্ঘ্য সংস্কৃতিমূলক ছবির লাইসেন্সের জন্যে আবেদন করো না কেন? জানো তো, সাধনা, উদয়শঙ্কর এবং আর ২।১ জন শিল্পী এরকম লাইসেন্স পেয়েছে। আর তাছাড়া তোমার দাবী তো আরও বেশী, কারণ এক সময় তোমার কোম্পানী ছিল এবং সে কোম্পানীর হয়ে তুমি ছবি করেছ। তুমি নিজেও অনেক নাচ-গানের ছবি পরিচালনা করেছ। তোমার পক্ষে লাইসেন্স পাওয়া মোটেই শক্ত হবে না।

একটু থেমে তিনি আরও বললেন: লাইসেন্স পেলে তুমি নিজেই ছবির প্রযোজনা ও পরিচালনা করতে পার। তাতে তোমার ফাইনান্সিয়ার পাওয়া মোটেই শক্ত হবে না। আর যদি একান্তই ফাইনান্সিয়ার না পাও তবে লাইসেন্সটা বিক্রি করতে পার। ভাল দাম পাবে।

আমি বললাম: আমি জানি মিঃ পাল, যে এখন একটা লাইসেন্সের দাম কালোবাজারে দেড় থেকে দু লক্ষ টাকা, কিন্তু আপনি জানেন যে আমি ওসব

কালোবাজারী ব্যবসায়ের মধ্যে নেই। যদি লাইসেন্স পাই তবে নিজেই ছবি করব।

মিঃ পাল হেসে বললেন: আমি তা খুব ভাল রকমই জানি—ওটা বললাম এমনি কথার কথা। যাই হোক, তুমি লাইসেন্সের জন্যে আবেদন কর। আর তুমি যখন বলছ তখন আমি মিঃ থাপারকে লিখব—তবে বিশেষ ফল হবে বলে মনে হয় না।

এই ফিল্ম লাইসেন্স সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

তখন যুদ্ধের বাজার—একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা নানা অসদুপায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করছিলেন। চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ব্যাঙের ছাতার মত রাতারাতি বহু গজিয়ে উঠতে লাগল। এদিকে কাঁচা ফিল্মের দারুণ টানাটানি। সেইজন্য ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকে তাঁদেরই লাইসেন্স দেওয়া হতো যাঁরা ইতিপূর্বে ছবি করেছেন।

কিছুদিন পরে মিঃ পাল আমায় ফোন করে জানালেন যে, তিনি মিঃ থাপারের কাছ থেকে চিঠির জবাব পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে তিনি এখন অন্য দপ্তরের ভার নিয়েছেন সুতরাং আমার বিষয়ে আর কিছু বলা বা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে আমিও একটি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করলাম।

আই-এফ-আই থেকে আমাকে "শর্টেজ অ্যাণ্ড হোর্ডিং অফ কয়েনস্" সম্বন্ধে ছবি করতে দেওয়া হয়েছিল। আমি 'করব না' বলতে পারলাম না। সেইজন্য 'দি ইণ্ডিয়ান স্ক্রীন'-এর সঙ্গে এ ছবিটাও সুরু করলাম। মিঃ মীরের ওপর ভার ছিল চিত্র-নাট্য অনুমোদন করা—প্রযোজনা করা এবং সম্পাদনা তত্ত্বাবধান করা। আর এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের ওপর দায়িত্ব ছিল চিত্রনির্মাণের সমস্ত খরচের টাকা পয়সা অনুমোদন করা। আমি যখন তাঁকে বললাম যে ভারতীয় চিত্রশিল্পের জনক ডি. জি. ফাল্কে যেখানে প্রথম ভারতীয় ছবি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' নির্মাণ করেছিলেন সেইখানে যেতে হবে এবং স্টুডিওর মধ্যে একটা তাঁবু করতে হবে—অর্থাৎ ম্যাডান কোম্পানী যেভাবে বায়োস্কোপের ছবি দেখাতেন তার 'শট' নিতে হবে, তার জন্য খরচ বরাদ্দ করতে হবে—তিনি তো শুনেই ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে চাইলেন। বললেন, এ তো বেশ কিছু খরচের ব্যাপার। আমাকে এ বিষয়ে দিল্লীতে লিখতে হবে তাদের অনুমোদনের জন্যে।

জানি না তিনি সত্যিই দিল্লীতে লিখেছিলেন কিনা—তবে কয়েকদিন পরে আমায় জানালেন যে কর্তৃপক্ষ এত টাকা মঞ্জুর করতে রাজী হচ্ছেন না।

আমার মনে হলো যে তিনি চান না যে আমি ছবিটা শেষ করি। তিনি চান যে, আমি যুদ্ধের প্রোপাগাণ্ডা ছবিগুলিই করতে থাকি; সেইজন্যে আমার সঙ্গে তাঁর প্রায়ই মন কষাকষি চলতে লাগল। শেষে ৩১শে মার্চ তারিখে আমি এক মাসের নোটিশ দিয়ে পদত্যাগ পত্র দাখিল করলাম।

তখন ১৯৪৫ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস হবে। আগেই বলেছি কৃষ্ণা রেডক্রশ-এ চাকরী নিয়েছিল। সে সময় সে ছিল দেওলালির মিলিটারী ক্যাম্পে। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে বম্বেতে যখন আসত তখন আমরা কয়েকটা দিন বেশ হাসি-খুশীর মধ্যে দিয়ে কাটাতাম। কিন্তু এই সময়টা এতই কম, কোথা দিয়ে যে কেটে যেত জানতেই পারতাম না।

এদিকে এপ্রিল মাস গেল, মে মাসও গেল—কিন্তু দিল্লী থেকে লাইসেন্সের ব্যাপারে কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। দিল্লীতে আমি আমার ভাগনে বড়দির একমাত্র ছেলে বুড়্‌ঢাকে (ভাল নাম ডাঃ সুশান্ত সেন) লিখলাম এই সম্বন্ধে একটু তদারক করে আমায় জানাতে। বুড়্‌ঢা তখন দিল্লীতে ডাক্তার হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছে, এমন কি আমাদের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালও দরকার হলে বুড়্‌ঢাকে ডেকে পাঠাতেন। মিঃ আজিজুল হক্ ছিলেন তখন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী এবং বুড়্‌ঢার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল।

জুন মাস নাগাৎ বুড়্‌ঢা আমায় টেলিগ্রাম করল অবিলম্বে দিল্লী চলে আসতে। 'চলে এস' বললেই তো আর যাওয়া যায় না—বেশ কিছু টাকার দরকার। কারণ যাওয়া-আসার খরচ, এবং দিল্লীতেও খরচ বেশ মোটা হবে। তারপর দু'মাস ধরে কোন কাজ-কর্ম নেই—সুতরাং রোজগারও নেই—এমনিতেই খুব টানাটানি করে চালাচ্ছি।

কি করব ভাবছি। হঠাৎ এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো টাকা যোগাড় করি কি করে? অথচ বুড়্‌ঢা আমায় টেলিগ্রাম করেছে অবিলম্বে চলে আসতে—এই বিভাগের সর্বময় কর্তার সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত করেছে—হয়ত আজিজুল হকের সঙ্গেই হবে।

বম্বেতে অনেককেই চিনি, তার মধ্যে পয়সাওলা লোক অনেকেই ছিলেন—কিন্তু টাকা ধার চাইবার মত অন্তরঙ্গ বন্ধু তেমন কেউ ছিল না। একজন লোকের কথা মনে পড়ল—তিনি মিঃ ওয়াদিয়া। কিন্তু তাঁরও তখন টাকা-পয়সার টানাটানি যাচ্ছে বলে শুনেছি, সুতরাং তাঁর কাছেই বা চাই কি করে?

অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভাবলাম—কিন্তু কোন কুল-কিনারা পেলাম না—অথচ পরদিনই আমাকে দিল্লী যেতে হবে।

পরদিন সকালে আর কোনো উপায় না দেখে মরীয়া হয়ে মিঃ ওয়াদিয়াকেই ফোন করে বললাম যে, একটা জরুরী ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি বললেন, বৈকালে যেতে।

সেইদিনই দুপুরবেলায় আমি আর টুকলু বসে লাঞ্চ খাচ্ছি এমন সময় বাইরে 'কলিং বেল' বাজার আওয়াজ হলো। একটু পরে চাকর এসে খবর দিল যে ডাক পিয়ন এসেছে একটা টেলিগ্রাফ মণি অর্ডার নিয়ে। টুকলুকে বললাম, কার টি-এম-ও দেখতে।

টুকলু পোষ্টম্যানের কাছ থেকে মণি-অর্ডার ফর্মটা নিয়ে এসে বলল: টেলিগ্রাফ মণি-অর্ডার এসেছে—তোমার নামে কলকাতা থেকে ৫০০৲ টাকা।

কথাটা শুনে আমি তো আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার নামে টাকা পাঠাবে কে? আমি তো কাউকেই লিখিনি টাকার জন্যে। দেখলাম মণি-অর্ডারের কুপনে লেখা আছে:

Have faith in God Kalida.

কালীদা? কালীদা কে?

টুকলুকে বললাম: কালীদা বলে তো কাউকে আমি চিনি না। কে এই ভদ্রলোক?

তাতে টুকলু বলে উঠল: এ তবে নিশ্চয়ই তোমার দাদা পাঠিয়েছে, ওটা এইভাবে পড়:

Have faith in God Kali—Da.

আমি হেসে বললাম: দূর-তোর যেমন বুদ্ধি! Have faith in God Kali?

সেজদাকে সেজদাই বলি—শুধু দাদা নয়। আর তাছাড়া সেজদাকে আমি কখনই চিঠিফিটি লিখি না।

যাই হোক, কালীদা যিনিই হোন—মনে মনে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ দিলাম।

আমার যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল দেখে আমি মিঃ ওয়াদিয়াকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলাম যে হঠাৎ একটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারে আমাকে আজ রাত্রেই দিল্লী চলে যেতে হচ্ছে—সেইজন্যে বিকালবেলায় তাঁর কাছে যাওয়া হয়ে উঠছে না। তিনি যেন কিছু না মনে করেন। দিল্লী থেকে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

সেই রাত্রেই আমি দিল্লী রওনা হলাম। ট্রেনে সমস্ত রাস্তাটা একই চিন্তা খালি মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল : কে এই কালীদা ?

বহু চেষ্টা করেও টাকা ধার পাওয়া যায় না—কারণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যার টাকা দেবার ক্ষমতা আছে, তার দেবার মত উদার মন নেই, অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। আর যার মন আছে, তার সামর্থ্য নেই। এ অবস্থায় কে এমন মহাপ্রাণ ব্যক্তি আছে যে আমার সাংঘাতিক দরকারের সময়, না চাইতে ৫০০ টাকা পাঠিয়ে দিলেন! আর তিনি কি করেই বা জানলেন যে এখন আমার টাকার দরকার!

নানা রকমের চিন্তা যখন মনের মধ্যে ভিড় করছে, তখন হঠাৎ মনে হলো যে হেম সোমের বাড়ীতে যাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সে ভদ্রলোক কালীদা নন তো? সোম আমাকে তাঁর নাম বলেনি, শুধু বলেছিল গৃহী-সন্ন্যাসী। আর যদি তিনিই হন, তাহলে 'কালীদা' কেন, তাঁকে দেখে তো আমার চেয়ে ছোটই মনে হয়েছিল। অবশ্য তাঁর কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়েছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন যে, "আপনার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হবে।" তিনি কি সত্যিই ত্রিকালদর্শী? ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব দেখতে পান?

এই সব নানা চিন্তায় ঘুম আসছিল না—ট্রেনে বসে বসেই হেম সোমকে একখানা চিঠি লিখে জানতে চাইলাম : তাঁর বাড়ীতে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তিনিই কি কালীদা?

সেজদি তখন বরোদায়, কারণ ব্রজেন্দ্রদা (স্যার বি. এল.) তখন বরোদার দেওয়ানরূপে কাজ করছিলেন। সেজন্য দিল্লীতে আমার ভাগ্নে বুড়ার ওখানে উঠলাম। আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই—অর্থাৎ বুড়া, তদানীন্তন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী মিঃ আজিজুল হকের সঙ্গে দেখা করার একটা বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম—কিন্তু তাঁর কাছে তখন পর্যন্ত আমার দরখাস্তটি গিয়ে পৌঁছায়নি। তিনি আমাকে কথা দিলেন যে, তাঁর দ্বারা যতখানি করা সম্ভব তিনি করবেন।

বম্বেতেই শুনেছিলাম যে এই বিভাগের খুদে সাহেবদের অর্থাৎ যাদের হাত দিয়ে লাইসেন্সের দরখাস্তটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর টেবিলে পৌঁছবে, তাদের খুশী করতে না পারলে লাইসেন্স বের করতে পারা যায় না, এবং এই খুশী করতে অনেক কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। সোজা পথে এবং লাইসেন্স প্রার্থীর যোগ্যতা অনুসারে লাইসেন্স পাওয়া-না-পাওয়া নির্ভর করে না।

আমার হলো খুব মুস্কিল। প্রথমতঃ এই সব 'খুদে সাহেব'দের খুশী করার মত অর্থ আমার নেই, দ্বিতীয়তঃ এই 'খুশী করার' ব্যাপারটাকে আমি মন থেকে কোনক্রমেই প্রশ্রয় দিতে পারলাম না। এখন কি করা উচিত! মন্ত্রীমশাই স্পষ্ট বলছেন যে, যতক্ষণ না দরখাস্তখানি তাঁর কাছে গিয়ে পৌছুচ্ছে ততক্ষণ তিনি কিছুই করতে পারেন না। এই সব দেখে বুড্‌ঢা আমায় বল্লে: মামু, পি. এন. থাপারের সঙ্গে তো তোমার যথেষ্ট জানাশোনা আছে, তাঁর কাছে যাও না, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবেন।

আমার যতদূর মনে পড়ে মিঃ থাপার তখন স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে তিনি খুব সমাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। ইনফরমেশন ফিল্মস ছেড়ে দিয়েছি শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন। ছেড়ে দেবার কারণটা তাঁকে বলতে তিনি আমাকে সমর্থন করলেন ও সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সহানুভূতিও প্রকাশ করলেন।

তারপর আমি তাঁকে বললাম যে, আমি একটা ফিল্মের লাইসেন্সের জন্তে দরখাস্ত করেছি—তিনি আমাকে এ বিষয়ে কোন রকম সাহায্য করতে পারেন কি না।

তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, ঐ বিভাগের সেক্রেটারীকে আমার হয়ে বলবেন এবং যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তার চেষ্টা করবেন। তিনি আমাকে একথাও বললেন যে, কোন সংস্কৃতিমূলক ছবি করা নিয়ে লাইসেন্স পাওয়া বিষয়ে আমার ন্যায্য দাবী আছে।

আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আমি মিঃ থাপারের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

মিঃ থাপারের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলাফল বুড্‌ঢাকে বলতেই বুড্‌ঢা বলল যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে সে বলে রাখবে দরখাস্তখানি এই বিভাগে এসে পৌছুলেই যেন তাকে খবর দেয়। তারপর সে যথাবিধি ব্যবস্থা করবে।

বুড্‌ঢার তখন দিল্লীতে দারুণ পসার—বিশেষ করে যত বিদেশী এম্‌ব্যাসী এবং উচ্চ সরকারী মহলে। প্রায়ই সে আমাকে তার ক্লাবে নয়ত বিভিন্ন 'এমব্যাসী'র দেওয়া ককটেল পার্টিতে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। এই হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কয়েকদিন কাটিয়ে আবার বম্বে ফিরে এলাম।

জুন মাসে, হেম সোমের কাছ থেকে আমার সেই চিঠির জবাব এল। উত্তরটা যথারীতি ভাসা-ভাসা—সে লিখেছে নাম জেনে আর কি হবে? যিনি তোমায় টাকা পাঠিয়েছেন, তিনি নিশ্চয় বুঝেছেন যে তোমার টাকার খুব দরকার, তাই তিনি

পাঠিয়েছেন। সোম স্পষ্ট করে কিছু না লিখলেও, আমি তার চিঠি পড়ে যা বুঝলাম তাতে, তার বাড়ীতে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাঁকে উদ্দেশ করেই লিখেছে—তিনিই তবে কালীদা। আমি তখন সোমের ঠিকানাতেই কালীদার নামে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলাম, আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। কিন্তু দিনের পর দিন চলে গেল—কোন জবাব এল না।

এদিকে কৃষ্ণা দেওলালী থেকে চলে এসেছে বম্বেতে। বম্বেতে সে এখন থাকবে কিছুদিন। ইতিমধ্যে তার 'ডিভোর্স' হয়ে গেছে—তার স্বামীর দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ আসেনি।

জুন মাস শেষ হয়ে জুলাই মাস এল—লাইসেন্স বিষয়ে বুড্‌ঢার কাছ থেকে কোন খবরই পাচ্ছি না। টাকার যথেষ্ট টানাটানি যাচ্ছে। লাইসেন্সের কিছু ঠিক না হওয়া পর্যন্ত, অন্য কোনো কাজেরও চেষ্টা করতে পারছি না। মনের যখন এই রকম অবস্থা, তখন কৃষ্ণার সাহচর্য আমাকে অনেকটা শান্তি দিত।

আগস্ট মাসে টাকা-পয়সার এত টানাটানি হলো যে দিন যেন আর চলে না। তখন আবার সেই অলৌকিক ঘটনা—কালীদার কাছ থেকে এল ৫০০৲ টাকার আর একটি মণি-অর্ডার। এবারও এল না চাইতে। সোমকে লিখলাম—কালীদাকেও আবার লিখলাম।

কালীদার কাছ থেকে কোনো জবাব পেলাম না, কিন্তু সোম উত্তরে জানাল: 'তোমার যখন খুব প্রয়োজন হয় সেই সময় যখন তুমি এই সাহায্য পাচ্ছ তখন বুঝতে হবে যে যিনি টাকা পাঠাচ্ছেন, তিনি তোমায় খুবই ভালবাসেন এবং তিনি বুঝতে পারেন তোমার প্রয়োজনের সময়টা। কি করে বুঝতে পারেন, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত। শুধু এইটুকু জানি যে তিনি সব বুঝতে পারেন, সব জানতে পারেন।

অলৌকিক ঘটনার কথা অনেক পড়েছি এবং শুনেছি, এখন আমার নিজের জীবনেও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম। এতদিনে বুঝলাম তাঁর কথার মানে, 'আপনার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হবে।' তাঁর মুখের কথাই যে তাঁর বাণী এতদিনে বুঝলাম!! সত্যিই তিনি ত্রিকালদর্শী।

আগস্ট মাসের শেষদিকে বুড্‌ঢার কাছ থেকে এল সেই বহু প্রত্যাশিত সুসংবাদ—ফিল্ম-লাইসেন্স-এর জন্যে আমার দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়েছে।

কিন্তু সুখ চঞ্চল, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী—অন্ততঃ আমার জীবনে। কৃষ্ণা একদিন এসে

আমায় বলল যে তাকে বাঙ্গালোরের কাছে একটা সামরিক হাসপাতালে বদলী করা হয়েছে।

আগে যখন দেওলালিতে থাকতো, তখন প্রায়ই সপ্তাহান্তে এসে ২।৩ দিন করে বোম্বাই-এ কাটিয়ে যেত, কিন্তু এখন, বাঙ্গালোর—অনেক দূর। খুব শীগ্‌গির দেখা হবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। ভগবান জানেন আবার কবে দেখা হবে। সুতরাং এই যে বিচ্ছেদ—এটা আমাদের দুজনের কাছেই খুব মর্মান্তিক রূপে দেখা দিল।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি—তখনও লাইসেন্সটি আমার হাতে এসে পৌঁছয়নি, তবে পাওয়া গেছে—এই শুভ খবরটুকুই পেয়েছি। এই সময় আবার এল দেবতার আশীর্বাদের মত কালীদার কাছ থেকে ৫০০৲ টাকার মণি-অর্ডার। ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি দিলাম কালীদাকে, কিন্তু এবারও যথারীতি কোনো উত্তর নেই।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি লাইসেন্সটি হাতে পেলাম। সে সময় আবার একটা গুজব রটলো যে আসছে বছর থেকে লাইসেন্স প্রথা একেবারে তুলে দেওয়া হবে। সুতরাং লাইসেন্সের দাম কমে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু প্রডিউসার আমাকে আশী হাজার থেকে এক লাখ টাকা দিতে চাইল—যদি আমি এটা বিক্রি করি।

তখন টাকার আমার খুবই দরকার। অভাব চারিদিকে। এক এক সময় মরীয়া হয়ে ভাবতাম যে দিই লাইসেন্সটা বিক্রি করে। প্রডিউসারদের সঙ্গে কথা বলে অনেকটা অগ্রসরও হতাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করতাম। তখন মনে হতো যে, গভর্ণমেণ্ট লাইসেন্স দিয়েছে আমাকে, যাতে আমি আমার মনোনীত গল্প, শিল্পী ও কলাকুশলী নিয়ে—এবং আমার পরিচালনায় ছবি করি। আর সেই লাইসেন্স কিনা কালো-বাজারে বিক্রি করে দেব?

যে সমস্ত প্রোডিউসার আমার কাছে লাইসেন্স নেবার জন্য এসেছিল তাদের প্রস্তাব হলো যে তারা আমার কাছ থেকে লাইসেন্সটি কিনে নিয়ে তাদের 'ইউনিট' দিয়ে ছবি তুলবে—আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকবে না। ছবির পরিচালনা করবে অন্য লোকে—ছবি মাথামুণ্ডু কি হবে সে বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারব না—অথচ ছবি মুক্তি লাভ করবে 'মধু বোস প্রোডাকশান'—এই নামে। এই যুক্তি আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না—তার ওপর 'কালো-বাজারী' ব্যাপারেও আমি জড়িয়ে পড়ব একথা মনে হতেই আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল।

আমার পরিচিত বহু লোক আমাকে বলল: অমন আদর্শ নিয়ে চললে আর

আজকের পৃথিবীতে বাস করা যাবে না, মিঃ বোস। প্রায় লাখখানেক টাকা হাতে পেয়ে ঠেলে দিচ্ছেন? আপনাকে তো কিছুই করতে হবে না—সবই তো প্রোডিউসার করবে, শুধু আপনার নামটা ব্যবহার করবে। আপনি তো কিছু না করে ঘরে বসেই প্রায় এক লাখ টাকা পাচ্ছেন, এতে আপনার আপত্তি করার কি থাকতে পারে?

আমি বললাম: আপত্তি করছি এই কারণে যে সে টাকা ভোগ করার চেয়ে আমার দুর্ভোগটাই বাড়বে বেশী।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার লাইসেন্স পাবার কিছু আগে সাধনাও তার নামে লাইসেন্স পেয়েছিল। তখন লাইসেন্সের দাম প্রায় দেড় লাখ টাকা—কালোবাজারে অবশ্য। তার কাছেও যখন প্রোডিউসাররা যাতায়াত করেছিল লাইসেন্সটিকে বিক্রি করার জন্যে তখন সেও দেড় লাখ টাকার লোভ পরিত্যাগ করে বিক্রি করতে রাজী হয়নি। যে কারণে আমি বিক্রি করিনি—সাধনাও ঠিক সেই কারণেই রাজী হয়নি। সত্যিই আমার খুব ভাল লেগেছিল সাধনার এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং নিষ্ঠাকে।

অক্টোবর গেল, নভেম্বর মাসও গেল। আমি এমন একজন প্রোডিউসার পেলাম না যে আমাকে ছবি করবার জন্যে টাকা দেবে, কিন্তু তাদের লাইসেন্সটি বিক্রি করে দিলে তারা সবাই ছবি করতে প্রস্তুত 'মধু বোস প্রোডাকশান' নাম দিয়ে।

এদিকে কালীদা কিন্তু আমাকে প্রতি মাসেই টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছেন—এমন কি অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসেও তিনি পাঠালেন দেড় হাজার টাকা। এবং সব সময় মণি-অর্ডার কুপনে লেখা থাকত সেই এক বাণী: 'Have faith in God' অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস রাখো।

ভগবানের উপর আমার কতটা বিশ্বাস হলো জানি না, তবে এই কথাটা ভাল-ভাবেই বিশ্বাস হলো যে কালীদা সত্যই অন্তর্যামী।

ডিসেম্বর মাস এসে গেল—তখনও লাইসেন্সের কোনো সুরাহা হলো না। এদিকে দিল্লী থেকে খবর এল যে ডিসেম্বরের শেষ কিংবা জানুয়ারীর গোড়া থেকেই এই লাইসেন্স প্রথার অবসান ঘটবে।

ঠিক এই সময়ে আমার জীবনে ঘটল দুটি ঘটনা—তার প্রভাব পরবর্তী জীবনে বিশেষভাবে অনুভব করেছিলাম।

খুবই মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে দিন কাটছিল। এত কষ্ট করে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে লাইসেন্সটা যদিও বা পাওয়া গেল, তবু টাকার অভাবে শেষপর্যন্ত ছবি করতে পারব কিনা, তার ঠিক নেই। কালোবাজারে যে লাইসেন্স বিক্রী করব না—এটা মনে মনে ঠিক করেই ফেলেছিলাম। একে তো এই মানসিক অশান্তি, তার ওপর কৃষ্ণার কাছ থেকে এমন একখানা চিঠি পেলাম যা অশান্তির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল।

আগেই বলেছি যে, রেডক্রশ বিভাগ থেকে কৃষ্ণাকে বাঙ্গালোরের কাছে একটা সামরিক হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। তার সঙ্গে মাসছয়েক দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি আমার, তবে চিঠির আদান-প্রদান ছিল। ইদানীং তার চিঠিও ক্রমশ কমে আসতে লাগল। প্রথমে কারণটা ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে চিঠি পড়ে মনে হতো যে কৃষ্ণার চিঠির ভাষার মধ্যে যেন সে আগের মত উত্তাপ আর নেই—কিরকম যেন মামুলি নিষ্প্রাণ ভাব। পরে অবশ্য আসল ব্যাপারটা জানতে পারলাম।

কৃষ্ণা আমায় লিখে জানাল যে, হাসপাতালের যিনি প্রধান ডাক্তার, তিনি একজন আই-এম-এস—খুব ভালো লোক, তাঁর প্রেমে পড়েছে সে। সেই সঙ্গে প্রেম এবং প্রেমিক-প্রেমিকা সম্বন্ধে একটা লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছে। তার পড়াশুনা ছিল ভালো এবং লিখতেও পারত মন্দ নয়। সে আমাকে সুন্দর ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করেছিল—ডাক্তারের সঙ্গে তার ভালবাসা এবং আমার সঙ্গে তার ভালবাসার মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং কতখানি? যাই হোক, মোদ্দা কথা হলো, তার চিঠি থেকে যা বুঝলাম তা হলো এই যে, তার বয়েস হয়ে আসছে, এদিকে শরীরও বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। এখন সে চায় স্থিতি—একটা নিশ্চিত আশ্রয় এবং জীবনের বাকি দিনগুলোর জন্যে একান্ত নির্ভরতা। এসব বিবেচনা করেই সে ঠিক করেছে যে, এই ডাক্তারকেই সে বিয়ে করবে। এর পরেও সে লিখেছে যে, আজ হয়ত আমরা উভয়ে উভয়কে খুবই ভালবাসি, কিন্তু আমাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী, আমাদের পেশা, আমাদের জীবনদর্শন সম্পূর্ণ আলাদা। একজন চিত্র-পরিচালকের জীবনে কোন নিশ্চিত নির্ভরতা বলে কিছু নেই, কোন বাঁধাধরা আয় নেই। এমন কি কাজকর্মেরও ঘড়ি-ধরা কোনো আইন-কানুন নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো ছবির সাফল্য বা অসাফল্যের ওপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। 'বক্স-অফিসে' ছবির সাফল্য মানেই আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, অর্থাৎ আরও কয়েকটা নতুন কন্ট্রাক্ট, আর ছবির ভাগ্য খারাপ হলে আমরাও খতম।

চিঠিখানাতে আমি অত্যন্ত আঘাত পেলেও তার মনের ভাবটা বুঝলাম। মনে

মনে এও বুঝলাম যে, সে এখন আর তরুণী নেই—ক্রমশ বয়েস হয়ে আসছে। সুতরাং এখন যদি এমন কাউকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে পায়, যার সঙ্গে বাকি জীবনটা নিরুদ্বিগ্ন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে, তবে সেটাই হবে তার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং কাম্য।

যুক্তি দিয়ে, তর্ক দিয়ে মনকে যতই বোঝাতে চেষ্টা করি, মন কিন্তু বোঝে না। বিশেষ করে যারা আমাদের মত ভাবপ্রবণ, তাদের কাছে এ-ধরনের আঘাত খুব বেশী করেই লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার নিঃসঙ্গ জীবনে কৃষ্ণার এই চিঠি অশান্তির মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলল।

মনের যখন এইরকম অবস্থা, চারিদিকে হতাশার সাগরে কোন কূলকিনারা দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে কালীদার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলাম—এই প্রথম চিঠি। চিঠিখানা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাতে যা লেখা ছিল, তাই মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করল। চিঠির হুবহু ভাষাটা এখন ঠিক মনে নেই, তবে মোটামুটি ভাবটা এইরকম: "You are a born fighter, you will have to fight against all odds (অর্থাৎ তুমি আজীবন সংগ্রাম করে এসেছ, আরও বহু সংগ্রাম করতে হবে)—তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।" তিনি যে নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছেন সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। এতদিনে আমি বুঝেছিলাম যে, তাঁর মুখের কথাই তাঁর বাণী। সুতরাং তিনি যখন বলেছেন, "ঘাবড়াবার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে"—তখন আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। মনে খানিকটা সান্ত্বনা পেলাম।

এর কিছুদিন পরেই একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল।

আর-কে-ও রেডিও পিকচার্সের ম্যানেজার মিঃ ক্র্যাস্টো আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। তার সঙ্গে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়াতে আমার প্রায়ই দেখা হতো। সে জানত গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে আমি একটা লাইসেন্স পেয়েছি ছবি করবার জন্যে। কিন্তু ব্ল্যাকমার্কেটে সে-লাইসেন্স বিক্রী করতে আমি রাজী নই বলে সেটার এখনও কোনো সুরাহা হয়নি, আমার কাছেই পড়ে আছে। সে একদিন আমাকে টেলিফোন করে বলল যে, আমি যেন একবার তার অফিসে গিয়ে দেখা করি—বিশেষ জরুরী দরকার আছে।

গিয়ে দেখা করতে ক্র্যাস্টো বলল: একজন বিরাট ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সেদিন আমার আলাপ হয়েছে, সে একটা হিন্দী ছবি করতে চায়। ভদ্রলোকের বাড়ী হলো হায়দ্রাবাদ। তাকে আমি তোমার কথা বলেছি। সে তোমার সঙ্গে

কথাবার্তা বলতে চায়—কবে তুমি দেখা করতে পারবে তার একটা দিন ঠিক করে ফেল। সে তোমার 'রাজনর্তকী' এবং 'কোর্ট ড্যান্সার' দুই-ই দেখেছে এবং তার ভাল লেগেছে। আমি তাকে বলেছি যে, গভর্নমেণ্ট তোমাকে একটা লাইসেন্স দিয়েছে পূর্ণাঙ্গ ছবি করার জন্যে।

তখন আমি ক্র্যাস্টোকে বললাম: শোনা যাচ্ছে যে, আসছে বছর থেকে এই ফিল্মের লাইসেন্স প্রথা গভর্নমেণ্ট একেবারে তুলে দিচ্ছে—তখন আর এর কোনো মূল্যই থাকবে না। রয়েছে আর মাত্র একটা মাস।

ক্র্যাস্টো বললে: ফিল্মের লাইসেন্স প্রথা উঠে গেলেও কিছুদিন এখন সেইসব প্রোডিউসারই ফিল্ম পাবে, যারা এর আগে লাইসেন্স পেয়েছে। একেবারে নতুন যারা, তারা তাদের নামে ফিল্মের 'কোটা' পাবে না। সুতরাং তোমার লাইসেন্স এখন এ-সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

দু'দিন পরে ক্র্যাস্টো সেই ধনী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার দিনস্থির করল। প্রথম আলাপেই মনে হলো ভদ্রলোকটি বেশ ভাল—সুন্দর পড়াশোনা আছে। প্রথমটা আমি বেশ অবাক হলাম যখন শুনলাম তিনি একজন মুসলমান। নাম মিঃ কলকাতাওয়ালা। তবে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলাম তখনই, যখন দেখলাম, বড় ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কবি এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন মুগ্ধ ভক্ত। আমি যখন তাঁকে বললাম, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আমার প্রথম জীবনে লেখাপড়া শুরু হয় এবং পরে তাঁর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাঁর দুটি ছোট গল্প—'ডালিয়া'র মঞ্চরূপ এবং 'গিরিবালা'র চিত্ররূপ (নির্বাক) দিয়েছি এবং গুরুদেব নিজে সে-চিত্রনাট্য সংশোধন করে দিয়েছিলেন—তখন তিনি আমার প্রতি আরও বেশী করে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি তখন 'গিরিবালা'র মোটামুটি গল্পটি আমার কাছ থেকে শুনতে চাইলেন। আমি বললাম—তিনি খুব আগ্রহসহকারে শুনলেন এবং আমাকে গল্পটির একটি সারাংশ লিখে দিতে বললেন।

দিন-দুই পরে 'গিরিবালা'র একটা সারাংশ তাঁকে লিখে দিলাম। পড়ে ওঁর খুব ভাল লাগল। তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে 'গিরিবালা'র সবাক চিত্রস্বত্ব পাওয়া যেতে পারে কিনা।

আমি বললাম: বিশ্বভারতীর কাছ থেকে এই গল্পটির প্রথমে চিত্রস্বত্ব আমারই নেওয়া ছিল, পরে আমি সেটা ম্যাডান থিয়েটার্সকে দিয়ে দিই। কিন্তু সেটা মাত্র নির্বাক সংস্করণের জন্য। সুতরাং বিশ্বভারতীর কাছে সবাক সংস্করণের স্বত্ব পাওয়ার

কোন অসুবিধে হবে না। যদিও গুরুদেব এখন জীবিত নেই, কিন্তু তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন। তিনিও আমায় খুবই স্নেহ করেন।

তারপর টাকাকড়ির বিষয় কথাবার্তা হলো এবং তাঁর সলিসিটর কন্‌ট্রাক্টের খসড়া তৈরী করে ফেলল। তাঁর সঙ্গে দেখা হবার ৮।১০ দিনের মধ্যে আমাদের কন্‌ট্রাক্ট সই হয়ে গেল। যেদিন সই করলাম, সে-তারিখটা হলো ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫। সে-তারিখটার কথা আমার আজও মনে আছে, কারণ টাকার দিক থেকে এইটিই আমার চিত্র-জীবনের শ্রেষ্ঠ কন্‌ট্রাক্ট। এই ছবির প্রোডাকশানের সমস্ত দায়িত্ব আমার—স্টুডিও, কলাকুশলী, শিল্পী, সংগীত-পরিচালক এবং যা কিছু প্রয়োজন সব নির্বাচনের পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র আমার।

আশ্চর্য, লাইসেন্স পেয়েছি প্রায় মাসতিনেক আগে, এত চেষ্টা করেও একজন ফাইনান্সিয়ার যোগাড় করতে পারিনি আর চিত্র-জীবনের এই শ্রেষ্ঠ কন্‌ট্রাক্ট এর জন্যে কোন চেষ্টা করিনি—হঠাৎ মিঃ ক্র্যাস্টোর টেলিফোন এল এবং ৮।১০ দিনের মধ্যে একজনের সঙ্গে আলাপ করে ছবি তৈরীর সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হয়ে গেল। তাও আবার তিনি ফিল্ম-জগতের লোক নন, হায়দ্রাবাদের একজন ধনী ব্যবসায়ী, যিনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আমার হাতে কয়েক লক্ষ টাকা তুলে দিলেন।

ভগবানের লীলা সত্যই আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বারবার কালীদার কথা মনে হতে লাগল—"ঘাবড়াবার কিছু নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে।"

প্রোডাকশানের তোড়জোড় শুরু করে দিলাম।

মনটা অন্যদিকে ব্যাপৃত থাকায় কৃষ্ণার সঙ্গে সম্প্রতি এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণাটা অনেকটা লাঘব হলো।

কন্‌ট্রাক্ট সই হবার কয়েকদিন পরেই মিঃ কলকাতাওয়ালা বললেন, কলকাতা গিয়ে বিশ্বভারতীর সঙ্গে গল্পটির চিত্রস্বত্ব পাকা করে আসতে।

আমি কলকাতায় এলাম ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। এসেই গেলাম শান্তি-নিকেতনে। সেখানে তখন পৌষের মেলা হচ্ছে। বহু পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলো। রথীদার (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সঙ্গে দেখা করে 'গিরিবালা'র সবাক চিত্রস্বত্বর কথা বললাম। আসল গল্পটির নাম হলো 'মানভঞ্জন', কিন্তু ছবি মুক্তিলাভ করেছিল 'গিরিবালা' নামে, অবশ্য গুরুদেবের নির্দেশে।

রথীদা আমাকে একটা চিঠি দিলেন কলকাতায় তাঁদের সলিসিটর শ্রীনৃপেন

মিত্রের নামে। কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম এবং কয়েক দিনের মধ্যেই চুক্তিপত্র সই হয়ে গেল।

বন্ধুবর হেম সোম কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—তাকেই আমি সংগীত-পরিচালকরূপে নির্বাচিত করে ফেললাম।

সব কাজ সেরে একদিন গেলাম কালীদার সঙ্গে দেখা করতে।

'গিরিবালা'র কণ্ট্রাক্ট সই করে বেশ মোটামুটি কিছু টাকা অগ্রিম পেয়েছিলাম। কালীদা আমাকে প্রায় ৪০০০৲ টাকার মত পাঠিয়েছিলেন। আমি জানতাম যে, এ-টাকা তাঁর নিজের নয়—নিশ্চয়ই কারু কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পাঠিয়েছেন। অবশ্য তাঁর এমন সব ভক্ত ছিল যাদের কাছে টাকার অঙ্কটা কিছু নয়। যত টাকাই হোক চাইলেই পাওয়া যেত। কিন্তু কালীদা নিজের জন্য কখনও এক পয়সাও চাননি কারু কাছ থেকে।

টাকাটা কালীদাকে ফেরৎ দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম: আপনার পাঠানো টাকা বোম্বায়ে আমাকে যে দুর্দিনের সময় কতখানি সাহায্য করেছে তা বলবার নয়।

তিনি মৃদু হেসে বললেন: এতে ধন্যবাদ দেবার কি আছে মধুবাবু! আপনার তখন টাকার দরকার পড়েছিল, আর আমি ভগবানের দয়ায় তা যোগাড় করে পাঠাতে পেরেছিলাম, তাই পাঠিয়েছিলাম।

আমি বললাম: কিন্তু কালীদা, আপনি জানলেন কি করে যে আমার টাকার খুব দরকার পড়েছিল। আমি তো কলকাতায় কাউকে জানাইনি, অথচ আপনি—

তিনি আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না—বাধা দিয়ে সে-প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন: থাক, থাক, ও-সব কথা ছেড়ে দিন। হাঁা, হেমদা বলছিল যে, আপনি বোম্বায়ের একজন খুব বড় ফাইনান্সিয়ারের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট সই করেছেন। ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এরপর কলকাতায় যে-ক'দিন ছিলাম, প্রায় রোজই কালীদার ওখানে যেতাম। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ-আলোচনা করে খুব ভাল লাগত। মনের দিক থেকে যে শূন্যতা ছিল, তা কালীদার সঙ্গে নানা আলোচনার মাধ্যমে যথেষ্ট সান্ত্বনা লাভ করতাম।

কিন্তু কলকাতায় আমার বেশী দিন থাকা হলো না। কমল দাশগুপ্তকে গানের সিচুয়েশানগুলো মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়ে বম্বে ফিরে গেলাম। মন্মথ রায় আমার সঙ্গে গেল।

নির্বাক 'গিরিবালা'র চিত্র-নাট্য আমার কাছেই ছিল, গুরুদেবের লেখা অনেক সংলাপও তার মধ্যে ছিল। হিন্দী দর্শকের জন্য মন্মথ কিছু কিছু অদল-বদল করল। হিন্দী চিত্রনাট্যও মোটামুটি তৈরী হয়ে গেল। বম্বে টকীজের সঙ্গে ঠিক হলো যে, ওখানেই শুটিং হবে। কয়েকজন বড় বড় শিল্পীর সঙ্গে প্রধান ভূমিকাগুলির জন্য কথাবার্তাও হলো।

ইতিমধ্যে কমল দাশগুপ্ত আমাকে চিঠি দিয়ে জানাল যে, গানের সুরগুলি সব হয়ে গেছে। এরপর আমাকে গিয়ে গানের সুর এবং প্লে-ব্যাক গায়ক-গায়িকাদের অনুমোদন করে দিয়ে আসতে হবে।

কলকাতায় এলাম। প্লে-ব্যাক গাইয়েদের নির্বাচন করতে বেশ কয়েকদিন সময় গেল। এদিকে বম্বে টকীজ থেকে তাগাদা এল—কবে থেকে আমি ওখানে শুটিং শুরু করতে চাই। সে-সময় বম্বেতে সমস্ত স্টুডিওগুলিতেই প্রচুর ছবি হচ্ছে—প্রত্যেকেই দিন-রাত কাজ করছে। শুধু আমার সঙ্গে স্বর্গীয় হিমাংশু রায় ও দেবিকারাণীর সম্বন্ধ অন্যরকম ছিল বলে বম্বে টকীজের ম্যানেজার আমাকে সেই স্টুডিওতে শুটিং করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেজন্য স্বভাবতই তারা শুটিং-এর দিন জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। আমি বম্বে টকীজের ম্যানেজারকে লিখে জানালাম, আমার বম্বে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। বম্বেতে ছবি করতে আমার মন একেবারেই চাইছিল না। এর প্রধান কারণ হলো কৃষ্ণার সঙ্গে বিচ্ছেদ। বম্বের সেই সব অতি পরিচিত জায়গা, সিনেমা, রেস্তরাঁ, জুহুর সমুদ্রসৈকত—যেখানে দিনের পর দিন কৃষ্ণার সঙ্গে আমি গেছি। কত আনন্দময় মুহূর্তই না কাটিয়েছি দুজনে একসঙ্গে! আর এখন সেই সব স্থানগুলির কথা মনে পড়লেই বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে—কৃষ্ণার বিচ্ছেদ আমার মনটাকে এতখানি নিঃস্ব করে দিয়েছিল।

এই সব ভেবে একদিন ঠিক করে ফেললাম যে বম্বেতে থাকা আমার আর চলবে না। অসহ্য হয়ে পড়ছে কৃষ্ণার স্মৃতি। সুতরাং বম্বেতে শুটিং না করে কলকাতায় করব শুটিং। ছোটবেলা থেকে আমি অত্যন্ত অভিমানী এবং ভাবপ্রবণ সুতরাং ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম।

আজ যখন স্থিরমস্তিষ্কে এই সিদ্ধান্তের কথা চিন্তা করি, তখন মনে হয় জীবনে বোধহয় এতবড় ভুল আর করিনি। আর এই ভুলের জন্যে সাংঘাতিক মাশুলও দিতে হয়েছিল।

কলকাতায় 'গিরিবালা'র (হিন্দী) গানগুলি গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করালাম। কমল দাশগুপ্তর সুর এবং গ্রামোফোন কোম্পানীর অর্কেষ্ট্রা। 'জবাব'-এর অভাবনীয় সাফল্যের দরুন সঙ্গীত-পরিচালকদের মধ্যে কমল দাশগুপ্তের স্থান তখন সবার উপরে। আর সত্যি কথা বলতে কি 'গিরিবালা'র গানগুলির সুরও কমল অপূর্ব দিয়েছিল। প্রথমেই গান রেকর্ড করার আরও একটা কারণ ছিল—প্রোডিউসারকে সুরগুলো শোনাতে হবে বোম্বেতে গিয়ে, কারণ তিনি তো কলকাতায় আসছেন না। যাই হোক, রেকর্ডগুলির নমুনা নিয়ে বম্বে চলে এলাম।

বম্বেতে আমার বন্ধুরা এবং হিতৈষীরা যখন একথা শুনল যে, আমি 'গিরিবালা' (হিন্দী) ছবির শুটিং কলকাতায় করব, তখন সকলেই একবাক্যে আমাকে নিষেধ করল। এমন কি রঞ্জিৎ মুভিটোনের শ্রীচণ্ডুলাল শাহের সঙ্গে দেখা হতে তিনিও আমাকে একদিন বললেন: এটা কি করছেন মিঃ বোস? হিন্দী ছবির শুটিং করতে যাচ্ছেন কলকাতায়? মিসেস বোসও এই ভুল করলেন। তিনি লাইসেন্স পেলেন— আমি তাঁকে বললাম বোম্বাইতে ছবি করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও চলে গেলেন কলকাতায় হিন্দী ছবি 'অজন্তা' করতে। আবার আপনিও সেই ভুল করতে যাচ্ছেন! সেখানে ভাল হিন্দী বলার শিল্পী পাবেন কোথায়? আর দেখতেই তো পাচ্ছেন এখন 'স্টারে'র যুগ—জানি না আপনাদের বাংলাদেশে এরকম 'স্টার প্রথা' চালু হয়েছে কিনা! কিন্তু হিন্দী ছবিতে দু'এক জন 'স্টার' না থাকলে ডিষ্ট্রিবিউটার পাওয়াই শক্ত। আর বড় 'স্টার'দের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—ছোট ছোট 'স্টার'দেরও আপনি এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে শুটিং করাতে পারবেন না—কারণ তারা এখন এত ব্যস্ত যেসকলেই একসঙ্গে তিন-চারখানা ছবিতে অভিনয় করছে। আমার কথা শুনুন—আপনি মস্ত ভুল করতে যাচ্ছেন। ভাল ফাইনান্সিয়ার পেয়েছেন, বম্বেতেই ছবি করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে, এবং আপনার ছবিও ভাল হবে।

বম্বে টকীজের ম্যানেজারও আমায় ঠিক একই কথা বললেন: আপনি যখন স্থির করেই ফেলেছেন যে কলকাতাতেই শুটিং করবেন, তখন আর আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, কাজটা ভাল হবে না মিঃ বোস। আপনি খুব ভুল করছেন। আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শুধু স্টুডিও ম্যানেজার ও প্রোডিউসারের নয়। আপনি তো জানেন মিঃ হিমাংশু রায়কে আমি কি রকম শ্রদ্ধা করতাম। আপনার সঙ্গে মিঃ রায়ের কি সম্বন্ধ ছিল, তিনি আপনাকে কত ভালবাসতেন তাও আমি জানি। আপনাকে আমিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি—আপনার

খাতিরে আমি এখন পর্যন্ত শুটিং-এর তারিখ খালি রেখেছি মে মাস থেকে—মাসে সাত দিন করে। এই তারিখগুলি পাবার জন্যে ৫।৬ জন প্রোডিউসার উদ্গ্রীব হয়ে আছে। এই তারিখগুলি বাতিল করলে এবছর আর বম্বে টকীজ স্টুডিওতে 'ডেট' পাওয়াই সম্ভব হবে না। আমার মনে হয় অন্য কোন স্টুডিওতেই শুটিং-এর তারিখ পাবেন না। যাক, ভাল করে ভেবে-চিন্তে কাল আমায় জানিয়ে দেবেন শেষ পর্যন্ত কি স্থির করলেন।

আমি তো মনে মনে স্থির করেই ফেলেছি যে বম্বেতে শুটিং করব না—কলকাতাতেই করব। সুতরাং পরদিন আমি বম্বে টকীজের ম্যানেজারকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলাম আমার যে সমস্ত 'ডেট'গুলি নেওয়া ছিল তা বাতিল করে দিতে।

মিঃ ক্র্যাস্টো, যিনি এই প্রোডিউসারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি বললেন যে, চিঠি লিখে মিঃ কলকাতাওয়ালাকে সব বলার চেয়ে হায়দ্রাবাদ গিয়ে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি এ বিষয়ে আলোচনা হওয়াই ভালো। যতই হোক, তিনিই তো প্রোডিউসার—আপনি কোথায় ছবি করবেন এ বিষয়ে তাঁর কথাই হবে শেষ কথা। সেই সঙ্গে গানগুলির রেকর্ড তো আপনি সঙ্গেই এনেছেন—সেগুলোও শুনিয়ে দেবেন।

ক্র্যাস্টোর কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ। গেলাম হায়দ্রাবাদে।

মিঃ কলকাতাওয়ালা আমাকে গেস্টহাউসে রেখে খুব খাতির করলেন। অতি সুস্বাদু মোগলাই খানার সঙ্গে বহুমূল্য পানীয় আমার জন্য নিয়মিত বরাদ্দ ছিল।

প্রথমে ঠিক করলাম তাঁকে আগে গানের রেকর্ডগুলো শোনাব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গানগুলো তাঁর ভালো লাগবেই, কারণ গুরুদেবের কয়েকটি গানের মূল ভাবধারা দিয়ে গানগুলি লেখা হয়েছিল, আর তাছাড়া কমল সুরও দিয়েছিল অপূর্ব। গানগুলো ভাল লাগার পর কলকাতায় শুটিং-এর কথাটা প'ড়ব বলে ঠিক করলাম।

আমার অনুমান ঠিকই হলো। গানগুলো শুনে তাঁর এত ভালো লেগে গেল যে যখন আমি কলকাতায় শুটিং করার কথা বললাম, তখন তিনি প্রতিবাদ অবশ্য করলেন, কিন্তু যতটা প্রবল প্রতিবাদ আশা করেছিলাম ততটা নয়। বম্বেতে চণ্ডুলাল শাহ, জে. বি. এইচ ওয়াদিয়া এবং অন্যান্যরা যা বলেছিলেন তিনিও সেই কথারই প্রতিধ্বনি করলেন। তিনি আরও বললেন: এত জোরালো গল্প, গানগুলির সুর এমন সুন্দর হয়েছে—ভাল শিল্পী-সমাবেশ হলে ছবি নিশ্চয়ই 'হিট' করবে। ভাল

করে ভেবে দেখে শুনে ঠিক করুন। হাজার হোক, আপনি পরিচালক—আপনার সিদ্ধান্ত আমি সব সময় সমর্থন করব।

আমি তখন বললাম: আমি একরকম স্থির করেই ফেলেছি মিঃ কলকাতা-ওয়ালা যে আমি কলকাতাতেই শুটিং করব। আমার পক্ষে এখন বোম্বায়ের 'স্টার'দের নিয়ে শুটিং করা সম্ভব হবে না। প্রথমতঃ তাদের টাকাও দিতে হবে প্রচুর, তার ওপর আমার কাজের সময় সকলকে ঠিকমত পাওয়া যাবে না। এরকম ভাবে কাজ করতে আমি অভ্যস্ত নই। আমি বহু নতুন শিল্পীকে সুযোগ দিয়ে 'স্টার' করেছি, সে আত্মবিশ্বাস আমার আছে—এবিষয়ে আপনি সম্পূর্ণভাবে আমার ওপর ভরসা করতে পারেন।

এরপর মিঃ কলকাতাওয়ালা আর কিছু বললেন না—শুধু বললেন: আপনার ওপর নির্ভর করতে আমি সব সময় প্রস্তুত মিঃ বোস। যাই হোক, শুটিং-এর সময় কলকাতা যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না—তবে আমি আমার এক বিশ্বস্ত সেক্রেটারী হাজি সাহেবকে পাঠিয়ে দেব। সেই আপনাদের সব টাকাকড়ি দেবে ওখানে।

এই বলে তিনি হাজি সাহেবকে ডেকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। চমৎকার লোক এই হাজি সাহেব। তিনি 'হজ্ব'তীর্থে গিয়েছিলেন বলেই তাঁকে হাজি সাহেব বলা হতো।

মিঃ কলকাতাওয়ালার কাছ থেকে এত সহজে সমর্থন পাব তা আশা করিনি। যাই হোক, মনটা খুবই প্রফুল্ল হয়ে উঠল। এরপর হায়দ্রাবাদে যে কয়দিন ছিলাম খুব আনন্দেই কেটেছিল। একদিন সেকেন্দ্রাবাদ গেলাম, সেখানে যেতেই টিপু সুলতানের স্মৃতি মনে ভেসে উঠল।

হায়দ্রাবাদ থেকে বম্বে ফিরে কলকাতা আসবার তোড়জোড় করতে লাগলাম। আবার সেই সমস্ত জিনিসপত্র পাঠানোর হাঙ্গামা। যাবতীয় আসবাব, গাড়ীটা—সবই পাঠাবার বন্দোবস্ত করলাম।

কলকাতায় এলাম—সমস্ত আসবাবপত্র উঠিয়ে নিয়ে। এসে উঠলাম গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। তখনকার দিনে হোটেলের খুব কম ঘরেই টেলিফোন যোগাযোগ ছিল, একমাত্র বিশেষ কয়েকটি 'সুইট' ছাড়া। দেখে শুনে আমি সেইরকম একটা 'সুইট' নিলাম।

আর্টিস্টদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে হবে, তাদের রিহার্সাল আছে—টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করতে হবে ইত্যাদি। হোটেলের দক্ষিণদিকে ঢাকা বারান্দা ছিল, সেইটাকেই আমি আমার অফিসে রূপান্তরিত করলাম। রিহার্সালও সেইখানেই হতো।

শুটিং-এর জোগাড়যন্ত্র চলতে লাগল। রাধা ফিল্ম স্টুডিও ঠিক করলাম শুটিং-এর জন্য। শিল্পীদের মধ্যে ঠিক হলো নায়করূপে ধীরাজ ভট্টাচার্য। বম্বে থেকে একটি শিল্পীকে ঠিক করেছিলাম, ভাগ্যক্রমে তার নামও কৃষ্ণা! নায়িকার মা-র ভূমিকায় তাকে নির্বাচন করেছিলাম। আর তার মেয়েকেই নায়িকারূপে নির্বাচন করেছিলাম। বয়স তার খুব কম, বড় জোর আঠারো বছর, কিন্তু তার মুখখানি ছিল ভারী মিষ্টি এবং সরলতা মাখানো। 'গিরিবালা'র ভূমিকায় এইরকমই একটি মেয়ে খুঁজছিলাম—তার 'নামকরণ' করলাম ইন্দ্রাণী। অহীনবাবুকে দিলাম নায়িকার পিতার ভূমিকা। মূল কাহিনীতে এই চরিত্রটি ছিল না, কিন্তু মন্মথ অহীনবাবুর উপযোগী করে এই চরিত্রটি তৈরী করেছিল। ক্রমে ক্রমে সব ভূমিকাই নির্বাচিত হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে রিহার্সালও মোটামুটি শেষ হলো। মে মাসের শেষদিকে রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে বেশ সুষ্ঠুভাবে শুটিং আরম্ভ হলো।

আমার হোটেলে তখন আবার পুরাতন বন্ধুদের আনাগোনায়, মজলিশ সরগরম হয়ে উঠল। সেই জজি, জ্ঞানাঙ্কুর, হেম সোম এবং আরও কয়েকজনের সান্নিধ্যে ও আন্তরিকতাময় পরিবেশে আমি আমার সেই মনমরা ভাবটা খুব শীগ্‌গীরই কাটিয়ে উঠলাম। কৃষ্ণার সঙ্গে বিচ্ছেদের দরুণ মনের মধ্যে যে অশান্তি ভোগ করছিলাম এতদিন—এইসব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে এসে আবার ধীরে ধীরে মনের শান্তি ফিরে পেতে লাগলাম।

আগেই বলেছি যে, সাধনাও ভারত সরকারের কাছ থেকে সংস্কৃতিমূলক একটি ছবি করার জন্য লাইসেন্স পেয়েছিল। ছবিখানির নাম "অজন্তা"। বোম্বায়ে থাকতেই আমি শুনেছিলাম যে ১৯৪৬ স্যালের প্রথম দিকে এই ছবিখানির নির্মাণের উদ্দেশ্যে সাধনা কলকাতায় চলে এসেছে।

কলকাতায় আমি যখন "গিরিবালা" (হিন্দি) তুলতে এলাম, তখন সে কলকাতায় মার সঙ্গে গড়িয়াহাটের বাড়িতে থাকে। আমার সঙ্গে অবশ্য দেখাশোনা হতো না। এপ্রিলের শেষদিকে রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে "গিরিবালা"র শুটিং শুরু হলো। মে মাসের মাঝামাঝি একদিন মিসেস মিত্র (ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের স্ত্রী ও জজির মা) আমায় ফোন করে জানালেন যে সাধনা তাঁর বাড়ীতে চলে এসেছে এবং

সেইখানেই সে থাকতে চায়, কারণ তার ছোট বোন নীলিনার অসুস্থতার জন্য তার মাকে সিমলা চলে যেতে হয়েছে। মাস তিনেক আগে সাধনাও নিউমোনিয়াতে ভুগেছিল বেশ কিছুদিন। সে অসুখের দরুণ এখনও তার শরীরটা পুরোপুরি সারেনি।

আমি তাকে এ অবস্থায় এখানে না রেখে সিমলাতেই পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করলাম। মিসেস মিত্র এবং জজিও আমার এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন। নীলিনা, কাপুরথালার মহারাজার ভাই রাজা চরণজিৎ সিংহের একমাত্র পুত্র রিপজিৎ সিংকে বিবাহ করেছিল। সাধনার মা ছিলেন এইখানে তাঁর মেয়ের কাছে। কিন্তু সাধনা তার বোনের শ্বশুরবাড়ীতে থাকতে রাজী হলো না। আমি তখন কস্টোফিন হোটেলে একটা ঘর তার জন্যে 'বুক' করলাম। তখন সিমলায় বহিরাগতদের দারুণ ভীড়, কোন হোটেলেই স্থান নেই। কিন্তু কস্টোফিন হোটেলের মালিক মিঃ ওবেরয় খুব দয়াপরবশ হয়ে তাঁর নিজের অতিথি অভ্যাগতদের জন্য রাখা একটি ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হোটেল তো বন্দোবস্ত হলো—এখন সমস্যা দাঁড়াল সাধনার সঙ্গে কে যাবে? আমার তখন "গিরিবালা"র শুটিং চলেছে পুরোদমে; সুতরাং আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। এই সময় আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে থেকেই কে একজন এক মহিলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিলেন যিনি সাধনার সঙ্গে যেতে পারেন। তিনি আবার একলা যেতে রাজী নন, তাঁর স্বামীও সঙ্গে গেলেন। এদের সঙ্গে আমি চামানের ছোটভাই আসগরকেও সঙ্গে দিলাম। যদিও হোটেলে আছি তার ওপর একা—কিন্তু চামান, আসগর এবং আমার পুরনো বাবুর্চি সকলেই আছে। অনেক বছর আমার কাছে কাজ করছে—সুতরাং কাজ না থাকলেও এদের ছাড়াতে আমার মন চাইল না।

"গিরিবালা"র শুটিং বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলছিল। জুলাই মাসে সাধনা তার মার সঙ্গে ফিরে এল কলকাতায়। আমি আশা করেছিলাম যে আমি যখন গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে আছি সাধনা সেইখানেই উঠবে অথবা তার মার বাড়ীতে। কিন্তু তারা এসে উঠল গ্র্যাণ্ড হোটেলে।

সেই সময় কালীদা এসে মাঝে মাঝে আমার হোটেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন, কত গল্প করতেন। কত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হতো। কলকাতায় আসার পর এই প্রথম তিনি আমার হোটেলে আসতে শুরু করলেন। প্রথমে এক

কারণ কিছু বুঝতে পারিনি, কারণটা বুঝলাম কিছুদিন পরেই যখন আমার জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় সময় এল।

এল সেই ঐতিহাসিক আগস্ট ১৯৪৬—শুরু হয়ে গেল ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তক্ষরা সংগ্রাম। রাস্তায় বেরুনো যায় না—কলকাতা শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত—ঠিক এই সময় সাধনা আবার সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। 'কল' দিলাম কর্নেল ডেনহাম হোয়াইটকে। তিনি কিছুদিন চিকিৎসা করার পর বললেন : মিঃ বোস, এই রোগীকে গ্র্যাণ্ডে না রেখে এখুনিই পি. জি. হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মিসেস বোসের যা অবস্থা তাতে সব সময় ডাক্তার এবং নার্সের দেখাশোনা করা দরকার। হাসপাতালের মত ঘড়ি ধরে নার্সিং বাড়ীতে সম্ভব নয়।

সাধনা কিছুতেই পি. জি. হাসপাতালে যেতে চায় না—শেষে অনেক কষ্টে তাকে রাজী করালাম। পি. জি'র তখন সর্বেসর্বা ছিলেন মেজর অ্যালিন্‌সন। তিনি এবং কঃ ডেনহাম হোয়াইট সাধনার জন্যে যা করেছিলেন তা আশাতীত, এজন্যে চিরদিন আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। কর্নেল এণ্ডারসন এবং ডাঃ মণি দে'ও দুতিন দিন এসেছিলেন, কঃ ডেনহাম হোয়াইটের সঙ্গে কনসাল্টেশানের জন্যে।

সে ঐতিহাসিক আগস্ট দাঙ্গায় ভারতবর্ষের চেহারা বদলে গেল—ভারতের মানচিত্রের পরিবর্তন হল—হাজার হাজার নরনারী তাদের জীবন বিসর্জন দিল—ছিন্নমূল নরনারী ও শিশুর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠতে লাগল। সকলেই তখন নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। চারিদিকে শুধু ভয় আর অবিশ্বাস—মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে চায় না। সে এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতি।

'গিরিবালা'র শুটিং বন্ধ হয়ে গেল। ছবির নায়িকা ও তার মা এত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে তারা কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বোম্বায়ে চলে গেল।

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে আমার সমস্ত আসবাবপত্রের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ওয়েলেসলী স্ট্রীটে একটা ফার্নিচারের দোকানে আমি আমার সমস্ত বাড়তি ফার্নিচার রেখেছিলাম। একদিন খবর পেলাম যে সে দোকানটি দুর্বৃত্তের দল পুড়িয়ে দিয়েছে এবং বাকীটা লুটপাট করেছে। তখন কলকাতার এমন অবস্থা যে দিনের বেলাতেও ওয়েলেসলীর দিকে যাওয়া অসম্ভব—এমন কি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনেই কয়েকটা ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটতে দেখা গেল।

কিন্তু প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে পি. জি.-তে যেতেই হতো। কারণ রাত্রের নার্সকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া এবং দিনের নার্সকে বাড়ীতে পৌঁছে

দিতে হতো। নইলে তারা কেউ আসতে চায় না। এদিকে আমার গাড়ীর ড্রাইভারও আসে না। অগত্যা বাধ্য হয়ে আমাকে নিজেকেই গাড়ী 'ড্রাইভ' করতে হতো। এই সময় গাড়ীতে আমার সঙ্গে থাকত চামান—কখনও বা তার ভাই আসগর।

এইভাবে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস কাটল।

তারপর অক্টোবর মাসে এল খানিকটা সাময়িক বিরতি। কিছুটা শান্ত ভাব দেখা দিল চারিদিকে।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর—এই তিনটে মাস যে আমার কি সাংঘাতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে কাটল তা জানেন একমাত্র ভগবান। সাধনার অসুখে জীবন-মরণ নিয়ে টানাটানি, 'গিরিবালা'র শুটিং বন্ধ—ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। কোনোদিকেই কোনো আলোর ইঙ্গিত নেই।

আমার জীবনে বরাবরই দেখেছি—When afflictions come they come in battalions. অর্থাৎ বিপদ যখন আসে তখন দল বেঁধে আসে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখেছি আবার কার যেন অদৃশ্য হস্ত আমাকে এই বিপদ-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে দেয়। বিপদের মেঘ কেটে যায়!

এ বারও তাই হলো আবার। অক্টোবরের শেষে সাধনা একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠল। ভগবানের অনেক দয়া যে সে সময় আমার হাতে টাকা ছিল—তাই ভালভাবে সাধনার চিকিৎসা করাতে পেরেছিলাম। 'গিরিবালা'র শুটিংও শুরু হলো—দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতায় আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হলো।

'গিরিবালা'র শুটিং ধীরে ধীরে এগোতে লাগল, নায়িকা ইন্দ্রাণী বম্বে থেকে ফিরে এসে যথারীতি শুটিং করতে লাগল।

এদিকে সাধনাও ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। ডিসেম্বর মাসে ডাক্তাররা বললেন: এইবার রোগিণীকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। তবে এখন বেশ কিছুদিন এঁকে সাবধানে থাকতে হবে। খাওয়া-দাওয়া এবং নার্সিং-এর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। কোনরকম এদিক-ওদিক হলে চলবে না।

ডিসেম্বর মাসে সাধনাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে গ্রেট ইস্টানেই তুললাম। প্রায় পাঁচ মাস একনাগাড়ে বিছানায় শুয়ে থেকে তার তখন এমন অবস্থা যে সামান্য চলাফেরা করবারও শক্তি নেই। মনে আছে মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে ময়দানে ইডেন গার্ডেনে যেতাম—সেখানে ওকে ধরে ধরে চলাফেরা করাতাম। ক্রমে ক্রমে সে গায়ে জোর পেল এবং ভগবানের দয়ায় সে নবজীবন লাভ করে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল।

এদিকে ডিসেম্বর মাসে 'গিরিবালা'র শুটিং শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ছবি একবার

বন্ধ হলে আর কি তেমন সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়! অনেক রকম বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে শেষ করতে হয়েছিল। যদিও কলকাতায় দাঙ্গার সে-রকম বীভৎসতা কমে এসেছিল কিন্তু উত্তেজনা এবং ভয় তখনও লোকের মনে বেশ ভালভাবেই ছিল। এক সম্প্রদায়ের লোক আর এক সম্প্রদায়ের এলাকায় যেতে রীতিমত ভয় করত। এইজন্যে আমার ইউনিটের কয়েকজন লোককে অদল-বদল করতে হয়েছিল নিতান্ত নিরুপায় হয়েই। তাতে খানিকটা কাজের অসুবিধা হয়েছিল।

নায়িকা ইন্দ্রাণী ও তার মা তাদের কাজ শেষ করে দিল্লীতে অর্থাৎ তাদের দেশে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সেইজন্য তারা কাজে আশানুরূপ মনঃসংযোগ করতে পারেনি। আর আমি যতটা আশা করেছিলাম ততটা ভাল কাজও তার কাছ থেকে পাইনি। যাই হোক, ছবি শেষ করে তারা ডিসেম্বরের শেষ নাগাৎ দিল্লী চলে গেল আর আমিও গিরিবালার সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

সেই সময় হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ নলিনীরঞ্জন সরকার গ্রেট ইস্টার্নে লাঞ্চ খেতে এলেই প্রায়ই আমাদের সুইটে আসতেন। অনেক দিন থেকেই সাধনাদের পরিবারের সঙ্গে নলিনীবাবুর ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় ছিল। ২।১ দিন আমরাও তাঁকে আমাদের সুইটে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

তিনি প্রায়ই কথায় কথায় বলতেন: কেন যে তোমরা এত খরচ করে হোটেলে পড়ে আছ এর কোনো মানেই হয় না। হোটেলে আছ অথচ নিজেদের চাকর-বাবুর্চি দিয়ে রান্না করছ, খাচ্ছ। আর হোটেলের পুরো বিল দিচ্ছ—এ ধরনের হোটেলে থাকার কোনো যুক্তিই নেই।

আমি বললাম: হোটেলের খাওয়া খেয়ে খেয়ে পাগল হয়ে যাবার যোগাড়। এদের রান্না আর ভাল লাগে না। তাছাড়া আমরা দুজনেই বাংলা রান্না খেতেই বেশী ভালবাসি।

তিনি বললেন: বেশ তো, বাংলা রান্না ভালবাস তো একটা ফ্ল্যাট নাও না——সেখানে অনেক কম খরচে নিজের মনের মত অনেক ভাল খাবার খেতে পারবে।

আমি বললাম: আগে ষ্টিফেন কোর্টে আমি যে ফ্ল্যাটটায় ছিলাম, তার ভাড়া দিতাম ৩৫০ টাকা। কিন্তু যখন বম্বে থেকে ফিরে এলাম, তখন দেখলাম সে-ফ্ল্যাটটায় ভাড়াও যেমন বেড়েছে তেমনি যে ভদ্রলোক এখন সেখানে রয়েছেন তাঁকে সেলামীও দিতে হয়েছে প্রচুর টাকা। অত টাকা সেলামী দেবার ক্ষমতা

আমার নেই, আর যদিও ক্ষমতা থাকতো, আমি on principle দিতাম না। সেইজন্যেই বাধ্য হয়ে হোটেলে আছি।

এই কথা শুনে নলিনীবাবু বললেন: আচ্ছা আমি একটা প্রস্তাব করছি। নিউ আলিপুরে হিন্দুস্থান ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট-এর তরফ থেকে অনেকখানি জমি আমরা নিয়েছি। আমি সেখানে খানিকটা জমি নিয়ে তোমাদের জন্যে একটা বাড়ী তৈরি করে দিচ্ছি। আমার মনে হয় খানপাঁচেক ঘর হলেই তোমাদের যথেষ্ট। নীচে খাবার-ঘর, বসবার-ঘর, অফিস ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, আর ওপরে দুখানা শোবার ঘর থাকবে।

আমি বললাম: বাড়ী করতে যে বলছেন, সে কি আর আমাদের দ্বারা সম্ভব? আমি তো বরাবরই দিন আনি, দিন খাই। আমার সঞ্চয় কোথায় যে জমি কিনব, বাড়ী করব?

বাধা দিয়ে তিনি বললেন: তা আমি জানি। আমার প্রস্তাবটা আগে ভাল করে শোনই না। জমি কিনে বাড়ী করে দেবে হিন্দুস্থান—তোমাদের প্ল্যান অনুযায়ী। তোমার দিক থেকে হোটেলে যে-টাকাটা মাসে মাসে দিচ্ছ সেইটাই দিও।

এ-কথায় আমি বললাম: আজ আমি একটা ভাল কণ্ট্রাক্ট পেয়েছি, ভাল টাকাও পেয়েছি, তাই হোটেলে এতবড় একটা স্থুইট নিয়ে রয়েছি। কিন্তু জানেন তো আমার বাঁধাধরা একটা রোজগার নেই যার ওপর ভরসা করে আপনাকে বলতে পারি যে, মাসে মাসে আপনাকে এই টাকা আমি দিতে পারি। ধরুন, এখন হাতে যে-টাকা আছে তা ফুরিয়ে গেল, এবং পরবর্তী কণ্ট্রাক্ট হতেও বেশ কিছু দেরী হলো। এ-অবস্থায় তো মাসে মাসে চুক্তি অনুযায়ী টাকা দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না।

তিনি হেসে বললেন: বেশ তো, তোমাদের জন্যে আমি একটা special clause করব, যখন যেমন পারবে, তখন তেমন দেবে। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। আর এজন্যে কোন অতিরিক্ত সুদ বা টাকা দিতে হবে না।

আমি বললাম: বেশ, আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন। এরপর যখন দেখা হবে তখন আপনাকে বলব।

কলকাতায় চৌরঙ্গী প্লেসে যখন ছিলাম, তখন থেকে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে একেবারে শহরের মাঝখানে থাকা। বম্বেতে যখন ছিলাম, তখন সব থেকে অভিজাত পল্লী 'মেরিন ড্রাইভ'-এ ছিলাম। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে আবার

রইলাম ষ্টিফেন কোর্টে। তখনকার আলিপুরের সঙ্গে এখনকার আলিপুরের অনেক তফাৎ। তখন আলিপুরে এমন বসতি গড়ে ওঠেনি—চারিদিকে ধূ-ধূ করছে মাঠ। তেমন লোকজন বাড়ী-ঘর কিছুই নেই। সুতরাং ওই তেপান্তরের মাঠে গিয়ে থাকতে একেবারেই মন চাইল না। এ একেবারে শহরের বাইরে, আত্মীয়স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের থেকে দূরে। কাছাকাছি কোন ক্লাবও নেই যে দু'দণ্ড গিয়ে সময় কাটাব।

সুতরাং এরপর যখন নলিনীবাবু আমাদের 'সুইটে' এলেন, তখন তাঁকে বললাম : আপনি আমাদের যে-সুযোগ ও সুবিধা দেবেন বলেছেন, এর জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ, হয়ত এরকম সুযোগ-সুবিধা জীবনে আর কোনদিনই পাব না। কিন্তু আমরা ভেবে দেখলাম যে, একেবারে শহর থেকে দূরে সেই 'ধারধাড়া গোবিন্দপুরে' গিয়ে থাকাটা আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে। আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে ওইরকম পরিবেশে। আমাদের যারা খুব অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাদের অনেকেরই গাড়ী নেই। ফলে এদের সঙ্গে যোগাযোগটাও কমে যাবে। তাছাড়া আমাদের ইচ্ছে আছে, আবার আমাদের সেই মঞ্চ-প্রতিষ্ঠান সি. এ. পি'কে জাগিয়ে তুলে স্টেজ-শো করব। 'আলিবাবা'র মত সি. এ. পি.-র শিল্পীদের দিয়ে আর একখানি ফিল্ম করবার ইচ্ছা আছে। অত দূরে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সংস্রব থেকে বিচ্যুত হয়ে এ-সব কাজ সম্ভব হবে না মিঃ সরকার।

নলিনীবাবু আর কিছু বললেন না, শুধু একটু হাসলেন মাত্র। যাবার সময় বলে গেলেন : আজ তুমি বলছ সম্ভব হবে না। শহর থেকে অতদূর—ধারধাড়া গোবিন্দপুর ইত্যাদি, কিন্তু এই আলিপুরই একদিন এমন আকার নেবে যে, তখন মাথা খুঁড়লেও এক কাঠা জমিও পাওয়া যাবে না। খুব ভুল করলে তোমরা। এখনও আমার কথা শোন—তোমরা যে-ধরনের কাজ কর অর্থাৎ তোমাদের যা পেশা, তাতে যদি একখানা বাড়ী থাকে মাথা গোঁজবার তাহলে ভবিষ্যতে অনেক ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

আজ জীবন-সায়াহ্নে এসে মর্মে মর্মে নলিনীবাবুর সেই কথাগুলি উপলব্ধি করছি।

'গিরিবালা'র সম্পাদনা ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী নাগাৎ শেষ হলো। আমি একটি ছবির সম্পূর্ণ প্রিন্ট নিয়ে বম্বে গেলাম আমার প্রোডিউসারকে দেখাবার জন্যে। আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে, 'গিরিবালার' প্রধান আকর্ষণ ছিল সঙ্গীত এবং গানগুলি। কলকাতায় দাঙ্গার জন্য শুটিং-এর সময় বাধা না পড়লে ছবি আরো অনেক ভাল হতে পারত।

যাই হোক, ছবি দেখে প্রোডিউসারের মোটামুটি ভালই লাগল। এবং বোম্বায়ের রয়্যাল অপেরা হাউসে রিলিজের ব্যবস্থা হতে লাগল।

এল এপ্রিল মাস। 'গিরিবালা'র দরুণ যা টাকা-কড়ি পেয়েছিলাম তা ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে আসতে লাগল। এই সময় আমি একটা ফ্ল্যাটের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। বরাতগুণে বিনা সেলামীতে এবং স্থানকাল বিবেচনা করে মোটামুটি ন্যায্যমূল্যে পেয়েও গেলাম একটা। আমাদের বিশেষ বন্ধু, কলকাতার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ এল. আর. প্যাটেল সপরিবারে ইংলণ্ড যাচ্ছিলেন বেড়াতে। সেই সময় ৩নং থিয়েটার রোডে তাঁর সুসজ্জিত ফ্ল্যাটটি আমায় দিয়ে গেলেন মাসিক মাত্র ৫০০ টাকা ভাড়ায়। ফ্ল্যাটটি বেশ বড়, তিনখানা শোবার ঘর, খাবার ঘর, বসবার ঘর, দক্ষিণে খোলা বারান্দা ইত্যাদি। মিঃ প্যাটেলের ভাড়া দেবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু যেহেতু তিনি বেশ কিছুদিনের জন্য বিলেত যাচ্ছেন, আর আমি একটা ফ্ল্যাট খুঁজছি—এটা তিনি জানতে পেরে আমাকেই সেটা দিয়ে যান।

এই ফ্ল্যাটের নীচে থাকতেন মিঃ সুশীল দে, আই-সি-এস। সুশীলের কথা আমি আগেই বলেছি—১৯৩৮ সালে যখন সি. এ. পি. সম্প্রদায়কে নিয়ে ঢাকা সফর করতে যাই সে সময় সুশীল ছিল ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছিল।

যাই হোক, মে মাসে আমরা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের পাট তুলে দিয়ে ৩নং থিয়েটার রোডে মিঃ প্যাটেলের ফ্ল্যাটে উঠে এলাম।

কিছু দিনের মধ্যেই সাধনা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। সুস্থ হয়েই সে ধরে বসল যে, সে এভাবে চুপচাপ বসে না থেকে একটা 'শো' করতে চায়। তখন তার একলা চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে কোন কাজের ভেতর লিপ্ত থাকাটা আমিও অনেক বাঞ্ছনীয় মনে করে বন্ধু'র হরেন ঘোষকে ডাকলাম। হরেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক হলো যে, হরেন সাধনার 'শো'র বন্দোবস্ত করে দেবে—ইতিমধ্যে কিছু দিন রিহার্সাল হোক। রিহার্সাল সম্পূর্ণ হলে হরেন হাউস-এর বন্দোবস্ত করবে।

শিল্পীদের এবং বাদ্যযন্ত্রীদের খবর দেওয়া হলো। পুরোদমে রিহার্সাল শুরু হলো ঐ থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটেই। কিন্তু কয়েক দিন রিহার্সাল চলবার পর দেখা গেল সাধনার মতিগতি আবার সেই পুরনো ধারায় ফিরে গেছে। আবার সে নিজের খেয়াল-খুশি মত স্বাধীন জীবন যাপন করবার চেষ্টা করল। আমি তাকে নিষেধ করলেও সে শুনত না, ফলে তার সঙ্গে আমার খিটিমিটি লেগেই থাকত।

এদিকে রিহার্সালও ঠিক মত হতো না—শিল্পী এবং বাদ্যযন্ত্রীরা এসে এসে ফিরে

যেত। এই নিয়েই আমার সঙ্গে শুরু হলো মনোমালিন্য। সাধনার ধারণা জন্মেছিল যে, স্বাধীনভাবে থাকলে সে অনেক ভাল কাজ করতে পারবে। আর তার এই ধারণাকে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল তার স্তাবকেরা। যতদিন সাধনা অসুস্থ ছিল ততদিন এই স্তাবকের দল তার কাছে একেবারেই ঘেঁষে নি—এখন সে সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব স্তাবকদের ভিড় আবার বাড়তে লাগল।

একদিন ব্যাপারটা চরমে উঠল।

টুকলু তখন আমাদের সঙ্গে থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটেই থাকত। ওখানে তখন থাকবার জায়গা ছিল যথেষ্ট, সুতরাং টুকলুর থাকার কোন অসুবিধাই ছিল না।

সাধনা সেদিন আগেই লাঞ্চ খেয়ে নিয়েছে। আমি আর টুকলু বসে লাঞ্চ খাচ্ছি। এমন সময় দেখলাম যে, সাধনা তার হ্যাণ্ড ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার এই যাওয়ার ব্যাপারে আমাকে সে আগে ঘুণাক্ষরেও জানায় নি। আমি তখন টুকলুকে বললাম : দেখ তো টুকলু সাধনা কোথায় যাচ্ছে?

টুকলু বেরিয়ে এসে দেখে সাধনা ইতিমধ্যে ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠতে যাচ্ছে। টুকলু তাকে বাধা দিতে গেলে সাধনা বেশ রেগে গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল এবং অপমানও করল। এই চেঁচামেচিতে রাস্তায় বেশ ভিড় জমে গেল। টুকলু আর কিছু না বলে ফিরে এসে আমাকে সব ব্যাপারটা বলল। সাধনা চলে গেল।

এটা হলো ১৯৪৭ সালের জুন-জুলাই মাসে। দাঙ্গার উত্তেজনা তখনও বেশ রয়েছে, কলকাতার লোকের জীবনযাত্রা তখনও স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে নি।

যাই হোক, সাধনা চলে গেল—কিন্তু গেল কোথায়? হাতে তো বিশেষ তার টাকা-কড়িও ছিল না। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জানা-শোনা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, আত্মীয়স্বজনদের কাছে ফোন করে খবর নিতে লাগলাম। সমস্ত বড় বড় হোটেলগুলোয় খবর নিতে লাগলাম, কিন্তু কোথাও তার কোন খবরই পেলাম না; শেষে রেলওয়ে স্টেশন, পুলিশ, হাসপাতাল সব জায়গাতেই খোঁজ করতে লাগলাম—কিন্তু কোথাও তার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। এ সময় জ্ঞানাঙ্কুর আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেল, রাত্রি গভীর হয়ে এল—তার কোন হদিশই পেলাম না। মানুষটা কি উধাও হয়ে গেল? একটা দারুণ নিরাশায় মন ও মেজাজ দুই-ই ভেঙ্গে পড়ল।

সমস্ত রাতটা তো এইভাবেই কাটল। পর দিন সকাল বেলায় আমাদের এক বন্ধুর স্ত্রী আমায় টেলিফোনে জানাল যে, সাধনা গিয়ে উঠেছে গ্র্যাণ্ড হোটেলে আজ সকালে। আগের দিন রাত্রে সে এই বন্ধুর ফ্ল্যাটেই ছিল। যতবার বন্ধুর স্ত্রী আমাকে

ফোনে জানাতে গেছেন ততবারই সাধনা বাধা দিয়েছে। এমন কি একথাও বলেছে যে, ফোন করে আমাকে জানালেই সে যেখানে খুশি চলে যাবে। শেষে এখন সে গ্র্যাণ্ডে চলে যাওয়ায় আমাকে ফোন করছে।

কথাটা শুনে প্রথমটা আমি অবাক হলাম। গ্র্যাণ্ডে থাকার মত তার হাতে টাকা কোথায়? পরে খোঁজ করে জানতে পারলাম যে, বম্বেতে তার একটা জাগুয়ার গাড়ী ছিল—খুব দামী গাড়ী সেখানা। সেইটা জলের দরে বিক্রি করেছে আমাদের এক বন্ধুর মাধ্যমে মাত্র ৬।৭ হাজার টাকায়, যেটার দাম খুব কমপক্ষে ২০,০০০ টাকা হওয়া উচিত ছিল। আর যিনি কিনলেন তিনিও আবার আমাদেরই এক 'বন্ধু'। সেই টাকাটা ওর হাতে ছিল এবং সেইটাই সম্বল করে সাধনা গিয়ে উঠেছে গ্র্যাণ্ডে।

তার কিছু দিন পরে আমাদের এক বন্ধু এসে সাধনার বাকী জিনিসপত্র নিয়ে গেল, এমন কি সাধনা রেডিওগ্রামটিও চেয়ে পাঠাল। 'বন্ধু' কথার চেয়ে, সাধনার একজন 'স্তাবক'ই তার সত্যিকার পরিচয়।

সাধনা যেরকম অমিতব্যয়ী তাতে ঐ ক'টা টাকা আর কতদিন? শীগ্‌গীরই সে-সব টাকা শেষ হয়ে গেল, এমন কি রেডিও-গ্রামটিও বিক্রি করে দিয়েছিল।

এই সব ব্যাপারে আমার মনটা এমনই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে, আর আমি সাধনার কোন রকম খোঁজ-খবর রাখার দরকার মনে করি নি। দেখলাম সে যখন আমার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চায়না—তখন আমিও তার সমস্ত ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলাম।

এর পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

সাধনা চলে যাবার পর আমি আর টুকলু থাকি সেই বিরাট ফ্ল্যাটে।

আগেই বলেছি আমার ফ্ল্যাটের নীচে থাকতেন সুশীল দে, আই-সি-এস। এই-খানে স্বনামধন্য মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর স্ত্রী এলেন রায় এসে কিছুদিন রইলেন সুশীলের অতিথি হিসাবে। শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে। কত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হতো শ্রীযুক্ত রায়ের সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শ্রীযুক্ত রায় তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বলে যেতেন। কখনও রাশিয়ার কথা, কখনও অন্য দেশের কথা—আমরা সবাই অবাক বিস্ময়ে শুনতাম তাঁর সেই কাহিনী। এত সুন্দর ছিল তাঁদের ব্যবহার এবং কথাবার্তা যে তাঁদের এই অল্প দিনের সান্নিধ্য আমার মনে গভীর দাগ কেটে দিয়েছিল।

সুধীন (কবি সুধীন দত্ত) ও তার স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্ত প্রায়ই আসত আমার

থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে। রাজেশ্বরী যদিও অবাঙ্গালী ছিল তবু সে ছিল শান্তি-নিকেতনের ছাত্রী এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তার দখল অসাধারণ। প্রায়ই সে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে শোনাত। আমি তাকে কতকগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিয়েছিলাম।

এই সময় একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সেটা হবে জুলাই-এর শেষ কিম্বা আগস্টের গোড়ার দিকে।

কলকাতায় দাঙ্গার উত্তেজনা আবার কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। হরেন ঘোষকে বললাম আমার ফ্ল্যাটে চলে আসতে। আমার ঘর তো খালিই পড়ে আছে। ধর্মতলায় সব সময় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আপিস করে কি লাভ ?

হরেন হেসে বললে : আরে আমার জন্যে তুই কিছু ভাবিস্‌নি। আমাকে সবাই চেনে, এতদিন ধরে আমি এখানে রয়েছি—আমার কিছু হবে না।

আমি বললাম : কি দরকার এ রকম প্রাণ হাতে করে ওখানে থাকার ? আমার ফ্ল্যাটে তো যথেষ্ট জায়গা আছে, এখানেই তোর আপিস কর। টেলিফোনও আছে, কোন অসুবিধা হবে না। হরেনকে অনেক কষ্টে রাজী করালাম, তবে সে বললে : কতকগুলো জরুরী টেলিগ্রাম আসবার কথা আছে। সেগুলো আসুক আর তাছাড়া আমি এখন দিল্লী যাচ্ছি। ফিরে এসে তোর এইখানেই আপিসটা করব।

হরেন দিল্লী চলে গেল। দিল্লী থেকে ফিরে বলল : আমি কয়েক দিনের মধ্যেই তোর ফ্ল্যাটে আমার আপিস ঘর করব। লোকজনদের সব বলে দিচ্ছি যে, এখন থেকে সব খোঁজ-খবর তোর ওখানেই করার জন্যে।

এই তার সঙ্গে আমার শেষ কথা এবং দিন দুই পরেই খবর পেলাম দুর্বৃত্তের দল নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করেছে তারই ধর্মতলা স্ট্রীটের অফিস ঘরে। এ খবর আপনারা অনেকেই জানেন। এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করতে আমি অপারগ। হরেনের মৃত্যুতে আমি হারালাম একজন সত্যিকার দরদী বন্ধুকে—আর আমাদের মঞ্চজগৎ হারাল একজন কৃতী ইম্প্রেসারিওকে।

এর কয়েক দিন পরেই এল ১৫ই আগস্ট। ভারত পেল তার বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। দীর্ঘ এক বছর ধরে সারা ভারতে হত্যার তাণ্ডবলীলা চলেছিল আর আজ সেই দুই সম্প্রদায়ের লোকেরাই ভাই-ভাই বলে উভয়ে উভয়ের গলা জড়িয়ে ধরল।

সেপ্টেম্বর মাস নাগাৎ আমার এক বন্ধু অলক মিত্র (যিনি এখন মাহিন্দ্র এণ্ড মাহিন্দ্র কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর) এবং তার স্ত্রী মীরা (বুলু) তাদের মেয়েকে নিয়ে বম্বে থেকে বদলী হয়ে কলকাতায় এল। প্রথমে কোন ফ্ল্যাট না পেয়ে আমার

ফ্ল্যাটেই এসে উঠল। বুলুর বাবা মিঃ এস. কে. দত্তর সঙ্গে ছিল আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয়। চমৎকার দিল-খোলা মানুষ ছিলেন এই মিঃ দত্ত। যতদিন অলক আর বুলু আমার ফ্ল্যাটে ছিল তিনি রোজই আসতেন এবং খুব গল্পগুজব হতো।

অক্টোবর মাসে আমার থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটের ছ'মাসের মেয়াদ ফুরিয়ে এল। মিঃ এল. আর. প্যাটেল ও তাঁর স্ত্রী ফিরে এলেন ইংলণ্ড থেকে, আমিও আবার এসে উঠলাম গ্রেট ইস্টার্নের সেই পুরনো 'স্যুইটে'। কালীদা এ সময় প্রায় রোজই আসতেন। আর কেউ না বুঝুক তিনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন যে, ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাতে আমার মনটা খুবই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে। এখন আমার প্রয়োজন সান্ত্বনা এবং শান্তি। তাই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন আমার মনটাকে ভুলিয়ে রাখবার। এই সময় তাঁর অনেক ভক্ত ও শিষ্যরাও আসতেন। তাঁদের সঙ্গেও আলাপ হলো। তার মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের বাংলা সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী—খাদ্য দপ্তরের রেশনিং বিভাগের একজন হোমরা-চোমরা। ওঁর ওপর চিনির বরাদ্দ বণ্টনের ভার ছিল।

সেই ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে কালীদা একদিন আমাকে বললেন: জানেন মধুবাবু, ছেলেটি কি বোকা?

আমি অবাক হয়ে বললাম: না-না, কি বলছেন কালীদা? আমার তো মনে হয় ঠিক উল্টো। আমার মনে হয় ইনি অসাধারণ বুদ্ধিমান।

কালীদা হেসে বললেন: বোকা ছাড়া কি! নিজের স্বার্থ বলে কিছু বুঝল না। চিনির বরাদ্দ বণ্টনের ভার ছিল এর হাতে, যদি সকলের কাছে সামান্য কিছু-কিছু করেও কমিশন খেত, তাহলেও লক্ষ-লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারত। আর বেশ আরামে থাকতে পারত। তা নয়, চাকরীতে কিনা ইস্তফা দিয়েছে।

ভদ্রলোক বললেন: ঠিক কথাই বলেছেন কালীদা, সে সময় এই গ্রেট ইস্টার্নেই লাঞ্চ আর ডিনারের ঠেলায় আমার প্রায় যায়-যায় অবস্থা। পানীয়ের তো কথাই নেই। সকাল থেকেই চলত বিয়ার, তারপর রাত্রে উৎকৃষ্ট দামী বিলাতী সুরা তো ছিলই। সকলের কাছে কমিশন খেলে কয়েক লক্ষ টাকা কামাতে পারতাম। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করুন তো কালীদাকে? তাহলে কি আমি ওঁর দেখা পেতাম? তাঁর স্নেহ, ভালবাসা আজ আমার মনে যা শান্তি দিয়েছে, তা কি কোনদিন পেতাম?

কালীদা সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে অন্য আলোচনার অবতারণা করলেন।

কালীদার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা হতো—কখনও সিনেমার গল্প হতো, কখনও টুকলুর সরস কৌতুক, হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে সময়টা কেটে যেত। এক-একদিন কালীদার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অনেক রাত্রি হয়ে যেত। কালীদা সে সবদিন হোটেলে ডিনার খেয়ে শুয়ে থাকতেন।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল।

১৯৪৮ সাল প্রায় শেষ হতে চলল। 'গিরিবালা'র দরুণ পাওয়া টাকা প্রায় শেষ হয়ে এল। গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে অত বড় 'স্থইটের' খরচ চালান মুস্কিল হয়ে পড়ল। স্থতরাং 'স্থইট' ছেড়ে একটা বড ঘরে remove করলাম।

ঘরটি সত্যিই বেশ বড় ছিল। একদিকে আমার অফিস, বসবার এবং খাবার জায়গা হলো, আর একদিকে একটা 'পার্টিশন' করে হলো আমার শোবার ঘর। মানে সেইখানে থাকল খাট, আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল এবং কতকগুলি স্থটকেশ। ওরই মধ্যে একটা কোণ ঘিরে নিয়ে আমার রান্না হতো।

মনের তখন যে অবস্থা তাতে নতুন কাজের যে চেষ্টা করব, তেমন কোন উৎসাহই পাই না মনে। কোনদিকেই কোনো আলোর সন্ধান পাই না—সব সময় মনে হয় যেন একটা বিরাট অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছি। একমাত্র কালীদার আশীর্বাদ এবং সান্ত্বনার জন্যে আমি আমার জীবনের সবথেকে সংকটময় সময়টি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। নৈরাশ্যের অন্ধকারে যখন আমি একেবারে দিশেহারা তখন তিনি যেভাবে আমাকে পথ দেখিয়ে মানসিক শক্তি ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন, তা একমাত্র আমিই জানি।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হলো, তাঁর নাম শ্রীরাখালদাস কুণ্ডু। তিনি বেশ বর্ধিষ্ণু এবং বনেদী বংশের ছেলে—খুব বিরাট কাঁসার বাসনের ব্যবসা ছিল তাঁদের। ছোটবেলা থেকে রাখালের জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে অসম্ভব আগ্রহ ছিল। বড়লোকের ছেলে—পয়সাকড়ির যথেষ্ট সাচ্ছল্য ছিল বলে বহুদেশ সে ভ্রমণ করেছিল। যে দেশেই রাখাল গিয়েছিল, সেইখানকার জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বেশ ভালরকম জ্ঞানলাভ করেছিল। এমন কি মিশরের সর্বত্র এবং মধ্য ও দূর প্রাচ্যের বহু দেশ সে ভ্রমণ করেছিল শুধু এই জ্যোতিষশাস্ত্রকে আয়ত্ত করার জন্য।

ভারতবর্ষেও যখনি সে কোনো বড় জ্যোতিষীর নাম শুনত যিনি ভৃগু পরাশর এবং বরাহ-মিহিরের নির্দেশিত পথে গণনা করেন, তাঁর কাছেই ছুটে যেত এবং সেখান থেকে কিছু-না-কিছু বের করে আনবার চেষ্টা করত। যখন সে ইজিপ্টে ছিল,

তখন সে ও-দেশের জ্যোতিষবিদ্যাও বেশ ভালরকম শিক্ষা করেছিল। এ বিদ্যাকে বলে 'রাক্ষস-গণনা'।

কুণ্ডুর সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই আমার মনে ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, প্রত্যেক মানুষকে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে চালিত করে এমন একটি শক্তি, যাকে ভাগ্যই বলুন বা নিয়তিই বলুন কিংবা ঈশ্বরের ইচ্ছাই বলুন। দিনের পর দিন আমাদের মধ্যে এই আলোচনাই হতো যে, মানুষ কি নিজের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে? তা যদি পারত তাহলে জগতপূজ্য শ্রেষ্ঠ সাধকদের সেই মহৎ বাণী তো মিথ্যে হয়ে যেত—তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে একটি তৃণও নড়ে না। "তুমি যা করাও মা আমি তাই করি—তুমি যা বলাও মা, আমি তাই বলি"—এই কথাই বলে গেছেন জগতের শ্রেষ্ঠ সাধকরা—ঈশ্বরের অবতাররা।

আমার জীবনে আমি বহুবার দেখেছি এবং পাঠকদেরও জানিয়েছি যে, কিভাবে কোন্ মঙ্গলময়ের অদৃশ্য হস্ত আমাকে উদ্ধার করেছে শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক সংকট থেকে। কুণ্ডুও ঠিক এই কথাই বলত: আপনার জন্মকোষ্ঠী দেখে আমার এইটাই বিশ্বাস হয়েছে যে, আপনার জীবনের সঙ্গে কয়েকটি গ্রহ-নক্ষত্রের এমনই যোগাযোগ রয়েছে, যারা আপনাকে একেবারে শেষমুহূর্তে বাঁচিয়ে দিয়ে যায়। এই গ্রহনক্ষত্রগুলির গুণে আপনার মানসিক শক্তি এমন অসাধারণ যে শারীরিক হোক, মানসিক হোক কিংবা আর্থিক হোক—সব বাধা আপনি অতিক্রম করে ওঠেন। বিশ্বের সব মহাপুরুষই যেমন বলেছেন, "তাঁর ইচ্ছা ছাড়া একটি তৃণও নড়ে না", তেমনি আমাদের সর্বোচ্চ স্তরের জ্যোতিষশাস্ত্রও বলে—যা ভাগ্যে আছে তা ঘটবেই।

অসাধারণ ছিল কুণ্ডুর ক্ষমতা এবং তার গণনায় সকলেই খুশী হতো—প্রত্যেকেরই একটা বিরাট আস্থা জন্মেছিল কুণ্ডুর গণনার ওপরে। তার কারণ অতীত ঘটনা সব মিলে যেত, বর্তমান সময় কিভাবে চলছে, তাও মিলত, সুতরাং ভবিষ্যতও যে মিলবে এতে আর কারু কোন সন্দেহ থাকত না। আমার অতীতের বহু ঘটনা যা শুধু একমাত্র আমিই জানি, তা কুণ্ডু এমন জোরের সঙ্গে বলে গেল, যাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম। যাক, এবারে আমার নিজের জীবনে কুণ্ডুর গণনা কিভাবে ফলে গিয়েছিল তাই বলি।

আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা কোন্ কোন্ সময়ে হবে, সে সমস্ত আমাকে লিখে দিল। কিন্তু আমার একমাত্র চিন্তা ছিল আমার ফিল্মের কণ্ট্রাক্ট কবে হবে তাই

জানতে। কারণ টাকাকড়ি যা আমার ছিল তা এই এতদিন বসে বসে খাওয়ার দরুণ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। আমার যতদূর মনে হয়, তখন ১৯৪৯ সালের মে মাস। আমি কুণ্ডুকে বললাম: অত সুদূর ভবিষ্যতে কি হবে জেনে এখন আমার লাভ নেই, এখন বল ২।১ মাসের মধ্যে কোন ফিল্মের কণ্ট্রাক্ট হবে কিনা—কাজকর্ম না হলে তো আর চলে না।

কুণ্ডু বললে: হবে মিঃ বোস, নিশ্চয়ই হবে। একটা নয়, দুটো কণ্ট্রাক্ট হবে।

আমি বললাম: বল কি কুণ্ডু? একেবারে দুটো?

সে বললে: হ্যাঁ। একটা হবে দু'মাস পরে—জুলাই মাসে, আর একটা খুব বড় কণ্ট্রাক্ট হবে—তবে সেটা হবে সেপ্টেম্বর মাস নাগাৎ।

আমি বললাম: দুটো ছবি তো একসঙ্গে করা সম্ভব নয়, তুমি আবার ভাল করে দেখ।

কুণ্ডু মনে মনে কি ভাবল, তারপর কাগজে কি সব লিখল, তারপর বললে: না, কণ্ট্রাক্ট দুটো ঠিকই হবে—তবে কাজ হবে একটি। জুলাই মাসে যে কণ্ট্রাক্ট হবে তাতে আসবে অনেক বাধা—এবং শেষ পর্যন্ত কাজই আরম্ভ হবে না আর সেপ্টেম্বর মাসে যে কণ্ট্রাক্টটা হবে সেটা খুব বড় কাজ—এবং তাতে ভাল টাকাই পাবেন। এই ছবিতে আপনার প্রচুর সুখ্যাতি এবং যশ হবে।

কুণ্ডুর কথায় মনে এক নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হলো, কারণ কুণ্ডুর গণনা অন্য অনেকের চেয়ে নির্ভুল হতো। এ আমার নিজের চোখে দেখা।

এই সময় কবি সুধীন দত্ত আমার হোটেলে মাঝে মাঝে আসত আর আমিও তার রাসেল স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে যেতাম। সুধীন পড়াশোনা করত প্রচুর, অনেক বিষয়েই তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তার পিতা হীরেন দত্ত ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর বিরাট লাইব্রেরীটির অনেকখানি সুধীন পেয়েছিল। এতে অনেক দুর্লভ এবং মূল্যবান গ্রন্থ ছিল। সুধীনও কবি হিসাবে বাংলাদেশে অতি সুপরিচিত, তার ওপরে বিখ্যাত সাহিত্য-পত্রিকা 'পরিচয়'-এর সে ছিল প্রাণস্বরূপ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সুধীন কখনও নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করত না। বেশীর ভাগ সময়েই যখন ওর ফ্ল্যাটে যেতাম তখন কোন দিন রাজেশ্বরীর রবীন্দ্র-সঙ্গীত হতো, আবার কোন দিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতো। আমাদের দেশের বহু বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিককে প্রায়ই তার ফ্ল্যাটে দেখা যেত। এই সব সাহিত্যিকদের আলাপ-আলোচনা আমার খুব ভাল লাগত।

একদিন কথায় কথায় স্থধীন আমাকে বলল: তুমি মাইকেলের জীবনী পড়েছ মধু?

আমি বললাম: না ভাই, ভাল করে পড়া হয়নি, তবে মোটামুটি কিছু কিছু জানি।

এই কথা শুনে স্থধীন তার লাইব্রেরী থেকে দুখানি বই বার করে দিলে—দুখানিই মাইকেলের জীবনী। একখানি হলো যোগীন্দ্রনাথ বসুর লেখা আর একখানি নগেন সোমের। বই দু'খানি আমার হাতে দিয়ে বললে: পড়ে দেখো বই দু'খানা। দেখবে কি অদ্ভুত নাটকীয় চরিত্র। একদিন হয়ত দেখব যে তুমিই এই বিরাট প্রতিভাধরের জীবনী চিত্রের মাধ্যমে লোকের সামনে তুলে ধরেছ। ক'টা লোকই বা মাইকেলের বিশদ জীবনী জানে? আর যারা জানে তারা শুধু এইটুকুই জানে যে মাইকেল মধুস্থদন দত্ত নামে এক ব্যক্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করেছিল আর খৃষ্টান হওয়ার ফলে বাপ তাকে ত্যজ্যপুত্র করেছিল আর এর শেষ জীবনটা অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছিল, এর বেশী আর কিছু নয়। তার বিরাট প্রতিভা, নাটকীয় জীবন, তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ক'টা লোক জানে?

যাই হোক, বই দু'খানা নিয়ে আমি বাড়ী চলে এলাম। স্থধীনের কথাগুলো আমার খুব ভাল লেগেছিল। স্থরু করে দিলাম মাইকেলের জীবনী পড়তে। যতই পড়তে লাগলাম ততই অভিভূত হয়ে যেতে লাগলাম এই অদ্ভুত চরিত্রের নাটকীয় উত্থান পতন দেখে। এইরকম একটি অপূর্ব চরিত্রের চিত্ররূপ দেবার ইচ্ছা আমার মনে প্রবল হয়ে উঠল। তখন খালি মনে হতো, নাচ গানের ছবি তো অনেক করলাম—এবার একটা পুরোপুরি নাটকীয় সংঘাতমূলক ছবি করা যাক।

দেখতে দেখতে জুলাই মাস এসে গেল। কুণ্ডুকে একদিন হাসতে হাসতে বললাম: কই কুণ্ডু, জুলাই মাস তো এসে গেল—তোমার গণনা কি হলো? কণ্ট্রাক্ট কই?

কুণ্ডু বলল: সবুর করুন না মিঃ বোস—সবেমাত্র তো জুলাই মাস পড়ল! কণ্ট্রাক্ট আপনার ঠিকই হবে এই মাসের মাঝামাঝি—তবে ছবি হবে না, কিছু টাকা পাবেন এইমাত্র। ছবি হবে, ভাল টাকা পাবেন, নাম-যশ পাবেন আপনার ঐ সেপ্টেম্বর মাসের কণ্ট্রাক্টে। আগেও যা বলেছি—এখনও সেই একই কথা বলছি।

বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলো না—জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষদিকে কুণ্ডুর প্রথম গণনাটির ফল দেখা দিল। একদিন ক্যামেরাম্যান শৈলেন বোস আমার কাছে এক ছবি করার প্রস্তাব নিয়ে এল। শৈলেনকে আমি জানি অনেকদিন

থেকে—সেই ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে। আমি যখন ইস্ট ইণ্ডিয়ায় 'সেলিমা' ছবি করি তখন সে ইস্ট ইণ্ডিয়ার ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করছিল ডিরেক্টর এ. আর. কার্দারের সঙ্গে। তারপর অবশ্য সে কলকাতায় অনেক ছবি করে এবং মাদ্রাজ ও কইম্বাটুরে গিয়ে ক্যামেরাম্যান হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে।

শৈলেন তখন একজন স্বাধীন চিত্র-প্রযোজকের হয়ে ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। আমার সম্বন্ধে শৈলেনের খুব উঁচু ধারণা ছিল। টাকা পয়সা সম্বন্ধে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল এবং একদিন এই প্রযোজকমশাই এসে আমার সঙ্গে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে টাকাকড়ি দিয়ে গেলেন। গল্পটি ছিল এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের। আমি প্রযোজকমশাইকে অনেক করে বললাম 'মাইকেলে'র জীবনী করবার জন্যে। কিন্তু তিনি বললেন যে তাঁর গল্প কেনা হয়ে গেছে—টাকাকড়িও বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে—সুতরাং এখন এই গল্প ছাড়া অন্য কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

যাই হোক, প্রথম কণ্ট্রাক্ট তো সই হয়ে গেল জুলাই মাসের মাঝামাঝি। কুণ্ডুর গণনার ওপর আমার বিশ্বাস হলো। এরপর কুণ্ডুর গণনার ওপর আমার বিশ্বাস এবং আস্থা দুইই বেড়ে গেল যখন আগস্ট মাসের শেষদিকে একদিন শৈলেন এসে বললে যে প্রডিউসার এখন এ ছবি করার সংকল্প ত্যাগ করেছেন। কুণ্ডু যা বলেছিল তা বর্ণে বর্ণে ফলে গেল—কণ্ট্রাক্ট হলো অথচ ছবি হলো না—লাভের মধ্যে আমার কিছু অর্থপ্রাপ্তি হলো।

এদিকে মাইকেলের জীবনীর একটা ধারাবাহিক দৃশ্য-সংস্থান যাকে বলে Sequences of scenes আমি করে ফেলেছি—এই বিষয়টার ভেতরে আমি এমনভাবে ডুবে গিয়েছিলাম যে, আমি অন্য আর কিছু চিন্তা করতেই পারতাম না।

সুধীন একদিন আমায় ঠাট্টা করে বলল: মধু, তুমি তো দেখছি 'মাইকেল' 'মাইকেল' করে পাগল হয়ে যাবে। মাইকেল আর তার জীবনের ঘটনা ছাড়া তুমি তো আর কোনো বিষয় আলোচনাই করতে চাও না। যাই হোক, তোমার sequences of scenes শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি মাইকেলের জীবনের আসল নাটকটি ঠিকই ধরেছ। কাব্যপ্রতিভা ছাড়াও মানুষ হিসেবে মাইকেলের আসল রূপটি আবিষ্কার করেছ নিখুঁতভাবে।

মাইকেলের চিত্রনাট্যের খসড়াটি অনেককেই শুনিয়েছিলাম—এর মধ্যে হেম সোমও ছিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় সোমের সঙ্গে এই মাইকেলের জীবনী নিয়েই আলোচনা

হচ্ছিল এমন সময় আমার পুরানো চিত্র-সম্পাদক শ্যাম দাস এসে আমাকে একটি ছবি করবার প্রস্তাব দিল। আগেই বলেছি যে শ্যাম আমার সমস্ত ছবির সম্পাদনা করেছিল সেই 'আলিবাবা'র সময় থেকে। সম্প্রতি সে আই-এন-এ পিকচার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীমণি গুহের সঙ্গে কাজ করছে। ইতিপূর্বে শ্রীগুহ 'স্বয়ংসিদ্ধা' নামে একখানি বাংলা ছবি নির্মাণ করেছেন নরেশ মিত্রের পরিচালনায়। অর্থাগমের দিক থেকে ছবিটি খুবই সার্থক ছবি—এর হিন্দি সংস্করণও যথেষ্ট খ্যাতি এবং অর্থলাভ করেছিল। এই হিন্দি সংস্করণটি পরিচালনা করেছিল শ্যাম দাস। এই দু'খানি ছবি থেকেই প্রযোজক শ্রীমণি গুহের লাভের অঙ্ক বেশ ভালই হয়েছিল। তিনি এখন একটি নৃত্যগীতবহুল ছবি করতে চান।

এর কয়েকদিন পরে শ্যামের সঙ্গে মণিবাবু এসে প্রস্তাব করলেন যে তাঁদের 'কিন্নরী' করার খুব ইচ্ছে। তিনি আমার 'আলিবাবা', 'কুমকুম', 'রাজনর্তকী' প্রভৃতি ছবি দেখেছেন—সুতরাং নাচগানের ছবি করতে আমার মত আর কেউ নেই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি তখন তাঁকে বললাম: সবই ঠিক মণিবাবু, কিন্তু নাচগানের ছবি ছাড়াও আমি নাটকীয় সংঘাতময় ছবিও করতে পারি। আমার 'অভিনয়' ছবি নিশ্চয় আপনি দেখেছেন। আর এই রকমই একটা দারুণ নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতমূলক চিত্রনাট্যের খসড়া আমার করা আছে—শুনুন না আপনি সেটা একদিন!

মণিবাবু জিজ্ঞেস করলেন: কার গল্প? কি রকম গল্প?

আমি বললাম: কোন লেখকের গল্প নয়—এটা হলো একটা জীবনী—মাইকেল মধুসূদন দত্তের।

মণিবাবু যেন আঁৎকে উঠলেন, তিনি বললেন: জীবনী—ও কি আমাদের দেশে চলবে? আগে দু-একটা যা হয়েছে যেমন চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতি—সেগুলো শুধু গানের জন্যেই চলেছে। এতে তো আর সেরকম গানের কোনো 'স্কোপ' নেই।

আমি জোর দিয়ে বললাম: গানের স্কোপ নেই—কিন্তু বিরাট ড্রামা আছে—যা প্রত্যেক লোকের ভালো লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার এই চিত্রনাট্যের খসড়াটা একবার শুনে দেখুন না!

আমি তখন খসড়াটা পড়ে শোনালাম। মণিবাবু তখন কিছু বললেন না। যাবার সময় বলে গেলেন: আমি একটু ভেবে দেখি মিঃ বোস। আপনাকে আমি পরে জানাব।

কয়েকদিন পরে শ্যাম আমায় টেলিফোন করে জানাল যে 'মাইকেল' এবং

'কিন্নরী' নিয়ে তাদের মধ্যে প্রচুর আলোচনা হয়েছে—এবং শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে যে মণিবাবু 'মাইকেল'-ই করবেন।

শুনে তো আমি আনন্দে ফেটে পড়লাম। এতদিন ধরে যে বিষয়টিকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলাম আজ তা সার্থক হলো। আর সার্থক হলো কুণুর অদ্ভুত গণনা।

সেই রাত্রে বেশ সমারোহ করে আমরা খানাপিনা করলাম। আমার অনেক বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধব সেদিন উপস্থিত ছিলেন।

এর কয়েকদিন পরে মণিবাবু এসে আমার সঙ্গে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। সে তারিখটা আমার আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে—১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ সাল।

এবার মাইকেলের জীবনীর চিত্রনাট্য করার পালা। সেজন্য আমি একজন ভাল সহকারী খুঁজতে লাগলাম যে আমাকে এবিষয়ে সব দিক দিয়ে সাহায্য করতে পারবে।

আমার পুরোন সুযোগ্য সহকারী হেমন্ত গুপ্ত কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছে। তার ভবিষ্যৎ ছিল খুব উজ্জ্বল, কিন্তু পরিচালক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আগেই তাকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। যাই হোক, আমার ঠিক মনে পড়ছে না আজ যে কে আমার সঙ্গে কবি বিমল ঘোষের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল। বিমলের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম যে ওর পড়াশোনা বেশ ভালই আছে এবং সংলাপ লেখারও ক্ষমতা আছে। তাকে নিয়েই চিত্রনাট্য লেখা সুরু করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকা নির্বাচনও চলতে থাকল।

মাইকেলের বাবা রাজনারায়ণ দত্তের ভূমিকায় আমি নির্বাচিত করলাম অহীনবাবুকে এবং মা জাহ্নবী দেবীর ভূমিকায় মলিনা দেবীকে ঠিক করলাম। মাইকেলের দুই স্ত্রী—একজন ফরাসী হেনরিয়েটা এবং অপরজন ছিলেন ইংরেজ মহিলা—রেবেকা। আমার ইচ্ছে ছিল এই দুটি ভূমিকায় আমি দুজন অবাঙ্গালী মেয়েকে দিয়ে অভিনয় করাব, যারা একটু একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলতে পারে, কিন্তু আমার প্রোডিউসার শ্রীমণি গুহ এবং চারুদা (শ্রীচারু রায়) দুজনেই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে অন্তত হেনরিয়েটার ভূমিকায় কোন বাঙ্গালী শিল্পীকে মনোনয়ন করতে। চারুদা ছিলেন এই ছবির শিল্পনির্দেশক।

চিরকালই আমার একটা ঝোঁক চিত্রজগতের নতুন নতুন শিল্পীকে আবিষ্কার করে তাদের লোকসমক্ষে তুলে ধরা। সেইজন্যে ইতিমধ্যেই যারা শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, বা যারা এখন ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয় করছে তাদের

না নিয়ে কয়েকটি বড় ভূমিকায় নতুন শিল্পীকে দিয়ে অভিনয় করানর ইচ্ছে ছিল। সে সময় আমি 'থ্রি হাণ্ড্রেড ক্লাবে' যাতায়াত করি—সেখানে আমাদের ইঙ্গবঙ্গ সমাজের প্রায় সকলেই যায়। বড় বড় সরকারী চাকুরে থেকে স্বরু করে বড় বড় শিল্পপতি পর্যন্ত।

মুখে মুখে এবং কাগজের মাধ্যমে খবরটা তখন বেশ ছড়িয়ে পড়েছে যে আমি মাইকেলের জীবনীর চিত্ররূপ দিতে যাচ্ছি। আমাদের সমাজে চিত্রজগতের একটা বিশেষ ধরণের জৌলুষ আছে এবং সব সমাজের মেয়েদের মনেই একটা বাসনা সুপ্ত হয়ে থাকে চিত্রজগতে অভিনয় করবার, নায়িকা হবার। অবশ্য এদের সকলের মধ্যেই যে বিরাট অভিনয়ক্ষমতা বা প্রতিভা আছে তা নয়, তবে তাদের ধারণা যে একবার ছবিতে নামতে পারলেই কাগজে কাগজে তাদের নামে পাবলিসিটি বেরুবে—ছবি বেরুবে—স্তাবকদের স্তুতি পাবে ইত্যাদি। এই আকর্ষণটা একটা দারুণ আকর্ষণ। আর কাগজে কাগজে নিজের ছবি ছাপা দেখার লোভ নেই এমন মানুষ খুব কমই আছে—সে তিনি শিল্পীই হোন, রাজনীতিকই হোন আর লেখকই হোন।

একদিন থ্রি হাণ্ড্রেড ক্লাবেই দেখা হয়ে গেল বন্ধুবর এ. ডি. খাঁন আই-সি-এস ও তাঁর স্ত্রী ঊষা খান-এর সঙ্গে। ঊষা আবার আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়া হয়। রামবাগানের দত্তপরিবারের যে শাখাটি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, ঊষা সেই পরিবারের মেয়ে। ঊষার বাবা ছিলেন বিনোদ দত্ত। বিনোদ দত্তের পিতামহ গোবিন্দ দত্ত প্রথম খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি হলেন আমার মাতামহ রমেশ দত্তের সম্পর্কে কাকা। এই গোবিন্দ দত্তের মেয়েরা হলেন অরু দত্ত ও তরু দত্ত, যাঁরা প্রথম মহিলা কবি বলে খ্যাতিলাভ করেন। ঊষার চেহারাটা বেশ ভাল ছিল—হেনরিয়েটা যে ধরনের শান্ত প্রকৃতির মহিলা ছিল, ঊষার চেহারায় সেদিক দিয়ে মানাবে খুব ভাল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ছবিতে অভিনয়ে তার ইচ্ছে আছে কি না। ঊষা বললে যে ছবিতে অভিনয়ের ইচ্ছে আর কার না থাকে—এর আগে সে কোন একটা ছবিতে অভিনয় করেছে। সে অভিনয় করতে রাজী হয়ে গেল এবং তাকেই হেনরিয়েটার ভূমিকা দেওয়া হলো।

মাইকেলের অকৃত্রিম সুহৃদ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ভূমিকার জন্য একটি নতুন শিল্পীকে মনোনয়ন করলাম। তার নাম হলো অবিনাশ দাস। চেহারাটি দেখে মনে হলো সে যেন 'বিদ্যাসাগরে'র ভূমিকা করবার জন্যেই জন্মেছিল। আর একটি প্রয়োজনীয় চরিত্র ছিল রেভাঃ কে. এম. ব্যানার্জির। হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী নামে এক নতুন শিল্পীকে এই চরিত্রে নির্বাচন করলাম। হরেন কলকাতা হাইকোর্টের

একজন অ্যাডভোকেট। শিল্প, নাটক ও অভিনয়ের দিকে তার ঝোঁক ছিল খুব বেশী। চেহারাটিও যেমন লম্বা চওড়া, দেখতেও তেমনি সৌম্য শান্ত। পরে বিদ্যাসাগর ও ৱেভাঃ কে. এম. ব্যানার্জির ভূমিকায় অভিনয় দেখে সকলেই একবাক্যে বলেছিল, এই ভূমিকা দুটিতে এঁদের যে রকম মানিয়েছিল এর থেকে ভাল আর ভাবা যায় না।

এইভাবে রঙ্গলাল, গৌর বসাক, রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন ঘোষ, ডব্লিউ. সি. বনার্জি, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি সমস্ত চরিত্রগুলিই নির্বাচিত হয়ে গেল। বাকী রইল শুধু মূল ভূমিকা মাইকেল ও ইংরেজ স্ত্রী রেবেকা। মাইকেলের চরিত্রের জন্যে শিল্পী খুঁজে বার করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম—যাকে বলে গরু খোঁজা—কিন্তু মাইকেলের চরিত্রে রূপ দেবার মত কোন ছেলেকেই পেলাম না। এমন ছেলে চাই যে হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থাতেও অভিনয় করতে পারবে আবার পরিণত বয়সেও অভিনয় করতে পারবে। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, বহু লোককে বলাও হলো—দেখলামও অনেকগুলি ছেলেকে, কিন্তু কাউকেই পছন্দ হলো না।

এদিকে ক্যালকাটা মুভিটোনে শুটিং-এর সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—তারিখও নেওয়া হয়েছে। চারুদার 'সেটে'র ডিজাইন সব তৈরী। প্রথমে কোন 'সেট' পড়বে সেই সেটে কোন কোন আর্টিস্ট দরকার তার সমস্ত তালিকা তৈরী হয়ে গেছে। আমার চিত্রনাট্য রচনাও ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এল। আর সপ্তাহ তিনেক মাত্র বাকী শুটিং-এর।

মণিবাবু একদিন বললেন: মিঃ বোস, মাইকেলের ভূমিকার জন্যে যখন কোন ছেলেকেই আপনার পছন্দ হচ্ছে না, তখন শিশিরবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখুন না। শিশিরবাবু তো এখন মঞ্চে এই চরিত্রই অভিনয় করছেন এবং লোকে তা ভালই নিয়েছে। আপনি তো এক সময় তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলেন—আপনি নিজে গিয়ে বললে তিনি ফিল্মে এই ভূমিকাটি হয়ত করতে রাজী হয়ে যেতে পারেন।

আমি বললাম: আপনি কি বলছেন মণিবাবু? আমি দেখাব মাইকেল যখন হিন্দুস্কুলের ছাত্র, তখন তার বয়স কত? ১৫-১৬। ফিল্মে কি শিশিরবাবুকে স্কুলের ছাত্র হিসাবে দেখানো যাবে? মঞ্চ হলো আলাদা জিনিস। সেখানে যা মানায় ফিল্মে কি তা মানায়? আমি এখনও হাল ছাড়িনি—দেখি না কাউকে খুঁজে বার করতে পারি কি না!

এদিকে সময় চলে যায়—কিন্তু মাইকেলের ভূমিকার জন্য আর কাউকে পাওয়া যায় না। তখন শুটিং শুরু হতে আর মাত্র পনের কুড়ি দিন বাকি।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি চিত্রনাট্য নিয়ে ব্যস্ত আছি, এমন সময় একটি ছেলে (যতদূর মনে পড়ে তার নাম ছিল জ্যোতি সেন) আমার সঙ্গে দেখা করতে এল একটি ভূমিকা পাবার আশায়। তার সঙ্গে এসেছিল আর একটি তরুণ যুবক। তরুণ যুবকটি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিত্ব, তার চলাফেরা, তার চোখ দুটি আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করল।

জ্যোতি তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে: ইনি হলেন মিঃ উৎপল দত্ত। লিটল্ থিয়েটার গ্রুপের প্রোডিউসার। স্টেজে অনেক বড় বড় নাটকের অভিনয় করেছে—তবে সেগুলি সবই ইংরিজি।

ছেলেটিকে বসতে বললাম। ছেলেটি বসতে বসতে চমৎকার ইংরিজিতে আমাকে বলল: আমি আপনাকে বিরক্ত করছি বলে কিছু মনে করবেন না মিঃ বোস। সেন যখন বললে যে সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছে তখন আমি আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমি আপনার একজন বিশেষ ভক্ত।

দেখলাম ছেলেটির ইংরিজি উচ্চারণ নির্ভুল। পরিষ্কার বিশুদ্ধ ইংরাজী—যাকে বলা হয় King's English।

উৎপলের সঙ্গে কথায় কথায় আরও জানতে পারলাম যে সম্প্রতি সে কলেজ ছেড়ে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেছে বটে, তবে তার শিল্পীমন সে বাঁধাধরা কাজে কোনো আনন্দ পায় না। সে মঞ্চকে ভালবাসে কিন্তু তার অনেক দিনের ইচ্ছে চিত্রজগতে আত্মপ্রকাশ করবার। ভূমিকা ছোট হলেও ক্ষতি নেই, তবে কোনো ভালো পরিচালকের অধীনে হওয়া চাই। বেশীর ভাগ কথাই সে ইংরেজিতে বলে গেল—মাঝে মাঝে যে দু' চারটা বাংলা কথা বলল তাতে বেশ জড়তা আছে দেখলাম। আমি তাকে ঠাট্টা করে বললাম: তুমি বাঙালীর ছেলে অথচ বাংলায় কথা বলতে তোমার এত বাধ-বাধ ঠেকে কেন?

তাতে সে হেসে উত্তর দিল: কলেজে সে বেশীর ভাগ অবাঙালীদের সঙ্গে মিশেছে, তাদের সঙ্গে ইংরাজিতে সেক্সপীয়ারের নাটক অভিনয় করেছে। এখনও তার অধিকাংশ বন্ধুই হলো অবাঙালী—তাদের নিয়েই সে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ গড়ে তুলেছে। সুতরাং বাংলা কথা বলার বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা হয় না।

যতক্ষণ সে কথা বলছিল, আমি কিন্তু সর্বক্ষণ তার মুখের দিকে লক্ষ্য করে

দেখছিলাম যে তার মুখের সঙ্গে মাইকেলের মুখের সাদৃশ্য অসাধারণ। তার বড় বড় দীপ্ত চোখ এবং তার ব্যক্তিত্বে আমি খুবই আকৃষ্ট হলাম। মাইকেলের চরিত্রে আমি যে জিনিসটি চাইছিলাম উৎপলের মধ্যে দেখলাম তা বিশেষভাবে রয়েছে। তার সঙ্গে যতই কথা বলতে লাগলাম ততই মনে হতে লাগল যে মাইকেলের ভূমিকার জন্য উৎপলই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

আমি তখন তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে বললাম: তোমাকে যদি ২।১টা দৃশ্যের জন্য একটা ছোট ভূমিকা দিই—তুমি তা করবে? মঞ্চে তো তুমি অনেক বড় বড় ভূমিকা করেছ!

এ কথা শুনে উৎপল তৎক্ষণাৎ বলল: আপনার পরিচালনাধীনে যদি একটা দৃশ্যেও অভিনয় করবার স্থযোগ পাই তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব। আমি যে-কোন 'রোল' করতে রাজী আছি। আমি শুধু দেখতে চাই যে সহজভাবে কোনরকম জড়তা বা ক্যামেরা-সজ্ঞানতা, যাকে বলে camera consciousness, না দেখিয়ে ক্যামেরার সামনে আমি দাঁড়াতে পারি কি না।

আমি তখন তাকে বললাম: ঠিক আছে। তুমি কাল এসো সন্ধ্যার সময়।

উৎপল চলে গেল।

পরদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় উৎপল এসে হাজির। আমি তখন তাকে মাইকেলের ভূমিকা থেকে কিছু কিছু অংশ পড়তে দিলাম। এই অংশগুলি ছিল বেশীর ভাগই ইংরিজিতে। সংলাপ বলবার ধরণ যেভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক সেইভাবেই সে বলে যাচ্ছে। বাচন-ভঙ্গী একেবারে নির্ভুল। কিন্তু বাংলা বিশেষ করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে তার উচ্চারণ একেবারে নৈরাশ্যজনক। তবে আমি হাল ছাড়লাম না—বিমলকে বললাম মাইকেলের একটি পুরো দৃশ্য ওকে লিখে দেবার জন্যে।

উৎপল আমার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে: আপনি কি আমাকে মাইকেলের ভূমিকাটাই দিতে চান নাকি?

আমি বললাম: হ্যাঁ, সেইরকমই ভাবছি—কেন পারবে না? তোমার কি সে আত্মবিশ্বাস নেই?

এতে সে বেশ জোরের সঙ্গেই উত্তর দিল: আমার আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট আছে মিঃ বোস, কিন্তু ছবিতে তো কথনও অভিনয় করিনি। একে এত বড় ভূমিকা—তার ওপর শুধু বাংলা ভাষা নয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দ! আপনি তো বলছেন ১৫ দিন পরে শুটিং আরম্ভ হবে—এই এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি কি তৈরী হতে পারব?

আমি তাকে উৎসাহ দিয়ে বললাম: চেষ্টা করে দেখই না! যদিও এতদিন তুমি মঞ্চে ইংরিজিতে বড় বড় ভূমিকা করেছ—তবু আমার মনে হয় তোমার মধ্যে শক্তি আছে, প্রতিভা আছে—সেটা ফুটিয়ে তোলা দরকার। আর তুমি চেষ্টা করলেই তা পারবে।

—আমি তো আপ্রাণ চেষ্টা করবই মিঃ বোস, বললে উৎপল। তার চোখ তখন আনন্দে ও ভবিষ্যতের স্বপ্নে জলজ্বল করছে। সে আরও বললে: মাইকেলের মত ভূমিকা পাওয়া যে-কোন শিল্পীর, বিশেষ করে একেবারে আনকোরা নতুন শিল্পীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য। আপনার সাহায্য পেলে আমি নিশ্চয়ই পারব।

আমি বললাম: পরিচালক হিসাবে সাহায্য তো আমি নিশ্চয় করব—তবে ভূমিকাটিকে ফুটিয়ে তোলাটা নির্ভর করছে তোমার শক্তির উপর।

তার পরদিন থেকে মাইকেলের ভূমিকার মহলা চলতে লাগল। বিমলকে বললাম চিত্রনাট্যের একটা কপি উৎপলকে দেবার জন্যে, কারণ সমস্ত চিত্রনাট্যটা পড়া থাকলে সমস্ত নাটক ও চরিত্রটি সম্বন্ধে তার একটা সম্পূর্ণ ও সঠিক ধারণা হবে।

মহলা শুরু হয়ে গেল পুরোদমে—বেলা ৫টা থেকে কোনদিন রাত্রি ১০টা, কোনদিন ১১টা আবার এক-একদিন ১২টাও বেজে যেতো। প্রায়ই আমরা তিন জনে অর্থাৎ আমি, উৎপল ও বিমল গ্রেট ইস্টার্নেই একসঙ্গে ডিনার খাই। দিন দিন আমি লক্ষ্য করলাম উৎপলের উন্নতি। আশ্চর্য তার ক্ষমতা—একটা কথা কোনদিন দু'বার বলতে হতো না।

আমি একদিন প্রযোজক মণিবাবুকে জানালাম যে আমি একটি ছেলে পেয়েছি—তার নাম উৎপল দত্ত, তাকেই আমি মাইকেলের ভূমিকাটি দেব বলে ঠিক করেছি।

তার পরদিন মণিবাবু এলেন সন্ধ্যার সময় উৎপলের রিহার্সাল দেখতে। সেদিন রাত্রে আর কোনো কথা হলো না, তার পরদিন সকালবেলায় এসে বললেন: ছেলেটির শক্তি আছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর বাংলা উচ্চারণ এত খারাপ যে লোকে হাসবে। তার ওপর আছে আবার আবৃত্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে। এরকম উচ্চারণ নিয়ে মাইকেলের ভূমিকা সে কি করে করবে? বিশেষ করে শিশিরবাবু এখন স্টেজে মাইকেলের ভূমিকা করছেন অপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে। এই ছবি দেখে সঙ্গে সঙ্গে লোকে তুলনা করবে। এখনও শুটিং-এর ৮।১০ দিন দেরী আছে—আপনি কোন রকমে শিশিরবাবুকে বলে কয়ে রাজী করান। নইলে আমি বলছি ছবি

একেবারে ডুবে যাবে। প্রথমতঃ নতুন ছেলে—ফিল্মে কখনও নামেনি—তার উপর বাংলায় এইরকম জড়তা—অত বড় ভূমিকা কি করে করবে মিঃ বোস?

আমি একটু ক্ষুব্ধ হয়েই বললাম: কি করে করবে সেটা আমার ওপরই ছেড়ে দিন না মণিবাবু। পরিচালক হিসাবে আমার কি কোনই দায়িত্ব নেই? ফিল্মে আমি অনেক নতুন শিল্পীকে সুযোগ দিয়েছি—আর আমি জোর গলায় বলতে পারি যে আমি কখনও অকৃতকার্য হই নি। প্রযোজক হিসাবে আপনি যেমনি আপনার টাকার বিষয় চিন্তা করছেন, তেমনি পরিচালক হিসেবে আমারও দায়িত্ব আছে। দুর্নামের ভয় আছে। ছবি যদি না দাঁড়ায় অর্থাৎ লোককে খুশী করতে না পারে, তাহলে যেমনি আপনার অর্থ নষ্ট হবে তেমনি আমারও সুনাম নষ্ট হবে। আমি এতগুলো ছবি করার পর পরিচালক হিসাবে এ দায়িত্ব নিতাম না—যদি না আমি বুঝতাম যে উৎপলকে দিয়েই এ ভূমিকায় অভিনয় করানো যাবে—এ আত্মবিশ্বাস আছে বলেই আপনাকে আমি বলছি আমার উপর ভরসা রাখুন—দেখবেন আপনি ঠকবেন না।

আমাকে এরকম জোরের সঙ্গে বলতে দেখে মণিবাবু আর কোন উত্তর দিলেন না, তবে দেখলাম যে তিনি খুশী হলেন না এবং আমার কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে বেশ ইতস্তত করছেন।

এর ২।৩ দিন পরে সমস্ত ব্যাপারটা এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যাতে 'মাইকেলে'র শুটিংই প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। মণিবাবু ধরে বসলেন যে শিশির-বাবুকেই 'মাইকেলে'র ভূমিকা দিতে হবে—আর আমিও জিদ ধরে বসলাম যে উৎপল ছাড়া এ ভূমিকা কেউ করবে না, তাতে যদি ছবি বন্ধ হয়ে যায়, তো যাক। উৎপল সম্বন্ধে যদি আমার এত বড় দৃঢ় বিশ্বাস না হতো, তাহলে জীবনে এত বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম না, যেখানে এতগুলো টাকার দায়িত্ব এবং আমার সুনাম দুর্নামের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।

যাহোক, অনেক কাঠ খড় পোড়ানোর পর মণিবাবু শেষে আমার প্রস্তাবেই রাজী হলেন এবং উৎপলকেই 'মাইকেলে'র নাম-ভূমিকার জন্য চুক্তিবদ্ধ করা হলো।

আগেই বলেছি যে, প্রতিদিন প্রায় ৫ ৬ ঘণ্টা করে রিহার্সাল দেওয়া হতো এবং শুটিং-এর দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, আমি তত অবাক হয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম যে উৎপল দ্রুত উন্নতি করছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে বাংলা ভাষার জড়তা তার অনেকটা কেটে গেছে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে আবৃত্তিও সে সুন্দর করতে পারছে।

মাইকেলের ইংরেজ স্ত্রী রেবেকার জন্য একটি ইংরেজ মেয়ে খুঁজছিলাম। উৎপলই একদিন তাদের লিটল্ থিয়েটার গ্রুপের একটি এমেচার মেয়ে শিল্পীকে আমার কাছে নিয়ে এল। মেয়েটি আর্মেনীয়ান, নাম গ্রেস ম্যাকাট্রিচ। গ্রেস উৎপলদের দলে অনেক বড় বড় ভূমিকায় অভিনয় করেছে—অবশ্য ইংরেজিতে। সে বাংলা বলতে পারত না একটি বর্ণ। সেইজন্য তার সংলাপগুলিতে বাংলার সঙ্গে কিছু কিছু ইংরিজিও রাখা হলো। দেখলাম মেয়েটি এত বুদ্ধিমতী যে বাংলা সংলাপগুলি সে যে শুধু সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছে তাই নয়, কথাগুলি যেভাবে উচ্চারণ করা উচিত সেইভাবেই উচ্চারণ করছে। বিশেষ বিকৃতি নেই, তবে একেবারে বাঙালী মেয়ের মত নয়—ইংরেজ মেয়েরা বাংলা বলবার চেষ্টা করলে যে রকম উচ্চারণ হয় সেইরকম এফেক্ট হলো। একেই রেবেকার ভূমিকায় নির্বাচন করলাম—তার নতুন নামকরণ করলাম মিরিয়াম স্টার্ক।

অন্যান্য ইংরেজ চরিত্রগুলি যেমন ডাঃ পামার, মাদ্রাজের এডভোকেট-জেনারেল জর্জ নর্টন, বিশপ্ (যিনি মাইকেলকে দীক্ষিত করেন) প্রভৃতি চরিত্রগুলিতে আসল ইংরাজ শিল্পীরাই অভিনয় করেছিলেন।

পুরোদমে মহলা চলতে লাগল। উৎপল, গ্রেস, উষা রোজই আসে আর সকলেই প্রাণমন ঢেলে মহলা দেয়।

শুটিং-এর কিছুদিন আগে আমার প্রিয় বন্ধুবর সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় একদিন সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। বসন্তের কথা আগে অনেকবার বলেছি। বসন্ত ছিল আমার শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। সময় পেলেই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত।

বসন্ত এসে বলল: আমার ছেলে বঙ্কিমকে তো তুমি দেখেছ। সে এই ফিল্ম-লাইনেই ঢুকেছে। বর্তমানে পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সহকারী হিসাবে কাজ করছে, কিন্তু আমার ইচ্ছে যে সে তোমার সহকারী হয়ে কিছুদিন কাজ করে। ওর লেখবার ক্ষমতা আছে। 'দীপালীর' বহু লেখাই ওর। আসলে তো ওর নামই রয়েছে সম্পাদক হিসেবে। আমার ছেলে বলে বলছি না—সে তোমায় চিত্রনাট্য লেখায় অনেক সাহায্য করতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি বললাম: এখন তো আমার সঙ্গে একজন সহকারী কাজ করছে—বিমল ঘোষ। বঙ্কিম যদি আমার সঙ্গে কাজ করতে চায় তাহলে নিশ্চয় তাকে আমার অন্যতম সহকারীরূপে নেব। সময়মত আমি তোমাকে টেলিফোন করে জানাব—তখন তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

শুটিং-এর ঠিক আগে আমি বসন্তকে ফোন করে বললাম বঙ্কিমকে পরদিন পাঠিয়ে দিতে।

বঙ্কিম এলো। তার বয়স তখন ৩৩।৩৪ হবে। কথাবার্তায় খুব ভদ্র, অমায়িক এবং smart। আমি তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে মাইকেল থেকেই একটি দৃশ্য তাকে লিখতে বললাম। অবশ্য দৃশ্যটি কি রকম হবে তার সারমর্ম আমি বুঝিয়ে দিলাম। তাকে বললাম, এই দৃশ্যটাতে সংলাপ বসিয়ে ঠিক মতো লেখ দেখি।

বঙ্কিম ঐখানে বসে বসেই লিখলো এবং পড়ে যখন আমাকে শোনাল তখন দেখলাম যে দৃশ্যটি সে ভালই লিখেছে এবং ভাষাতেও রীতিমত দখল আছে। আমি খুশী হয়ে বললাম: ঠিক আছে বঙ্কিম, তুমি কাল থেকেই আমার সহকারী হিসাবে কাজ আরম্ভ করে দাও।

বিমল ঘোষ কবি মানুষ—লেখাই তার পেশা কিন্তু স্টুডিওতে গিয়ে সেটের মধ্যে পরিচালকের প্রধান সহকারী হয়ে কাজ করা আর ঘরে বসে সংলাপ লেখার মধ্যে অনেক তফাৎ। সুতরাং কয়েকদিন পরেই দেখলাম যে বিমল সে কাজ ঠিক করতে পারছে না। এদিকে বঙ্কিম এর আগে অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সহকারী হিসাবে কাজ করেছে বলে পরিচালকের প্রধান সহকারীর কাজ তার সব জানা আছে। সুতরাং আরম্ভ হবার কয়েকদিন পর থেকে বঙ্কিমই আমার প্রধান সহকারীর কাজ করতে লাগল। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল (বীরেশ্বর বিবেকানন্দ) পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ছবির সংলাপই বঙ্কিম লিখেছে শুধু রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ও 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' ছাড়া এবং তার সংলাপ রচনা বড় বড় মহারথীদের থেকে কোন অংশে খারাপ নয় এ আমি জোর গলায় বলতে পারি। তাকে আমি স্নেহ করি বলে বলছি না। হেমন্ত গুপ্ত মারা যাবার পর সে শুধু এখন আমার সহকারী নয় সে আমার কাজে নানান ভাবে সাহায্য করে থাকে।

যাই হোক, ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে 'মাইকেল'-এর শুটিং আরম্ভ হলো।

আমি বুঝতে পারছিলাম যে, 'মাইকেল মধুসূদন' চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছে এত বড় কঠিন একটা চরিত্রে নবাগত উৎপল দত্ত কি রকম করে তাই দেখবার আশায়। বিশেষ করে আমার প্রোডিউসার শ্রীমণি গুহ তো খুবই নার্ভাস হয়েছিলেন। গজ-গজ করতে করতে অন্যান্য লোকদের বলতেন:

আমি এত করে বললাম যে এই ভূমিকার জন্যে শিশিরবাবুকে (শিশিরকুমার ভাদুড়ী) নেবার জন্যে, কিন্তু মিঃ বোস জিদ করে এই আনকোরা নতুন ছেলেকে নিলেন, কি যে হবে ভগবানই জানেন। এই একটি চরিত্রের উপরই ছবির সাফল্য বা অসাফল্য নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবে।

আমার কিন্তু উৎপল সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ কাজ ভালই করবে। প্রতিদিন রিহার্সালে তার উন্নতি লক্ষ্য করে আমার ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল। তবু তার নিজের আত্মবিশ্বাস জন্মাবার জন্য উৎপলের প্রথম শুটিং তারিখ ফেললাম একজন অভিজ্ঞ এবং নামকরা শিল্পীর সঙ্গে। মলিনা দেবীকে নির্বাচিত করেছিলাম তার মা জাহ্নবী দেবীর ভূমিকায়। তার সঙ্গেই উৎপলের প্রথম শুটিং-এর তারিখ ফেললাম এবং দৃশ্যটিও ছিল খুব নাটকীয়। সে দৃশ্যটি অতবড় একজন শিল্পীর সঙ্গে উৎপল এমন সুন্দর এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অভিনয় করল যে, সকলেই অবাক হয়ে গেলাম। এতক্ষণে আমার মনটাও ভরে উঠল এই ভেবে যে, আমি যে বিরাট দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছিলাম তা সার্থক হলো। মণিবাবুও উৎপলের প্রথম দিনেই এরকম একটা শক্ত নাটকীয় দৃশ্যে একজন বড় শিল্পীর সঙ্গে এমন সহজ ও সাবলীল অভিনয় দেখে খুশী হলেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, উৎপল একটা মুহূর্তের জন্যেও কোন রকম জড়তা বা ক্যামেরা-সচেতনতা দেখায় নি। দৃশটি চিত্রায়িত হবার পর সকলেই এসে আমাকে এবং উৎপলকে অভিনন্দন জানালেন।

তারপর থেকে শুটিং যত অগ্রসর হতে লাগল উৎপল ততই উন্নতি করতে লাগল এবং প্রত্যেকটি নাটকীয় দৃশ্যেই সমস্ত শিল্পীদের সঙ্গে তিনি নতুনই হোন বা পুরাতন অভিজ্ঞই হোন, সহজ, সুন্দর, সাবলীলভাবে অভিনয় করে তার অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে লাগল। ইংরাজীতে যাকে বলে 'Stealing the scene'—উৎপলের ক্ষেত্রেও সেই কথাই আমি বলতে চাই।

উৎপল যে মাইকেলের চরিত্রটি কত ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনারূপে গ্রহণ করেছিল তার একটি দৃষ্টান্ত আমি এখানে বলতে চাই।

নিম্নলিখিত দৃশ্যটি সেদিন গৃহীত হবে। চিত্রনাট্য থেকে সে দৃশ্যটি আমি তুলে দিলাম—

[মধুসূদনের কক্ষ—জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে মাইকেল শুয়ে আছেন। মাথার কাছে বসে হেনরিয়েটা মাথায় জলপটি দিচ্ছেন ও মাঝে মাঝে পাখার বাতাস করছেন।

দরজার কাছে পুরাতন ভৃত্য রঘু বসে আছে। মধুসূদন জ্বরের ঘোরে উত্তেজিতভাবে আবৃত্তি করছেন]:—

মধুসূদন :

বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, "কি হেতু
হে দূত রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম ? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন হে সন্দেশবহ
মলিন বদন তব ? দেব দৈত্য জয়ী
লঙ্কার পঙ্কজ রবি সাজিছে সমরে,
আজি অমঙ্গল বার্তা কি মোরে
কহিবে ?"

[মধুসূদন ক্লান্তভাবে হাঁপাতে লাগলেন। হেনরিয়েটা সযত্নে মধুসূদনের ঘাড়ের তলায় হাত দিয়ে শোয়াবার চেষ্টা করছেন]

হেনরিয়েটা : চুপ কর ! জ্বর বাড়বে যে !

[মধুসূদন বিহ্বলের মত হেনরিয়েটার দিকে তাকালেন]

মধুসূদন (বালিশে মাথা রেখে) : রাবণ ! রাবণ ! রাবণ ! পরাক্রান্ত লঙ্কেশ্বর বলিষ্ঠ রাবণ। হেনরিয়েটা—ওরা বলে, আমি নাকি রাবণকে বড় করেছি। ভুল ভুল ! রাবণকে বড় করতে হয় না, আপন মহিমাতেই রাবণ বড়। আমি বাল্মীকি নই হেনরিয়েটা, আমি মুনি ঋষি নই—আমি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এই পৃথিবীর মানুষ রামকে আমি মানুষের চেয়ে বড় সম্মান দিতে পারব না। I hate Ram and his rabble.

[রঘুর প্রবেশ]

রাম লোকটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখতে পারিনা। লোকটা কাপুরুষ। আর লক্ষ্মণ ? হ্যাঁ, লক্ষ্মণকে বরং মন্দ লাগে না। তবু আমার মেঘনাদের কাছে কতটুকু ? মেঘনাদ ! দুরন্ত রাবনি মেঘনাদ !

[আবৃত্তি]

কহিলা বীরেন্দ্র, দেখি আশীষ দাসেরে
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি
পশিব সমরে আজি নাশিব রাঘবে।

হেনরিয়েটা : একটু শান্ত হও মাইকেল। মেঘনাদ, মেঘনাদ করে তুমি যে পাগল হয়ে যাবে।

রঘু : (এক গ্লাস জল এনে) একটু জল দেব দাদাবাবু ?

মধুসূদন : জল ! হ্যাঁ, হ্যাঁ—দে।

[হেনরিয়েটা রঘুর হাত থেকে জলের পাত্রটি নিয়ে পরম যত্নে মধুসূদনকে খাওয়ালেন। জল পান করে মধুসূদন আবার বললেন]

মধুসূদন : এ আমার প্রলাপ নয়, আর আমি পাগলও হব না হেনরিয়েটা। Either Meghnad will finish me or I will finish Meghnad.

[এই বলে তিনি ক্লান্তভাবে বালিশের ওপর মাথা রেখে চোখ বুঁজলেন। হেনরিয়েটা কপালে হাত দিয়ে দেখলেন ভীষণ জ্বর। তিনি জলপটি দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারটা বাজল।]

এই দৃশ্যটির সেদিন শুটিং-রিহার্সাল হয়ে গেছে, রিহার্সাল দেখে আমার বেশ ভালই লেগেছিল।

এদিকে সেট তৈরী, সেটে আলো-টালো সব সাজান হয়েছে, ক্যামেরাম্যান জি. কে. মেহতা ক্যামেরা নিয়ে বসে আছেন। শব্দগ্রহণ করছিলেন বাণী দত্ত। সকলেই আমরা সেটে তৈরী, কিন্তু উৎপলকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেক-আপ রুম, ক্যান্টিন, বাথরুম—কোথাও নেই সে। কোথায় গেল সে ? শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজন এসে বললে, অন্য একটা ফ্লোরের এক কোণে কম্বল মুড়ি দিয়ে উৎপল একটা খাটে শুয়ে আছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : কি উৎপল, এখানে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছ যে ? শরীর খারাপ নাকি ?

উৎপল তাড়াতাড়ি খাট থেকে উঠে সলজ্জ হেসে বললে : না মিঃ বোস, ও কিছু নয়। আপনি চলুন সেটে, আমি আসছি।

আমি তবু বললাম : না-না, তোমার যদি শরীর খারাপ হয়ে থাকে তাহলে বল—আমি না হয় আজ shooting pack-up করে দিই।

—না-না ও কিছু নয়। আমার শরীর ভালই আছে। আমি একটু নিজেকে 'মুড'-এ আনতে চেষ্টা করছিলাম।

এই দৃশ্যটির জন্যে সে যে কত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে প্রস্তুত করছিল তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সে যে অন্যান্য শিল্পীর মত অবসর সময়টুকু হাসি-ঠাট্টা

বা গল্প-গুজবে না কাটিয়ে মাইকেলের চরিত্রটিকেই ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা করে নিজেকে সর্বক্ষণ ডুবিয়ে রেখেছিল, এইটিই তার সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তার শিল্প-প্রতিভার ওপর আমার এমন একটা বিশ্বাস এসে গেল যে, এর পর আমার চিত্রনাট্য থেকে বহু দৃশ্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে তার অভিনয়-ক্ষমতাকে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিলাম। এতে অন্য কোন শিল্পীর অভিনয় আশানুরূপ না হলেও, বা কিছু নীরস হলেও উৎপলের অভিনয় সে 'সিনটিকে' টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

অন্যান্য নবাগত শিল্পীদেরও যেমন অবিনাশ দাস (বিদ্যাসাগর), হরেন রায়চৌধুরী (রেভাঃ কে. এম. ব্যানার্জি), মিরিয়াম স্টার্ক (রেবেকা), শ্রীপতি চৌধুরী (কবি রঙ্গলাল), বাণীব্রত মুখোপাধ্যায় (গৌরদাস বসাক)—এদের অভিনয়ও বেশ ভালই হয়েছিল। তাদের অভিনয় দেখে কারও একবারও মনে হয়নি যে তারা নবাগত। এছাড়া পুরোনো অভিজ্ঞ শিল্পীরা তো ছিলেনই—যেমন অহীন্দ্র চৌধুরী (রাজনারায়ণ দত্ত), মলিনা দেবী (জাহ্নবী দেবী), প্রীতি মজুমদার (পুরাতন ভৃত্য রঘু)। আমার বন্ধুবর হেম সোমকেও একটি ভূমিকা দিয়েছিলাম—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভূমিকা। আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে, যদিও সোম এর আগে কোন ছবিতে বা স্টেজে কখনও কোন ভূমিকাতেই অভিনয় করেনি, তবুও এ ভূমিকাটির প্রতি সে পূর্ণ সুবিচার করেছিল।

মাইকেল মধুসূদন ছবিতে দু'খানি গান ছিল। একটি কীর্তন গান রাধারানীর কণ্ঠে আর একটি মাইকেলের কণ্ঠে—'তুমি যে আমারই কবিতা'। গেয়েছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুর দিয়েছিল চিত্ত রায়। সে সময় এ রেকর্ডখানি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

মে মাসের শেষাশেষি শুটিং শেষ হলো।

এইবারে আমি আর শ্যাম সম্পাদনায় লেগে গেলাম। শ্যামের সহকারীরূপে কাজ করত মণ্টু বা শিব ভট্টাচার্য। মণ্টু অবশ্য এখন স্বাধীনভাবেই ছবির সম্পাদনা করছে। সে 'মাইকেলে'র শুটিং-এর সময় আমার অন্যতম সহকারীরূপেও কাজ করেছিল।

সম্পাদনা শেষ হলো, ব্যাক-গ্রাউণ্ড মিউজিক নেওয়া হলো এবং ছবি মুক্তির দিন গুণতে লাগল। ক্রমে 'মাইকেলে'র মুক্তিদিবস ঘোষিত হলো ১৪ই জুলাই—লাইট হাউস এবং আরও কয়েকটি চিত্রগৃহে—রূপবাণী, অরুণা, ইন্দিরা।

তদানীন্তন রাজ্যপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাট্জু লাইটহাউসে এই ছবির উদ্বোধন করবেন।

এই সময় ফাইনাল প্রোজেকশান দেখে কিন্তু, কেন জানি না, আশানুরূপ খুশী হতে পারলাম না। কোথায় যেন কিসের অভাব মনে হতে লাগল। শ্যাম আর আমি দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক করলাম ২।৩টি দৃশ্য আবার চিত্রগ্রহণ করতে হবে।

এই ২।৩টি দৃশ্যের শুটিং-এর পর আবার ফাইনাল কপি প্রিণ্ট হলো।

'মাইকেলে'র মুক্তির দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল ততই আমি নার্ভাস বোধ করতে লাগলাম। আমার এই দীর্ঘ চিত্র-পরিচালক জীবনে এর আগে কখনও এতখানি নার্ভাস হই নি। আমার শুধু ভয় হচ্ছিল যে, এরকম একটা নাটকীয় কাহিনী—যার মধ্যে নাচ নেই, গান নেই—এক কবির জীবনকাহিনী—লোকে কি নেবে? তার ওপর একটি মাত্র শিল্পীর ওপর সমস্ত নাটকটি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। এতবড় ট্র্যাজেডি ফুটিয়ে তুলতে যদি এই শিল্পীটি না পারে? তখন? এইসব নানা রকম চিন্তায় মনটা খুব চঞ্চল ছিল।

যাই হোক, উদ্বোধনের দিন ডঃ কাটজু লাইটহাউসে এলেন। আমি তাঁকে receive করে উৎপলকে বললাম: তুমি ডঃ কাটজুকে 'ডায়াসে' নিয়ে যাও। আমি আর যাব না।

দেখলাম উৎপল বেশ শান্ত সংযত এবং আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। উৎপল বললে: 'ডায়াসে' উঠে আপনি যদি কিছু না বলেন সেটা কি ভাল দেখাবে?

আমি বললাম: তুমি আমার হয়ে যা বলবার বলে দিও। তোমার ওপরই আমি সব দায়িত্ব দিলাম।

উৎপল রাজ্যপালকে নিয়ে চলে গেল 'ডায়াসে'। আমি পিছনের একটি সীটে ঊষা খাঁ ও তার স্বামী-মিঃ এ. ডি. খাঁর পাশে গিয়ে বসলাম।

রাজ্যপালের উদ্বোধনী বক্তৃতার পর এবং উৎপলের ধন্যবাদ প্রদানের পর ছবি আরম্ভ হলো।

ইণ্টারভ্যাল হলো, দেখলাম ছবি বেশ জমেছে। দর্শকদের কথাবার্তায় বোঝা গেল যে, তারা উৎপলের অভিনয়কে বেশ ভালভাবেই নিয়েছে।

যা হোক, ছবি শেষ হলো। এখন কিন্তু পুরো ছবিটা দেখে বেশ ভালই লাগল, আগে যতটা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম এখন কিন্তু আর সে রকম মনে হলো না।

তবুও আমি ঠিক নির্ভয়ে বাইরে বেরুতে পারছিলাম না। বন্ধুবান্ধব এবং পত্রিকা-সমালোচকদের সামনে দাঁড়াতে কি রকম একটা কিন্তু-কিন্তু বোধ করছিলাম। আমি পেছনে বসেছিলাম তাই প্রথমে আমাকে কেউ দেখতে পায়নি। কিন্তু বেশীক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারলাম না। বন্ধুবান্ধবরা আমাকে খুঁজে

বের করে বললে : তোমাকে সকলে খোঁজাখুঁজি করছে, আর তুমি এখানে লুকিয়ে বসে আছ ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সকলে মানে ?

—মানে দর্শকরা, টেক্‌নিসিয়ানরা এবং প্রেসের লোকেরা।

এইবার বুঝলাম যে ছবিখানি তাহলে সকলের ভালই লেগেছে। মনে খানিকটা ভরসা পেলাম। হতাশার ভাবটা কেটে গেল এবং সাহস করে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সকলে আমাকে আর উৎপলকে অভিনন্দন জানাল।

শেষকালে 'লাউঞ্জে' এত ভীড় জমে গেল যে, বেরুবার পথ পর্যন্ত বন্ধ। সমালোচকরা সকলে একবাক্যে বলল : 'মাইকেল মধুসূদনই' আপনার শ্রেষ্ঠ ছবি মিঃ বোস। এতদিন নাচ-গানে ভরা ছবিই শুধু করেছেন, অবশ্য 'অভিনয়' ছবি বাদে। কিন্তু আমাদের ধারণাই ছিল না যে, 'মাইকেল'-এর মত এমন একটা ট্র্যাজিক চরিত্রের চিত্ররূপ এত সুন্দরভাবে আপনি দিতে পারবেন। যাই হোক, আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

তারপর উৎপলকে বললেন তাঁরা : চিত্র-জগতে আপনার প্রথম অভিনয় চির-দিন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আপনার অভিনয় সত্যিই অপূর্ব !

পরে সমস্ত পত্র-পত্রিকাতেই 'মাইকেলে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছিল।

প্রযোজক মণি গুহ মহাশয় এতদিনে নিশ্চিন্ত হলেন। আগে তিনি 'স্বয়ংসিদ্ধা' তৈরী করে প্রচুর সুনাম এবং অর্থোপার্জন করেছিলেন, এবার 'মাইকেল মধুসূদন' তৈরী করে তিনি শুধু অর্থই পেলেন না, পেলেন যশ ও সম্মান, যাকে বলে prestige, আর প্রায় সকলকেই বলতে শোনা গেল যে, এ prestige শুধু পরিচালক মধু বসু ও প্রযোজক শ্রীমণি গুহ মহাশয়ের একলার নয়, এ prestige সারা বাংলার চিত্রশিল্পের।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সব সমালোচনা বেরিয়েছিল, তার মধ্যে থেকে শুধু কয়েকটি সমালোচনার কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করছি :—

"...মাইকেল মধুসূদন চিত্রখানি শ্রীমধু বসুর পরিচালক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এইরূপ একখানি চিত্র উপহার দিয়া বাঙলা চিত্রশিল্পের গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য পরিচালক শ্রীযুত বসুকে অভিনন্দিত করিতেছি। ...নবাগত শ্রীউৎপল দত্ত নাম-ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় এমনই বিস্ময়কর যে, মনে হয় এই চরিত্রটি রূপদানের জন্যই যেন তাহার জন্ম সার্থক।" ...আনন্দবাজার পত্রিকা (২১-৭-১৯৫০)

"...'মাইকেল মধুসূদন' ভারতীয় চিত্র-ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অবদান। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সমগ্র তিন যুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবি বলে পরিগণিত হবার যোগ্যই শুধু নয়, সেই সঙ্গে ভারতীয় ছবির উৎকর্ষ সম্পর্কে

বর্তমান নৈরাশ্যকে দূর করে দিয়ে একটা বলশালী উঁচু আশাকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলারও প্রেরণা জাগিয়ে তোলে।"

...দেশ (৫-৮-১৯৫০)

"...A rank newcomer, Utpal Dutta, springs a genuine surprise by playing the title role in a fashion as if he was born to act that great character."

...HINDUSTHAN STANDARD.
(22.7.50)

"...It is a positive contribution to Bengal's screen art, reflecting Modhu Bose's lofty achievement in the realm of direction and story-telling."

...AMRITA BAZAR PATRIKA, (23.7.50)

'মাইকেল মধুসূদন'-এর অভাবিত সাফল্যে প্রযোজক শ্রীমণি গুহ অর্থ এবং সম্মান দুই-ই প্রচুর পেলেন। এতদিনে ওঁর মুখে হাসি ফুটল। আমাকে একদিন উনি বললেন যে, এবার তিনি যে ছবি করবার পরিকল্পনা করছেন, সেটা হিন্দী ও বাংলা দুটি ভাষাতেই করবেন। আমার সঙ্গে ওঁর একটা মৌখিক বোঝাপড়া হলো যে, ওঁর পরবর্তী ছবিটা আমিই পরিচালনা করব।

'মাইকেল'-এর সাফল্যের দরুণ দুই-একজন চিত্রনির্মাতা এলেন, তাঁদের হয়ে ছবি করবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমি তখন মণিবাবুকে কথা দিয়েছি যে, তাঁর পরবর্তী দোভাষী ছবি করব, যদিও কোন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিনি, তবু কথা তো দিয়েছি—সুতরাং কোন চিত্রনির্মাতার কথাই আমি খুব আমল দিলাম না।

'মাইকেল'-এর শুটিং-এর সময় যে পরিমাণ মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম হয়েছিল, এইবার 'মাইকেল' মুক্তিলাভ করার পর বেশ কিছুদিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেব বলে স্থির করেছিলাম। কিন্তু পূর্ণ বিশ্রাম আর হয়ে উঠল না। 'মাইকেলে'র সাফল্যে চারিদিক থেকে বন্ধু-বান্ধবদের অভিনন্দনের ঠেলায় আমার প্রাণ যায় আর কি? প্রায়ই 'থি হাণ্ড্রেড ক্লাবে' কোন-না-কোন বন্ধুর সম্বর্ধনা রক্ষা করতে যেতে হতো। সেগুলি বেশীর ভাগই ককটেল পার্টি—শেষ হতে কোন-কোন দিন ভোর হয়ে যেত।

'মাইকেলে'র শুটিং-এর সময় উৎপলের সঙ্গে আমার একটা গভীর হৃদ্যতা ও প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সাধারণত যে প্রীতি গড়ে ওঠে, এ ছিল তার থেকেও গভীর, ভাই-ভাই-এ যে স্নেহ-ভালবাসা থাকে, এ ঠিক তাই। তাই ছবি শেষ হয়ে সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করার পরেও আমাদের দুজনের মধ্যে সে সম্বন্ধ এতটুকু শিথিল হয়নি। বরং গভীরতরই হয়েছিল বলা চলে। সে আমাকে অনুরোধ করত লিটল্ থিয়েটারের হয়ে সে যে-সব নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা

করত তা দেখতে যাবার জন্য। এগুলি বেশীর ভাগই ছিল শেক্সপীয়রের নাটক ইংরাজীতে।

আমি একদিন তাকে বললাম: শেক্সপীয়রের নাটক মঞ্চস্থ করছ—খুব ভাল কথা, কিন্তু বাংলা নাটক কিছু করছ না কেন? তোমার মধ্যে বিরাট প্রতিভা আছে, আর তোমার লিটল্ থিয়েটার গ্রুপে যে-সমস্ত শিল্পী আছে, তাদের মধ্যেও যথেষ্ট শক্তি আছে, তুমি তাদের ট্রেনিং দিলে তারা বাংলা নাটকে ভালই করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমার এই কথাগুলো উৎপল মন দিয়ে শুনল। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এর পর উৎপল লিটল্ থিয়েটার গ্রুপের শিল্পীদের ট্রেনিং দিয়ে বাংলায় নাটক মঞ্চস্থ করতে শুরু করে। আজ উৎপল দত্তের নাম বাংলার মঞ্চজগতে যুগান্তর নিয়ে এসেছে। শ্রেষ্ঠ মঞ্চ-প্রযোজকদের মধ্যে আজ উৎপল একজন। একের পর এক যুগান্তকারী নাটক লিখে এবং তা পরিচালনা করে, বহু-পুরাতন মিনার্ভা থিয়েটারে—দিনের পর দিন আজ কয়েক বৎসর ধরেই সে নাট্যজগতে আলোড়ন নিয়ে এসেছে। নইলে তো মিনার্ভা থিয়েটারের নাম লোকে ভুলেই যেতে বসেছিল।

সত্যই আজ উৎপল অভিনেতা, নাট্যকার ও নাট্য-প্রযোজক হিসাবে প্রচুর নাম করেছে, কিন্তু ষোল বছর আগে অর্থাৎ 'মাইকেল' ছবির শুটিং-এর সময় সে দোটানার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। অভিনয়কেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে, না 'স্টেটস্-ম্যানে'র সম্পাদকীয় বিভাগেই কাজ করবে অর্থাৎ সাংবাদিকের জীবন গ্রহণ করবে—এটাই ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কিন্তু তার সহজাত আসক্তি ছিল নাটক, অভিনয় ও মঞ্চের ওপর। আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করত: আপনি কি বলেন মিঃ বোস? আমি কি অভিনয় এবং নাট্য-প্রযোজনাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করব? কিন্তু তাহলে তো আমায় 'স্টেটসম্যানে'র চাকরী ছাড়তে হবে।

'মাইকেলে' তার কাজ দেখে আমার ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, সে বিরাট প্রতিভার অধিকারী। আমি তাকে বললাম: সত্যিই 'স্টেটসম্যানে' চাকরী করলে তোমার এই প্রতিভা সব নষ্ট হয়ে যাবে।

তার যেটি প্রাণের কথা, আমি যে সেটাই সমর্থন করছি, তাতে সে খুশী হয়ে বলল: আপনি একবার আমার মাকে বলুন না মিঃ বোস! তাঁর ইচ্ছে নয় যে, আমি স্টেটসম্যানের চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে অভিনয়কেই পেশা হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ করি। অবশ্য আমার অভিনয় করা এবং নাট্য-প্রযোজনা করায় তাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। আর তাছাড়া তাঁর মন খুব উদার এবং প্রগতিপন্থী। সুতরাং

আপনি যদি তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলেন তাহলে হয়ত তিনি রাজী হয়ে যাবেন। সত্যি কথা বলতে কি মিঃ বোস, 'স্টেটসম্যানে'র এ কাজ আর আমার ভাল লাগে না মোটেই। কিন্তু আমার কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, সাংবাদিক হিসেবে আমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, ইংরেজী লেখায় আমার বেশ ভাল দখল আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উৎপল অবশ্য ইংরাজী সাহিত্য প্রচুর পড়াশোনা করেছে এবং সে সত্যিই ইংরাজী ভাল লেখে।

যাই হোক, উৎপলের মার সঙ্গে একদিন দেখা হলো। আলাপ করে দেখলাম অসম্ভব বুদ্ধিমতী এবং অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী এই মহিলা। আমি তখন তাঁকে বললাম যে, উৎপলের মত একটা বিরাট প্রতিভার অপচয় ঘটছে 'স্টেটসম্যানে' চাকরী করে অথচ অভিনেতা এবং নাট্য-প্রযোজক হিসেবে তার বিরাট সম্ভাবনা পড়ে আছে।

তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন এবং উৎপলকে 'স্টেটসম্যানে'র চাকরীতে ইস্তফা দেবার অনুমতি দিলেন।

প্রথম দিন দেখা হবার পর থেকেই উৎপলের মার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মনটা ভরে উঠেছিল। সেদিন থেকে তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমাদের এই শ্রদ্ধার সম্পর্ক অটুট ছিল। আমি সত্যিই তাঁকে আমার একান্ত শুভানুধ্যায়িনী এবং বন্ধু বলে মনে করতাম। মনে আছে, ১৯৫৪-৫৫ সালে একবার এস্টোরিয়া হোটেলে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। দীর্ঘ রোগভোগের পর আমি সবে একটু সুস্থ হয়েছি এমন সময় উৎপলের মা একদিন এলেন আমায় দেখতে। কথায় কথায় তাঁকে বলেছিলাম যে, হোটেলের খাওয়ায় অরুচি ধরে গেছে, বিশেষ করে এই সময় যদি একটু ভাল বাংলা রান্না খেতে পেতাম, তাহলে মুখটা ছাড়ত।

এই কথা শুনে তিনি বললেন: বাংলা রান্না খেতে চান—এ আর এমন কি বড় কথা! আপনি একটু ফোন করে আপনার চাকরকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি রান্না করে পাঠিয়ে দেব।

আমি আপত্তি করাতে তিনি বললেন: আপনি বলেছেন যে উৎপল আপনার ছোট ভাই-এর মত, সুতরাং আমার সঙ্গে এ-ফর্মালিটি কেন?

এ-কথার পরে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। এরপর বেশ কয়েকদিন উনি রান্না করে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সত্যই একজন উদার এবং উচ্চমনা মহিলা ছিলেন। উৎপল তার মার কাছ থেকে অনেক গুণই পেয়েছে। পৃথিবীতে দেখা গেছে, মাতা যদি মহীয়সী মহিলা হন, তাঁর সন্তানও সেইসব সদ্গুণের

সবগুলি না হোক, অনেকখানি পায়। বিখ্যাত মনীষীদের সাফল্যের মূল উৎস তাঁদের মা—এসম্বন্ধে পৃথিবীতে বহু উদাহরণ আছে, নতুন করে আশা করি আর বলবার দরকার হবে না। উৎপল সত্যই ভাগ্যবান—এইরকম একজন মহীয়সী মহিলাকে তার মা হিসেবে পেয়েছিল বলে।

যাক, আগের কথায় ফিরে আসি।

মাসখানেক পরে এক দন মণিবাবু এসে আমায় জানালেন যে, তিনি তাঁর পরের ছবির গল্প ঠিক করে ফেলেছেন। তাতে আমি বললাম: আমার সঙ্গে কোনরকম আলোচনা করলেন না, অথচ নিজেই গল্প ঠিক করে ফেলেছেন?

তাতে তিনি বললেন: আমি জানি এ-গল্প আপনার পছন্দ হবেই—এ হলো আপনার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গল্প।

—রবীন্দ্রনাথের কোন্ গল্প? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—মালঞ্চ। পড়েছেন নিশ্চয়ই। তিনি হাসিমুখে বললেন। 'মালঞ্চ' পড়েছি বলে তখন আমার মনে পড়ল না। আমি একটু ভেবে বললাম: মালঞ্চ? কই না, পড়েছি বলে তো মনে পড়ছে না। তাঁর তো বহু ছোটগল্প আছে—হয়ত তার মধ্যে আছে। তা এ-'মালঞ্চে'র কথা কে আপনাকে বলল?

মণিবাবু তার কোনো জবাব না দিয়ে কথাটা এড়িয়ে গেলেন।

আমি শ্যামের কাছে শুনেছিলাম যে, 'মাইকেলে'র সাফল্যের পর মণিবাবুর এখন অনেক বন্ধু জুটেছে। তাদের বন্ধু না বলে স্তাবক বলাই ভালো। তাদেরই মধ্যে কেউ যে পরামর্শ দিয়েছে—এটা বেশ বুঝলাম।

আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম: 'মালঞ্চ' গল্পটি নির্বাচন করতে কে আপনাকে পরামর্শ দিয়েছে, বলুন না?

এবারেও তিনি আমাকে কোনোরকম জবাব না দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর একটি খণ্ড আমাকে দিয়ে গেলেন—যার মধ্যে 'মালঞ্চ' গল্পটি ছিল।

তারপর তিনি আমায় বললেন: আপনি আগে পড়ে দেখুন মিঃ বোস—গল্প আপনার নিশ্চয় ভাল লাগবে।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেই ফেললেন: হ্যাঁ, ভাল কথা—মালঞ্চের হিন্দী ও বাংলা দুটি সংস্করণের জন্যই বিশ্বভারতীর কাছ থেকে চিত্রস্বত্ব আমার কেনা হয়ে গেছে। টাকাকড়ি সব দিয়ে এসেছি।

শুনে তো আমি অবাক। ভাবতেও পারিনি যে তলে-তলে মণিবাবু সব কাজই

আগে থেকে পেরে তবে আমার কাছে এসেছেন। আমি বললাম: যে ছবি পরিচালনা করবে তার সঙ্গে গল্প সম্বন্ধে কোনোরকম আলাপ-আলোচনা না করেই আপনি একেবারে বিশ্বভারতীর কাছ থেকে দুটি সংস্করণের চিত্রস্বত্ব কিনে ফেললেন? এটা কি ঠিক হলো মণিবাবু? এর কোন উত্তর না দিয়ে তিনি শুধু বললেন: আপনি আগে পড়ুন, তারপর বলবেন যে, আমি ঠিক করেছি, কি ভুল করেছি। আমার মনে হয় গল্পটির মধ্যে দুটি সংস্করণের জন্যেই বিরাট সম্ভাবনা আছে।

এই বলে তিনি চলে গেলেন। বুঝলাম যে 'স্বয়ংসিদ্ধা' ও 'মাইকেলে' প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি হওয়ায় তাঁর এখন ধারণা হয়েছে যে, গল্প নির্বাচনের ব্যাপারেও তিনি যা স্থির করবেন তার থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না। যে পরিচালক ছবি পরিচালনা করবে তাঁর সঙ্গেও আগে থেকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন না।

যাই হোক, 'মালঞ্চ' হলো একটা ছোটগল্প, খুবই মনস্তত্ত্বমূলক—ঘটনার বিশেষ ঘাত-প্রতিঘাত নেই, যাকে বলে ড্রামাটিক ক্লাইম্যাক্স, তার একান্ত অভাব, এই হলো আমার মত। অথচ পড়তে ভাল লাগে। কিন্তু পড়তে ভাল লাগলেই তার চিত্ররূপ দেওয়া যায় না।

আমার এই মতই জানালাম মণিবাবুকে, যখন তিনি এলেন ৩।৪ দিন পরে।

সেই সঙ্গে এও জানালাম যে, এই গল্পের ওপর ভিত্তি করে কোন ফিল্ম করা সম্ভব নয় আমার মতে। এতে আছে শুধু মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ। পড়তে খুব ভাল লাগলেও আমি কাউকে ছবি করার কথা বলব না।

আগেই বলেছি যে মণিবাবু বিশ্বভারতীর কাছ থেকে চিত্রস্বত্ব কিনে ফেলেছেন, সুতরাং এখন আর তিনি আমার কোন যুক্তিই শুনলেন না। উপরন্তু তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে লাগলেন: 'মালঞ্চে'র মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা আছে। আমি অনেক যুক্তি দিয়ে তর্ক করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি কোন কথাই কানে তুললেন না।

তাঁর শেষ কথাগুলো এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বলেছিলেন: মিঃ বোস, আপনি খুব বড় ডিরেক্টার, আর্টিস্টদের শেখানও খুব সুন্দর—আপনি অনেক ভাল ভাল বড় ছবি পরিচালনা করেছেন, কিন্তু গল্প নির্বাচন ব্যাপারে জনসাধারণ কোন্ গল্প নেবে, আর কোন্ গল্প নেবে না—এটা অন্ততঃ আমি ভালই বুঝি। তারা কি চায় আমি খুব ভালরকম বুঝে নিয়েছি, সুতরাং গল্প নির্বাচনের ভারটা আপনি আমার ওপরই ছেড়ে দিন। আপনি এ বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে চিত্রনাট্য লিখুন,

শিল্পী নির্বাচন করে তাঁদের ট্রেনিং দিন, অর্থাৎ পরিচালনার ব্যাপারে যা আপনার করণীয় তাই করুন।

বুঝলাম মণিবাবুর মানসিক অবস্থা তখন এমন একটা পর্যায়ে পেঁছেছে, যেখান থেকে তাঁকে টলানো যাবে না। সুতরাং যে-কোনোরকম যুক্তি-তর্কই এখানে নিস্ফল—এও বুঝলাম।

একথার উত্তরে আমি বললাম: আজ পর্যন্ত আমি অনেক রকমের ছবি পরিচালনা করেছি, 'আলিবাবা' থেকে 'মাইকেল'—কিন্তু আমি কখনও জোর গলায় বলতে পারি না যে, জনগণ কি চায়? আর আপনি দু'খানা ছবি করেই জনগণের মনের কথা বুঝে নিয়েছেন?

বেশ—আপনি যখন মনস্থির করেই ফেলেছেন যে, এই 'মালঞ্চ'রই দোভাষী ছবি করবেন, তখন আর আমার কিছু বলবার নেই। তবে আমাকে মাপ করবেন। এ ছবির পরিচালনা করা আমার দ্বারা হবে না।

মণিবাবু আমার এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বললেন: আপনি ভুল করছেন মিঃ বোস। পরিচালক হিসেবে আপনি ভাল টাকাই পেতেন। তাছাড়া আমি বলছি 'মালঞ্চ'র গল্প দর্শকে ভালই নেবে।

আমি তখন একটু বিরক্ত হয়েই বললাম: আমি জানি যে ডিরেকসনের জন্যে আমি ভাল টাকা পেতাম, কিন্তু টাকাটাই আমার জীবনে সব কিছু নয়। তা যদি হতো তাহলে আজ আমি বেশ দু' পয়সা জমাতে পারতাম। হয়ত একটা বাড়ীও করতে পারতাম। বছরের পর বছর এভাবে হোটেলে কাটাতে হতো না। কিন্তু, ভালই বলুন আর মন্দই বলুন, কি আমার বোকামীই বলুন, টাকার চেয়ে আমি উঁচুতে স্থান দিই আমার সুনামকে। আমি কোন মতেই যেটুকু সুনাম অর্জন করেছি তা নষ্ট করে বদনাম কিনতে পারব না। কারণ এই গল্প থেকে কখনও ভাল ছবি হতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস। এই ছবির জন্যে যখন কয়েক লক্ষ টাকা নষ্ট হবে তখন আপনিই আমার বদনাম দেবেন। যাকগে, আমাকে আপনি মাপ করবেন, এ ছবি আমি করতে পারব না। আপনি অন্য কাউকে দিয়ে করান।

—এই যদি আপনার শেষ সিদ্ধান্ত হয় তাহলে আর আমি কি বলতে পারি? বলে তিনি চলে গেলেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, মণিবাবু নিজের জিদ বজায় রাখতে দুটি সংস্করণেই 'মালঞ্চ' ছবি করলেন। এ জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করেছিলেন। কিন্তু ছবি যখন রিলিজ হলো তখন দেখা গেল এরকম শোচনীয় অবস্থা (যাকে ইংরাজীতে বলে absolute

flop) খুব কম ছবির ভাগ্যেই ঘটেছে। শুনেছিলাম এই বাবদ মণিবাবুর খুব মোটা রকমের ক্ষতি হয়েছিল—বেশ কয়েক লক্ষ টাকার মত।

যাই হোক, মণিবাবুর সঙ্গে এতদিন ধরে একটা মৌখিক কথাবার্তা চলছিল বলে আমি আর কোন প্রডিউসারকেই বিশেষ আমল দিই নি। এখন 'মালঞ্চ' ছেড়ে দিয়ে আমাকে বেশ একটু বিব্রত হয়ে পড়তে হলো। এদিকে যে সব প্রোডিউসার এর আগে আমার কাছে এসেছিল তারা ইতিমধ্যে অন্য লোককে দিয়ে ছবি আরম্ভ করে ফেলেছে। সুতরাং হাতের কাছে আর কোন কন্‌ট্রাক্ট না থাকায় চোখে অন্ধকার দেখলাম।

এইভাবে পূজা কেটে গেল। 'মাইকেল' রিলিজ হয়েছিল জুলাই মাসে—এই ৩।৪ মাস বসে থেকে আমার যা কিছু সঞ্চয় ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল।

আমার জ্যোতিষী বন্ধু রাখালদাস কুণ্ডু প্রায়ই আসে। আগেই বলেছি তার সম্বন্ধে। কুণ্ডুর গণনা প্রায়ই নির্ভুল হয়। এবারও সে গণনা করে বলল যে, ডিসেম্বর নাগাৎ আমি একটা ছবির কণ্ট্রাক্ট পাব এবং কিছু টাকাও পাব।

এই সময় হাতে কাজকর্ম নেই, তার ওপর একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোর দরুণ আবার আর একটা দারুণ মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলাম। ফলে পানীয়র মাত্রা গেল বেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে খরচও খুব বেড়ে গেল। কি রকম যেন একটা গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

হেম সোম, বসন্ত, জজি, সুধীন দত্ত, কুণ্ডু এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুরা প্রায়ই আসত—এসে নানাভাবে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা করে আমাকে চাঙ্গা করে তুলবার আপ্রাণ চেষ্টা করত। যতক্ষণ তারা থাকত, ততক্ষণ সময়টা বেশ কেটে যেত, কিন্তু তারা চলে গেলেই আবার যে তিমিরে, সেই তিমিরে।

দেখতে-দেখতে ডিসেম্বর মাস এল—আর আশ্চর্যভাবে কুণ্ডুর গণনা এবারেও ফলে গেল। আমি প্রযোজক শ্রী এস. ডি. নারাং-এর সঙ্গে একটি বড় ছবির কণ্ট্রাক্ট সই করলুম। ছবিখানির নাম হলো 'সিরাজদ্দৌল্লা'।

টাকা পেলাম। কাজও এল—আর সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শান্তিও ফিরে এল।

আমি 'সিরাজদ্দৌল্লা'র চিত্রনাট্য রচনা শুরু করে দিলাম বঙ্কিমকে নিয়ে। বঙ্কিম এবারও আমার প্রধান সহকারী ছিল।

সিরাজদ্দৌল্লা ইতিহাসের একটি বিরাট চরিত্র, সুতরাং এ চরিত্রটিকে ভালরকম জানতে গেলে, বুঝতে গেলে, আগে বেশ ভালরকম পড়াশুনা করতে হবে।

সেইজন্যে আমি আর বঙ্কিম তদানীন্তন বাংলার ইতিহাস খুব ভাল করে পড়তে শুরু করে দিলাম। সিরাজদ্দৌল্লা সম্বন্ধে যেখানে যা তথ্য পাওয়া গেল সব সংগ্রহ করলাম। স্যর যদুনাথ সরকারের 'বাংলার ইতিহাস'-খানিকে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে সামনে রেখে আমরা অগ্রসর হতে থাকি। প্রায় দু'মাস লাগল সিরাজের জীবন, সে সময়ে দেশের পরিস্থিতি এবং অন্যান্য চরিত্রগুলিকে ঠিকমত বুঝতে।

আমি দেখলাম সিরাজের চরিত্রে আছে প্রচুর নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত যা খুবই করুণ এবং মর্মস্পর্শী। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে যে একটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী চিত্রনাট্য রচনা করা সম্ভব সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হলাম। মার্চের মধ্যে সিরাজদ্দৌলার চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ হলো। ছবির সংলাপগুলি সব বঙ্কিমই লিখল। এই চিত্রনাট্য যেদিন পড়া হলো সেদিন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, এরকম চিত্তাকর্ষক চিত্রনাট্য তাঁরা খুব কমই শুনেছেন। আমারও তাই ধারণা। মিঃ এস. ডি. নারাংও চিত্রনাট্য শুনে খুশীই হয়েছিল।

'সিরাজদ্দৌলার' মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধের দৃশ্য ছিল। এর মধ্যে অবশ্য প্রধান হলো সেই চিরস্মরণীয় পলাশীর যুদ্ধ। চিত্রনাট্য শুনে তো মিঃ নারাং খুব খুশী হলো, কিন্তু এই সব যুদ্ধের দৃশ্য তুলবার কথা ভেবেই মিঃ নারাং বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। চিন্তিত হবারই কথা, কারণ ফরাসী ও বৃটিশ সৈন্যবাহিনী দেখাতে গেলে দরকার প্রচুর ইংরাজ সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য, হাতী এবং হাজার হাজার লোকজন। ফরাসী, বৃটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যদের সমস্ত পোষাক, তারপর চরিত্রগুলির পোষাক-পরিচ্ছদ সবই তৈরী করতে হবে। এদের খরচের কথা ভেবে চিন্তা হবারই তো কথা।

মিঃ নারাং-এর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলে আমি বুঝলাম যে, তার এত টাকাও নেই, আর এত বড় ছবি করবার মত তার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাও নেই। মুখে অবশ্য মিঃ নারাং কিছু বলল না বটে, তবে কথাবার্তায় ও ভাবে-ভঙ্গীতে বুঝলাম যে, সে ছবি করতে চায় খুব সস্তায়। কিন্তু আমাকে ভেঙে কিছু না বলায় আমিও তখনকার মত চুপ করেই রইলাম।

খ্যাতিমান তরুণ শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত চরিত্রগুলির পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সেটের ডিজাইন করল। অনেক পরিশ্রম করে আশু প্রত্যেক চরিত্রের একাধিক কস্টুমের ডিজাইন করেছিল।

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ভূমিকা নির্বাচন শুরু করলাম। নতুন নতুন মুখ নিয়ে বরাবরই আমার কাজ করার ঝোঁক। সিরাজের ভূমিকার জন্য বহু

নামকরা পুরোনো শিল্পী আমার কাছে আবেদন জানিয়েছিল, কিন্তু আমি অবশ্য শেষ পর্যন্ত বীরেন চ্যাটার্জিকেই মনোনীত করেছিলাম। বীরেন তখন সবেমাত্র দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছে। চিত্রাভিনেতা হওয়ার ইচ্ছেটাই তখন তার মধ্যে প্রবলতম এবং এইটাকেই সে পেশা হিসেবে নিতে চায়।

দেখলাম তার চেহারাটি ভাল এবং দেখতেও সুপুরুষ। বীরেনকে নির্বাচন করার আর একটা মস্ত বড় কারণ ছিল যে সে হিন্দী বলতে পারে চমৎকার। মিঃ নারাং আমাকে বলেছিল যে, এত বড় একটা বিরাট ব্যয়বহুল ছবি হিন্দী ও বাংলা দুই সংস্করণে না করলে আর্থিক ক্ষতি হবে, শুধু বাংলা সংস্করণ করলে টাকা তোলা মুস্কিল হবে। কিন্তু তখন তার সব কিছুই নির্ভর করছিল তার একটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত বাংলা ছবির ওপর। তার ধারণা ছিল এই বাংলা ছবিটির আর্থিক সাফল্য বিরাট কিছু হবে এবং সেই টাকা থেকেই এই দোভাষী ছবি সিরাজদ্দৌলার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হবে।

সিরাজের পত্নী লুৎফন্নিসার জন্য আমি নির্বাচন করলাম ঊষা খাঁ (দেবযানী)-কে।

এই চিত্রনাট্যে আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র ছিল নর্তকী—ফৈজী। এই চরিত্রটিকে শুধু নর্তকীর চরিত্র বললে ভুল হবে, এর মধ্যে রয়েছে বিরাট নাটকীয় সংঘর্ষ। এই ভূমিকাটির ওপর যে সুবিচার করতে পারে সে একমাত্র সাধনা। তাকে ছাড়া আর কারু কথা আমি ভাবতেই পারলাম না। সাধনা তখন বোম্বাইতে, আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত ব্যবস্থা করলাম এবং মিঃ নারাং-এর সংগে তার কন্‌ট্রাক্টও সই হয়ে গেল।

মিঃ নারাং-এর বাংলা ছবিখানি মুক্তিলাভ করার কথা ছিল এপ্রিলের শেষ নাগাৎ, সেইজন্য সে ঠিক করেছিল যে 'সিরাজদ্দৌলা'র শুটিং আরম্ভ হবে মে মাসের শেষে কিম্বা জুন মাস নাগাৎ।

যতই শুটিং-এর তারিখ এগিয়ে আসতে লাগল এবং প্রোডাকশানের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের তালিকা মিঃ নারাং-এর কাছে যেতে লাগল, সেই সব জিনিষের দামের অঙ্ক দেখে মিঃ নারাং ততই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগল। বেশ মোটারকম একটা আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে এসব জিনিষের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত হতে পারে না, এদিকে সে তার একখানি সদ্য-মুক্ত বাংলা ছবির ওপর সমস্ত ভরসা করে বসেছিল। দুর্ভাগ্যবশত ছবিখানি লোকে তেমন নিল না, ফলে তার সমস্ত প্রোগ্রামই উল্টে-পাল্টে গেল। আমি যখনই প্রোডাকশনের কোন বন্দোবস্ত করতে বলি, কি প্রধান

ভূমিকাগুলির কণ্ট্রাক্ট করতে বলি, তখনই মিঃ নারাং বলত : সব হবে মিঃ বোস, আমি দিন পনেরোর মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

কিন্তু তার কথার ভাবে বুঝলাম যে, যদিও মিঃ নারাং এ ছবি করে, তবে তা খুব সস্তায় করতে চেষ্টা করবে, অর্থাৎ যাকে চিত্রজগতের ভাষায় বলে 'ঠুকে' দেওয়া আর কি। মানে যুদ্ধের দৃশ্য কিছুই তুলতে চায় না। আমি তখন তাকে বললাম : যুদ্ধের কোন দৃশ্যই যদি না তোলা হয়, এমন কি সেই বিখ্যাত পলাশী যুদ্ধও জোড়াতালি দিয়ে স্টক-শট (stock shot) দিয়ে 'ঠুকে' দেওয়া হয়, তার ওপর প্রোডাকশানের অন্যান্য দিকেও খরচ কমিয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ করবার তালে থাকলে আর 'সিরাজদ্দৌলা'র মত ছবি করতে নামা কেন?

মিঃ নারাং আমাকে মুখে কিছু না বললেও আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ একটা মন কষাকষি চলতে লাগল। একদিন একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সে আমাকে জানাল যে, সে এই ছবি করার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছে।

মিঃ নারাং-এর সিদ্ধান্তে আমি মর্মাহত হলাম—অনেক খেটে এর চিত্রনাট্য রচনা করেছিলাম। তার ওপর 'সিরাজদ্দৌলা'র মত একটা বিরাট ঐতিহাসিক ছবি তুলব হিন্দী ও বাংলায়—যাতে থাকবে সর্বভারতীয় আবেদন। অবশ্য যখন আমি মিঃ নারাং-এর এই কণ্ট্রাক্ট সই করি, তখন আমার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব বলেছিলেন যে, 'সিরাজদ্দৌলা'র মত এমন বিরাট ছবি করবার মত প্রযোজক বাংলাদেশে কেউ নেই, যার আর্থিক সঙ্গতি এবং সুদক্ষ প্রোডাকশান বিভাগ রয়েছে।

যা হোক, সত্যই আমার দুঃখ হলো মিঃ নারাং-এর জন্য। কারণ সে বেশ কিছু টাকা খরচ করেছিল চিত্রনাট্য রচনা ও অন্যান্য বিষয়ে। এর কিছুদিন পরে বোধহয় অক্টোবর মাস নাগাদ মিঃ নারাং কলকাতার তল্পি-তল্পা গুটিয়ে বোম্বাই চলে গেল।

মানুষ হিসেবে মিঃ নারাং সত্যিই খারাপ ছিল না, বরং আমার একজন ভাল বন্ধুই ছিল, বলা চলে। তবে সে ছিল একজন দুঃসাহসী অ্যাড্‌ভেনচারার। সুখের বিষয়, তার এই দুঃসাহস বম্বে গিয়ে বেশ কার্যকরী হয়েছে। তার কয়েকটি ছবি ওখানে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। এখন সে বোম্বের নামকরা চিত্র-নির্মাতাদের মধ্যে একজন।

১৯৫২ সালের গোড়ার দিকে আমি গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল ছেড়ে দিলাম। প্রায় ছয় বছর ধরে থাকার ফলে, একে আর হোটেল বলে মনে হতো না—একরকম ঘর-বাড়ীর মত হয়ে গিয়েছিল : ছাড়বার সময় একটু কষ্ট হয়েছিল বই কি!

গ্রেট ইস্টার্ণ ছেড়ে আমি চলে আসি গ্র্যাণ্ড হোটেলে, তারপর ওখান থেকে

সদর স্ট্রীটের ফেয়ারলন হোটেলে। গ্রেট ইস্টার্ণের তুলনায় এখানকার ঘরটি খুবই ছোট, তবে খাবার-দাবার ছিল চমৎকার। হোটেলটি হলো একটি আর্মেনিয়ান বৃদ্ধা মহিলার, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব জিনিষের তদারক করতেন।

ফেয়ারলন হোটেলে পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে সোম, কুণ্ডু, জজি এবং আরও অনেকে তো আসতই, তাছাড়া পুরোনো সাংবাদিক বন্ধুরাও প্রায়ই আসত। যাদের কথা আজ বিশেষভাবে মনে পড়ছে তারা হলো নির্মল ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকার স্বনামধন্য সিনেমা সম্পাদক এন. কে. জি.) এবং মহেন্দ্র সরকার (যুগান্তর)। এদের মধ্যে নির্মলের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। যখন আমরা চৌরঙ্গী প্লেসে ছিলাম এবং সি. এ. পি. যখন একটার পর একটা নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছিল—'আলিবাবা' এবং 'অভিনয়'-এর চিত্ররূপ যখন খুবই জনসমাদৃত—তারপর ১৯৪২ সালে যখন ষ্টিফেন কোর্টে এলাম তখন নির্মল প্রায়ই আসত আমাদের ওখানে। কিন্তু ফেয়ারলনে আসার পর আমাদের সে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ়তর হয় এবং আমি আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, আজও তা অক্ষুণ্ণ আছে।

এরপরে যে ফিল্মের কণ্ট্রাক্টটি আমি সই করি, নির্মলই হলো তার প্রধান সূত্র। প্রযোজক শ্রীকালীকিঙ্কর বিশ্বাসের (সুপ্রভাত ফিল্মস লিমিটেড) সঙ্গে নির্মলের বিশেষ পরিচয় ছিল, সেই-ই সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেয়। কণ্ট্রাক্ট সই হয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫২।

সুপ্রভাত ফিল্মস তখন ইতিমধ্যে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পতিতার সিদ্ধি' উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব সংগ্রহ করেছে। চিত্রনাট্য রচনার সময় আমি 'পতিতার সিদ্ধি' নাম পরিবর্তন করে রাখলাম 'রাখী'। কাহিনীটি ছিল খুবই নাটকীয় সংঘাতময়, নায়িকার ভূমিকায় আমি নির্বাচন করলাম সন্ধ্যারাণীকে আর নায়কের ভূমিকায় ঠিক করলাম অসিতবরণকে। তারা দুজনেই তখন খ্যাতির শীর্ষে। আর একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট ভূমিকায় ঠিক করলাম অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'কে। কৃষ্ণচন্দ্র এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ভারও নিলেন। এতে যে কয়খানি গান ছিল তা সবই লিখেছিল প্রণব রায়। অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিল শিপ্রা মিত্র, বীরেন চ্যাটার্জি, ছায়া দেবী, তুলসী চক্রবর্তী, প্রীতি মজুমদার, কেতকী দত্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আমি যখন 'রাখী'র চিত্রনাট্য প্রায় শেষ করে এনেছি বঙ্কিমের সঙ্গে বসে (এ ছবিতে সেই ছিল প্রধান সহকারী এবং সংলাপও সেই লিখেছিল) তখন আমার কাছে মণিলাল শ্রীবাস্তব একটি প্রস্তাব আনল রবীন্দ্রনাথের একটি কাহিনীর চিত্ররূপ দেবার। আমার খুব ইচ্ছা ছিল না আর একটা ছবির কণ্টাক্ট সই করবার, কেননা

তখনও 'রাখী'র চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ হয় নি, কিন্তু গুরুদেবের আর একটি কাহিনীর চিত্ররূপ দেবার লোভও ছাড়তে পারলাম না। সেই জন্যে মণিলালের এ প্রস্তাবে আমি না-ও বলতে পারলাম না। প্রভা পিকচার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীমোহনলাল জেলোকার হয়ে এই মণিলাল শ্রীবাস্তবই সমস্ত কথাবার্তা বলছিল।

আমার বহুদিন থেকেই বাসনা ছিল গুরুদেবের 'শেষের কবিতা'র চিত্ররূপ দেবার। কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষী যে-কেউ আমার এই ইচ্ছার কথা শুনেছে সে-ই বলেছে : আরে, 'শেষের কবিতা'র কখনও ফিল্ম হয় ? এটা হলো একটা কাব্য। পড়তে খুব ভালো, কিন্তু নাটক কোথায় ? নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত কোথায় ? রবীন্দ্রনাথের এটি একটি শ্রেষ্ঠ রচনা—এর এতটুকু এদিক-ওদিক হলে জনসাধারণ তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। এরকম দুঃসাহসিক কাজ করতে যেও না মধু। শেষে কি তোমার চিত্রজীবনে একটা বিরাট কলঙ্কের দাগ লাগাবে ?

আমি চিরদিনই দুঃসাহসী। যে কাহিনীকে চিত্ররূপ দেবার কথা কেউ কল্পনাও করেনি সেই কাহিনীকে চিত্রে রূপায়িত করবার একটা বাসনা আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। আমি 'শেষের কবিতা' বার বার পড়লাম এবং যতই পড়ি ততই আমার মনের ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগল যে এর কাব্যধর্মী দিক ছাড়াও নাটকীয় সংঘাতও তৈরী করার প্রচুর ইঙ্গিত দিয়েছেন গুরুদেব। যাই হোক, আমি মণিলালকে বললাম যে আমি কণ্টাক্ট সই করতে পারি যদি শ্রীজেলোকা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' করতে রাজী হন।

শ্রীমোহনলাল জেলোকা ছিলেন প্রগতিশীল ভদ্রলোক। তিনি ব্যবসায়ে প্রচুর টাকা করেছিলেন, তিনি এমন একটা ছবি করতে চাচ্ছিলেন যাতে সুনামটা হয় বেশী, অথচ লোকসান না যায়। আমার ওপর তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। আমি যখন তাঁকে বললাম যে, 'শেষের কবিতা' হয়ত তেমন আর্থিক সাফল্য এনে দেবে না, যাকে বলে বক্স অফিস হিট—তবে তাঁর টাকা নিশ্চয় উঠে আসবে এবং সুনাম পাবেন প্রচুর। আর যদি ভাগ্যে থাকে তাহলে কিছু লাভ নিশ্চয়ই হবে। তবে ছবি হিসেবে বাংলা চিত্রজগতে 'শেষের কবিতা' যে একটি স্মরণীয় অবদান বলে স্বীকৃত হবে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মিঃ জেলোকা এই কথা শুনে খুশী হলেন—এবং আমার সঙ্গে কনট্রাক্ট সই করলেন ১৬ই অক্টোবর ১৯৫২।

আমি যখন 'শেষের কবিতা'র কনট্রাক্ট সই করলাম তখন 'রাখী'র চিত্রনাট্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমি তখন সময় পেলেই কালীদার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতাম। একদিন তিনি বললেন : আপনি রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' করছেন—

এ বিষয়ে আপনাকে একজন প্রচুর সাহায্য করতে পারবে, বিশেষ করে সংলাপ রচনায়।

ভদ্রলোকটি কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন: আপনি নেপেনকে চেনেন? মানে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আপনার সঙ্গে আলাপ আছে কি?

আমি বললাম: আলাপ আছে, তবে সামান্য। খুব ঘনিষ্ঠভাবে নেই। আমি জানি তিনি একজন নামকরা সাহিত্যিক।

কালীদা বললেন: নেপেন আমার অনেকদিনের বন্ধু। অবশ্য সেজন্য তাকে নিতে বলছি না। সে আপনাকে চিত্রনাট্য-রচনায় অনেকরকম সাহায্য করতে পারবে—আর রবীন্দ্রনাথের বই-এর সংলাপ যদি কেউ ঠিকমত লিখতে পারে তো সেই-ই পারবে। সেদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—ওর সময়টা এখন খুব ভাল যাচ্ছে না। একটা কাজকর্ম হলে ওরও উপকার হয়—আর আপনিও উপকৃত হবেন।

আমি সেদিন চলে আসার সময় বলে এলাম যে যত শিগ্‌গীর সম্ভব সে যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে।

দিন দুই পরে নৃপেন এল আমার সঙ্গে দেখা করতে ফেয়ারলন হোটেলে—সঙ্গে রয়েছে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ফুল। পরে বুঝলাম যে এইটাই তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো বিলাসিতা। যখনই বাড়ী ফেরে তখনই প্রচুর ফুল নিয়ে ফেরে।

নৃপেনের সঙ্গে 'শেষের কবিতা' বই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো। নৃপেনও বলল: 'শেষের কবিতা'র চিত্ররূপ দেওয়া খুবই দুঃসাহসিক কাজ, কিন্তু তুমি যখন মনস্থির করেই ফেলেছ তখন দেখাই যাক কতদূর কি করা যায়!

'রাখী'র শুটিং তখন সুরু হয়েছে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র চিত্রনাট্যও লেখা শুরু করলাম নৃপেনের সংগে। আমি পর পর কোন দৃশ্য আসবে তাই লিখে দি, যাকে ফিল্মের ভাষায় বলে Scene Sequences—আর সে সেগুলিকে ঠিকমত বিন্যস্ত করে সংলাপ রচনা করে যায়।

'রাখী'র শুটিং বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলল। প্রযোজক কালীকিঙ্কর বিশ্বাস আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। টেকনিসিয়ান স্টুডিওর সব কলাকুশলীরাও আমাকে সবদিক দিয়ে সহযোগিতা করেছিল—বিশেষ করে শব্দযন্ত্রী সত্যেন চ্যাটার্জি। জয়ন্তীভাই জানি ক্যামেরার কাজ করেছিলেন। আগেই বলেছি অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে সঙ্গীত-পরিচালনা করা ছাড়াও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় (এক অন্ধ সঙ্গীতজ্ঞ)

অভিনয় করেছিলেন। শ্যাম দাস ছিল সম্পাদক এবং তাকে সাহায্য করেছিল শিব ভট্টাচার্য (মণ্টু)।

'রাখী'র শুটিং যখন পুরোদমে চলেছে এবং 'শেষের কবিতা'র চিত্রনাট্যও যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন এস. বি. পিকচার্সের শ্রীজীবন দত্ত এলেন আর একটি ছবি করার প্রস্তাব নিয়ে। ছবিটির নাম হলো মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'। পড়ে গেলাম মহা সমস্যায়। এদিকে 'রাখী'র শুটিং চলছে, ওদিকে 'শেষের কবিতা'র প্রস্তুতি চলছে—এ অবস্থায় আর একখানি ছবির দায়িত্ব নিই কি করে? এ ছবিখানিও আবার নৃত্যগীতবহুল বিরাট ছবি।

জীবনবাবুকে বললাম: আমার হাতে এখন দুখানি ছবি রয়েছে। অন্ততঃ 'রাখী' release হোক, আর 'শেষের কবিতার'ও শুটিং কিছুটা অগ্রসর হোক—তখন 'বিক্রমোর্বশী'র কাজ আরম্ভ করব।

তাতে জীবনবাবু বললেন: আমার এর মধ্যে ডিষ্ট্রিবিউটার ঠিক হয়ে গেছে—তারা শীগ্‌গির শুটিং আরম্ভ করতে চায়। আপনি যেরকম সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করেন তাতে 'রাখী'র শুটিং চালিয়েও 'শেষের কবিতা' এবং 'বিক্রমোর্বশী'র চিত্রনাট্য তৈরী করা কিছু অসম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আমি চাই 'বিক্রমোর্বশী' যেন হয় ঠিক আপনার 'রাজনর্তকী'র মত—বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ, নাচগানেভরা একখানি ছবি। আমি তো বাংলাদেশে আর কোনো লোক দেখি না যে এই ছবি করতে পারবে।

আমার কিন্তু সত্যিই আর বড় ছবি নিতে মন চাইছিল না, বিশেষ করে 'শেষের কবিতা'র জন্য—কারণ এতেই আমি সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু জীবনবাবু এমনভাবে ধরলেন যে আমি আর না বলতে পারলাম না।

আশ্চর্য! আমার জীবনের কথা ভাবতে গেলে সত্যিই আশ্চর্য লাগে। ১৯৫১ সালের মে মাসে আমার 'সিরাজদ্দৌলা'র চুক্তি নাকচ হয়ে গেল—তখন থেকে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত হাতে কোনো কাজ ছিল না। কাজের চেষ্টাও করিনি, কোনো প্রডিউসারও আমার কাছে আসেন নি। তারপর এই দু'মাসের মধ্যে একেবারে তিন-তিনটে কন্‌ট্রাক্ট—'রাখী', 'শেষের কবিতা' এবং 'বিক্রমোর্বশী'!

যাই হোক, ৭ই নভেম্বর ১৯৫২ সাল আমি শ্রীজীবন দত্তের সঙ্গে 'বিক্রমোর্বশী'র কন্‌ট্রাক্ট সই করলাম। তিনটি ছবির কাজই সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে চলতে লাগল—"রাখী"-র শুটিং এবং 'শেষের কবিতা' ও 'বিক্রমোর্বশী'র চিত্রনাট্য রচনা।

'শেষের কবিতা'র চিত্রনাট্য লেখা শেষ হলো ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ।

তারপর সমস্যা দাঁড়াল নায়ক ও নায়িকা নির্বাচন নিয়ে—অমিত রায়ে ও লাবণ্য। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি দীপ্তি রায়কেই ঠিক করলাম লাবণ্যের ভূমিকায়। কিন্তু 'অমিত রায়ে'র চরিত্র নির্বাচন করতেই প্রাণান্তকর ব্যাপার হলো।

অনেক শিল্পী দেখলাম, কারুর চেহারার মিল হয়-তো অভিনয়ক্ষমতা নেই, আবার যার অভিনয়ক্ষমতা আছে তার চেহারার সঙ্গে 'অমিত রায়ে'র মিল হয় না। খুবই মুস্কিলে পড়া গেল।

সবিতাব্রত দত্ত গুরুদেবের কোন একটা নাটকে অভিনয় করে মঞ্চে খুব নাম করে-ছিল। আমার এক সাংবাদিক বন্ধু আমায় বললে: আপনি সবিতাব্রতকে একবার চেষ্টা করে দেখুন না! অবশ্য চেহারার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা অনুযায়ী না মিললেও অভিনয়ের দিক থেকে সে ভূমিকাটিকে সুন্দর ফুটিয়ে তুলতে পারবে বলেই আমার মনে হয়।

সবিতাব্রতর কাছে খবর পাঠাতে সে এল। তার সঙ্গে 'অমিত রায়ে'র চরিত্র সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হলো। তারপরে সে নিজে থেকেই বললে: অভিনয়ের দিক থেকে আমি আপনাদের খুসী করতে পারব বলেই আমার বিশ্বাস, কিন্তু চেহারার দিক থেকে তো আমাকে মানাবে না মিঃ বোস। আমি বরং আমাদের দলের একটি ছেলেকে নিয়ে আসব আপনার কাছে। সে আমাদের সঙ্গে স্টেজে ছোটখাটো 'রোল' করে। আপনি তাকে একবার দেখুন। চেহারার দিক থেকে আমার মনে হয় তাকে ভালই মানাবে। যদিও সে এখন পর্যন্ত কোন ফিল্মে নামেনি—তবে আপনি তো বহু নতুন ছেলেমেয়েকে সুযোগ দিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে নায়ক-নায়িকারূপে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, সেইজন্যে আমার মনে হয়, সে যদি আপনার কাছে উপযুক্ত ট্রেনিং পায় তবে সেও ভূমিকাটিকে ভালই ফুটিয়ে তুলতে পারবে। তার বুদ্ধি আছে, প্রতিভাও আছে।

সত্যিই আমি সবিতাব্রতকে মনে মনে তারিফ না করে পারলাম না। গুরুদেবের সৃষ্টি 'অমিত রায়ে'র মত একটি বিখ্যাত চরিত্রে অভিনয়ের লোভ সংবরণ করা অন্য কোন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ! চরিত্রটির ওপর সুবিচার করবার জন্যেই সে নিজে লোভ না করে অপর একজন শিল্পীর নাম করল—এতে তার হৃদয়ের মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া গেল।

কয়েকদিন পরে সবিতাব্রত একটি তরুণ যুবককে সঙ্গে করে নিয়ে এল আমার কাছে এবং আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল এই বলে যে, এর নাম নির্মল চক্রবর্তী, কলকাতা হাইকোর্টের কোন একটা বিভাগে কাজ করে। নির্মলের সঙ্গে অনেকক্ষণ

ধরে কথা হলো, 'শেষের কবিতা' থেকে খানিকটা অংশ ওকে পড়তে দিলাম—দেখলাম ওর বাচন খুব স্পষ্ট এবং গলার স্বরটিও ভাল। চিত্রনাট্য থেকে একটা দৃশ্য ওকে লিখে দেওয়া হলো এবং বললাম দু-চারদিন পরে এই দৃশ্যটি ভাল করে পড়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

ঠিক হয়েছে, জানুয়ারি মাসে 'শেষের কবিতা'র শুটিং আরম্ভ হবে—প্রথমেই 'লোকেশন শুটিং'—শিলং-এ। অন্যতম ব্যবস্থাপক কল্যাণ গুপ্ত চলে গেছে শিলং-এ সব বন্দোবস্ত করে রাখতে—আর মণিলাল শ্রীবাস্তব কলকাতায় সব বন্দোবস্ত করছে। কার কোন ক্যামেরা যাবে, কার পোর্টেবল সাউণ্ড মেশিন যাবে—দলের মধ্যে যারা যাবে তাদের প্লেনে যাতায়াতের টিকিট বুক করা ইত্যাদি। শিল্পীদের মধ্যে শিলং-এর লোকেশনে যাওয়ার কথা হলো 'লাবণ্য', 'অমিত' ও 'কুমার মুখো'। লাবণ্যর ভূমিকায় দীপ্তিকে রিহার্সাল করেছিলাম আর কুমার মুখোর ভূমিকার জন্য নির্বাচন করলাম উৎপল দত্তকে। কুমার মুখুজ্জের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুদেব লিখেছেন : 'কুমার মুখুজ্জে অ্যাটর্নি। সংক্ষেপে কেউ বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো…অমিত তাকে ধূমকেতু নাম দিয়েছিল।… বিলাতে আজও যায়নি বলে তার বিলিতি কায়দা খুব উৎকটভাবে প্রকাশমান। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা দীর্ঘ মোটা চুরুট থাকে। এইটেই তার ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ।'

গুরুদেবের এই বর্ণনা পড়ে মনে হলো উৎপলকে এই ভূমিকায় চমৎকার মানাবে। যদিও ভূমিকাটি ছোট, কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 'মাইকেল'-এ ঐরকম অভাবিত সাফল্যের পর এইরকম একটা ছোট ভূমিকা উৎপলকে দিতে প্রথমটায় আমি একটু ইতস্তত করেছিলাম। কিন্তু আমি যখন তাকে এই ভূমিকাটির কথা বললাম তখন সে সত্যিকারের শিল্পীর মতো বললে : ছোট 'রোল' তো কি হয়েছে মিঃ বোস? আপনি যদি মনে করেন যে ভূমিকাটি আমাকে ঠিক মানাবে তাহলে আমি নিশ্চয় করব।

যাই হোক, নির্মলকে আমি কিছুদিন ধরে 'অমিত রায়ে'র ভূমিকাটির রিহার্সাল করে বুঝলাম যে সে এই চরিত্রটির ওপর সুবিচার করতে পারবে। সুতরাং তাকেই নির্বাচন করলাম।

অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে নির্বাচন করলাম চন্দ্রাবতী (যোগমায়া), ছবি বিশ্বাস (অবনীশ), বনানী চৌধুরী (সিসি), রমলা চৌধুরী (লিলি), সমর রায় (শোভনলাল) এবং বীরেন চ্যাটার্জী (নরেন)। বাকী রইল শুধু আর একটি

বিশিষ্ট চরিত্র—সেটি হলো 'কেটি'। এই ভূমিকার জন্য কোন শিল্পীকেই আমি ধারে-কাছে দেখতে পেলাম না।

বন্ধুবর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণর সঙ্গে কেটির চরিত্র নিয়ে বহু আলোচনা হতো। যদিও ভূমিকাটি ছোট, তবুও এর গুরুত্ব অসাধারণ। কেটির আসল রূপটি ফুটিয়ে তোলা খুবই শক্ত। বিশেষ করে কেটি যখন অমিত রায়ের কাছে শেষবারের মত বিদায় নিচ্ছে—তখন মনে হয় গুরুদেবের সমস্ত সহানুভূতি যেন কেটির ওপরই ঝরে পড়ছে।

যাই হোক, কেটির শুটিং যখন ফেব্রুয়ারী অথবা মার্চ মাসের আগে হবে না তখন শিলং-এর শুটিংটা শেষ করে আসা যাক। কেটির জন্যে শিল্পী পরে খুঁজলেই চলবে।

আমাদের শুটিং প্রোগ্রাম মত ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে আমরা শিলং গেলাম। শিল্পীদের মধ্যে ছিল নির্মল, দীপ্তি, উৎপল ও প্রীতিকুমার। কলাকুশলীদের মধ্যে ছিল ক্যামেরাম্যান জি. কে. মেহতা ও তার সহকারী, শব্দযন্ত্রী ও তার সহকারী, আর আমার সহকারী মণ্টু।

মণিলাল আমাদের দলের সকলেরই গৌহাটি পর্যন্ত প্লেনে যাবার সব বন্দোবস্ত করলে। কল্যাণ গৌহাটিতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল—গৌহাটি থেকে আমরা মোটরে করে শিলং পৌছলাম।

শিলং-এ আমি এবং দীপ্তি থাকতাম Pinewood hotel-এ আর সকলে থাকত অন্য একটি হোটেলে। শুটিং অনেক জায়গায় হলো—রাস্তায়, একটা খালি বাড়ীর মধ্যে, ঝর্ণার ধারে এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে—যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যিই মনোরম। 'শেষের কবিতা'র শুটিং-এর বন্দোবস্ত এমন সুষ্ঠুভাবে হয়েছিল যে, আমাদের একটা দিনের জন্যও কোনোরকম অসুবিধে ভোগ করতে হয়নি। আর এটা সম্ভব হয়েছিল মণিলাল এবং কল্যাণের সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্যে। এত সুন্দর বন্দোবস্ত আমি খুব কম দেখেছি। আমরা কাজ করতাম একটি সুখী পরিবারের মত। লাঞ্চের সময় সবাই একসঙ্গে বসে লাঞ্চ খেতাম কখনও পাইন বৃক্ষশ্রেণীর নীচে বসে, কখনও ঝরণার ধারে, কখনও পাহাড়ী নদীর ধারে বসে। সন্ধ্যার পর প্রায় রোজই দীপ্তি ও নির্মলকে নিয়ে আমার হোটেলে রিহার্সাল করতাম। এক-একদিন অনেক রাত হয়ে যেত।

শিলং-এর লোকেশন শুটিং শেষ হতে প্রায় দিন কুড়ি সময় লেগেছিল।

কলকাতায় ফিরে এসে 'বিক্রমোবর্শীর' চিত্রনাট্য রচনা এবং 'রাখী'র শুটিং নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

১৯৫৩ সালের প্রথম দিকটা আমার জীবনের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত সময়। একদিকে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে 'শেষের কবিতা'র শুটিং আরম্ভ হলো, ওদিকে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে 'রাখী'র শুটিং চলছে পুরোদমে—তার ওপর 'বিক্রমোর্বশী'র চিত্রনাট্য রচনা ও ভূমিকা নির্বাচন।

মার্চের মাঝামাঝি নাগাদ সাধনা কলকাতায় এলো বম্বে থেকে। আসবার কয়েকদিন পরে আমায় ফোন করে জানাল যে 'আলিবাবা' ও 'অভিনয়ে'র প্রযোজক শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীবাবুলাল চোখানী তাঁর নতুন ছবি 'মা ও ছেলে'তে তাকে একটি ভূমিকায় নির্বাচন করেছেন। আমার চলতি ছবি 'শেষের কবিতা' ও 'বিক্রমোর্বশী'-তে কোনো ভালো চরিত্র আছে কিনা!

সাধনার টেলিফোন পেতেই মনে হলো যে এই একজন শিল্পী যে 'শেষের কবিতা'র কেটির ভূমিকায় সার্থক রূপ দিতে পারবে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই এই ভূমিকাটির জন্য সাধনাকেই মনোনীত করলাম। আমার নির্বাচনে কোনোরকম ভুল হয়নি, কারণ 'শেষের কবিতা' যখন মুক্তি লাভ করল তখন জনসাধারণ এবং সমালোচক সবাই একবাক্যে 'কেটি'র প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

এদিকে জীবন দত্ত মশায়ের একান্ত ইচ্ছে 'উর্বশী'র ভূমিকাটি সাধনাকে দেবার—আমারও সেইরকম ইচ্ছেই ছিল। বাংলাদেশে সেই একমাত্র শিল্পী যাকে 'উর্বশীর' ভূমিকা নির্ভয়ে দেওয়া যেতে পারে—কারণ একজন প্রথম শ্রেণীর নৃত্যশিল্পী ছাড়া এ ভূমিকা কল্পনাই করা যায় না। আর তাছাড়া শুধু নৃত্যই নয়, অভিনয়েও অত্যন্ত পারদর্শিনী হতে হবে। আসলে আমি তারই উপযোগী করে ভূমিকাটি তৈরী করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাধনা 'উর্বশী' চরিত্রে নামতে চাইল না। তার বক্তব্য ছিল: আমার এখন বয়েস হয়েছে, উর্বশীর চরিত্রে মানাবে না। যদিও জীবনবাবু এবং আমি দুজনের কেউই তার সঙ্গে একমত হতে পারিনি, বরং তাকে অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে এটা সম্পূর্ণ তার ভুল ধারণা। তাছাড়া উর্বশীর ভূমিকায় নাচটাই তো প্রধান আকর্ষণ সেখানে তো তার ধারে-কাছে কেউ ঘেঁসতে পারবে না। কিন্তু সাধনাকে তার সংকল্প থেকে টলানো গেল না।

আমি বেশ মুস্কিলে পড়লাম। উর্বশীর চরিত্রটি তৈরী করেছি সাধনার জন্যে—এখন সব বদলাতে হবে—নাচের দিক দিয়ে, অভিনয়ের দিক দিয়ে, সব দিক দিয়ে। তাছাড়া উর্বশী করবার মত কলকাতায় মেয়ে কোথায়? যে দু-চারজন মেয়ে একটু-আধটু নাচতে পারে তাদের অভিনয় করবার ক্ষমতা নেই, আর চেহারার দিক দিয়েও মানাবে না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্রযোজক জীবন দত্ত মশায় ছন্দা নাম্নী একটি মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। ছন্দা এর আগে একটা বইতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, তবে নাচ তেমন জানে না—যাকে বলে একেবারে এমেচার। উর্বশীর ভূমিকায় তাকে নিতে আমি প্রথমে আপত্তি করেছিলাম।

জীবনবাবুকে আমি বললাম: উর্বশী বলতে লোকের যা ধারণা এবং যে ধরনের নাচ তার কাছ থেকে লোকে আশা করবে, ছন্দা কি সেরকম নাচতে পারবে? অসম্ভব! আর উর্বশী যদি লোককে খুশী করতে না পারে তাহলে আপনার ছবিও গেল!

দেখলাম যে জীবনবাবু অবিলম্বে 'বিক্রমোর্বশী'র শুটিং আরম্ভ করতে চান। অনেক চেষ্টা করেও যখন আর কাউকেই পাওয়া গেল না তখন বাধ্য হয়ে ছন্দাকেই তিনি পছন্দ করলেন। এর ওপর সাধনা যখন ছন্দাকে নাচ শেখাবার ভার নিল তখন জীবনবাবু আমায় বললেন: মিঃ বোস, আপনি আর আপত্তি করবেন না। মিসেস বোস যখন ভার নিয়েছেন তখন ওকে রীতিমত শেখালে নাচগুলো ও চালিয়ে নিতে পারবে—তবে হাজার হলেও মিসেস বোসের মতো কি আর হবে? কিন্তু কি আর করা যায় বলুন? মিসেস বোসকে এত করে আমি বললাম, আপনিও অনেক বোঝালেন—কিন্তু কে যে ওঁর মাথায় ঢুকিয়েছে যে 'উর্বশী'র রোল ওকে মানাবে না—এখানে আর আমাদের কোনো যুক্তিই টিঁকছে না। যা হোক, মিসেস বোস যখন ভার নিয়েছেন ছন্দাকে নাচ শেখাবার তখন কিছুটা খাড়া করবেন নিশ্চয়ই।

সাধনার ওপর ভার দেওয়া হলো নৃত্য পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করবার। উর্বশীর কয়েকটি একক নৃত্য ছাড়া কয়েকটি গ্রুপ ও ব্যালে নৃত্যও ছিল এর মধ্যে। সাধনা এই নাচগুলি compose করতে সুরু করে দিল। এছাড়া একটা বিশেষ চরিত্রও তাকে দেওয়া হলো। চরিত্রটি হলো 'রাণী উশীনরী'—পুরুরবার স্ত্রী। অন্যান্য ভূমিকায় ছিল উৎপল দত্ত (দৈত্যরাজ কেশী), বীরেন চ্যাটার্জি (পুরুরবা), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদূষক), পদ্মা দেবী (কেশীর স্ত্রী) প্রভৃতি।

'রাখী'র শুটিং যখন শেষের দিকে, তখন 'বিক্রমোর্বশী'র শুটিং আরম্ভ হলো। এই সময় 'রাখী', 'শেষের কবিতা' এবং 'বিক্রমোর্বশী' সবগুলিরই শুটিং একসঙ্গে চলতে লাগল। এক মাস এমন গেছে যে, ৩০ দিনের মধ্যে ২৮ দিন শুটিং করেছি। আর শুধু চোখ বুঁজে শুটিং করা তো নয়—প্রত্যেকের বিষয়বস্তু হলো সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। 'রাখী' হলো একটি নাটকীয় সংঘাতবহুল চিত্র, 'শেষের কবিতা' হলো

প্রেমধর্মী কাব্যিক রচনা, আর 'বিক্রমোর্বশী' হলো নৃত্যগীতবহুল 'ট্রিক সীনে' ভর্তি জাঁকজমকপূর্ণ ছবি, যাকে বলে fantasy.

১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি 'রাখী'র শুটিং শেষ হলো এবং ছবিটি মুক্তিলাভ করল আগস্ট মাসে মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে। দর্শক ও সমালোচক সকলেরই উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল।

'রাখী' ছবি দেখে সমালোচকদের মতামতের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"সমগ্রতার দিক থেকে 'রাখী' বর্তমান বছরের একখানি স্মরণীয় চিত্র। রাখীর ব্যথা-বেদনাকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের সঞ্চার হয়—পরিচালক মধু বসু তা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ছবিতে তুলে ধরেছেন।"

—যুগান্তর (১১-৯-১৯৫৩)

"...বিষয়বস্তুর আবেদনটি ফুটিয়ে তোলায় পরিচালক মধু বসু চমৎকার শিল্পকৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুতঃ নাট্যকুশলতার এমন সুসমৃদ্ধ চিত্রসৃষ্টি দীর্ঘদিন পর বাংলা পর্দায় দেখা গেল...নামভূমিকায় সন্ধ্যারাণী এবং রাখহরির ভূমিকায় অসিতবরণ তাদের অভিনয়-দক্ষতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন......আলোকচিত্র ও শব্দযোজনায় বাংলা চিত্রশিল্পের মানরক্ষা করার মতো কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এর জন্যে যথাক্রমে জয়ন্তীভাই জানি ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায় অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করবেন"।

—আনন্দবাজার পত্রিকা (৪-৯ ৫৩)

"...Modhu Bose's newest Supravat Films' 'Rakhi' shall go a long way to enhancing his repute and pointing to his conspicuous flair for handling emotionally deep dramatic material".

—Amrita Bazar Patrika (4-9-53)

"...Sandhya Rani and Asit Baran give highly emotional performances......... K. C. De's musical scores deserve special praise. In technical qualities 'Rakhi' scores a distinct triumph".

—Hindusthan Standard (4.9.53)

এর পর 'শেষের কবিতা'র এবং 'বিক্রমোর্বশী'র শুটিং পুরোদমে চলতে লাগল, যথাক্রমে ক্যালকাটা মুভিটোন ও ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। অক্টোবর মাসে 'শেষের কবিতা'র শুটিং শেষ হলো। এই ছবিতে কাজ করে সত্যিই খুব আনন্দ হয়েছিল। প্রযোজক শ্রীমোহনলাল জেলোকা, কলাকুশলী এবং শিল্পীদের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছিলাম। ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, দীপ্তি, নির্মল, সাধনা, উৎপল, বীরেন, বনানী, সমর, টুকলু প্রভৃতি সমস্ত শিল্পী মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেছিল ; তার ওপরে মণিলাল শ্রীবাস্তব এবং কল্যাণ গুপ্তের চমৎকার ব্যবস্থাপনার জন্য 'শেষের কবিতা' এমন সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খলভাবে শেষ করতে পেরেছিলাম।

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'শেষের কবিতা' মুক্তিলাভ করল চিত্রা, লাইটহাউস, ইন্দিরা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে। ছবির মুক্তিলাভের আগে পর্যন্ত আমি খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম। গুরুদেবের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তিগুলির মধ্যে 'শেষের কবিতা' অন্যতম সুতরাং এরকম একটি প্রেমধর্মী কাব্যিক রচনার চিত্ররূপ দেখবার জন্যে জনসাধারণ ও সমালোচকরা স্বভাবতই খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। আমি যদি তাঁদের মনের কল্পনার কাছাকাছি না পৌছুতে পারি, তাহলে তাঁরা আমায় কখনই ক্ষমা করবেন না। শুধু কালীদা'র আশ্বাসবাণীই আমার মনে খানিকটা শক্তি ও সাহস এনে দিল।

যাহোক, 'শেষের কবিতা' যখন মুক্তিলাভ করল, সুখের বিষয়, জনগণ এবং সমালোচকরা সকলেই খুশি হয়েছিল ছবি দেখে। যাঁরা এই কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভবপর নয় বলে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন, তাঁরাও তাঁদের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সংবাদপত্রগুলির মতামতের কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম :—

"একদিন যা সবায়ের মনে অভাবনীয় বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, তাকেই সবায়েরই কাছে মনোজ্ঞ করে তুলে ধরার একটি স্মরণীয় কৃতিত্ব 'শেষের কবিতা'র চিত্ররূপ।···কাব্যের ছন্দাভরণকে যথাসম্ভব অলঙ্কৃত রেখে সোজাভাবে একটি সহজ প্রেমের গল্পকে সামনে তুলে ধরায় চিত্রনাট্য রচনা এবং পরিচালনা উভয় দিক থেকেই অসাধারণ শিল্পকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ···আঙ্গিক পারিপাট্যের দিক থেকে ছবিখানি বর্তমান বাঙলা চিত্রশিল্পের গৌরব করার মতো কৃতিত্ব প্রকাশ করেছে।

···আনন্দবাজার পত্রিকা (১৮-১২-৫৩)

"···প্রেমধর্মী কাব্যিক রচনাকে মনস্তত্ত্বের জটিলতা থেকে সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে এনে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে যে দুর্লভ শিল্পজ্ঞানের পরিচয়, পরিচালক মধু বসু মূর্ত করে তুলেছেন, তাঁর অতুলনীয় শিল্পসৃষ্টি 'শেষের কবিতায়'।···নির্মলকুমার অভিনয় ও আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে অমিতকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। শান্ত-স্নিগ্ধ লাবণ্যরূপে দীপ্তি রায়কে সবারই ভাল লাগবে। আর সাধনা বসুকে ভাল লাগবে কেটির চরিত্রে··· কলাকৌশলের দিক থেকে 'শেষের কবিতা' চলতি বছরের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।"

···যুগান্তর (২৫-১২ ৫৩)

"...The credit of Modhu Bose lies in neatly blending the literary sparks of Tagore with the more technical art of the motion picture...the original flavour of the Tagore's novel is excellently maintained throughout this neatly produced love drama."

—Amrita Bazar Patrika (11.12.53)

"...'Sesher Kabita' raises the stature of Bengal's film industry by the sheer beauty of thematic content and technical execution."

—Hindusthan Standard (11.12.53)

১৯৫৩ সালের শেষের দিকে আমরা 'বিক্রমোর্বশী'র বহির্দৃশ্য তুলতে সমস্ত ইউনিট নিয়ে রাঁচী গেলাম। আর্টিস্টদের মধ্যে ছিল ছন্দা, বীরেন ও নীলিমা দাস। এই বইতে নীলিমার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ক্যামেরাম্যান ছিল জয়ন্তীভাই জানি। 'রাথী'তে কাজ করার পর একজন প্রথম শ্রেণীর ক্যামেরাম্যান হিসেবে জয়ন্তীভাই-এর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া প্রোডাকশন বিভাগের লোক, শব্দযন্ত্রী ভূপেন ঘোষ ও তাঁর সহকারী ও আমার সহকারী বঙ্কিম এই ইউনিটের সঙ্গে গিয়েছিল। প্রযোজক জীবন দত্ত মশাইও আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন।

রাঁচীতে আমি ছিলাম বি. এন. আর হোটেলে, দলের অন্যান্য সকলে ছিল অন্য একটি হোটেলে। এই হোটেলটি আবার আমাদেরই বাড়ীর কম্পাউণ্ডে তৈরী হয়েছিল—যার এখন নাম হয়েছে পি. এন. বোস কম্পাউণ্ড।

অনেক পুরনো বন্ধুরা এল আমার সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে, তাদের মধ্যে একজন ছিল আমার স্কুলের সহপাঠী। সে এসে বললে: রাঁচীতে এসে তোদের পুরনো বাড়ীটা একবার দেখবি না—তা কি হয়? চল, চল, একবার দেখেই আসবি চল। বলে সে একরকম জোর করেই আমায় ধরে নিয়ে গেল আমাদের বাড়ীর দিকে।

এর আগে আমি রাঁচীতে সর্বশেষ গিয়েছিলাম ১৯৪৪ সালে, যখন ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইণ্ডিয়ার হয়ে ডকুমেণ্টারী ছবি "Dances of India"র জন্য সাঁওতাল নাচ তুলতে গিয়েছিলাম। সেবারও বাড়ীটা দেখে মনের মধ্যে যেরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এবারেও তাই হলো। সেই বাড়ী, রংটা এখনও সেই আগের রং-ই আছে, সেই ঢেউ-খেলানো লম্বা সীমান্ত প্রাচীর, সেই পুরনো ফটক। সবই ঠিক আছে, শুধু বদলে গেছে তার আবহাওয়া, তার পরিবেশ—আর নেই সেই পুরনো মানুষগুলি।

বাড়ীটার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম। কত পুরনো স্মৃতি যে মনের মধ্যে ভিড় করে এল, তার ঠিক নেই। অজান্তে কখন যে চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল এসে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। আমার বন্ধুটি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে আমার হাতটি ধরে খুব সহানুভূতির সুরে বললে: চল যাই। তোর হোটেলেই ফিরে যাই।

ভাবাবেগের আতিশয্যে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমার গলা দিয়ে কোন আওয়াজই বেরুল না। আমার বন্ধুটিই তখন গাড়ীর ড্রাইভারকে বলে দিল হোটেলে ফিরে যেতে।

এর পর আর কখনও রাঁচী যাইনি। অন্য ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের সময় দুই-একবার রাঁচীর কথা উঠেছিল কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই তা এড়িয়ে গেছি।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রাঁচীতে 'বিক্রমোর্বশী'র শুটিং-এর কথা। বেশীর ভাগ শুটিংই আমরা করলাম জোনা-ফলস্-এর কাছে। সেখানেও বহু পুরাতন স্মৃতি জড়িয়ে ছিল। স্কুল ও কলেজ-জীবনে দল বেঁধে কত পিকনিকই না করেছি সেখানে।

যাই হোক, রাঁচীতে লোকেশন শুটিং সব শেষ করে কয়েকদিন পরে কলকাতায় ফিরে এলাম।

১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে—'বিক্রমোর্বশী'র শুটিং তখন প্রায় শেষের মুখে। আগেই বলেছি যে এই ছবিতে অনেকগুলি trick shot ছিল। এই সব দৃশ্যের জন্যে প্রয়োজন হয় বিশেষ অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যানের—যাঁরা এই ধরনের কাজই করেন। বাংলাদেশে যদিও ফটোগ্রাফির মান খুব উঁচু—যেমন লাইটিং, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল এবং অন্যান্য বিষয়—কিন্তু trick-photography এখনও সে পর্যায়ে উঠতে পারেনি। এখনও শোনা যায়—যদি কোনো ছবিতে 'ট্রিক-শট' কিছু থাকে, তবে প্রযোজককে ছুটতে হয় বোম্বাই—এই ধরনের শট্ তুলে আনবার জন্যে। সুতরাং চোদ্দ বছর আগে 'বিক্রমোর্বশী' নির্মাণের সময় যে কি অবস্থা ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

ছবি আরম্ভের সময় প্রযোজক শ্রীজীবন দত্তের সঙ্গে আমার কথাই হয়েছিল যে ছবির সাধারণ শুটিং শেষ করে বোম্বাই গিয়ে 'ট্রিক-শট'গুলি তুলে আনা হবে। কিন্তু 'বিক্রমোর্বশীর' শুটিং যখন সমাপ্তিমুখে তখনও দেখি জীবনবাবুর বম্বে যাবার কোনো লক্ষণ নেই। আমি যখনই বলি: এইবার বম্বে গিয়ে 'ট্রিক-শট'গুলি তুলে আনা যাক—অনেকগুলো 'ট্রিক-শট' রয়েছে আর সেগুলি তোলা না হলে ছবির সম্পাদনা করা যাচ্ছে না—জীবনবাবু তখনই বলেন সেই একই কথা—সব হবে মিঃ বোস, বম্বে যাবার এত তাড়া কিসের? এদিককার শুটিংটা শেষ হয়ে যাক না! ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষে একদিন তাঁর মনের আসল কথাটি বলে ফেললেন: দেখুন মিঃ বোস, প্রোডাকশনে অনেক খরচা হয়ে গেছে—এ অবস্থায় আর বম্বে গিয়ে 'ট্রিক শট'গুলি তুলে আনা সম্ভব নয়। সুতরাং যা করবার—এখানেই কোন রকমে ম্যানেজ করে নিন।

আমি বললাম, 'ম্যানেজ' কি করে করব বলুন? 'বিক্রমোর্বশী' ছবিতে নাচ-গুলিও যেমন বিশেষ দরকারী এবং আকর্ষণের বস্তু—তেমনি এই ট্রিক-শটগুলিও

বিশেষ প্রয়োজনীয়। আর 'শট'গুলি নিতে হবে এমন ক্যামেরাম্যানকে দিয়ে যে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী। লোকে যদি কোনো রকমে 'ট্রিক-শট'গুলি ধরে ফেলে তাহলে ছবিটাই মার খেয়ে যাবে। ছবির জন্যে আমরা সকলেই প্রাণপণে খাটছি—আপনার টাকাও খরচা হয়েছে প্রচুর—সুতরাং এই শেষের দিকে ক'টা টাকা বাঁচিয়ে আর ছবিটা নষ্ট করবেন না। তাতে আমাদের দুজনেরই ক্ষতি হবে—আপনার যেমন হবে অর্থ নষ্ট—আমার হবে তেমনি সুনাম নষ্ট।

জীবনবাবুকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। তিনি কিছুতেই তাঁর জিদ ছাড়লেন না। এমনিতে জীবনবাবু খুব ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু একটা মহা দোষ ছিল—তিনি ছিলেন ভীষণ একগুঁয়ে। একবার যা স্থির করতেন তা থেকে কিছুতেই তাঁকে নড়ানো যেত না। কারু কোন যুক্তি বা অনুরোধ কিছুই শুনতেন না।

এই নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ মনান্তর এবং মতান্তর হলো। আমাকে শেষে বাধ্য হয়েই 'ট্রিক-শট'গুলি এখানেই তুলতে হলো। কিন্তু সেগুলো মোটেই মনোমত হলো না। Projection দেখে হতাশ হয়ে জীবনবাবুকে শেষবারের মতো বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বললাম বম্বে গিয়ে এই ক'টা শট নিয়ে আসি। কিন্তু তিনি সেই যে গোঁ ধরে বসেছিলেন, তা থেকে আর কিছুতে নড়ানো গেল না।

এতে আমার মন একেবারে ভেঙ্গে গেল—বেশ বুঝতে পারলাম যে ছবি মুক্তিলাভ করলে লোকে কি বলবে—সেই ভেবে আমার ছবি সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনো উৎসাহই রইল না। এছাড়াও আরও কয়েকটি ব্যাপারে ক্রমাগত মনোমালিন্য ঘটতে লাগল। শেষে আমি 'বিক্রমোর্বশী'র শেষ কয়েকটি দৃশ্যের শুটিং না করেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। অসমাপ্ত অংশগুলি জীবনবাবু অন্য কোনো লোককে দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে তুলে রিলিজ করেছিলেন। সুতরাং এ ধরণের ছবির পরিণাম যা হয় তাই হলো।

'রাখী' এবং 'শেষের কবিতা'র সাফল্যের পর 'বিক্রমোর্বশী'র এই পরিণাম দেখে মনে একটা দারুণ আঘাত পেলাম। এই ছবিটার জন্যে সকলেই খুব খেটেছিল—জীবনবাবুও ছবিখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে প্রচুর খরচা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখ হয় এই ভেবে যে, তীরে এসে তরী ডুবে গেল।

১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি আমি ফেয়ারলন হোটেল থেকে উঠে এলাম ওরই কাছাকাছি আর একটি হোটেলে—অ্যাস্টোরিয়ায়। এই হোটেলটির মালিক হলো মিঃ মোহন নামে এক সিন্ধী ভদ্রলোক—তার সঙ্গে আমার আগে থেকেই আলাপ

ছিল। একদিন হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তিনি আমায় কথায় কথায় বললেন : মিঃ বোস, আপনি ফেয়ারলন হোটেলে একটা ছোট ঘরের জন্যে এত টাকা খরচ করছেন কেন? আপনি আমার হোটেলে চলে আসুন। ওখানে আপনাকে বড় ঘর দেব আর হোটেলের চার্জও ফেয়ারলনের থেকে অনেক কম করে দেব।

এই প্রস্তাব শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে উঠে এলাম।

মিঃ মোহন তাঁর কথা রেখেছিলেন। তিনি আমাকে যে ঘরটা দিয়েছিলেন সেটা ছিল দু সীটের ঘর, কিন্তু আমাকে এক-সীটের ঘর বলেই ভাড়া নিতেন। তিনি আমার সমস্ত রকম সুবিধা-অসুবিধার দিকে খুব নজর রাখতেন।

অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে থাকার সময় আমি তিনখানা ছবি পরিচালনা করি—'শুভলগ্ন', 'পরাধীন' ও 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র'। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র'। 'পরাধীন' ছবিতে অহীনবাবু আমার সঙ্গে কাজ করেছিলেন আর সেইটাই তাঁর শেষ ছবি। তখন তিনি একরকম অবসরই নিয়েছিলেন শুধু আমার অনুরোধ এড়াতে না পেরে এই ছবিতে তিনি নেমেছিলেন, এবং তাঁর অভিনয়ও হয়েছিল অপূর্ব। এতে অনেক বড় বড় নামকরা শিল্পী ছিল—অভিনয়ও সকলে বেশ সুন্দর করেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ছবির কাহিনীটি দর্শকদের মোটেই অন্তর স্পর্শ করতে পারেনি।

অ্যাস্টোরিয়ায় থাকার সময় আমার শেষ ছবি হলো 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র'। আমি আমার চিত্র-জীবনে দেখেছি, যে-ছবির আরম্ভটি বেশ সুষ্ঠুভাবে হয়, আর প্রযোজকের সঙ্গে পরিচালকের বেশ সদভাব থাকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ দু'জনে বেশ মিলে-মিশে চিত্রনাট্য অনুযায়ী কাজ করেন, কোনো রকম টাকা-পয়সার গণ্ডগোল না হয়—তাহলে সে ছবি সাফল্যলাভ করতে বাধ্য। সুখের বিষয় 'মহাকবি গিরিশচন্দ্রে'র প্রযোজক সুনীল বসু মল্লিক খুব ভাল করেই জানে যে ছবি কিভাবে করতে হয়। এর প্রত্যেকটি বিভাগ সম্বন্ধে তার সঠিক এবং স্পষ্ট ধারণা আছে। সে জানে যে প্রোডাকশন বিভাগটিই চিত্র নির্মাণ ব্যবসায়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিভাগ। যদি এই বিভাগটি পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে কাজ করে তাহলে শুটিং-এর অনেক সময় সংক্ষেপ করা যায় এবং তাতে করে ছবির খরচও অনেক কমে যায়। সুনীল বসু মল্লিকের অন্যতম অংশীদার বিমল ঘোষের ওপরে এই প্রোডাকশনের ভার দেওয়া হয়েছিল। বিমলের সংগঠন-শক্তি ছিল অসাধারণ।

তার সঙ্গে কাজ করে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি আমি আমার জীবনে এমন কর্মিৎকর্মা এবং সুদক্ষ প্রোডাকশান ম্যানেজার আর দেখিনি।

'মহাকবি গিরিশচন্দ্রে' বহু বড় বড় শিল্পী কাজ করেছে—আর 'সেটে'র সংখ্যাও ছিল অনেকগুলি এবং সেগুলি সবই বড় বড়। তার ওপর গানও ছিল বেশ কয়েকটি—প্রায় ৭।৮টি হবে। এক কথায় বলতে গেলে 'গিরিশচন্দ্র' একটি বিরাট ছবি কিন্তু সমগ্র ছবিটি শেষ হয়েছিল মাত্র ৩৫টি শুটিং দিনে। প্রযোজক সুনীল বসু মল্লিকের পূর্ণ সহযোগিতা এবং বিমল ঘোষের নেতৃত্বে তার প্রোডাকশান বিভাগের তৎপরতাই এটা সম্ভব করে তুলেছিল। যে যত বড় শিল্পীই হোক—সে ঠিক সময়ে এসে মেক-আপ করে নির্দিষ্ট সময়ে শুটিং আরম্ভের আগে সেটে গিয়ে হাজির হয়েছে। শুটিং-এর আগে সেটে যা কিছু জিনিসপত্র প্রয়োজন সব এনে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি আর এই ছবির ক্যামেরাম্যান অনিল গুপ্ত আগের দিন গিয়ে সেটটি দেখে আসতাম। সেই সময় অনিলকে বুঝিয়ে দিতাম পরদিন কিভাবে কাজ হবে। শুটিং-এর এই সমস্ত যোগাড়-যন্ত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিমল বন্দোবস্ত করত। ওর নজর ছিল সব দিকে।

শুটিং-এর ব্যবস্থা ছাড়াও শুটিং-এর দিন শিল্পী এবং কলাকুশলীরা কে কি খাবে সেদিকেও বিমলের তীক্ষ্ণ নজর ছিল, এমন কি অনেকের মনস্তুষ্টি করতে চীনা রেস্তোরাঁ কিম্বা ফারপো থেকেও খাবার নিয়ে আসত। সত্যিই প্রোডাকশান বিভাগের লোক এই রকমই হওয়া উচিত।

এই রকম একটা আনন্দময় পরিবেশে সকলেই বেশ প্রাণ-মন ঢেলে কাজ করেছিল। শিল্পী এবং কলাকুশলী সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল ছবিখানিকে সার্থক ও সফল করে তুলতে। এরকম সমস্ত বিভাগের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা আমি এক 'রাজনর্তকী' ছাড়া আর কোন ছবিতে পাই নি।

১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' মুক্তিলাভ করে রাধা, পূর্ণ ও অন্যান্য চিত্রগৃহে। এ ছবি যে কতখানি সাফল্যলাভ করেছিল তা আমায় নতুন করে বলতে হবে না, কারণ ১৯৫৭ সালে রাষ্ট্রপতির মানপত্র (President's Certificate of Merit) পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল 'গিরিশচন্দ্রের।'

এর নাম-ভূমিকায় ছিল পাহাড়ী সান্যাল এবং অন্যান্য ভূমিকায় ছিল সন্ধ্যারাণী, মলিনা, ভারতী, তপতী, শোভা সেন, গুরুদাস, নীতিশ, সবিতাব্রত, অনুপ, অহীন্দ্র চৌধুরী, উৎপল, অসিতবরণ, জহর রায়, পঞ্চানন, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি।

কলাকুশলীদের মধ্যে ছিল: ক্যামেরা—অনিল গুপ্ত, শব্দযন্ত্রী: বাণী দত্ত, সম্পাদক: কমল গাঙ্গুলী, সুরশিল্পী: অনিল বাগচী, শিল্প-নির্দেশক: কার্তিক বসু, সহকারী: বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেন রায়।

প্লে-ব্যাক শিল্পীদের মধ্যে কণ্ঠদান করেছিলেন ধনঞ্জয়, মানব ও গীতা দত্ত।

'মহাকবি গিরিশচন্দ্রে'র পরে আমি আর মাত্র একখানি ছবি পরিচালনা করেছি—সেটি হলো 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'— ৯৬৩ সালে। তখন আমি অ্যাস্টেরিয়া হোটেল থেকে কারণানি এস্টেটে চলে এসেছি।

আমি আমার কর্মজীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছি। জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যা বলবার ছিল সবই বলেছি। শুধু আর একটি ঘটনা যা অ্যাস্টেরিয়া হোটেলে থাকতে ঘটেছে, যেটা আমার জীবনের আর একটি অপ্রত্যাশিত এবং স্মরণীয় ঘটনা, সেটা হলো দীর্ঘদিন পরে আমার কাছে সাধনার প্রত্যাবর্তন। কি অবস্থায়, কি ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে এই প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছিল সেকথাই বলছি।

মঞ্চকে আমি ভালবেসে এসেছি সেই ছেলেবেলা থেকে। বলতে গেলে মঞ্চই আমার প্রথম প্রেম। আজ এই ৪০ বৎসর ধরে চিত্র জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে এবং বহু ছবি পরিচালনা করা সত্বেও পাদপ্রদীপের আলোর মাদকতা আমার মনকে আকুল করে তোলে।

১৯৫৭ সাল—তখন আমি এষ্টোরিয়া হোটেলে থাকি। হাতে কোন কাজ নেই, সুতরাং সময় অফুরন্ত। রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী পডতে পড়তে গুরুদেবের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি আর একবার পড়লাম। পড়ার পর মনে হলো যে এই কাহিনীটাকে নাট্যরূপ দিলে তো বেশ সুন্দর হয়। মনস্তত্ত্বমূলক ঘাত প্রতিঘাতের অপূর্ব নাটকীয় বিশ্লেষণ আছে এই 'ঘরে বাইরে'তে। 'ঘরে বাইরে'-র নাট্যরূপ দেওয়া হলো এবং সেই নাট্যরূপ নিয়ে দেখা করলাম শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে। নাট্যরূপ শুনে চারুবাবুর খুবই ভালো লাগল। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে চারুবাবুর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং গুরুদেবের বহু পুরাতন এবং অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের ভেতর চারুবাবু অন্যতম। সুতরাং তাঁর ভাল লাগায় আমি খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

সি. এ. পি'র তখন আর কোনো অস্তিত্ব নেই। পুরাতন শিল্পীদের মধ্যে শুধু সাধনা ও টুকলু। বেশীর ভাগই মৃত আর যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরা মঞ্চ থেকে অবসর নিয়েছেন। কোনো নাটকে অভিনয় করার দিকে আর সাধনার বিশেষ উৎসাহ নেই—সে এখন নাচের দিকেই মনঃসংযোগ করেছে বেশী। এক বছর আগে মিলি (সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়) মারা গিয়েছে—তার মৃত্যু সংবাদে আমি সত্যই মর্মাহত হয়েছিলাম। সে যে শুধু আমাদের সি. এ. পি'র সর্বাপেক্ষা পুরাতন শিল্পী হিসাবে নয়, সে ছিল আমার অত্যন্ত দরদী বন্ধু—দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এ বন্ধুত্ব আমাদের অক্ষুণ্ণ ছিল।

যাই হোক, যখন আমি স্থির করলাম যে এইবার 'ঘরে বাইরে' মঞ্চস্থ করব—তখন আর এ সব ভেবে কোনো ফল নেই। সব তোড়জোড় সুরু করলাম। উৎপল দত্ত, শিপ্রা মিত্র, নির্মলকুমার, বাণী গাঙ্গুলী, লীলাবতী (করালী) প্রভৃতির মত লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিল্পীদের নির্বাচন করলাম। ১৯৫৭ সালের গোড়ার দিকে নিউ এম্পায়ারে থিয়েটার সেণ্টার কর্তৃক আয়োজিত একটি নাট্যোৎসবে ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের তরফ থেকে 'ঘরে বাইরে' দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলাম। তারপর সেই বছরই বৈশাখে রবীন্দ্র জয়ন্তী সপ্তাহে জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রভারতীতে মঞ্চস্থ করলাম।

সেই বছর শীতকালে বাইরে কয়েকটি জায়গায় আমরা 'ঘরে বাইরে' মঞ্চস্থ করবার সংকল্প করলাম। সাধনা তখন তার মার সঙ্গে গড়িয়াহাট রোডের বাড়ীতে থাকে। আমি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে তাকে দেখে আসতাম। একদিন সে আমায় বলল যে অনেকদিন চুপচাপ বসে থাকা সত্যিই কষ্টকর—তাই তার ইচ্ছে আবার মঞ্চে নেমে কোনো 'শো' করা। আমি তাকে বললাম যে 'ঘরে বাইরে'-তে বিমলার চরিত্রটি অভিনয় করবার জন্যে, কিন্তু সে বললে যে মঞ্চে কোনো নাটকে সে অভিনয় করতে চায় না। তবে 'ঘরে বাইরে' অভিনয়ের আগে একটা একক নৃত্যে সে পাদপ্রদীপের সামনে দর্শকদের অভিবাদন করতে চায়। ঠিক হলো 'দ্রৌপদী' নৃত্য। এ নৃত্যটি সত্যিই অপূর্ব— যেমনি পরিকল্পনা তেমনি উপস্থাপনা। নৃত্যটি প্রায় ১০ মিনিটের। আমি দেখলাম যে কোন একটা কাজের মধ্যে থাকলে তার মনটাও ভালো থাকবে, স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে—তাই আমি রাজী হয়ে গেলাম। সাধনা তার নাচের রিহার্সাল সুরু করল।

এই বছরের শেষ দিকে আমি কুলটি, বার্ণপুর ও চিত্তরঞ্জনে 'ঘরে বাইরে' মঞ্চস্থ করার বন্দোবস্ত করলাম। 'ঘরে বাইরে' নাটক আরম্ভ হবার আগে হতো সাধনার একক নৃত্য "দ্রৌপদী"। অবশ্য এই সফরের সময় 'ঘরে বাইরে'র ভূমিকালিপির আমূল পরিবর্তন করতে হয়েছিল। কারণ শিপ্রা ও নির্মল তখন ষ্টার থিয়েটারের বাঁধা শিল্পী আর উৎপলও তার লিটল থিয়েটার গ্রুপ নিয়ে ব্যস্ত। সেইজন্যে আমি নির্বাচন করলাম সাধনা রায়চৌধুরী, বীরেন চ্যাটার্জী, শেখর চ্যাটার্জী ও সবিতাব্রত দত্তকে যথাক্রমে বিমলা, নিখিলেশ, সন্দীপ এবং অমূল্যর ভূমিকায়। বলা বাহুল্য, "ঘরে বাইরে" নাটক এবং সাধনার 'দ্রৌপদী' নৃত্য দুইই বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং সর্বত্রই বিপুল জনসম্বর্ধনা পেয়েছিল। এই 'শো'গুলি অবশ্য সি. এ. পি'র মাধ্যমেই উপস্থাপনা করা হয়েছিল।

১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমে আমরা ফিরে এলাম। চিত্তরঞ্জন থেকে

হাওড়া ষ্টেশনে পৌছতেই এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে করে সাধনার সঙ্গে আমার পুনর্মিলনের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠল।

সেই ঘটনাটির কথাই এখন বলছি।

দিনের পর দিন 'দ্রৌপদী'র মত একটি অত্যন্ত কঠিন নাচের দরুণ পরিশ্রম এবং ক্রমাগত এ-জায়গা থেকে ও-জায়গা যাতায়াতের জন্য তার যথেষ্ট স্বাস্থ্যহানি ঘটেছিল। তারও পর ১৯৫৫ সালে সে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সেই সময় তার যে শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল তার প্রভাব থেকে সে এখনও নিজেকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। চিত্তরঞ্জন থেকে ফেরবার সময়ই সাধনা আমাকে বললে যে শরীরটা তার ভাল মনে হচ্ছে না—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং দুর্বল মনে হচ্ছে। আমি তখন ট্রেনের 'কুপে' কামরার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম করতে বললাম। কিন্তু হাওড়া ষ্টেশনে পৌছে ট্রেন থেকে নামবার সময় দুর্বলতাবশতঃ চৈতন্য হারিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

হাওড়া ষ্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর যখন সাধনা একটু সুস্থ বোধ করল তখন তাকে আমি ট্যাক্সি করে আমার হোটেলেই নিয়ে এলাম। প্রথমতঃ অনেক রাত্রি হয়ে গেছে—ভাবলাম এত রাত্রে আর ওকে ওর মার বাড়ীতে না নিয়ে যাওয়াই ভালো। বিশেষ করে এই সফরে বেরুবার আগে দেখে গিয়েছিলাম যে ওঁর শরীরটা খুবই খারাপ—বেশ কিছুদিন থেকে ভুগছিলেন। তাছাড়া আমি ভাবলাম যে আজ রাত্রেই কোন ভাল ডাক্তারকে ডেকে সাধনাকে পরীক্ষা করানো বিশেষ দরকার। এত রাত্রে ওকে ওর মার ওখানে নিয়ে গেলে সেটা সম্ভবপর নাও হতে পারে। মেজর পি, বর্ধন আগে সাধনাকে দেখেছিলেন, তার ওপর তিনি এ্যাষ্টোরিয়া হোটেলের কাছাকাছি থাকতেন। সুতরাং ঠিক করলাম যে তাঁকেই ডেকে পাঠাব।

এই সব সাত-পাঁচ ভেবে সাধনাকে এ্যাষ্টোরিয়া হোটেলেই নিয়ে এলাম। হোটেলে পৌছে মেজর বর্ধনকে ফোনে আসবার জন্যে অনুরোধ করলাম। ১৯৫৫ সালে সাধনা এ্যাষ্টোরিয়া হোটেলের কাছে একটা হোটেলে ছিল। সেখানে একবার তার অসুখ করেছিল তখন মেজর বর্ধন ওর চিকিৎসা করেছিলেন। সেই থেকে আমাদের দুজনকেই উনি খুব স্নেহ করতেন।

এ্যাষ্টেরিয়ায় পৌছে যখন টেলিফোন করলাম তখন রাত অনেক হয়েছে—কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সানন্দে রাজী হলেন আসতে। আমি বরেনকে ট্যাক্সি নিয়ে পাঠালাম মেজর বর্ধনকে নিয়ে আসতে।

এতক্ষণ বরেনের বিষয় কিছুই বলা হয় নি। তার পুরো নাম বরেন বসু। আমি

যখন ফেয়ারলন হোটেলে থাকি তখন সে প্রথম আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। সবেমাত্র তখন সে দিল্লী থেকে এসেছে। সে আমার 'রাজনর্তকী', The Court Dancer দেখে আমার একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছিল। যখন এ্যাষ্টোরিয়ায় চলে আসি তখন বরেন প্রায়ই আসত এবং 'ঘরে বাইরে' নাটকটিতে অভিনেতা ও প্রোডাকশান ম্যানেজার হিসেবে যুক্ত ছিল। ১৯৬৩ সালে আমি যে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছবি করি তাতে সে ছিল আমার অন্যতম সহকারী। সে আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট হলেও তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা অত্যন্ত স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আজ পর্যন্ত আমার যে-ক'জন সত্যিকারের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী আছে বরেন তাদের মধ্যে একজন। আর একজনের নাম মণ্টু (শিব ভট্টাচার্য)। প্রথমে সে ছিল সম্পাদক শ্যামদাসের সহকারী। আজ অবশ্য সে নিজেই স্বাধীনভাবে ছবি সম্পাদনা করছে এবং ভালই কাজ করছে।

যা' হোক বরেন মেজর বর্ধনকে সেদিন এ্যাষ্টোরিয়া হোটেলে নিয়ে এল। মেজর সাধনাকে পরীক্ষা করে বললেন: ভয়ের কোনো কারণ নেই মিঃ বোস। এটা অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং ক্লান্তির জন্যেই হয়েছে। কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বলে তিনি একটা ওষুধ লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

পরদিন সকাল বেলাতেই দেখলাম সাধনা বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। আমি সাধনার মার বাড়ীতে ফোন করতে সাধনার ভাই ধরল, তাকে আর সাধনার অসুখের বিষয় কিছু বললাম না—শুধু বললাম যে চিত্তরঞ্জন থেকে ফিরতে অনেক রাত্রি হয়ে গিয়েছিল বলে ওকে আর তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাইনি, আমার হোটেলেই আছে। তোমার মায়ের অসুস্থতার জন্যে অত রাত্রে আর তোমাদের বিরক্ত করতে চাইনি। যাই হোক ওকে এখন তোমাদের ওখানে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

তাতে ওর ভাই জানালে যে সাধনাকে ওখানে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের সফরে বেরোবার পরই নাকি সাধনার মা'র শরীর খারাপ হয়েছে। আরো জানাল মা'কে পি. জি-হসপিটালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

শুনে মনটা দমে গেল। সাধনার মা ভুগছিলেন ঠিকই বেশ কিছুদিন থেকে—কিন্তু হঠাৎ এমন কি বাড়াবাড়ি হলো যে হাসপাতালের কেবিনে রাখতে হচ্ছে? তাছাড়া সাধনার মার হাসপাতালে যাওয়ার সঙ্গে ওর বাড়ীতে ফিরে যাবার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? মার অসুখের বাড়াবাড়ি শুনে সাধনাও খুব অস্থির হয়ে পড়ল বাড়ী যাবার জন্যে। তখন তার ভাইকে বললাম যে আমার হোটেলের ঘরে জায়গা খুবই কম—দুজনের পক্ষে থাকা খুবই অসুবিধা হবে। কিন্তু ওর ভাই-এর কথায়

ভাবে বুঝলাম যে সে চায় না এখন সাধনা তাদের বাড়ীতে যায়—অন্ততঃ যতদিন পর্যন্ত না তার মা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরে আসেন।

কিন্তু যতদিন যেতে লাগল সাধনার মার অবস্থা ভাল হওয়া দূরে থাক, আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল। শেষকালে পি. জি. হাসপাতাল থেকে ওঁকে মেডিক্যাল কলেজের একটি কেবিনে স্থানান্তরিত করতে হলো। সুতরাং সাধনা আমার হোটেলেই থেকে গেল।

আমার হোটেলের ঘরটা যদিও বড়ই ছিল—কিন্তু ফার্নিচার অনেক। তার ওপর দুটো খাট লাগালে আর নড়বার চড়বার জায়গা থাকে না। সাধনারও অসুবিধে হতে লাগল, কারণ আব্রু (privacy) বলতে কিছু রইল না। আমারও অসুবিধে হতে লাগল কারণ কাজকর্ম নিয়ে কোনো বাইরের লোকজন আমার সঙ্গেও দেখা করতে আসতে পারে না। রাত্রে সাধনা শোবার জন্য আমার সিঙ্গল্ খাটটাই ব্যবহার করতে লাগলো। কিন্তু আমি? একটা সোফার ওপর শুয়ে রাতের পর রাত কাটানো যে কি কষ্টকর সেই সময়েই তা প্রথম হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম।

যাই হোক, এইভাবে জানুয়ারী মাসটা কাটলো, ফেব্রুয়ারীও কাটলো—সাধনার মার অবস্থা দিনের পর দিন খারাপের দিকেই যেতে লাগল। সাধনা ও আমি প্রায়ই তাঁকে দেখতে যেতাম। সাধনা যে আমার কাছে ফিরে এসেছে—এবং আমাদের দুজনের মধ্যে আবার মিলন হয়েছে—এ সংবাদে তিনি খুব খুশী হলেন—যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি আর বেশীদিন নেই। একদিন তিনি আমার হাত দুটি ধরে বললেন: আমি জানি আমার আর বেশী দিন নেই মধু। সাধনার জন্যে আমার খুব ভাবনা ছিল যে আমি চলে গেলে ওর কি হবে? কে দেখাশোনা করবে ওকে? তুমি তো ওকে ভাল করেই জান। ওর বৈষয়িক জ্ঞানগম্যি একেবারে নেই। যাক, এখন আমি শান্তিতে মরতে পারব। আমি জানি—তোমার কাছে থাকলে ওর আর কোনো ভয় নেই। তুমিই এখন ওর একমাত্র আশ্রয়।

আমিও তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আমি বেঁচে থাকতে ওর কোনো অসুবিধে হতে দেবো না।

এদিকে এ্যাষ্টোরিয়া হোটেল আমার ঘরের ভাড়া বাড়িয়ে দিল। এতদিন একজনের জন্য ভাড়া নিচ্ছিল, এখন দু'জনের দাবী করতে লাগল। দেখলাম হোটেলখরচ বাবদ অনেক টাকা লাগছে—অথচ দুজনেরই অসুবিধা হচ্ছে প্রচুর। বাধ্য হয়ে আমি তখন একটি সুবিধামত ফ্ল্যাট খুঁজতে সুরু করে দিলাম। কিন্তু ফ্ল্যাট

চাইলেই কি সহজে ফ্ল্যাট পাওয়া যায় কলকাতা সহরে? অনেক দালালকে বললাম, বন্ধুবান্ধবের অনেককে বললাম—কিন্তু সকলের মুখেই ঐ এক কথা মোটা সেলামি ছাড়া ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না—একরকম অসম্ভব বললেই হয়।

অনেকদিন কোনো কাজকর্ম নেই—তার ওপর হোটেলে মোটা টাকা দিতে হচ্ছে—সুতরাং সেলামী দেওয়া তো দূরের কথা, দৈনন্দিন খরচ চালানোই মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শেষকালে একদিন 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের শরণাপন্ন হলাম। তাঁর খাতিরে আমি এই কারণানী এস্টেটের বর্তমান ফ্ল্যাটটি পেলাম বিনা সেলামীতে। এই সাহায্যটি যেন ঈশ্বর প্রেরিত—যে শুনল সেই অবাক হয়ে গেল। কারণানী এস্টেটের মত সম্ভ্রান্ত স্থানে বিনা সেলামীতে ফ্ল্যাট পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।

১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল আমরা এ্যাস্টোরিয়া থেকে কারণানী এস্টেটে উঠে এলাম। মে মাসের প্রথমদিকে হাসপাতাল থেকে সাধনার মাকে গড়িয়াহাট রোডের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তখন খানিকটা সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু ঐ মাসেরই শেষ দিকে তাঁর অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়ল—এবং ১লা জুন তারিখে তিনি সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে আমাদের সকলের মায়া কাটিয়ে পরপারের দিকে যাত্রা করলেন।

সাধনার এ্যাস্টোরিয়া হোটেলে আসার ব্যাপারটা এত বিস্তারিত ভাবে বললাম এইজন্যে যে এখানেও সেই অদৃশ্য হস্তের খেলা—মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণায় আমাদের পুনর্মিলন সম্ভব হলো।

এ পুনর্মিলন ভালো কি মন্দ শুভ কি অশুভ তার বিচার করবার স্থান এটা নয়। বিচ্ছেদের জন্য কে দায়ী তার বিচার যেমন আমি করিনি, মিলনের জন্যেও তেমনি কোনও কৃতিত্ব আমি দাবী করি না। পৃথিবীতে অনেক দিন বেঁচে এইটুকুই সার বুঝেছি যে এই পৃথিবীর অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তার নীরব ইচ্ছা ছাড়া এখানে কোনও ঘটনা ঘটবার উপায় নেই। আমরা শুধু কারক—কর্তা অবাঙ্‌মনসোগচর।

সত্যিই তো, আজ বয়সের এই পরিণতিতে এসে ভালো মন্দের বিচার করবার আমিই বা কে? যেদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ-শিখরে উঠেছিলাম, সেদিনও যেমন

ভালো-মন্দের বিচার করিনি, আজ এই পূর্ণচ্ছেদের পূর্ব-পরিচ্ছেদে পৌঁছেও সে বিচার করবার অধিকার আমার নেই। আর তাছাড়া সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভালো-মন্দ একাকার হয়ে যাবার উদাহরণ তো যথেষ্টই দেখলাম। এখন জীবনের সব কিছু ভালো সব কিছু মন্দ সেই ভালো-মন্দাতীতকে নিবেদন করেই তো নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।

অভাব অনেক দেখেছি, প্রাচুর্যও দেখেছি অনেক। আমরা দুজন অনেক ঐশ্বর্য-দারিদ্র্য অনেক উত্থান-পতনের মুখোমুখি হয়েছি। আমরা একদিন বহু মানুষের মুখরোচক সংবাদ হয়ে উঠেছিলাম, আবার এখন বহু-মানবের স্মৃতির আড়ালে হারিয়ে গিয়েছি। সেদিন সৌভাগ্যের শিখরে উঠে যদি অহঙ্কারে উদ্দাম হয়ে না-উঠে থাকি তো আজ দুর্ভাগ্যের সিংহ-দ্বারে এসে হতাশার হাহাকার করবোই বা কেন?

আজ মনে পড়ছে গুরুদেবের সেই কথাগুলো: "মধুর সাধনা নয়, মধুর মাধবী।"

সাধনা আমার কাছে আজ সত্যিই মাধবী। গুরুদেবের সেই অমোঘ বাণী যে কত সত্য তা প্রমাণ হতে এই পনেরোটি বছর সময় লাগলো। পনেরো বছরের দীর্ঘ ব্যবধানে প্রমাণ হলো আমি যেমন সাধনাকে ভুলিনি, সাধনাও তেমনি আমাকে ভুলতে পারেনি। নিজের হাজার কাজের মধ্যে আমি সাধনাকে ভোলবার হাজার সাধনা করেছি, আবার সাধনাও বার-বার আমার কাজের বাধা হয়ে আমাকে হাজার বার এই বলে ভোলাতে চেয়েছে যে আমাকে সে ভুলে গেছে। কিন্তু শেষবারের মত প্রমাণ হয়েছে আমরা দুজনেই দু'জনকে ভোলবার সাধনায় ব্যর্থ হয়েছি। মনে রাখা যত শক্ত, ভুলে যাওয়াও তো তেমনি আরো শক্ত। পরস্পরকে আমরা যত ভুলতে চেয়েছি, ততই পরস্পরকে নিবিড করে পেয়েছি। পেয়েও পেয়েছি, হারিয়েও পেয়েছি। তাই বার বার দু'জনে দু'জনকে যতই ত্যাগ করেছি ততই কাছে পেয়েছি। দু'জনে দু'জনকে তাই এত ভালবেসেছি। আজ মনে হয় আমরা দুজনে দুজনকে এত ভালো না বাসলে বোধ হয় এমন করে আমাদের ছাড়াছাড়িও হতো না, আবার পরস্পরকে এত নিবিড় করে কাছেও পেতাম না। না হারালে পাওয়ার আনন্দ কি পাওয়া যায়? সাধনা একদিন যদি আমার জীবন থেকে হারিয়েই গিয়ে থাকে তো সে-সাধনা আজ মাধবী হয়ে ফিরে এসেছে।

মা বলতেন—মধু ভগবানে বিশ্বাস রেখো। সুখে দুঃখে তিনিই তোমাকে দেখবেন।

আর কালীদা বলতেন—Have faith in God.

কালীদার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল বারাণসীতে। 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'র ছবি তুলতে গিয়েছিলাম সেখানে। ফিরে আসবার সময় আমাকে আশীর্বাদ করলেন। বললেন—'যত ভুল তত ফুল'।

আজ মাও নেই, আর কালীদাও নেই। কিন্তু দু'জনের সেই শেষ কথাগুলোই আজ আমার জীবনের অমূল্য পাথেয় হয়ে রইল। তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েই এই গ্রন্থের পূর্ণচ্ছেদ টানলাম।



নিউ থিয়েটার্সের দোভাষী ছবি 'মীনাক্ষী'র একটি দৃশ্যে শ্রীমতি সাধনা বসু ও সন্ধ্যারাণী



'মাইকেল মধুসূদন' চিত্রের একটি দৃশ্যে 'মাইকেল' ও 'হেনরিয়েটার' ভূমিকায়
উৎপল দত্ত ও দেবযানী



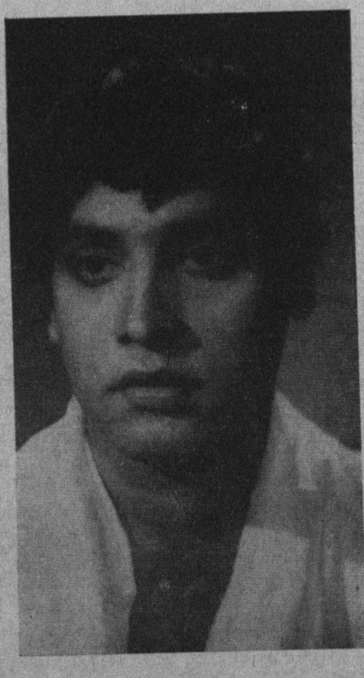
মিঃ জে, বি, এইচ ওয়াদিয়া



'রাজনর্তকী' হিন্দি সংস্করণের একটি দৃশ্যে সাধনা বসু (রাজনটী মধুছন্দা) এবং পৃথ্বিরাজ কাপুর (যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি)



'রাখী'র ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী



'রাখী'র নায়ক 'রাখহরি'র ভূমিকায় অসিতবরণ



লেখকের ভাই ও বোনেরা ॥ পিছনে ঃ ছোটদি (উমা দে), ন'দি (পূর্ণিমা বসু)
মাঝে ঃ (বাঁ থেকে) সেজদি (প্রতিমা মিত্র), বড়দি (সুষমা সেন), মেজদি (সুরমা রায়), সেজদা (৺অমর নাথ বসু) সামনে বসে ঃ মধু বসু
(ছবিটি ১৯৫৩ সালে নেওয়া হয়েছিল)



সাধনা বসু ও লেখক ॥ কারনানি স্টেটের ফ্ল্যাটে ছবিটি তুলেছিল ৺হরেন ঘোষের ছেলে অশোক ১৯৬৬ সালে

পরিশিষ্ট

"দালিয়া" নাটক সম্বন্ধে (১৮৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

"গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার এম্পায়ার থিয়েটারে সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহে কলিকাতা এ্যামেচার প্লেয়ারস্ কর্তৃক মধু বোসের প্রযোজনায় ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউটের সাহায্যকল্পে রবীন্দ্রনাথের দালিয়ার অভিনয় দেখে এসে বহু পুরানো এই বিদেশী উক্তিটি মনে পড়ে গেল—

"Tempora mutantur, nos et mutamur in illis." এই উক্তিটি যে অযথা স্মৃতিশক্তিকে উত্তেজিত করেছে তা নয়, এর প্রধান কারণ জাতির জীবনে যে একটা নূতন চিন্তাধারা বহে গেছে, এদেশের রঙ্গালয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করে সে পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই এর আবহাওয়ায় যে সময়টা কাটাতে হয় তার প্রতি মুহূর্তটি যে ব্যর্থতার বেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে তা বলাই বাহুল্য। এমনি ব্যর্থতার মধ্যে 'দালিয়া'র নাট্যাভিনয় যে কয়েক ঘণ্টার জন্যেও আমাদের চিত্তকে রূপে-রসে সঞ্জীবিত করতে পেরেছিল, এর জন্যেই আমরা প্রযোজকের নিকটে কৃতজ্ঞ। যাঁরা প্রচার করেন ভাল নাটকের উপরেই অভিনয়ের আকর্ষণ নির্ভর করে, তাঁদের এই উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে শুধুমাত্র সুপ্রযোজনার গুণে দালিয়ার নাট্যরূপ কত মনোহর ও কত চিত্তাকর্ষক হয়েছে, তা চোখে না দেখলে কারুর প্রত্যয় হবে না—এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যদি সেদিন উপস্থিত না থাকতেন তাহলে তিনিও উপলব্ধি করতে পারতেন না। একটি সামান্য ঘটনাও যে রুচি ও সঙ্গতির অসামান্য রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, সুদক্ষ প্রযোজক মধু বোস তা প্রমাণ করেছেন। যে চরিত্রটিকে কিছুতেই ভোলা যায় না, তা হচ্ছে আমিনা বা তিন্নী এবং তারই রূপদায়িনী শ্রীমতী সাধনা বসু। ...শ্রীমতী সাধনা এই চরিত্রটিকে যেভাবে রূপায়িত করেছেন—সার্থক তাঁর সাধনা, তাঁর শক্তি !...দালিয়ার ভূমিকায় মধু বোসের অভিনয় যেমন স্বাভাবিক তেমনি মনোজ্ঞ হয়েছে। শ্রীমতী অমলা নন্দীর একক নৃত্যখানি প্রচুর উপভোগের বস্তু হয়েছিল। 24-2-33 (Batayan) (বাতায়ন ২৪-২-৩৩)

The play is an established attraction and under Mr. Modhu Bose attains a high standard of production. Tagore's original short story from which it has been adapted is enhanced by the addition of songs and dances, with the Poet's melodies harmonised to the requirements of a Western orchestra.

STATESMAN 22. 2. 33.

"আলিবাবা" নাটক সম্বন্ধে (১৯৪ পৃষ্ঠা)

"The repeat performance of Mr. Modhu Bose's "Alibaba" on board the Empire Theatre on Friday last was a decided success. Mr. and Mrs. Bose as Abdalla and Morzina were superb. Gouri Ojha as Alibaba has beaten hollow many who hitherto appeared in this role. Mr. Kamal Biswas as

hypocrite selfish and proud Kasim was excellent...The music and the dances were simply charming. We hope Mr. Bose will give us another treat of the like in near future."

"DIPALI"......16. 3. 1934.

"মন্দির" নাটক সম্বন্ধে (২০৫ পৃষ্ঠা দেখুন)

'মন্দির' নাটকের সংগঠনকারিবৃন্দ : নাট্যকার সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রযোজনা ও পরিচালনা : মধু বসু, নৃত্য পরিকল্পনা ও পরিচালনা : সাধনা বসু, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনা : চারু রায়, আলোক-নিয়ন্ত্রণ : গীতা ঘোষ, নৃত্যসুরসৃষ্টি : তিমিরবরণ, সঙ্গীত-সুরসৃষ্টি : পঙ্কজ মল্লিক, অর্কেস্ট্রা : মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য, প্রচার : এলা সেন।

ভূমিকা : দেবদাসী মঞ্জুলা—সাধনা বসু, রাণী ইন্দ্রাণী—সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, পুরোহিত আয়ুধ—হরেন মুখোপাধ্যায়, সেনাপতি কুঞ্জর—মধু বসু, রাজা সুপর্ণ—প্রীতিকুমার মজুমদার, সখী চম্পা—ললিতারাণী, বিপুল—কমল বিশ্বাস, অপর্ণা—শান্তিলতা ঘোষ, পতঙ্গ—বি. পি. মেহেরা, মাতঙ্গ—যোকেন চট্টোঃ, বিজয়া—নীলিমা রায়।

সি-এ-পি ব্যালে : মঞ্জু দে, সান্ত্বনা বসু, লতা দত্ত, বিনীতা গুপ্ত, অনিতা গুপ্ত, বিনীতা দে, অণিমা রায়, অমিতা গুপ্ত, শান্তা দত্ত।

"......The C.A.P. ballet was charmingly effective......and drew loud praise from the house with their artistically co-ordinated dances......Sm. Sadhona Bose is to be congratulated on her dance directions. The costumes and settings were gorgeous and appropriate. The Orchestra conducted by Sj. Mihir Kiron Bhattacharya, played to perfection the music composed by Sj. Timir Baran Bhattacharya. The lighting effects were very well done and for this thanks are due to Sj. Gita Ghose."

AMRITA BAZAR PATRIKA 9. 4. 1936.

"......I must congratulate Modhu Bose, producer of the play, for the very high level of artistry the Calcutta Art Players have reached in "Mandir.......The art direction of "Mandir" was in the able hands of the noted artist-dirctor. Charu Roy, and as a result the sets and costumes were all well-conceived and highly artistic."

...by Thespis in DIPALI 10. 4. 1936

"Encouraged by the success that reward their two performances of Mr. Sourindra Mukherji's drama "Mandir" last week, the Calcutta Art Players will repeat the play at the Empire Theatre today...the C. A. P.'s presentation of

"Mandir" set a new standard for the Bengali stage and the public weary, many of them, perhaps, of the stultifying conventionalities of the professional stage, was not slow to show its appreciation. Certainly "Mandir" must have opened the eyes of many to new possibilities of the Bengali drama. The C. A. P. are frankly modernistic......and it is their virile treatment of an old theme, no less virile acting and freedom from worn-out, often meaningless conventionalities ass ociated with Indian stage, that their modernism is revealed."

THE STATESMAN. 17. 4. 1936.

"আলিবাবা" চিত্র সম্বন্ধে—(২১০ পৃষ্ঠা)

"Modhu Bose, who has been responsible for the direction, has shown complete mastery of cinema technique in this picture."

...STATESMAN, 13.2.1937.

"...Sm. Sadhona Bose interprets the role of 'Morzina' with sheer beauty, admirable restraint and complete versatility......and at once establishes her as one of the best talented artistes of the land......Bibhuti Ganguly and Priti Mazumdar portray the characters of Alibaba and Mustafa with commendable ability......Mr. Modhu Bose must be given the credit of having made a highly entertaining, pictorially attractive film drama......"

...AMRITA BAZAR PATRIKA, 20.2.1937

...'Alibaba' is an 'A' class production...Direction is excellent It very ably opens up a new field of Indian cinematographic art..."

J. N. M. (FILMLAND, 20.2.1937)

"The cast is composed mostly of the C.A.P....All the players bring in a freshness of outlook hardly seen here before on the screen...Modhu Bose and Sadhona Bose in portraying the roles of 'Abdulla' and 'Morzina' make a team that is unique in this country,...

ADVANCE, 20.2.1937

'Alibaba is an 'A' class quality picture...A lyrical rhythm has been maintained through out the play just as it is done in a musical extravaganza of the West and this is indeed sweet and pleasing......the great director of "Selima" has satisfied us immensely''.

VARIETIES, 19.2.1937.

"ওমরের স্বপ্নকথা" ও "সাবিত্রী" (নাটক) (২২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সংগঠনকারিবৃন্দ: নাট্যকার (সাবিত্রী): মন্মথ রায়, প্রযোজনা ও পরিচালনা: মধু বসু, সুরসৃষ্টি: তিমিরবরণ, নৃত্য-পরিকল্পনা ও পরিচালনা: সাধনা বসু, গীতিকার: অজয় ভট্টাচার্য, অর্কেস্ট্রা: প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, আলোক-নিয়ন্ত্রণ: গীতা ঘোষ, প্রচার: এলা সেন।

ভূমিকা: "ওমরের স্বপ্নকথা"। সাকী—সাধনা বসু, ওমর—প্রীতিকুমার মজুমদার।

"সাবিত্রী"। সাবিত্রী—সাধনা বসু, সত্যবান—মধু বসু, অশ্বপতি—বিভূতি গাঙ্গুলী, মালবী—গৌরীলাল, দ্যুমৎসেন—প্রীতিকুমার মজুমদার, শৈব্যা—শান্তিলতা ঘোষ, যম—কালী ঘোষ, আশ্রমবালিকা—সতী দেবী, শাশ্বতী—মঞ্জু দে।

সি-এ-পি ব্যালে: বিনীতা দে, অনিতা গুপ্ত, নির্মলা দত্ত, বিনীতা গুপ্ত।

"সেদিন ফার্স্ট এম্পায়ারে 'সি এ-পি' সম্প্রদায়ের 'সাবিত্রী' ও 'ওমর খৈয়ামের স্বপ্নকথা' নৃত্য-নাট্যাভিনয় দেখে এসে তাঁদের পরিকল্পনার অভিনবত্বে শুধু চমৎকৃতই হইনি, বিস্মিত হয়েছি। ...গান ও সুরের মধ্য দিয়ে ওমর খৈয়ামের কাব্যের ভাবরূপকে এঁরা যেভাবে মূর্ত করে তুলেছেন, তা সত্যই এক স্বপ্ন...এই পরিকল্পনার জন্য আমি শ্রীমধু বোসকে আমার অভিনন্দন জানাই। ...সাকীর ভূমিকায় শ্রীমতী সাধনা স্বপ্নের জাল বুনে গিয়েছেন। অপূর্ব তাঁর সাধনা! আর চমৎকার হয়েছে ওমরের স্বপ্নকথার দৃশ্যপরিকল্পনা! সাবিত্রী নাটকে শ্রীমতী সাধনার সাবিত্রী এক অপূর্ব ভাবাভিব্যক্তিতে সঞ্জীবিত...এর পরেই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন, সত্যবানের ভূমিকায় মধু বোস। তাঁর সহজ স্বাভাবিক অভিনয় সত্যই আমাকে মুগ্ধ করেছে। শাশ্বতীর ভূমিকায় শ্রীমতী মঞ্জু দে নাচে, গানে, অভিনয়ে বিশেষ নিপুণতা দেখিয়েছেন। এই উভয় নাটকেই তিমিরবরণের যন্ত্রসঙ্গীত অভিনয়কে প্রাণবন্ত করেছে...পরিশেষে পরিচালক মধু বোসকে আমি আমার অভিনন্দন জানালাম। তাঁর এই স্বপ্ন-সুন্দর নাট্য-প্রযোজনা বিংশ শতাব্দীর গর্বের বস্তু।"

"দুন্দুভি" (৭-৫-৩৭)

'ওমরের স্বপ্নকথা' নৃত্য-নাট্যাভিনয় আমাদের দেশে অভিনব প্রচেষ্টা। 'সি-এ-পি' সম্প্রদায়, গান ও সুরের মধ্য দিয়ে ওমর খৈয়ামের কাব্যের ভাবরূপকে মূর্ত করিয়াছেন...

...আনন্দবাজার (৫-৫-১৯৩৭)

' The fourth performance of "Savitri" and "Omar Khayyam" by the C.A.P. was held yesterday before a packed house at the first Empire. The dream-songs of Omar Khayyam with the accompaniment of Sadhona Bose's dance and Timir Baran's excellent orchestra captivated the audience. It was followed by "Savitri" ...The principal roles were those of Sadhona Bose as Savitri and Modhu Bose as Satyaban and they acquitted themselves admirably."

—"Amrita Bazar Patrika" (5.5.37)

"That the 'rubayiats' of Omar Khayyam could be set up in such elegant and enchanting pieces of entertainment must have been a revelation to many. The credit goes to the dramatic abilities of the Producer, Mr. Modhu Bose......

..."Advance" (4.5.37)

"ওমরের স্বপ্নকথা" ও "বিদ্যুৎপর্ণা" (নাটক) (২২২ পৃষ্ঠা)

'...কালের পরিবর্তনে দেশের যে রুচির পরিবর্তন হয় বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়গুলির কর্তৃপক্ষরা যেন তা মানতে রাজী নন, তাই সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেমন একটা বিতৃষ্ণা জাগে যার ফলে আজ রঙ্গালয়গুলির দুরবস্থার আর অন্ত নেই। অথচ সকল দেশেই সকল লোকের মধ্যে নাট্যকলার একটি বিশেষ স্থান আছে বলেই সি-এ-পি আজ এতটা জনপ্রিয় হতে পেরেছে। এই শহরে আজ এমন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি নেই যিনি এঁদের অভিনয়কলার প্রশংসা না করেন। সম্প্রতি ফার্স্ট এম্পায়ারে এঁরা যে দু'খানি নাটকের অভিনয় করে নাট্যামোদীদের আনন্দ বিতরণ করেছেন, তা হচ্ছে 'বিদ্যুৎপর্ণা' ও 'ওমর খৈয়াম'। 'বিদ্যুৎপর্ণা'র নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় নাট্যকার হিসেবে বিশেষ পরিচিত এবং এ নাটকখানির রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সমধিক প্রশংসনীয়। এর অভিনয়ে যে দুজন অভিনেতা আমাদের বিশেষ খুসী করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন অহীন্দ্র চৌধুরী ও বিভূতি গাঙ্গুলী।...স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে শ্রীমতী সাধনা বসুর অভিনয় বিশেষভাবে প্রাণস্পর্শী হয়েছে···শ্রীমতী মঞ্জু দে'ও উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন···এবারে 'ওমর খৈয়াম'-এর অভিনয় অধিকতর উন্নত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। ...সর্বশেষে আমরা প্রযোজক মধু বসুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' ...বাতায়ন (১৯-১১-৩৭)

"রাজনটী" নাটক সম্বন্ধে (২২৭ পৃষ্ঠা)

সংগঠনকারিবৃন্দ :—নাট্যকার : মন্মথ রায়, প্রযোজনা ও পরিচালনা : মধু বসু, সুর সৃষ্টি : তিমিরবরণ, নৃত্য-পরিকল্পনা ও পরিচালনা : সাধনা বসু, গীতিকার : অজয় ভট্টাচার্য, অর্কেস্ট্রা : প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, আলোক-নিয়ন্ত্রণ : গীতা ঘোষ।

'রাজনটী'র ভূমিকা : রাজনটী মধুচ্ছন্দা—সাধনা বসু, কাশীশ্বর গোস্বামী—অহীন্দ্র চৌধুরী, যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি—মধু বসু, মহাকাল—বিভূতি গাঙ্গুলী, আচংফা—প্রীতিকুমার মজুমদার, প্রিয়া—মঞ্জু দে, রিয়া—শীলা দত্ত, রাজা জয়সিংহ—কল্যাণ মজুমদার, শ্রীকণ্ঠ—প্রতাপ মুখার্জি, রক্ষী—বোকেন চট্টোঃ।

"সি-এ-পি সম্প্রদায়ের "রাজনটী" নৃত্যনাট্যাভিনয় আমরা ফার্স্ট এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে দেখিয়া আসিয়াছি। ...আজ যে আমাদের দেশের লোকেরা নৃত্যকলাকে অবজ্ঞা না করিয়া তাহার যথার্থ মর্যাদা দিতে শিখিয়াছে তাহার মধ্যে সি-এ-পি সম্প্রদায়ের সাধনা যে অনেকাংশে রহিয়াছে একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। এ সত্য তাঁহারা ইতিপূর্বে আরও অনেকবার প্রমাণিত করিয়াছেন।...শ্রীযুত মন্মথ রায় 'রাজনটী' নাটকের মধ্যে যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রতিভার যশোগান করিতেছি..."

...আনন্দবাজার পত্রিকা (৫-১ ৩৮)

নৃত্যগীত ও ভাবের মূর্ছনায় মন্মথ রায়ের 'রাজনটী' দর্শকমণ্ডলীকে অভিভূত করিতে সক্ষম হইয়াছে। ...রাজনটী মধুচ্ছন্দার ভূমিকায় সাধনা বোস ও রাজপুত্র চন্দ্রকীর্তির ভূমিকায় মধু বোস এক অপূর্ব ভাবধারার সৃষ্টি করিয়াছে।" ...যুগান্তর (৫-১-১৯৩৮)

"The Calcutta Art Players opened their new year season with a drama written by Manmatha Ray—'Rajnati' (The Court Dancer)—at the First Empire Theatre last night.......Again the combination of Sadhona Bose (as the Court

Dancer) and Ahindra Choudhury (as the holy Preceptor) carried the play, especially in the scene of renunciation, in which both of their dramatic abilities rose to a high pitch. A word should be said of Modhu Bose who undertook the dual task of Producer and hero. He was very successful, on the one hand, as a Producer, and, on the other hand, as Prince Chandrakirti.

STATESMAN. 31. 12. 1937.

"The Calcutta Art Players have scored one of their biggest hits by their latest "Rajnati" which is from the pen of Manmatha Ray.......The dancer of the Royal Court, Modhuchhanda, could not have found a bitter exponent of her role than Sadhona Bose.......Ahindra Chowdhury finds the role of Kashiswar, the High Priest, a proper foil for his strong personality.......Monju De gives a sparkling performance as Priya."

DIPALI. 14. 1. 1938.

বম্বে সফর সম্বন্ধে (২৩৪ পৃষ্ঠা)

"The Calcutta Art Players made a brilliant and definitely impressive entry into the cnsciousness of the Bombay public with their debut at the capital last Saturday evening....Sadhona Bose is an artist from the crown of her beautiful head to the red soles of her hennaed feet and in the exquisite grace and that indescribable quality of her dancing, which gives one the feeling that an Ajanta fresco or some ancient sculptured goddess has suddenly come to life....The Calcutta Art Players deserve both gratitude and congratulation on having brought to Bombay one of the best shows of this kind that we have seen in many years ..combining as it does beauty with art and exquisite grace".

...THE EVENING NEWS OF INDIA. Bombay (19.9.1938)

"CALCUTTA ARTISTS GIVE FINE DISPLAY. All members of the Calcutta Art Players are to be congratulated on their respective contributions".

...THE TIMES OF INDIA, Bombay, (19.9.1933)

"রূপকথা" নাটক সম্বন্ধে (২৪২ পৃষ্ঠা)

"সি-এ-পি সম্প্রদায় গত দশ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় নৃত্যকলার সাধনা এবং রঙ্গমঞ্চে উন্নত রস ও মার্জিত রুচি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের সেই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে...রূপকথার কাহিনীকে মঞ্চে রূপ দিবার চেষ্টা এ পর্যন্ত আমাদের দেশে দেখা যায় নাই; আখ্যানভাগের অভিনবত্বে,